# বাংলায় ধনবিজ্ঞান

## দ্বিতীয় ভাগ

(১৯৩১-১৯৩৩)

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বিদ্যাবৈভব

এবং

শ্রীবনীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় তত্ত্বনিধি, শ্রীসুধাকান্ত দে, শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস পালিত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু, শ্রীযুক্তা সুষমা সেনগুপ্তা, ডক্টর মণীন্দ্রমোহন মৌলিক, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহা, শ্রীবাদল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাশগুপ্ত, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র ও শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

১৯৩৯

মূল্য ৩৲

# প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এস-সি

"বাংলায় ধনবিজ্ঞান" দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে ১৯৩১ হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে আলোচিত রচনাবলী স্থান পাইয়াছে। প্রথম ভাগে ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত সময়ের রচনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছিল। প্রথম ভাগ ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাদবপুর কলেজ অব্ এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজির রাসায়নিক এঞ্জিনীয়ার অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক-গণের পরামর্শদাতা। তিনি প্রথম ভাগের মত দ্বিতীয় ভাগেরও সম্পাদন করিয়াছেন। ডক্টর মণীন্দ্রমোহন মৌলিক ডি, এস-সি, পল (রোম) এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় বি, এস-সি, বি-এল বাণেশ্বর বাবুকে সম্পাদনের কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কোন লেখকের নিকট প্রুফ পাঠাইতে পারা যায় নাই। এই জন্য লেখকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

কলিকাতা,<br>জুলাই ১৯৩৯ } চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ

# সূচীপত্র

# ধনবিজ্ঞানের মুক্তিলাভ *

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

প্রায় আড়াই বৎসর পর আবার দেশে ফিরিয়া আসিলাম। আবার পুরাণো ঘানিতে জুড়িয়া যাইব। পুরাণো কথাই আর একবার নতুন করিয়া বলি। তবে যন্ত্রনিষ্ঠা, যন্ত্রপাতির লালসা, শিল্পনিষ্ঠা, কারখানা-নিষ্ঠা, ব্যাঙ্ক-নিষ্ঠা, বীমা-নিষ্ঠা, মজুর-নিষ্ঠা, মজুর-আন্দোলন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকবার অনেক বকিয়াছি। আজ আর সেসব লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিব না।

আমার ব্যবসা মজুরের কাজ করা। মজুরগিরি আমার বিভিন্ন প্রকারের। কখনও মোতায়েন আছি শিক্ষা-প্রচারে, কখনও বা বর্ত্তমান ভারতের জীবন কি রকম এবং আমেরিকা-জার্ম্মাণি ও চীন-জাপানের সহিতই বা এর যোগাযোগ কিরূপ, তাহা আলোচনা করি। আমার আর এক রকমের মজুরগিরি হইতেছে আর্থিক জগতের কোন্ দেশ কোন্ পথে চলিতেছে তার সন্ধান রাখা,—এবং উন্নতি-অবনতির, গতি-ভঙ্গীর জরীপ করা।

* ইয়োরোপ হইতে বিনয়বাবুর দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসিবার পর বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স-ভবনে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত চা-সভায় সম্বর্দ্ধনার উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম (৭ নবেম্বর ১৯৩১)। ("আর্থিক উন্নতি"—পৌষ, ১৩৩৮, ডিসেম্বর ১৯৩১)। পরিষদের গবেষকগণ ব্যতীত বহুসংখ্যক বণিক, বীমা-ব্যবসায়ী, শিল্প-নায়ক ও সংবাদপত্রসেবী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।—সম্পাদক।

"বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ" প্রতিষ্ঠা করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেমন মজুর, এ রকম আরও পাঁচ-সাত-দশ-বিশজনকে মজুর রূপে গড়িয়া তোলা। ইহা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। আমাদের কারবার ধনদৌলত সম্বন্ধে আলোচনা করা,—এ সম্বন্ধে খবরের কাগজ পড়া, কেতাব পড়া। এজন্য, ধনোৎপাদন যেখানে-যেখানে ঘটিতেছে সেইসব কর্ম্মকেন্দ্রে যাইয়া লোকজনের সঙ্গে মোলাকাৎ করা ইত্যাদি।

ধনদৌলত সৃষ্টি করা এই পরিষদের কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত নয়, বলাই বাহুল্য। তাহার জন্য ব্যবস্থা চাই অন্য রকমের। বঙ্গীয় বণিক্-সঙ্ঘের (বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের) বাড়ীতে বসিয়া আজ বকাবকি করিতেছি। সুতরাং ধনদৌলত সৃষ্টি করা কি কাজ এই মুহূর্ত্তে তাহার স্বতন্ত্র আলোচনা অনাবশ্যক। জ্ঞানবৃদ্ধি আর সাহিত্যসৃষ্টি ছাড়া এই পরিষদের আর কোনো মতলব থাকিতে পারে না এইটুকুই সম্প্রতি সজোরে বলা দরকার।

ধনদৌলতের আলোচনা করার চরম উদ্দেশ্য কি? ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চায় বাঙালীকে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম হইতে হইবে। উদ্দেশ্যটা খুব সোজা। তবে ইহা কার্য্যে পরিণত করা কষ্টসাধ্য,—এমন কি অনেক দিন পর্য্যন্ত আকাশ-কুসুম মাত্র।

বাঙালীরা ধনদৌলতের চর্চ্চায় অগ্রগামী জাতিদের অন্যতম হইতে পারে কিনা, এবং যদি পারে তাহা হইলে কি করিয়া হইতে পারে এবং কবে হইতে পারে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার একটা নেশার মধ্যে পরিগণিত। আর একটা গুরুতর কথা আছে। ধনবিজ্ঞান-বিদ্যাকে ইংরেজি ভাষার দাসত্ব হইতে মুক্তি দেওয়াও আমার একটা উদ্দেশ্য। ধনবিজ্ঞানের মুক্তিলাভ আমার জীবনের অন্যতম "পুরুষার্থ" বিশেষ।

## ধনবিজ্ঞানের বাংলা এম-এ

অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা চালাইতে হইবে বাংলা ভাষার বাহনে। ইংরেজি ভাষা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ চাই। কত দিনে কি উপায়ে বাঙালীর উচ্চতম শিক্ষা-ক্ষেত্রে ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্র,—কি কৃষি-বিষয়ক, কি শিল্প-বিষয়ক, কি বাণিজ্য-বিষয়ক,—একমাত্র বাংলা ভাষার মারফৎ আলোচিত হইবে, একথা আমার মাথায় যার-পর-নাই বড় স্থান অধিকার করে।

প্রশ্ন উঠিবে,—এম্-এ ক্লাসে ধনবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের জন্য বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভবপর কি? ১৯১১ সনে—সেই গৌরবময় স্বদেশী বিপ্লবের যুগে,—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে একটা প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলাম। তখনকার কথা ছিল,—বিশ্ব-বিত্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার ধাপে প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়ে বাংলা ভাষা কায়েম করিতে হইবে। সেই প্রস্তাবটাই আজ সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে চালাইবার কথা বলিতেছি। অন্যান্য বিত্যার কথা ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র ধনবিজ্ঞান বিত্যার সম্বন্ধে সেই বিশ বছর আগেকার প্রস্তাবই আবার খাড়া করিলাম।

আমি যেমন মজুর এই ধরণের মজুর বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কাজে বর্ত্তমানে আছে আর সাতজন। তাহারা সকলেই নির্ভরযোগ্য করিৎকর্ম্মা যুবা।

কিন্তু, আজই সারা বাংলা দেশ হইতে এই সাত জনেরই সমান সত্তর কি ষাট, কমসে কম্ পঞ্চাশ জন সংগ্রহ করিতে পারি। এদেরই সমান তাদেরও কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে, মাথাও আছে। কিন্তু এই পঞ্চাশ জনকে দুপেট খাইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করার দরকার। সেই ব্যবস্থা করার ক্ষমতা এই হাড়ে নাই।

খাইতে দিবার পর তাদেরকে কাজে লাগানো কঠিন নয়। যদি এদের প্রত্যেককে মাসে ১৫০৲ করিয়া দেওয়া যায়,—অধ্যাপক হইলে এই রকমই বেতন পাইয়া থাকে,—পঞ্চাশ জনে তাহা হইলে অঘটন ঘটাইতে পারে।

ধরা যাউক যেন বছর দশেকের জন্য মোসাবিদা বা "প্ল্যান" করিতেছি।

দশ বছর যদি এদেরকে রাখা যায়, তাহা হইলে খরচ পড়ে লাখ নয়েক টাকা। এই পঞ্চাশটি গরুকে শুধু বাথানে বাঁধিয়া রাখিলে চলিবে না, এদের জন্য "গোচারণের মাঠ" চাই। এদের মাঠে লইয়া যাওয়া চাই, কাহাকেও ব্যাঙ্কে, কাহাকেও বীমায়, কাহাকেও ফ্যাক্টরীতে পাঠানো দরকার হইবে। আবার কেহবা যাইবে বেড়াইতে জামসেদপুরে, কেহবা সিধা পাঞ্জাবের খাল-মণ্ডলে; আর এক-আধজন যদি পারে, সমুদ্র সাঁত্‌রাইয়া ওপারটা ঘুরিয়া আসিবে। যাইবে জাপানে, আমেরিকায়, রুশিয়ায়, ইতালিতে, জার্ম্মাণিতে ইত্যাদি।

এই যে গোটা পঞ্চাশেক গরু,—এরা দুধ দিবে কি রকম?

প্রথমতঃ, এদের কাজ হইবে অন্যান্য ভাষায়,—ইংরেজি, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান—অর্থশাস্ত্রের যে সব কেতাব আছে বাংলা ভাষায় সেই সবের তর্জ্জমা করা বা চুম্বক প্রকাশ করা। ইহার ফলে বাংলাভাষার মারফৎই ধনবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী বইগুলা পাওয়া যাইবে। তারপর, "আর্থিক উন্নতি" যেরকম মাসিক পত্রিকা সেরকম দশ-বারখানা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাগজ এক সঙ্গে চালানো সম্ভবপর হইবে। তাহার ফলে ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিষয়ক বহুবিধ রচনা বাঙালীর সাহিত্যে দাঁড়াইয়া যাইবে। এই সঙ্গে বলিয়া রাখি যে, এইসকল রচনা, সমালোচনা, টীকা-টিপ্পনীর ভিতর স্বাধীন চিন্তার এবং গবেষণার ঠাঁইও আছে বিস্তর।

এইভাবে কাজ চালাইতে পারিলে ১৯৪০ সনের মধ্যে বাঙালীর ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা ইংরেজি ভাষার দাসত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরচিন্তার তর্জ্জমা করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে না। স্বাধীন গবেষণার ফলও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

নয় লাখ টাকার হাঁক শুনিবা মাত্র আঁৎকাইয়া উঠিবার কথা। বস্তুতঃ, যুবক বাংলার আজকাল যে-অবস্থা তাহাতে মাথা-পিছু মাসিক টাকা পঞ্চাশেক (দেড় শ' নয়) ঢালিতে পারিলেও অনেক ডানপিটে গবেষক বাহাল রাখা সম্ভব। নয় লাখের কথা বলিলাম কেবল মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার জন্য। দেশের লোক একবার এই অধমকে,—সেকালের মতন একালেও,—কিঞ্চিৎ-কিছু সাহায্য করুন। অনেক-কিছু খাড়া করানো যাইবে।

## বিদেশী গবেষণা-পরিষদের ধরণ-ধারণ

'রিসার্চ্চ' বস্তুটা কি, এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কম। সেই জন্য প্রথমেই বলিতে চাই যে, গবেষণার মধ্যে মিষ্ট্রি, রহস্য, আধ্যাত্মিকতা কিছু নাই। প্রতিদিনের নিত্য-নৈমিত্তিক কারবার লক্ষ্য করিলেই অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা ফ্যাকটরি, ব্যাঙ্ক, বীমা, বহির্ব্বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতির কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কিরূপ অনুসন্ধান চালায় তাহা দেখিলেই এটা সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অতি সাধারণভাবে সিগারেট ফুঁকিতে-ফুঁকিতে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়া চলে। সেইগুলাই আবার কিছুদিন পরে কাগজ-পত্রে বাহির হইয়া থাকে।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্কুলমাষ্টার জনকতক নিয়োজিত আছে,

গবেষণা-বিভাগে,—ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক খবরাখবর সঞ্চয় করিবার জন্য। খবরের কাগজের কাটিং বা চিরকুট দিনের পর দিন জড় করিয়া তাহারা চিরকুটের লাইব্রেরী অনেক সময়ে খাড়া করিয়া তোলে। চিরকুট-গুলা সাজাইয়া-গুছাইয়া সেই সবের সারমর্ম্ম আবার প্রবন্ধাকারে বা পুস্তকাকারে বাহির করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরণের বিভাগ-সমূহই ইন্‌ষ্টিটিউট নামে পরিচিত।

ইয়োরোপের নানা প্রদেশে এইভাবে গবেষণা চালানো হইতেছে। এই যাত্রায় দেখিয়া আসিলাম যে, বিলাতের আর জার্ম্মাণির মজুরদলের কর্ম্মকেন্দ্রে এই ধরণের তথ্যসংগ্রহ হামেশা চলিয়া থাকে।

বার্লিনের আর ভিয়েনার ক্রাইসিস্‌-ইন্‌ষ্টিটিউট বা চক্র-পরিষৎ ত আছেই। ইতালিতেও মুসলিনি মোটা টাকা ঢালিয়া এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন।

তারপর, বাঘা-বাঘা ব্যাঙ্কের কেরাণীরাও পৃথিবীর উৎ-পাদন বিষয়ক সংখ্যা—কৃষি-সংক্রান্ত, শিল্প-সংক্রান্ত,—কোথায় বাড়্‌তি, কোথায় ঘাট্‌তি ইত্যাদি তথ্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যর অন্যান্য খবরাখবর সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহের জন্যই একদল কেরাণী বহাল থাকে। সেই সংবাদগুলা যখন কাগজে বাহির হয় আমরা রচনাবলীর বহর ও আকার-প্রকার দেখিয়া অবাক হইয়া যাই—ভয়ানক 'মিষ্টিরিয়াস' বলিয়া বোধ হয়। আসল কথা—রোজ-রোজ মামুলি সংবাদ সংগ্রহ করিতে-করিতে লোকেরা আর্থিক জীবনের উঠানামা আঁকিবার বিদ্যায় পাকিয়া উঠে। ইহার ভিতর মগজের কেরদানি—হাতী-ঘোড়া কিছুই নাই।

আর একটা বৃহৎ পরিষদের কথা উল্লেখ করিতেছি। সে জেনীভার আন্তর্জ্জাতিক মজুর পরিষৎ। সমস্ত দুনিয়ার খবর এখানে সংগৃহীত হয়,—মজুর হইতে পুঁজিপতির খবর পর্য্যন্ত। আর একটা পরিষৎ—

জেনীভার লীগ অব্ নেশ্যন্সের (বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের) আফিস। প্রত্যেক দেশের লোক এখানে পাওয়া যাইবে। ইংরেজ, ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্ম্মাণ ইত্যাদি ত বটেই, পোল, ফিন, চেক, রুমেণিয়ান, ডেনিশ, এবং আরও কত কি? মায় ভারতসন্তান পর্য্যন্ত। এখানকার অনেকেই ২।৩টা ভাষা জানে। এই দুইটা পরিষৎ গবেষকদের বাথান বিশেষ। দুঃখের বিষয় ভারতবাসীরা যে-কয়জন এখানে স্থান পাইয়াছে তাহারা সকলেই প্রায় কেরাণীস্থানীয়,—অর্থাৎ স্বাধীনভাবে মাথা খাটাইয়া কাজ করার দায়িত্ব তাহারা চাখিতে পারে না। তাহাদের প্রত্যেকেরই মাথায় হয় ইংরেজ না হয় আর-কোনো ইয়োরোপীয়ান "বড় সাহেব।" আমার বিবেচনায় ভারত-সন্তানের পক্ষে এই পদগুলা সামাজিক বা রাষ্ট্রিক হিসাবে লোভনীয় নয়। তাহাদের চরম মাহিয়ানার দৌড় মাসিক সাত-আট শ' টাকা। ভারত-সন্তানের বিচারে মাহিয়ানার পরিমাণটা লোভনীয় মালুম হওয়া অসম্ভব নয়। তবে ঐ আবহাওয়ায় এই বেতনটা অতি-কিছু নয়। মনে রাখিতে হইবে যে, এই পর্য্যন্ত বোধ হয় মাত্র একজন ভারত-সন্তান উঠিতে পারিয়াছে।

যে-সব ঘটনাবলী এইভাবে ইয়োরোপের পরিষদে-পরিষদে সংগৃহীত হইতেছে, সেইগুলাই আবার 'ব্লু-বুক' হইয়া নীল মলাটের ভিতরে বাহির হইয়া আসে। গবেষণার কোনো ধাপেই রহস্যময় অতি-কিছু নাই। সকলেই কাজ করিয়া চলিতেছে হাতে তুড়ি দিতে-দিতে। আমাদের বাংলা দেশে আজই শ'য়ে শ'য়ে এই ধরণের গবেষক এবং মণ-মণ গবেষণার দলিল জাহির করিতে পারি,—যদি "রূপচাঁদ" ঢালিবার ব্যবস্থা থাকে। দেশের লোকেরা একবার এই অধমকে গবেষণা-পরিচালনার সুযোগ দিয়া দেখুন না?

গবেষণা বস্তুটা হাতী-ঘোড়া নয়,—বারে বারে বলিতেছি।

দেশের লোকের চৈতন্য হউক। বাঙালীর ধনবিজ্ঞান-গবেষণাও ঠিক এইরূপ মামুলি জিনিষে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে, যদি বাংলা ভাষার সাহায্যে তথ্য-সংগ্রহ, সংখ্যা-সংগ্রহ, তথ্য-বিশ্লেষণ আর অঙ্ক-বিশ্লেষণ চালাইবার ব্যবস্থা করা যায়। "আর্থিক উন্নতি"র মতন দশ-বারখানা ধনবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রচারিত হইতে থাকিলেই বাংলা দেশে গবেষণা-জুজুর ভয় আর থাকিবে না। বিদেশী অর্থশাস্ত্রীদের সঙ্গে টক্কর দিবার কাজে বাঙালী ধনবিজ্ঞানসেবী মাত্রেই সাহসী হইতে পারিবে। আমি তে-রে-কা-টা সাধিয়া যাইতেছি মাত্র। দেখা যাউক বাঙালীর সাহস বাড়ে কিনা।

আমি ইংরেজিকে বয়কট বা বর্জ্জন করিতে বলিতেছি না। বস্তুতঃ আমি শুধু ইংরেজি কেন, ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্ম্মাণ, জাপানী ইত্যাদি ভাষা শিক্ষায়ও উৎসাহ দিয়া থাকি। তবে ফরাসীরা যেমন তাদের দেশীয় ভাষায় নিজেদের শিক্ষাকার্য্য চালায়, জাপানীরা যেরকম নিজের দেশে নিজের ভাষা দ্বারা শিক্ষা প্রচার করে, আমরা বাঙালী সেইরূপ বাংলা ভাষাকেই শিক্ষাদীক্ষার একমাত্র বাহন মনে করিব। ইহার ভিতর ভাবুকতা বা অতি-মাত্র উচ্ছ্বাস কিছু নাই। আমাদের দাবী এই যে, আগামী ৫।৭।১০ বছরের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার বিষয়ীভূত প্রত্যেক বিদ্যাকেই ইংরেজি ভাষার দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে হইবে। ধন-বিজ্ঞানের উচ্চতম আলোচনায়ও পঠন-পাঠন-গবেষণার সকল স্তরেই চাই বাংলা, চাই একমাত্র বাংলা।

## গবেষণার বিষয়

এই গেল ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় যুবক বাংলার পক্ষে অন্যতম চরম লক্ষ্য ও আদর্শের কথা। এইবার কয়েকটা গবেষণার ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। নিম্নলিখিত বিষয় কয়েকটা সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতে

পারিলে আমাদের একটা বড় অভাব পূর্ণ হয়। অন্ততঃ আমি নিজে সুখী হই যদি বাঙালী ধনবিজ্ঞান-সেবকেরা এইসকল বিষয়ে কতকগুলা বই বাজারে ঝাড়িতে পারে। আগামী তিন-চার বৎসরের ভিতর এইসকল আলোচনাই আমার কার্য্য-তালিকায় প্রধান ঠাঁই দখল করিবে। তবে ঘাড়ে এত সব দায়িত্ব রাখিয়া চলিতেছি যে, নিজে কতটুকু পারিব সে কথা স্বতন্ত্র। আমার পক্ষে কি সম্ভব তাহার কথা বলিতেছি না। দেশের অভাবের কথাই ভাবিতেছি।

প্রথমতঃ, ১৯০৫ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙালী লেখকেরা বাংলায় ও ইংরেজিতে ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাহা-কিছু চিন্তা করিয়াছে অর্থাৎ প্রকাশ করিয়াছে তাহার একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সঙ্কলন করা আবশ্যক। তাহার নাম হইতে পারে "যুবক বাংলার অর্থনৈতিক চিন্তা।" ১৯৩০-৩১ সনে মিউনিকের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টারি করিবার সময়ে এই বিষয়টার দিকেই বিস্তৃততররূপে ভারত-বাসীর নজর টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছি।

"ভির্টশাফ্‌ট্‌স্‌-ভিস্‌সেনশাফ্‌ট্‌লিখার গেডাঙ্কেনগাঙ ডেস ইণ্ডার্স জাইট ১৯০৫" (ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তা,—১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী-কাল) নামে জার্ম্মাণ ভাষায় একটা বই লিখিবার মতলব ছিল। তাহাই এক্ষণে বাংলা ভাষায়—একমাত্র বাঙালীর চিন্তা-বিষয়ক রচনার আকার গ্রহণ করিবে। এই ত সঙ্কল্প। দেখা যাউক এখানকার কোনো গবেষক অথবা অন্যান্য বাঙালী ধনবিজ্ঞানসেবীরা এই দিকে মাথা ঘামায় কি না।

দ্বিতীয়তঃ, মাথাপিছু বাঙালীর আয় কত এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাইতে চাই। অথবা অনুসন্ধান রুজু করাইতে ইচ্ছা করি। এজন্য দরকার হইবে জেলায়-জেলায় খুঁটিয়া-খুঁটিয়া তথ্য সংগ্রহ করার। মেহনৎ লাগিবে খুব। অনেক গবেষকের সমবেত কাজ আবশ্যক হইবে।

তৃতীয়তঃ, লোকবিদ্যা সম্বন্ধে লেখা-পড়া আমাদের দেশে খুব কমই চলে। বিদ্যাটা প্রধানতঃ সংখ্যা ঘাঁটাঘাঁটির মামলা। পরিষদের উদ্যোগে এই দিকে কিঞ্চিৎ-কিছু গবেষণার ব্যবস্থা করিতে পারিলে সুখী হইব।

চতুর্থতঃ, মজুর, মজুরি, মজুর-বিষয়ক আইন-কানুন, মজুরদের ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-বেকার-বীমা, মজুর-আন্দোলন ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙালী ধনবিজ্ঞানসেবীদের মহলে লেখালেখি সুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিষদের তদ্বিরে কোনো-কোনো গবেষককে এই কাজে বাহাল রাখিতে পারিলে সুখী হইব।

পঞ্চমতঃ, দুনিয়ার ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের যেসকল ইংরেজি, মার্কিণ, ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান ও অন্যান্য বই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তাহার ভিতর গ্রন্থকারদের মৌলিক ( বা স্বকীয় ) কতখানি আর ধার-করা ( বা পরকীয় )ই বা কতখানি তাহা জরীপ করিয়া বাংলা ভাষায় একখানা বই প্রকাশ করা আবশ্যক। এই দিকেও দেশের লোককে মাথা খেলাইবার জন্য ডাকিতেছি। এই ধরণের বই বাহির হইয়া গেলে বাঙালী লেখক, পাঠক, মাষ্টার মহাশয়রা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিদেশী গ্রন্থকারদের মতন বাংলা ভাষায় গ্রন্থকার গড়িয়া তুলিবার জন্য বাংলা দেশকে বিশ-পঁচিশ বৎসর বসিয়া থাকিতে হইবে না। বাঙালী জাতি আজই ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে সমর্থ,—"বারেক জাগিয়া করিলে পণ"। দেশের লোককে কথাটা যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে বলিতেছি।

## ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ

যাহাকে বিশ্লেষণাত্মক ( আনালিটিক্যাল ) বা তত্ত্বমূলক ( থিয়োরেটি-

ক্যাল ) ধনবিজ্ঞান বলে এখন পর্য্যন্ত আমি সেই দিকে বেশী নজর দিতে পারি নাই। বস্তুতঃ ১৯২৬ সনে "আর্থিক উন্নতি" প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বস্তুনিষ্ঠা আর দুনিয়া-নিষ্ঠার উপর বাঙালী ধনবিজ্ঞান-সেবীদের নজর বিশেষরূপে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছি। অবশ্য দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক-বীমা-বাণিজ্য-মূল্য-কর-মুনাফা-মজুরি ইত্যাদি বস্তুবিষয়ক তথ্যগুলা বিশ্লেষণ করিতে-করিতেই কিছু-না-কিছু থিয়োরি বা তত্ত্ব গৌণভাবে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য। কিন্তু মুখ্যতঃ থিয়োরির বা তত্ত্বাংশের দিকে নজর দেওয়া তখন উদ্দেশ্য ছিল না। ঘটনাচক্রে আজও বেশী-মাত্রায় সম্ভবপর নয়। বস্তু ও সংখ্যা আর সংখ্যা ও বস্তু,—এই দুই দুনিয়ার ভিতর পায়চারি করা আর এই দুই মুল্লুকের মালগুলা বিশ্লেষণ করা এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঙালী অর্থশাস্ত্রীদের প্রধান ধান্ধা হওয়া উচিত। তবে বলিয়া রাখি যে, মুখ্যতঃ তত্ত্ব-বিশ্লেষণের কাজে মাথা খেলাইতে যাওয়া অন্যায় নয়। সেই দিকে মাথা খেলাইতেও হইবে। বস্তুতঃ তত্ত্ব-বিশ্লেষণের জগতে হাত দেখাইতে পারার পূর্ব্বে ভারতীয় ধনবিজ্ঞানসেবীরা ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার রাজ্যে নাম করিতে পারিবে না। ধনবিজ্ঞানসেবী বা অর্থশাস্ত্রীরূপে দুনিয়ায় ইজ্জৎ পাইতে হইলে ভারতীয় সুধীগণকে তত্ত্ব-বিশ্লেষণে পাকিয়া উঠিতেই হইবে।

"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এই-সকল তত্ত্বের কিছু-কিছু আলোচনা আছে। বইটা যন্ত্রস্থ। এক ঘাড়ে চালাইতে হয় ধন-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান। এই তিন-তিনটা স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বিদ্যার মুল্লুকে যে-যে ধরণের দায়িত্ব লওয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বাংশের মুখ্য আলোচনা এখনো কিছু কাল অল্পমাত্র খাপ খাইবে। তবে এখনই যদি কোনো বাঙালী সেই দিকে মাথা খেলাইতে রাজি থাকে তাহাতে বাঙালী

জাতির লাভ ছাড়া লোকসান নাই। আমার নিজের মেজাজ খেলিতেছে প্রধানতঃ উন্নতি-তত্ত্বের বিশ্লেষণ-কাণ্ডে। আর্থিক জীবনের সাম্য-সম্বন্ধগুলার বিশ্লেষণই প্রধান ধান্ধা রহিয়াছে।

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি যে-ধরণের ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্ব-বিশ্লেষণের কথা বলিতেছি তাহা আজ ১৯৩১ সনের শেষাশেষি গোটা ভারতের কোথাও অনুষ্ঠিত হইতেছে না। এই কথাটা প্রত্যেক বাঙালী ও অ-বাঙালী ভারতীয় সুধীর বিনা গোঁজা-মিলে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থের প্রথমভাগে (১৯৩০) ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের দৌড় খতাইয়া দেখিয়াছি। তাহাতে অর্থশাস্ত্রী হিসাবে বাঙালী বা অন্যান্য ভারত-বাসীর গৌরব করিবার কিছু নাই। ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ ভারতে কেন আলোচিত হইতেছে না, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে তত্ত্বাংশের আলোচনা সুরু হইতে পারে,—এইসকল বিষয়ে তর্কপ্রশ্ন, বাদানুবাদ, শল্লা-পরামর্শ চলা উচিত। দুঃখের কথা, তর্কপ্রশ্ন এখনো চলিতেছে না,—বলিতে হইবে। এমন কি অভাববোধই সৃষ্ট হয় নাই মনে হইতেছে। অভাবের দিকে আমাদের এক প্রকার ভ্রূক্ষেপই নাই বলা যাইতে পারে।

এক কথায় আমি আমার পাঁতি দিয়া রাখিতেছি। পঁচিশ-আঠাশ বৎসর বয়স্ক যুবাদের পক্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া শহরে ও পল্লীতে বস্তুনিষ্ঠ ও সংখ্যানিষ্ঠ গবেষণার কাজে লাগিয়া থাকা আবশ্যক। যন্ত্রপাতি, ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্ব্বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক কর্ম্মকেন্দ্রে মাস ছয়েক হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করাও চাই। তাহার পর বৎসর চার-পাঁচেকের জন্য ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন দেশে গিয়া কোনো-কোনো মাতব্বর অর্থশাস্ত্রীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেই সকল অর্থশাস্ত্রীদের টোলে মূল্য, মজুরি, চক্র, মুদ্রা, কর, সুদ, মুনাফা ইত্যাদি সম্বন্ধে যেসকল

গবেষণা চলিতেছে সেইসকল গবেষণার ভিতর "দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়া" চাই। সেখানে গিয়া ভারতীয় পল্লীর নৃতত্ত্ব আর ভারত-সরকারের শুল্কনীতির ইতিহাস জাহির করিলে চলিবে না। আর একটা কথাও বলার দরকার। অঙ্কশাস্ত্রে খানিকটা দখল থাকা আবশ্যক। তাহার ভিতর সংখ্যা-বিজ্ঞানের আবহাওয়াও চাই। অঙ্ক আর সংখ্যাবিজ্ঞানকে অর্থশাস্ত্রের সহায়করূপে ব্যবহার করিবার মত ক্ষমতা থাকিলেই হইল। এই দুই বিদ্যায় রথী বা মহারথী না হইলেও ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ববিশ্লেষণের কাজ চলিয়া যাইবে। তবে যোগ-বিয়োগে আঁৎকাইয়া উঠিলে অথবা বক্রিম ছবি দেখিবামাত্র চিৎ হইলে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বে প্রবেশ সহজ হইবে না।

এই পাঁতি মাফিক কাজ চালানো বর্ত্তমানের বাংলায় বা ভারতে সম্ভবপর কি? এখনো সম্ভাবনা যারপরনাই কম মনে হইতেছে। আসল মামলা এখানে স্বদেশ-সেবার। দেশটা যে ধনবিজ্ঞানবিদ্যায়, আর বিশেষতঃ ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশে নেহাৎ গরীব এই ধারণাটা প্রথমে দেশের লোকের মাথায় বসা আবশ্যক। যতখানি আন্তরিক স্বদেশ-সেবার প্রবৃত্তি থাকিলে ভারতের লোক এইসকল অভাবের কথা ভাবিতে পারে ততখানি আন্তরিক স্বদেশ-সেবা ভারতের কোথাও,—১৯২৫ সনে প্রথমবার দেশে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে আজ দ্বিতীয়-বার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত,—দেখিতে পাইতেছি না। ভারতীয় লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকজনের মহলে-মহলে প্রায় সকলেই যেন এক-একটা "আঙুল ফুলে' কলাগাছ" বিশেষ। যে-দেশের লোকেরা নিজের খেয়ালে নিজকে বড় ভাবিয়া গ্যাঁট হইয়া বসিয়া থাকে সেই দেশের উন্নতি বহু সময়-সাপেক্ষ। উচ্চতর আদর্শের চর্চ্চা এই সকল লোকের মেজাজে উৎপাত-স্বরূপ। নতুন-নতুন অভাবের কথা এই আবহাওয়ায় আলোচিত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। কাজেই এই অভাববোধ সৃষ্টি

করিবার জন্ম আর তাহার পর এই অভাব-মোচনের ব্যবস্থা করিবার জন্ম বঙ্গ-মাতা আর ভারত-মাতাকে এখনো অনেক দিন বসিয়া থাকিতে হইবে। দেখা যাউক কত দিন। আজ ১৯৩১ সনের নবেম্বর। প্রত্যেক তিন-তিন বৎসর, পাঁচ-পাঁচ বৎসর অথবা দশ-দশ বৎসর পর অবস্থাটা জরীপ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

বিদেশী ভাষার আওতা হইতে ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে উদ্ধার করা বাংলায় ধনবিজ্ঞানের মুক্তিলাভের প্রথম উপায়। মুক্তিলাভের দ্বিতীয় উপায় হইতেছে,—যখন-তখন আর যেখানে-সেখানে ভারতীয় পল্লী এবং ভারত-গবর্মেণ্টের আর্থিক-নীতির কাহিনীতে মজিয়া না থাকা। বরং একদম দেশ-নিরপেক্ষ ও কাল-নিরপেক্ষ কার্য্য-কারণসমূহের গবেষণার জন্ম বিদেশী টোলে-টোলে পায়চারি করা বাঞ্ছনীয়।

সুদ-তত্ত্ব, মজুরি-তত্ত্ব, মুনাফা-তত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বগুলাকে কোনো নির্দ্দিষ্ট দেশ বা কোনো নির্দ্দিষ্ট কালের সঙ্গে জড়াইয়া না রাখিয়া আলোচনা চালাইতে অভ্যাস করা আবশ্যক। দেশ হইতে আর কাল হইতে মুক্ত হইলে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা স্বরাজ অর্জ্জন করিতে পারিবে। ধনবিজ্ঞানের এই বিচিত্র মুক্তিলাভ সম্বন্ধে ভারতে আমরা আজও সজাগ হইয়াছি কিনা সন্দেহ। তাহার আবশ্যকতা আমি অনেক দিন হইতেই বোধ করিতেছি। গবেষণার সময়ে অথবা গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে অন্ততঃ পক্ষে ভারতকে ভুলিয়া থাকিতে অভ্যাস করিলেও স্বরাজশীল ধনবিজ্ঞানের মূর্ত্তি কিছু-কিছু নজরে আসিতে পারে। ক্রমশঃ সব কয়টা দেশ ভুলিয়া গবেষণা চালাইবার মতন যোগ্যতা জন্মিবে। ১৯২৬ সনে মাদ্রাজে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" গ্রন্থে এই ভারত-নিরপেক্ষ গবেষণা-প্রণালীর উপর বিশেষ জোর দিয়াছি।

ধনবিজ্ঞানের মুক্তিলাভের জন্ম অন্যান্ম দু'একটা পথ বাৎলানো

যাইতে পারে। "আর্থিক উন্নতি" প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তাহা বাৎলানো হইতেছেও।

## বণিক-সঙ্ঘ ও ধনবিজ্ঞান

আজই পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, টাকা-পয়সা রোজগার করা এক প্রকার ব্যবসা আর ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা চালানো, সাহিত্য সৃষ্টি করা, তত্ত্বের অনুসন্ধান করা আলাদা ব্যবসা। কৃষি,শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি চালাইয়া ধনদৌলত সৃষ্টি করা এক জিনিষ আর কৃষি, শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি ধনদৌলত সৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে হদিশ দেখানো বা মোল্লাগিরি করা আর এক জিনিষ। সুতরাং ধনদৌলত-স্রষ্টার নিকট যাহা আশা করা যায় ধনদৌলত-শাস্ত্রীর নিকট তাহা আশা করা উচিত নয়। আজ আমরা যে-ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতেছি সে হইতেছে ধনদৌলত-স্রষ্টাদের ঘর। তাঁহাদের অনেকে এখানে উপস্থিত আছেন। ইহা আনন্দের কথা। এই ঘরের মালিক বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স (বাঙালীর জাতীয় বা স্বদেশী বণিক-সঙ্ঘ)। এই চেম্বারের বা সঙ্ঘের সভ্যেরা ধনদৌলত সৃষ্টি করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে ধনবিজ্ঞান-পরিষদের যোগাযোগ নেহাৎ উড়ু-উড়ু মাত্র। তাঁহারা কেজো লোক। আমরা এইসকল কেজো লোকের অভিজ্ঞতাসমূহকে আমাদের গবেষণার বস্তুমাত্র বিবেচনা করি।

ব্যস্, এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ। কিন্তু কেজো লোকের জীবন আমাদের আলোচ্য বিষয় বলিয়া তাঁহাদের মতামতগুলা আমরা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য এরূপ বুঝিলে ভুল করা হইবে। চাষী, শিল্পী, বণিক্, ব্যাঙ্কার, বীমাদার, মজুর, কুলী, জমিদার, পুঁজিদার ইত্যাদি প্রত্যেকেই নিজ-নিজ উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে লাভ-লোকসান সম্বন্ধে এবং সুখ-দুঃখের কারণ সম্বন্ধে নিজ-নিজ মেজাজ-মাফিক নিজ-নিজ

স্বার্থ মাফিক মত প্রচার করিবে ইহা ত স্বাভাবিক। ধনবিজ্ঞানের সেবক হিসাবে আমরা তাঁহাদের আলোচনাগুলা, মতামতগুলা শুনিব বটে। যদি এই সমুদয়ের কোনো-কোনোটা আমাদের বিচারে গ্রহণীয় হয় তাহা হইলে আমরা সেইগুলা গ্রহণ করিব। কিন্তু অন্যান্য মতামত সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারিব না। অর্থাৎ ধনবিজ্ঞান বিদ্যার একটা স্বাধীনতা আছে। কোনো ব্যক্তি ব্যাঙ্ক চালাইতে ওস্তাদ বলিয়া অথবা আর-একজন বহির্ব্বাণিজ্যে লক্ষপতি হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অথবা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা-কিছু বলিয়া যাইবেন ধনবিজ্ঞানের সেবকেরা তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে হজম করিতে বাধ্য নয়। সবই বিচার, যুক্তি, তর্ক, হাতাহাতি, পাঞ্জা-কষাকষির মামলা। ধনবিজ্ঞানসেবীরা স্বরাজশীল স্বাধীনতানিষ্ঠ চিন্তার কারবার করিয়া থাকে।

বাংলাদেশে আর বাংলার বহির্ভূত ভারতে ধনবিজ্ঞানের স্বরাজ সম্বন্ধে লোকজনের মাথাটা আজও পরিষ্কার নয়। পয়সাওয়ালা বেপারীরা, বীমার দালালেরা, ফ্যাক্টরির মালিকেরা, অথবা মজুর-নায়কেরা, কিম্বা জমিদারেরা অথবা চাষীরা যেসকল মত প্রচার করিতে অভ্যস্ত সেইসকল মতে সায় দিবার দিকে যদি কোনো ধন-বিজ্ঞানসেবীর মেজাজ না খেলে তবে তাহাকে নেহাৎ গরু, আহাম্মুক অথবা পণ্ডিত-মূর্খ বিবেচনা করা দস্তুর দেখা যায়। এই দস্তুর হইতে ধনবিজ্ঞানকে উদ্ধার করা বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ নিজের অন্যতম ধান্ধা বিবেচনা করিয়া থাকে। বাংলায় ধনবিজ্ঞানের মুক্তিলাভের জন্য ধনবিজ্ঞান-সেবীদিগকে সর্ব্বদা এই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক ওস্তাদ-মণ্ডলের আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। তাঁহাদের সঙ্গে অসহযোগ চাই না। চাই মাখামাখি পুরাদস্তুর। তাহা না হইলে ধনবিজ্ঞানের গবেষণা বস্তুনিষ্ঠ হইবে না। তবে তাঁহাদের

মতগুলা বেদবাক্যস্বরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া চলিবে না। তাঁহাদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালাইবার সময় ধনবিজ্ঞান-সেবীদিগকে নিজ-নিজ স্বাধীনতা বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। অনেক সময় তাঁহাদের সঙ্গে একমত হওয়া চলিবে কিনা সন্দেহ। এ কথা প্রথম হইতে দুই পক্ষেরই জানিয়া রাখা উচিত।

## রাষ্ট্রিক আন্দোলন ও ধনবিজ্ঞান

এই গেল মুক্তিলাভের তৃতীয় উপায়। চতুর্থ উপায়ও বাৎলাইতেছি। সে হইতেছে কথায়-কথায় রাষ্ট্র, রাষ্ট্রিকতা, রাষ্ট্র-নৈতিক মতামত, রাষ্ট্রিক স্বার্থ ইত্যাদির দোহাই না পাড়া। আর্থিক জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রের, শাসন-ব্যবস্থার, রাষ্ট্রিক অর্থনীতির, রাজস্ব-ব্যবস্থার, রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলির যোগাযোগ নিবিড় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমুদয়ের কথা না তুলিয়াও,—আর এই সমুদয়ের প্রভাবে অতিমাত্রায় বিচলিত না হইয়াও কৃষি-নীতি, শিল্প-নীতি, শুল্ক-নীতি, মুদ্রা-নীতি ইত্যাদি গণ্ডা-গণ্ডা আর্থিক নীতির বিশ্লেষণ চালানো যাইতে পারে। দেশ-বিদেশের অর্থশাস্ত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই রাষ্ট্রনৈতিক জীব হিসাবে কোনো-না-কোনো দলের লোক। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের গবেষণা চালাইবার সময় তাহারা আদামুণ খাইয়া হস্ত-দন্তভাবে কোনো একটা মতের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে উকিলি সুরু করিতে ঝুঁকে না। রাষ্ট্রনীতির কবল হইতে ধনবিজ্ঞানকে বাঁচানো ধনবিজ্ঞানের স্বরাজ বা মুক্তিলাভের অন্যতম উপায়। এই লক্ষ্যের বা আদর্শের কথা ১৯২৬ সনের ২৬ জানুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকার মারফৎ দেশবাসীকে জানাইয়া দিয়াছি। "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য (১৯২৭)। ধনবিজ্ঞানের সেই স্বরাজবিষয়ক আদর্শ আজও আবার খোলাখুলি বলিয়া রাখিলাম।

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ওস্তাদগণের সঙ্গে লেনদেনের সময় যেমন চাই ধনবিজ্ঞানসেবীদের স্বাধীনতা, তেমন গবর্মেণ্ট, গবর্মেণ্ট-ঘেঁশা লোকজন, আর গবর্মেণ্ট-বিরোধী দল বা ব্যক্তিদের সঙ্গে আনাগোনার সময়ও চাই ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা। এক-তরফা রায় দিবার খেয়াল ধনবিজ্ঞান-সেবীদের মগজ হইতে ঝাড়িয়া ফেলা কর্ত্তব্য। অর্থ-শাস্ত্রের আখড়ায় গবর্মেণ্ট-বিরোধী মেজাজ যেমন বর্জ্জনীয়, গবর্মেণ্ট-পক্ষীয় মেজাজও সেইরূপই বর্জ্জনীয়। চাই আলোচনা, তর্ক-প্রশ্ন, বিচার, যুক্তিনিষ্ঠা, স্বাধীন চিন্তার খেলা। এই আবহাওয়ায় ধনবিজ্ঞান বিদ্যা নয়া মূর্ত্তিতে তাহার স্বরাজ দেখাইতে সমর্থ হইবে।

আমাদের দেশে গবর্মেণ্ট-বিরোধী রাষ্ট্রিক কংগ্রেস যে-ধরণের অর্থ-নৈতিক কর্ম্মকৌশল পছন্দ করিতে অভ্যস্ত ভারতীয় বণিক্-সঙ্ঘের বণিক্-ব্যাঙ্কার-পুঁজিপতিরা প্রায় অবিকল সেই অর্থনীতির প্রচারক। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই চোখ-কান বুঁজিয়া কংগ্রেসের দেখাদেখি স্বদেশী বণিক-সঙ্ঘগুলা,—আর স্বদেশী বণিক-সঙ্ঘের দেখাদেখি কংগ্রেস,—গবর্মেণ্ট-প্রবর্ত্তিত বা গবর্মেণ্ট-সমর্থিত অর্থনীতির বিরোধী। ধনবিজ্ঞানের আখড়ায় বা টোলে এইরূপ চোখ-কান-বুঁজা গবর্মেণ্ট-বিরোধী নীতির সমর্থন যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইবে না। ধনবিজ্ঞানের মুক্তিলাভ যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই কথাটা তলাইয়া-মজাইয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য, কম-সে-কম রাষ্ট্রিক আন্দোলন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার জন্য যখন-তখন যে-কোনো গবর্মেণ্ট-প্রবর্ত্তিত আর্থিক প্রচেষ্টার বিরোধী হওয়া বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। কাজেই কংগ্রেস ও চেম্বার-অব-কমার্সের পক্ষে দেশের ভিতর এই ধরণের বিরোধ সৃষ্টি করা খুবই সঙ্গত কাজ। লোক ক্ষেপাইবার জন্য এইসব আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের পরিষদে অর্থনৈতিক কর্ম্মকৌশল-গুলাকে সাধারণতঃ জনগণের আর্থিক মঙ্গলামঙ্গলের তরফ হইতেই

যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই ধন-বিজ্ঞানসেবীদিগকে কংগ্রেস ও বণিক-সঙ্ঘের মতে সায় দেওয়া সম্ভবপর না হইতেও পারে। ধনবিজ্ঞানের স্বরাজ বা মুক্তিলাভ বলিলে এই বিচিত্র অবস্থাও বুঝিতে হইবে।

## আডাম স্মিথের যুগে রহিয়াছে একালের বাঙালী

মনে হইবে যেন বাঙালী ধনবিজ্ঞানসেবীদের চরম লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে লম্বা-লম্বা বোলচাল ঝাড়িতেছি। বিলাত, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি ইত্যাদি বাঘা-বাঘা দেশের ধনবিজ্ঞান-পরিষদের আবহাওয়ায় চলা-ফেরা করিতে-করিতে বুঝি মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে! ব্যাপার তত গুরুতর নয়। গোটা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা—আর বিশেষতঃ বাংলাদেশের বর্ত্তমান অবস্থা,—ধনবিজ্ঞানবিদ্যার চর্চ্চায় কত হীন—তাহা আমার সর্ব্বদা জানা আছে। এই বিষয়ে চোখ বুঁজিয়া কথা-বার্ত্তা বলা অথবা আকাশ-কুসুম কল্পনা করা এই হাড়-মাসের রেওয়াজ নয়।

আজকালকার ভারতে আমরা একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে নানা প্রকার আধুনিকতম বই, প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি পড়িয়া থাকি বটে। কিন্তু ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-গবেষণার ফিরিস্তি লইবার সময় ইস্কুল-কলেজে বই-পড়ার আর পরীক্ষায় পাশ করার হিসাব লইলে চলিবে না। এমন কি পরীক্ষায় পাশের জন্য যে "থীসিস"-জাতীয় বই লিখিতে হয় তাহাও অন্তর্গত করা ঠিক নয়। অর্থনৈতিক লেখালেখির ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের দৌড় বিংশ শতাব্দীর দুনিয়ার মাপকাঠিতে অতি-সামান্য। এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মিল্-মার্ক্সের যুগে দুনিয়ার ধনবিজ্ঞান-চিন্তা যে-দরের ছিল বর্ত্তমানে ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-

চিন্তার দর ততখানি পর্য্যন্ত উঠিতে পারে নাই। রমেশচন্দ্র ও রাণাডে হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীরা যতখানি লেখালেখি করিয়াছে অর্থাৎ যতখানি ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে,—বিশেষতঃ ইস্কুল-কলেজের পরীক্ষা-নিরপেক্ষ হইয়া যতটা ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় কালি-কলমের সদ্ব্যবহার করিয়াছে,—তাহার কিম্মৎ বুঝিতে হইলে অষ্টাদশশতাব্দীর বিলাতী-ফরাসী-জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান চিন্তামণ্ডলে প্রবেশ করিতে হইবে। অতিরঞ্জিতভাবে হিসাব করিতেছি কিনা সন্দেহ।

আমার বিবেচনায় ১৯৩১ সনে ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা বিলাতী আডাম-স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) ও রিকার্ডোর (১৭৭২-১৮২৯) মাঝামাঝি যুগ ছাড়াইয়া আসিতে পারে নাই। রিকার্ডো বলিলে বুঝিতে হইবে এমন একটা চিন্তাবীর যে ধনবিজ্ঞানটাকে বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব-রাশিতে ভরিয়া একটা বিলকুল নয়া বিদ্যার জন্ম দিয়াছে। আর তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আডাম স্মিথ দেশী-বিদেশী সম্পদের তথ্য,—দুনিয়ার ধনদৌলত বা স্বদেশী সম্পদবৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল,—ইত্যাদি নানা তথ্যের সঙ্কলনকর্ত্তা বা সংগ্রাহক। ধনবিজ্ঞানের "তত্ত্বাংশ" সম্বন্ধে আডাম স্মিথকে বড়-বেশী ইজ্জদ দেওয়া চলিবে না। আডাম স্মিথ প্রধানতঃ কর্ম্ম-কাণ্ডের দার্শনিক, কর্ম্মকৌশলের পণ্ডিত। রিকার্ডোর লেখালেখিতেই ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা বিজ্ঞানের মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। ভারতে আমরা রিকার্ডোর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো একটা অবস্থায় রহিয়াছি। সেই জন্য মোটের উপর বলিতেছি যে, বিজ্ঞানের বাটখারায় ফেলিলে ১৯৩১ সনের যুবক ভারত ঠিক যেন আডাম স্মিথের যুগে রহিয়াছে। নিক্তির ওজনে কড়ায়-ক্রান্তিতে এসব জিনিষের সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। সবই ঠারে-ঠোরে বুঝিতে হইবে।

বাঙালী আর অন্যান্য ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের জন্য ধনবিজ্ঞানের মুক্তিলাভ সম্বন্ধে যতই আশা, উৎসাহ, ভাবুকতা পায়দা করিতে চাই

না কেন, আমাদের বর্ত্তমান শৈশবাবস্থা সম্বন্ধে ধারণা আমার ধোঁআটে নয়। আমরা কোথায় আছি এই কথাটা নিরেটভাবে জানা থাকিলে ধাপে-ধাপে উন্নতি করা অথবা উন্নতির পথ ঠাওরানো সম্ভবপর হইবে।

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-গবেষণার বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মূল্য সম্বন্ধে দারিদ্র্য ও দৈন্যের কথা বলিলাম। এমন কি যদি লেখালেখির সংখ্যা বা পরিমাণ মাত্র হিসাব করিয়া দেখি তাহাতেও লজ্জা নিবারণের কোনো উপায় ঢুঁঢ়িয়া পাই না। প্রবন্ধ, পুস্তিকা আর গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে ভারতীয় এবং বিশেষতঃ বাঙালী ধনবিজ্ঞানসেবীরা শামুকের রীতিতে অগ্রসর হইতেছে। ১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব হইতে আজ পর্য্যন্ত,—এমন কি ১৯২৫ সনের পরবর্ত্তী এ কয় বৎসরের,—লেখালেখি জরীপ করিলে দেখা যায় যে, ফি বৎসর এমন কি একখানা করিয়া বইও বাঙালীরা বাংলায় অথবা ইংরেজিতে বাহির করিতে পারে নাই। পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য যেসব "থীসিস"-জাতীয় রচনা লিখিতে হয় সেইসব বাদ দিলে অবস্থা আরও সঙ্গীন দাঁড়াইবে।

পরীক্ষায় পাশের জন্য যেসকল বই লেখা হয় তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার গুরুতর কারণ আছে। প্রথমতঃ, এই সবের ভিতর লেখকের মানসিক স্বাধীনতা খুব কম দেখা যায়। কোন্-কোন্ মত পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার সম্ভাবনা সেই দিকে নজর রাখিয়া লেখকেরা তথ্যসংগ্রহ ও তত্ত্ব পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এক কথায়,—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরীক্ষকদের মর্জ্জি মাফিক বই লেখা হয়। ইহার চেয়েও গুরুতর আপত্তি আছে। পরীক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া বই লেখালেখির ভিতর কোনো লেখকের চরিত্রে গবেষণার আকাঙ্ক্ষা বা স্বভাব আছে কিনা বুঝা যায় না। পরীক্ষায়

ডিগ্রী পাইবার পর লেখক আদৌ লেখাপড়ার ঝোঁক রক্ষা করিয়া চলিবে কিনা তাহার স্থিরতা নাই। এই কারণে পরীক্ষায় পাশ-ফেলের পর লেখকেরা যেসকল রচনা প্রকাশ করে তাহার হিসাব লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

## গবেষকদের অন্নচিন্তা

বর্ত্তমান ধনবিজ্ঞান-পরিষদের কাছে বেশী-কিছু আশা করা উচিত নয়। কেন না এই পরিষদের গবেষকগণ এখানে-ওখানে-সেখানে খাটিয়া ভাত-কাপড় জুটাইয়া থাকে। অন্নচিন্তার হাঙ্গামা সাম্‌লাইবার পর অবসর মত গবেষণা চালানো তাহাদের দস্তুর। লেখাপড়ার জন্য তাহারা এক আধ্‌লাও পায় না। এই অবস্থায় তাহাদের পক্ষে দু'এক বৎসরের বেশী লেখা-পড়ার কাজে লাগিয়া থাকা সম্ভবপর নয়। নিয়মিতরূপে বেশী-দিন লাগিতে পারিলে কাজের পরিমাণও বেশী হইতে পারে আর মূল্যও উঁচু দরের হইতে পারে। বর্ত্তমানে গবেষকদের সুমতির উপর দেশের পক্ষে যতটুকু নির্ভর করা উচিত তাহার বেশী আশা করা অন্যায়। যাহারা লেখাপড়ার কাজের জন্য নিয়মিত টাকা-পয়সা রোজগার করিয়া থাকে তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও অধ্যবসায়ের উপরই অন্যান্য বিজ্ঞানের মতন ধন-বিজ্ঞানেরও ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার বর্ত্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে মাথা পরিষ্কার রাখিয়া কাজে নামিলে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আর অন্যান্য বাঙালী ধনবিজ্ঞান-সেবীরা নিজ-নিজ কর্ত্তব্যের পথ সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবে। এই জন্যই একদিকে আশমানের চাঁদের কথাও পাড়িলাম আবার অপর দিকে আমাদের খানা-ডোবা-নর্দ্দমার কথাও মনে করাইয়া

দিলাম। নর্দ্দমার ভিতর নাক গুঁজিয়া আশমানের সাধনা করা ১৯০৭ সন হইতে বরাবরই এই অধমের স্বভাব-সিদ্ধ।

একটা সোজা কথা সকলেরই মালুম হইবে। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকেরা গবেষক হিসাবে কোনো দিনই দুপয়সা করিতে সমর্থ হইবে না। টাকা রোজগারের পথ এ নয়। লেখাপড়ার কোঠে পয়সার খেলা নাই,—বিশেষতঃ যে কিম্ভূতকিমাকার লেখাপড়ায় আমাদের মতিগতি! পরিষদের পক্ষে এই ধরণের লোভ দেখানো অসম্ভব। অধিকন্তু টাকা-পয়সার জোরে সমাজে যে-শ্রেণীর সরকারী-বেসরকারী মানসম্ভ্রম, ইজ্জৎ, খ্যাতি ইত্যাদি পায়দা হয় তাহার লোভ দেখানোও পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব ফুস্‌লাইয়া লোক জড় করা বা ভিড় জুটানো এই পরিষদের মুরোদে কুলাইবে না। এই পথ কষ্টস্বীকারের পথ, স্বার্থত্যাগের পথ, "নিজের খেয়ে বনের ম'ষ তাড়াবার" পথ। যে-সময়টা লোকেরা আড্ডা মারিয়া এবং পরচর্চ্চা করিয়া আনন্দ পায় সেই সময়টা ফ্যাক্টরিতে, কারখানায় বা লাইব্রেরিতে নষ্ট করিবার মতন কলিজা যাহাদের আছে একমাত্র তাহাদের পক্ষে এই পরিষদের গবেষক হওয়া সম্ভব।

গবেষকেরা লেখক হিসাবেও পয়সা রোজগার করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করি না। এই বাথানে লেখক তৈয়ারি করাই অথবা লেখক হইবার সুযোগ দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু লেখকদের রচনা বাজারে বিকাইবে এরূপ ভরসা রাখি না। "আর্থিক উন্নতি"র যদি পাঠক ও গ্রাহক থাকে, ভাল কথা। কিন্তু না থাকিলেও দুঃখ নাই। কেননা আমাদের আসল মতলব,—ধনবিজ্ঞান বিষয়ক লেখক সৃষ্টি করা। ধনবিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধের বা বইয়ের লেখকেরা একদিন না একদিন দু'পয়সা রোজগার করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেদিন এখনো বহুদূরে, হয়ত বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে "আসিবে সেদিন

আসিবে।” বর্ত্তমানে আমরা পথ সাফ করিয়া যাইতেছি মাত্র। লোকেরা আমাদিগকে আহাম্মুক বলে। আমাদের কাজকর্ম্মের একমাত্র দাম বা সম্বর্দ্ধনা,—দেশের লোকজনের নিকট হইতে আহাম্মুক খেতাব লাভ! বৎসর চব্বিশেক ধরিয়া নানাক্ষেত্রেই আমি দেশে-বিদেশে এইরূপ আহাম্মুকি চালাইয়া আসিতেছি। কয়জন গবেষক এই খেতাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে—অথবা এই আবহাওয়ায় নতুন-নতুন গবেষক জুটিবে কিনা,—ভবিষ্যতে জানা যাইবে। সংসারের নানা প্রকার চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় অন্যান্য পথে ঢের। কাজেই একদিকে ক্ষতি, অপর দিকে লাভ,—এই দুই-টানায় পড়িয়া অনেক গবেষককে যে গবেষকের পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে ইহা সহজেই বুঝা যায়। বস্তুতঃ অন্যান্য কারণেও দুই-তিন বৎসরের বেশী কাহারো মেয়াদ আশা করা উচিত নয়। তাহাতেও সন্তুষ্ট থাকাই উচিত।

## পাঠ্য-পুস্তক বনাম নির্দ্দিষ্ট সমস্যা

লেখালেখি এই পরিষদের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তক রচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। এই হাড়ে কোনো দিন টেক্স্ট বুক জাতীয় বই বাহির হয় নাই। ভবিষ্যতেও যে টেক্স্টবুক এই অধমের কলমে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহার সম্ভাবনা কম।

পাঠ্য পুস্তকগুলা চাঁছা-ছোলা, পালিশ-করা বই। এই সবের ভিতর সুরু-মাঝখান-খতম সকল অংশই পরিমাণে মাপাজোকা। অধিকন্তু অনেক অধ্যায়ের মোটা অংশকে অপরাপর লেখকের মতামত বা গবেষণার ফল দিয়া পূরু করিতে হয়। একমাত্র নিজের স্বাধীন গবেষণা বা সিদ্ধান্ত দিয়া টেক্স্ট বুক লেখা চলে না। নানা প্রকার ধানাই-পানাই ঢুকানো আবশ্যক হয়। ঘটনাচক্রে এই অধম চাঁছা-ছোলা, পরের মতামতে ভরা, আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা রচনায় হাত তৈয়ারি করে নাই। এই হাতে যাহা-

কিছু বাহির হইয়াছে তাহার প্রায় সবই খোঁচে ভরা, গ্যাঁজে পরিপূর্ণ, অনেকটা তর্ক-বহুল মাল। নিজের গবেষণা বা সিদ্ধান্ত-মাফিক কোনো অংশ অতি-পুরু, আবার কোনো অংশে হয়ত মালের পরিমাণ নেহাৎ কম। এই রচনা-রীতির কারণ ও অতি-সোজা।

নির্দ্দিষ্ট সমস্যা লইয়া নতুন তথ্য সংগ্রহ করা এই অধমের দস্তুর। নির্দ্দিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে নতুন-কোনো আলোচনা-প্রণালী বা গবেষণা-প্রণালী দেখাইয়া দিবার জন্য জীবনের প্রথম হইতেই কলম ধরিয়া আসিতেছি। ভবিষ্যতেও বোধহয় তাহাই চলিবে। তাহা ছাড়া নির্দ্দিষ্ট সমস্যার মীমাংসা সম্বন্ধে নতুন-কোনো সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব পাওয়া যায় কিনা তাহার খোঁজই আজ পর্য্যন্ত সকল প্রকার লেখালেখির লক্ষ্য রহিয়াছে। বলা বাহুল্য এই ধরণের নির্দ্দিষ্ট সমস্যার বিশ্লেষণ বা আলোচনা হইতে যে সকল টীকা-টীপ্পনী, ছোট-বড়-মাঝারি প্রবন্ধ, পুস্তিকা বা গ্রন্থ বাহির হয় তাহা কোনো-দিন ইস্কুল-কলেজের জন্য টেক্‌স্‌টবুক জাতীয় রচনা হইতে পারে না।

ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষকেরা এই আদর্শেই নির্দ্দিষ্ট সমস্যার জন্য তথ্য সংগ্রহ করিতে আর সম্ভব হইলে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। এই অভ্যাসের ফলে হয়ত তাহাদের কাহারো-কাহারো টেক্‌স্‌টবুক লিখিবার খেয়ালও জাগিতে পারে। তাহা মন্দ নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলায় ধনবিজ্ঞান বিষয়ক টেক্‌স্‌টবুক লিখিলেও প্রকাশক জুটিবেনা। কেন না ইস্কুল-কলেজের মাষ্টার-ছাত্র কেহই এই মালের তোআক্কা রাখে না। আজ ১৯৩১ সনের নবেম্বর মাসেও,—স্বদেশী বিপ্লবের সিকি শতাব্দী পরেও,—যুবক বাংলা বিলাতী মালেরই খাদক। অধিকন্তু ইংরেজিতে বই লিখিলেও ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষকেরা মক্কেল জুটাইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এইসকল বিষয়ে চোখকান খুলিয়া কাজে লাগিয়াছি।

## আন্তর্জ্জাতিক ও সামাজিক তথ্য

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণা-ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। দুনিয়ার সকল দেশই পরিষদের চৌহদ্দির ভিতর পড়ে। কাজেই আন্তর্জ্জাতিক তথ্যের আলোচনা আমাদের লাগিয়াই আছে। "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ * নামে একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই কায়েম করিবার ইচ্ছা আছে। তাহার পর ধনবিজ্ঞান পরিষদের ঘাড় হইতে বিদেশী অর্থ-কথার আলোচনা খানিকটা ঝাড়িয়া ফেলা যাইতে পারিবে।

অপর দিকে সমাজ-কথা, সামাজিক তথ্য, স্বাস্থ্য, লোকবল, কর্ম্মদক্ষতা, জীবনের বাড়তি-ঘাট্‌তি, মানুষের উৎসাহ, নৈরাশ্য, আকাঙ্ক্ষা, অভাববোধ, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদির আলোচনাও ধনবিজ্ঞান পরিষদের গণ্ডীর ভিতর রহিয়াছে। এইগুলা প্রধানতঃ সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। দুঃখের কথা, বাংলা-দেশে আজও সমাজ-বিজ্ঞান বিদ্যাটা ইস্কুল-কলেজের বই মুখস্থ করার বিদ্যারূপেই জীবন চালাইতেছে। সমাজবিজ্ঞানে গবেষণা ও লেখালেখি চালাইবার জন্য স্বতন্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠান বা পত্রিকা নাই। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ কায়েম হওয়া আবশ্যক। কবে হইবে বলা

* "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ ৯ এপ্রিল ১৯৩২ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের গবেষকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিদাস পালিত ও মন্মথনাথ সরকারের রচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থান পাইতেছে।

"আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ হইতে ১৪ এপ্রিল ১৯৩৭ সনে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের গবেষক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেনের রচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইল। ধনবিজ্ঞান পরিষদের দুই গবেষকের—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও সুবোধকৃষ্ণ ঘোষালের,—রচনা "সমাজ-বিজ্ঞান" প্রথম ভাগ (১৯৩৮) গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।—সম্পাদক।

কঠিন। এই হাড়ে অনেক-কিছু চালানো সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। যাহা হউক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের তদ্‌বিরে আমাদিগকে সমাজ-বিজ্ঞানের নানা তথ্য আর তত্ত্বও কিছু-কিছু ছুঁইয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে। আমাদের বিধানে ধনবিজ্ঞান একমাত্র কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক বিদ্যা নয়। ইহা রাষ্ট্রবিষয়ক আর সমাজ-বিষয়ক বিদ্যাও বটে। তবে কোনো বিদ্যার ক্ষেত্রেই কোনো প্রকার একচোখো প্রচারকার্য্য চালানো এই পরিষদের এলাকার অন্তর্গত নয়।

# বহরমপুরে বঙ্গীয় শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন*

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

বহরমপুরে বঙ্গীয় শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার গৌরব আমাকে দেওয়া হইয়াছে। এই কার্য্যের প্রারম্ভে আমার প্রধান কর্ত্তব্য বহরমপুরের মহানুভব, শ্রেষ্ঠ স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিদের অন্যতম, কাশিমবাজারের পরলোকগত দানবীর, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। স্বর্গীয় মহারাজা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার টাউন হলে জাতীয়তা-নিষ্ঠ স্বদেশসেবকগণের সভায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের আন্দোলন সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহাতেই যুবক বাংলার এবং যুবক ভারতের জন্ম হয়।

ঐ সময় হইতে যুবক বাংলা রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গঠনমূলক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া ক্রমাগত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে। আজ বঙ্গদেশে যা-কিছু শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, আজ যেসকল কাপড়ের কল, কয়লার খনি, রাসায়নিক কারখানা, চা-বাগান, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য মহাজনী প্রতিষ্ঠান, জীবন-বীমা-কোম্পানী, শ্রমজীবী-সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দেখা যাইতেছে, সেগুলি প্রধানতঃ ১৯০৫ সনের

* বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মেলন-সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতার সারমর্ম্ম ( ৪ ডিসেম্বর ১৯৩১ )। লিবার্টি, অ্যাড্‌ভান্স, অমৃতবাজার পত্রিকা, বসুমতী, হিতবাদী, আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদির বিবরণী হইতে সঙ্কলিত। "আর্থিক উন্নতি", অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ ( ডিসেম্বর ১৯৩১ )।

গৌরবময় স্বদেশী আন্দোলন হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী জাতির মধ্যে একটা বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল। সেই বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম লক্ষণ দেখিতেছি যে, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার প্রস্তুত করিবার কাজে বাঙালী এঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রীরা আজ উল্লেখযোগ্য গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাহা ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক জগতেও বাঙালীর সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রিক এবং নানা প্রকার কৃতিত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বর্ত্তমানে যে-সকল মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা বিশাল দুনিয়ার সমসাময়িক শিল্প-জগতে হয়তো ছেলেখেলা মাত্র। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা বাঞ্ছনীয় যে, কেবল মাত্র জগতের প্রধান-প্রধান শিল্পী ও বণিক্ জাতির তুলনায়ই বাঙালীরা আধুনিক শিল্পে ও যন্ত্রবিদ্যায় নিকৃষ্ট। কিন্তু বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, অন্যান্য বল্কান দেশ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইয়োরোপ এবং পোলাণ্ড ও রুশিয়া—এইসকল স্বাধীন জনপদের তুলনায় বাংলা একেবারে নগণ্য নহে। প্রকৃত পক্ষে শিল্পবিষয়ে ইয়োরোপের শতকরা ৬০ জন লোকের অবস্থা অল্পাধিক পরিমাণে বাঙালীদের অবস্থারই মত। ইয়োরোপের সব-কয়টা দেশ বিলাত, জার্ম্মাণি ইত্যাদির মতন শিল্পোন্নত মুল্লুক নহে। তুলনামূলক শিল্পনিষ্ঠার দিক্ দিয়া বাঙালীর অবস্থা একপ্রকার চলন-সই।

ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনা করিলেও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে বাংলার অবস্থা মোটের উপর আশাপ্রদ। শিল্প-বিষয়ক কৃতিত্বের কথা বিবেচনা করিলে মারাঠা কিম্বা দাক্ষিণাত্যবাসী ও বাঙালীর মধ্যে, পাঞ্জাবী ও বাঙালীর মধ্যে, এবং তামিল কিম্বা অন্ধ্রবাসী ও বাঙালীর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলা যায় না। কেবল পার্শী, গুজরাটী

ও ভাটিয়ারা এ বিষয়ে বাঙালীদের অগ্রবর্ত্তী। সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, তাহারা মারাঠা, পাঞ্জাবী এবং ভারতের অন্যান্য জাতিরও অগ্রবর্ত্তী। প্রসঙ্গক্রমে প্রত্যেকে স্বীকার করিবে যে, মারাঠা, পাঞ্জাবী ও বাঙালীরা আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যে খানিকটা পশ্চাৎপদ থাকা সত্ত্বেও তাহারা গুজরাটি, ভাটিয়া ও পার্শীদের তুলনায় অন্যান্য বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে।

ধনবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের এইরূপ তথ্যমূলক বিশ্লেষণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙালীদের শিল্প-সম্বন্ধীয় অনুন্নতি তাহাদের শিল্প-বিমুখতারূপে পরিগণিত হইতে পারে না। বাঙালী জাতির এই অনুন্নতির ইহাই সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, যে-কারণেই হউক বাঙালীর অর্থনৈতিক উদ্যম ও কর্ম্ম-কৌশল অনেক দিন পর্য্যন্ত আধুনিক শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিচালিত না হইয়া অপরাপর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। মাত্র সেদিন নবীন শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির উদ্যম দেখা দিয়াছে। এই বিলম্বের জন্যই বাঙালীরা প্রধানতঃ বর্ত্তমান যুগ-সুলভ শিল্প-ব্যবসায় বেশ-কিছু অনুন্নত রহিয়াছে।

এই অনুন্নতির ব্যাখ্যা দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু আমি ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বাঙালী জাতির দোষস্খালন করিতে প্রস্তুত নই। বাঙালীদের শিল্প-বিষয়ক শোচনীয় দুরবস্থা দূর করা আবশ্যক। দূর করিতেই হইবে। আজ যুবক বাংলার সম্মুখে একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ রহিয়াছে। সেটা এই যে, শিল্প-বাণিজ্যে যুবক বাংলাকে গুজরাটি, ভাটিয়া, পার্শীদিগের সমকক্ষ হইতে হইবে। ইহাই প্রথম স্বীকার্য্য। কেবল তাহা নহে, যুবক বাংলাকে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইয়োরামেরিকা ও জাপানের উচ্চতর আদর্শ অনুসারেও চলিতে হইবে।

আমাদের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উপায়ও অস্পষ্ট নহে। কয়েকটা কর্ম্ম-কৌশল বা উপায়ের কথা বলিয়া যাইতেছি। প্রথমতঃ, ১৯০৫

সনের স্বদেশী বিপ্লবে যে সকল ভাব সূচিত হইয়াছিল ঐগুলির মধ্যেই যুবক বাংলার শিল্পনীতি প্রধানভাবে নিহিত আছে। স্বদেশী যুগের যন্ত্রনিষ্ঠা ও শিল্পনিষ্ঠার সকল প্রকার আবহাওয়ার মধ্যেই শিল্প ও ব্যবসার আগ্রহ বদ্ধমূল ও প্রসারিত হইতে পারে। চাই আবার নতুন জোরে, নতুন উৎসাহে সেই স্বদেশী বিপ্লবের উন্মাদনা।

দ্বিতীয়তঃ, যুবক বাংলার পক্ষে গবর্মেণ্টকে স্বদেশী শিল্পের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাধ্য করিতে হইবে। আধুনিক ও মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী নীতি অনুসারে রাষ্ট্রিক সাহায্যের পুনর্ব্যাখ্যা—অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও রুজু হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র অনুসন্ধান, প্রচার, পরীক্ষা-মূলক কার্য্য প্রভৃতিতেই এই সরকারী সাহায্যকে খতম করিলে চলিবে না। চাই সরকারী তাঁবে ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্য্য এবং সরকার কর্ত্তৃক ব্যবসার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ। অধিকন্তু চাই গঠনমূলক শুল্ক, ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্য্যে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা-প্রসার ইত্যাদি। তাহা ছাড়া আবশ্যক শিল্প-বাণিজ্যের জন্য সকল প্রকার সরকারী আর্থিক সাহায্য। ইহাই হইল একালের দুনিয়ায় শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক সরকারী কর্ম্মকৌশল।

আমি আজ কেবল মাত্র এই আভাষ দিতেছি যে, কৃষি-সংক্রান্ত ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উন্নত রকমের যন্ত্রপাতি অবিলম্বে জেলায়-জেলায় প্রস্তুত হওয়া উচিত। এইসকল যন্ত্রপাতির চাহিদা প্রবল এবং ঐগুলি দেশের কারিকর ও মিস্ত্রী দ্বারা সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। এই দিকে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা হউক।

তৃতীয়তঃ, কলিকাতার ও বাংলার অন্যান্য ব্যবসা-প্রধান অঞ্চলে "শিল্প-পুঁজিসঙ্ঘ" স্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ যেসকল ব্যবসা উন্নতিলাভে সমর্থ হইতেছে না, সেগুলিকে অর্থসাহায্য প্রদান করা ঐসকল সঙ্ঘের প্রধান কাজ হইবে। তরুণ বাংলার

কতিপয় ব্যবসায়ী এইরূপ কয়েকটা সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেম ও ব্যবসা-বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে পারেন।

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় এক্ষণে পাঁচ-ছয়টা "শিল্পপুঁজি-সঙ্ঘ" গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। সঙ্ঘগুলা অংশীদারদের কোম্পানীরূপে কাজ করিবে। প্রত্যেক অংশের মূল্য শ'-পাঁচেক টাকার কম হওয়া উচিত নয়।

বুঝাই যাইতেছে যে, আমি চব্বিশ ঘণ্টা প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে একমাত্র সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরতা চাই না।

এখানে আরও একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। যুবক বাংলার পক্ষে মাড়োয়ারী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সহযোগ লাভের চেষ্টা করা সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। বাংলার সকল প্রকারের আন্দোলনে মাড়োয়ারীরা বহুকাল ধরিয়া বাঙালী জাতির মতই আগ্রহসহকারে যোগদান করিয়া আসিতেছে। আমাদের স্বার্থের জন্যই আরও অনেক দিন তাহাদের সাহায্য পাওয়া আবশ্যক হইবে।

ইহুদীরা ইয়োরোপ ও আমেরিকার শিল্পবাণিজ্য-ক্ষেত্রে যেসকল কার্য্য করিয়া থাকে, মাড়োয়ারীরা আখিক ভারতে ঠিক তাহা করিতেছে। ইহুদী যে হিসাবে "আন্তর্জ্জাতিক জীব", মাড়োয়ারীও সেই হিসাবে "নিখিল ভারতীয়" ব্যক্তি। কেবল মাত্র বাঙালী নহে, মারাঠা, পাঞ্জাবী, তামিল, বিহারী ও ভারতের অন্যান্য জাতি মাড়োয়ারীদের পুঁজির উপর অল্পাধিক নির্ভর করে। যুবক বাংলার পক্ষে মাড়োয়ারীদের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসা আবশ্যক।

সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, বাঙালী আমরা অনেকদিন বিলম্বে আধুনিক শিল্প-ব্যবসায় প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছি। আমরা ইহাও যেন না ভুলি যে, গ্রেট-বৃটেনের অধিবাসীদের তুলনায় এমন কি ফরাসী ও জার্ম্মাণরা শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রায় দুই পুরুষ

পিছাইয়া পড়িয়াছিল। ইতালিয়ান আর জাপানীরাও শিল্প-ব্যবসায় বেশ-কিছু বিলম্বে ব্রতী হইয়াছে। কিন্তু বিলম্বে ব্রতী হইয়াও এই সকল জাতি অনেক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছে। বাঙালী জাতিরও বর্ত্তমান শৈশবাবস্থা গৌরবময় এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বাঙালীরা বিভিন্ন বিদ্যা ও কলায় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, কৃষিকর্ম্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। সুতরাং বাঙালীরা বিলম্বে শিল্প-ব্যবসার পাঠ আরম্ভ করিলেও তাহারা জার্ম্মাণ-জাপানীদের মতই আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইবে, আমি এরূপ বলিতে সাহসী হইতেছি।

যুবক বাংলার শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক কার্য্যকারিতা ভারতের আজও যাহারা অনুন্নত তাহাদিগকে,—এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত অধিবাসীদিগকে,—উদ্দীপনা প্রদান করিবে। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন বা স্বদেশী বিপ্লব রুশ"গস্প্লান" ও ফাশিস্ত্ ইতালীর আর্থিক স্বদেশ-প্রেমের মতই জগতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দুনিয়ায় বাঙালীর দিগ্‌বিজয় সুরু হইয়াছে মাত্র।

এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি যুবক বাংলাকে ত্যাগ ও সংগঠন-মূলক কার্য্যে আহ্বান করিতেছি। বাংলার যৌবন-শক্তি আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকুক।

# রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের মূল-সূত্র*

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

ভারতে এখনও রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু শীঘ্রই প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে। এই সম্বন্ধে জল্পন-কল্পন চলিতেছে কিছু দিন ধরিয়া। তাই রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের "জাতি"-বিশ্লেষণ এবং কোষ্ঠীগণনা বর্ত্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক হইবে।

## নোট-ব্যাঙ্কিং

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে "ফেডারাল রিজার্ভ" প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধনবিজ্ঞানসেবী ও ব্যবসায়ী মহলে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" কথাটার বেশ-কিছু চল বাড়িয়াছে। "কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক" কথাটা ততদূর ব্যাপক নয়, আর ইহার প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে অল্প দিন হইতে। মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় এই কথাটা জন্মলাভ ও রূপগ্রহণ করিয়াছে। বাজারের উঠানামা, আর্থিক সঙ্কট, মুদ্রার স্থিতীকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রানুগতা বা ঐক্যসাধন এবং কর্জ্জ-নিয়ন্ত্রণ সেই ব্যবস্থারই অন্তর্গত। একালের "সরকারী ব্যাঙ্ক" নামে পরিচিত কতকগুলা প্রতিষ্ঠানকেও রিজার্ভ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নামে অভিহিত করা অনেকটা সার্ব্বজনিক দস্তুর দেখিতে পাওয়া যায়।

* এই প্রবন্ধ প্রথমে দুইবার ইংরেজিতে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯২৬ এবং ১৯৩২ সনে।

কিন্তু এইখানে বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, বিলাত (১৬৯৪), ফ্রান্স (১৮০০), জার্ম্মাণি (১৮৭৫), জাপান (১৮৮২) এবং ইতালির (১৮৯৩) এই ধরণের সেকেলে ব্যাঙ্কগুলার কোনটাকেই "রিজার্ভ", "কেন্দ্রীয়" বা "সরকারী" বলা হয় না। আপন-আপন দেশের নামানুসারেই এইগুলার নামকরণ হইয়াছে। "সরকারী" প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগুলার দৌড় কতটুকু তাহা সমঝিতে হইলে উহাদের ভিতর-বাহির রীতিমত খতাইয়া দেখিতে হইবে। সহজেই প্রশ্ন উঠিবে,—অতীতে এগুলা আপন-আপন দেশের রিজার্ভ-কেন্দ্রের কাজ করিয়াছিল কি না এবং বর্ত্তমানেই বা এই সম্বন্ধে এগুলার হালচাল কেমন। এইসব প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে মুদ্রার বাজারে এগুলার কার্য্যকলাপের ইতিহাস এবং সংখ্যা-রাশির হিসাব আবশ্যক হইবে। কিন্তু একটি বিষয় সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই যে, এগুলা পুরাপুরি ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্ক। ব্যবসাবাণিজ্যের কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানরূপে নোট ছাপানো এবং নোট চালানোও এগুলার কারবার এবং একটা বিশেষত্বও বটে। কাগজী মুদ্রা এবং নোট বাহির করার কাজে এগুলা প্রধানভাবে মোতায়েন।

ইতালিতে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলা এমিস্সিয়োনে ব্যাঙ্ক, ফ্রান্সে সিকুলাসিওঁ ব্যাঙ্ক এবং জার্ম্মাণিতে নোট-ব্যাঙ্করূপে পরিচিত। ইংরেজিতে ইহার প্রতিশব্দ "ইশু-ব্যাঙ্ক" হওয়া কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত ব্যাঙ্কের উপর দুই ধরণের কাজ ন্যস্ত থাকে। প্রথমতঃ ডিপজিট ও কর্জ্জদাদনের কারবার করিয়া এগুলা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজ করে। দ্বিতীয়তঃ কাগজের নোট বাহির করাও এগুলার বিশেষ ধান্ধা। ১৮৪৪ সনের ব্যাঙ্ক চার্টার আইনে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডকে (১) মামুলি ব্যাঙ্কিং কারবার ও (২) নোট বাহির করা—এই দুই কাজের জন্য দুই স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

এই সমস্ত কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয়, রিজার্ভ, সরকারী বা আধা-

সরকারী রূপটা অগ্রাহ্য করা বর্ত্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্করূপে যে এগুলা সাধারণ ব্যাঙ্কের কারবারও চালায় তাহা ঘাঁটিয়া দেখাই প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষি, শিল্প বা অন্যান্য শ্রেণীর ব্যাঙ্কিংয়ের মত নোট-ব্যাঙ্কিংয়ের নিজস্ব ঝুঁকি এবং ঐ সমস্ত ঝুঁকি সামলাইবার পন্থা আছে। এখানে নূতন রাইখ্স বাঙ্ক এবং বাঁক্ ত্য ফ্রাঁসকে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব। ইহাতে নোট-ব্যাঙ্কিং এবং বাণিজ্যবিষয়ক ব্যাঙ্কিং এই দুমুখো সমস্যার ইশু-ব্যাঙ্কগুলার দ্বারা কি ভাবে সমাধান হইতে পারে তাহা পরিষ্কার-রূপে বুঝা যাইবে।

## জার্ম্মাণির পাঁচটা নোট-ব্যাঙ্ক

১৮৫১ সনে জার্ম্মাণিতে ১০টা নোট-ব্যাঙ্ক ছিল। ১৮৬০ সনে এই সংখ্যা ৩০ এবং ১৮৭৫ সনে ৩৩-এ পরিণত হয়। এক প্রুশিয়াতেই ব্যাঙ্ক অব্ প্রুশিয়া নামক সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও ৮টা নোট-ব্যাঙ্ক ছিল।

১৮৭৫ সনের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে আইন জারি হয়। ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ও উহার পরিচালনে সর্ব্বত্র একই ধরণের নিয়ম-কানুন প্রচলন করার ব্যবস্থা করা হয়। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সিক্কার ঐক্য-সাধনও ঐ আইনের অন্যতম ধান্ধা ছিল।

১৮৭৫ সনের আইনের বলে ৩৩টি ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিবার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এইগুলার নোট ছাপাইবার মুরোদ ৩৮৫০ লক্ষ মার্ক পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়। এই ৩৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাইখ্স বাঙ্ককেও ধরা হয়, এবং ইহার নোট বাহির করার দৌড় স্থির করা হয় ২৫ কোটি মার্ক পর্য্যন্ত। উক্ত আইনে এই ব্যবস্থাও কায়েম করা হয় যে, যদি এই সমস্ত ব্যাঙ্কের কোনোটি ফেল মারে বা নোট

বাহির করার অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে তাহা হইলে রাইখ্স বাঙ্ক ঐ ফেল-মারা ব্যাঙ্কের সমস্ত অধিকার ভোগ করিবে এবং ঐ ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে নোট বাহির করার অধিকারী ছিল রাইখ্স বাঙ্ক সেই পরিমাণে অতিরিক্ত নোট বাহির করিতে পারিবে।

১৯০০ সনে রাইখ্স বাঙ্ক বাদে নোট-ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৭টি। এইগুলার মোট পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটি মার্ক। নোট-ব্যাঙ্কগুলা যেই কারবার গুটাইয়াছে বা অধিকার ত্যাগ করিয়াছে রাইখ্স বাঙ্ক সেই তাহাদের স্থান দখল করিয়া পুঁজির ঘাটতি ও নোট ছাপাইবার ঘাটতি দুই-ই পূরণ করার ব্যবস্থা করিয়াছে।

১৯১৩ সন হইতে জার্মাণিতে নোট-ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল মাত্র পাঁচটি, যথা—(১) ব্যাভেরিয়ার বায়ারিশে নোটেনবাঙ্ক, (২) স্যাক্সনির সেক্‌সিশে বাঙ্ক, (৩) ভুর্টেম্বার্গের ভুর্টেম্ব্যার্গিশে নোটেনবাঙ্ক, (৪) বাডেনের বাডিশে নোটেনবাঙ্ক এবং (৫) রাইখ্স বাঙ্ক (ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক)। শেষোক্ত ব্যাঙ্কটির প্রধান কার্য্যালয় বার্লিনে অবস্থিত এবং দেশের মধ্যে তখন ইহার শাখা-কার্য্যালয় ৪৮০।

১৯১৩ সনে প্রথম চারটি নোট-ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা (মার্কে) নিম্নরূপ ছিল :—

| | পুঁজি | নোট | নগদ |
|---|---|---|---|
| বায়ারিশে | ৭,৫০০,০০০ | ৬৬,০৫৫,০০০ | ৩৯,১৯৭,০০০ |
| সেক্‌সিশে | ৩০,০০০,০০০ | ৫৪,৬৯৭,০০০ | ৩৪,২৪৩,০০০ |
| ভুর্টেম্ব্যার্গিশে | ৯,০০০,০০০ | ২১,২২৭,০০০ | ১১,০০০,০০০ |
| বাডিশে | ৯,০০০,০০০ | ১০,৮০৩,০০০ | ৭,৯১২,০০০ |

এই চারটি ব্যাঙ্কের মোট নোট ছাপানোর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৬০,০০০,০০০ মার্ক।

১৯১৩ সনে রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের সর্ব্বোচ্চ নোট প্রচার ২,৫৯৩,৪৪৫,০০০ মার্ক এবং সর্ব্বনিম্ন প্রচার ১,৭১১,৭০০,০০০ মার্ক দাঁড়ায়; সুতরাং এই বৎসরের গড় প্রচার ছিল ১,৯৫৮,১৭৩,০০০ মার্কের কাছাকাছি। প্রথম চারটি নোট-ব্যাঙ্কের সমবেত নোট-জারি অপেক্ষা রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের মোট নোট-প্রচার প্রায় ১৩ গুণ বেশী। প্রাগ্‌-যুদ্ধ যুগে এই অনুপাতই ছিল

যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের প্রথম বৎসরে (১৯১৯) পূর্ব্বোক্ত চারটি নোট-ব্যাঙ্কের নোট-জারি নিম্নরূপ দাঁড়ায়:—

| | |
|---|---|
| বায়ারিশে | ১০৩,৮০০,০০০ মার্ক |
| সেক্‌জিশে | ৮৪,৭০০,০০০ মার্ক |
| ভুর্টেম্ব্যাগিশে | ৩১,৭০০,০০০ মার্ক |
| বাডিশে | ৩৭,৭০০,০০০ মার্ক |

সুতরাং মোট প্রচারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৬০,০০০,০০০ মার্ক হইতে প্রায় ২৫৮,০০০,০০০ মার্ক পর্য্যন্ত। এইগুলির ৬২% বাড়তি মহাযুদ্ধের সময়কার রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের অতি-বাড়ের তুলনায় কিছুই নয়। ১৯১৯ সনের মাত্র একটা রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের নোট-প্রচার দাঁড়ায় ৩৫,৬৯৮,৩৬৯,০০০ মার্ক। এই বৎসরের সর্ব্বনিম্ন সীমা ২২,৩৩৬,৮৪৪,০০০ মার্ক, এবং বৎসরের গড় ২৭,৯৮৭,৮০৮,০০০ মার্ক। মহাযুদ্ধের পরে কাগজী মুদ্রার যে অতি-প্রচলন দস্তুরে পরিণত হয় ইহা তাহার পূর্ব্বাভাসরূপে ধরা যাইতে পারে। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯১৯ সনের গড় ১৪২৯% বেশী। সুতরাং রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের সহিত অপর চারটি ব্যাঙ্কের অনুপাত ১০৮: ১। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই অনুপাত ছিল ১৩ : ১।

জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সিক্কার বাজারে এই চারটি ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বুঝা যাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে কাগজী মুদ্রার

অতি-প্রচলন দেখা দেয়। কাজেই ১৯২৪ সনে ব্যাঙ্কসমূহ পুনর্গঠনের সময় এই ব্যাঙ্কগুলির নোট-প্রচারের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় নাই। ১৯২৪ সনের আইনে উক্ত ব্যাঙ্ক-চতুষ্টয়কে সর্ব্বোচ্চ সীমায় নিম্নলিখিতরূপ নোট-ছাপানোর অধিকার দেওয়া হয় :—

| | | |
|---|---|---|
| বায়ারিশে | ৭০,০০০,০০০ | রাইখ্‌স্ মার্ক |
| সেক্‌জিশে | ৭০,০০০,০০০ | ,, ,, |
| ভুর্টেম্ব্যাগিশে | ২৭,০০০,০০০ | ,, ,, |
| বাডিশে | ২৭,০০০,০০০ | ,, ,, |

সুতরাং এইগুলার মোট নোট-প্রচার ১৯৪,০০০,০০০ রাইখ্‌স্ মার্কের বেশী হইতে দেওয়া হয় নাই।

ব্যাঙ্কগুলাকে ১৯৩৫ সনের ১লা জানুয়ারি পর্য্যন্ত এই অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয়। তারপর এই অধিকার নাকচ বা হ্রাস করিবার কথা। প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর এক বৎসরের নোটিশ দিয়া অধিকার নাকচ করিবার বা কমাইবার রেওয়াজ কায়েম করা হইয়াছে। কোনো ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণ মুল্লুকের রাইখ্‌স্ বাঙ্কের জন্য কেন্দ্রীভূত একচেটিয়া নোট-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে।

রাইখ্‌স বাঙ্ক ১৮৭৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সময় ব্যাঙ্ক অব্ প্রুশিয়া, ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী প্রভৃতি প্রদেশের প্রতিষ্ঠানের মত সরকারী নোট-ব্যাঙ্ক ছিল। কিন্তু এইটির উচ্ছেদ সাধন করিয়া রাইখ্‌স বাঙ্কের গোড়াপত্তন করা হয়। প্রদেশের নাম ইহার সহিত জড়িত না করিয়া নয়া জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের নামে ইহা প্রচলিত করা হয়। নিম্নে প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতে ১৯২৩ সন পয্যন্ত ( মহাযুদ্ধের পর কাগজী মুদ্রার অতি-প্রচলন সহ ) এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জীবন-কথা লিখিত হইল :—

| সন | গড় নোট-প্রচলন | ১৮৭৬ সনের শতাংশ | সর্ব্বোচ্চ প্রচলন | সর্ব্বনিম্ন প্রচলন |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৭৬ | ৬৮৪,৮৬৬,০০০ | ১০০ | ৭৭৭,৬৭৭,০০০ | ৬২১,০৮৯,০০০ |
| ১৮৯৬ | ১,০৮৩,৪৯৭,০০০ | ১৫৮,২ | ১,২৫৭,৯২৫,০০০ | ৯৭৩,৪৮৪,০০০ |
| ১৯১৩ | ১,৯৫৮,১৭৩,০০০ | ২৮৫,৯ | ২,৫৯৩,৪৪৫,০০০ | ১,৭১১,৭০০,০০০ |
| ১৯২১ | ৭৮,৬১৯,৪৭১,০০০ | ১১,৪৭৯,৫ | ১১৩,৬৩৯,৪৬৪,০০০ | ৬৫,৫১৯,৮৭৭,০০০ |
| ১৯২২ | ... | ... | ১,২৮০,১ মিলিয়ার্ড | ১১১,৯ মিলিয়ার্ড* |
| ১৯২৩ | ... | ... | ৪৯৬,৫ ট্রিলিয়ন | ১,৩৩৬,৫ ,, |

পুনর্গঠিত রাইখ্‌স বাঙ্কের প্রথম বৎসরের (১৯২৪) হালচাল নিম্নরূপ :— ( রাইখ্‌স মার্কে হিসাব )

| গড় নোট-প্রচলন | ১৮৭৬ সনের শতাংশ | সর্ব্বোচ্চ প্রচলন | সর্ব্বনিম্ন প্রচলন |
|---|---|---|---|
| ১,০৬৮,৪৬৫,০০০ | ১৫৬ | ১,৭৪১,৪৪০,০০০ | ১,৪৮৪,২৪৯,০০০ |

এই প্রসঙ্গে ১৮৯৬ সনের মাপজোক খতাইয়া দেখার দরকার।

## ৬ কাগজী মুদ্রা বনাম ব্যাঙ্ক-নোট

ব্যাঙ্ক-নোট বস্তুটা কাগজী মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলা বড় বড় পাওনা পরিশোধের সময় এই চিজ প্রয়োগ করে। ব্যাঙ্কগুলার অধিকারে যে সোনা থাকে এবং ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে যাহা জমা থাকে তার পরিবর্ত্তে উহারা প্রতিশ্রুতির নোট প্রচার করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যাঙ্ক যে দেনার ঝুঁকি ঘাড়ে লয় ব্যাঙ্ক-নোটগুলা তার দলিল-সাক্ষী ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য ব্যাঙ্কগুলা

---

* বিলিয়ন = মিলিয়ার্ড = ১,০০০,০০০,০০০।

ট্রিলিয়ন = ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০।

যে মূল্যের কাগজী মুদ্রা ছাড়ে ঠিক সেই মূল্যের মূল্যবান্ ধাতু জমা রাখিতে অভ্যস্ত।

রাষ্ট্র কিন্তু ব্যাঙ্কগুলার লেনদেনের কারবার বাড়াইবার জন্য উহাদিগকে সঞ্চিত মূল্যবান্ ধাতু অপেক্ষা অধিক মূল্যের নোট বাহির করিবার অধিকার দিয়াছে। ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে নিয়ম ছিল, প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে প্রচারিত নোটের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যবান ধাতু জমা রাখিতে হইবে। প্রচারিত নোটসমূহের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের সোনা সকল সময়ে জমা রাখা নোট-ব্যাঙ্কগুলা নিরাপদ্ ভাবিত, কারণ দরকার হইলে তাহার দ্বারা নগদ টাকায় শোধ দেওয়াও সম্ভবপর হইতে পারে।

সুতরাং পুরাতন দস্তুর নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত করা যাইতে পারে। নোট-ব্যাঙ্কগুলা নোটের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের সোনা জমা রাখিত। বাকী দুই-তৃতীয়াংশের জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা থাকিত। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কগুলা ভাল ভাল সিকিউরিটি বা কোম্পানীর কাগজ জমা রাখিতে চেষ্টা করিত, কারণ প্রয়োজন হইলে ঐগুলা অনায়াসে বিক্রয় করিয়া দায় উদ্ধার করা চলিত। দ্বিতীয়তঃ ব্যাঙ্কগুলা তিন-মাসী মেয়াদের, তিন মাসের মধ্যে পরিশোধিতব্য এক্সচেঞ্জ বিল বা বিনিময়ের দলিল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কাগজ রাখিত।

সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এই ধরণের ব্যাঙ্ক-নোটগুলিকে কাগজী মুদ্রা বলা চলে না। মূলতঃ এইগুলা ধাতব মুদ্রারই স্থলাভিষিক্ত। কোনো ব্যাঙ্কই খাঁটি কাগজী মুদ্রা বাহির করে নাই। একমাত্র গবর্ণমেণ্টই বিপদ-আপদের সময় কাগজী মুদ্রা বাহির করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ মহাযুদ্ধের সময়কার রেওয়াজ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাগজী মুদ্রার দস্তুর এই যে, উহা ধাতব মুদ্রায় পরিণত হইতে পারে না।

কাগজী মুদ্রার উদাহরণস্বরূপ রাইখ্স্ কাস্সেন্শাইন অর্থাৎ

ইম্পীরিয়্যাল ট্রেজারি বিল উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৪ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখের আইন দ্বারা জার্ম্মাণির ফেডার্যাল গবর্ণমেণ্ট এইগুলা প্রথম জারি করে। রাইখ্স বাঙ্কে এইগুলা জন্মলাভ করে নাই। এর জন্য কোনো সোনাও মজুদ রাখা হয় নাই বা এগুলা সোনায় রূপান্তরিতব্যও ছিল না। সুতরাং এইগুলা যেমন এক পক্ষে পূরাপূরি কাগজী মুদ্রার লক্ষণযুক্ত অন্য পক্ষে তেমনি এগুলা ব্যাঙ্ক-নোট হইতে পৃথক বস্তু। দেশবাসী যখন বা যদি গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব এবং আর্থিক লেনদেনে বিশ্বাসবান্ হয় একমাত্র তখন ও তবেই গবর্ণমেণ্ট কাগজী মুদ্রা জারি করিতে সাহসী হইয়া থাকে।

যে আইন অনুসারে রাইখ্স কাস্‌সেন্‌শাইনের প্রথম প্রচলন হয় তদনুসারে নিয়ম করা হয় যে, ১২ কোটি মার্কের বেশী এই চিহ্ন বাহির করা চলিবে না। সুতরাং সাধারণ সময়ে সাম্রাজ্যের মুদ্রা-ব্যবস্থায় এইগুলা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই দাঁড়াইত না।

১৮৭৬ সনে এই খাতে কাগজী মুদ্রা বাহির করা হয় ৪৩,৮০৮,০০০ মার্ক, এবং ১৯১৩ সনে মাত্র ৪৬,২০২,০০০ মার্ক। এই সময়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সীমা উপস্থিত হয় ১৯০৭ সনে এবং মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫,৪৩৯,০০০ মার্ক; কারণ এই বৎসর আমেরিকার আর্থিক সঙ্কটের ঢেউ ইয়োরোপেও লাগিয়াছিল।

মহাযুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের পরবর্ত্তী কাগজী মুদ্রার অতি-প্রচলনের যুগেও রাইখ্স কাস্‌সেন্‌শাইন সিক্কার জগতে বড়রূপে প্রতিভাত হয় নাই। ১৯২০ সনের সর্ব্বোচ্চ সীমার বৎসরে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১০০,২৫৯,০০০ মার্ক।

এই শ্রেণীর কাগজী মুদ্রা চাপা পড়িয়া যায় ডার্লেহেন্‌স্ কাস্‌সেনশাইন (লোন ট্রেজারী বিল) নামক আর এক ধরণের কাগজী মুদ্রার প্রভাবে। মহাযুদ্ধের প্রথম বৎসরে (১৯১৪) ইহার পরিমাণ

৮৭১,১৬৮,০০০ মার্ক হইলেও ১৯২২ সনে ২৩৮,৪৭২,৫৮১,০০০ মার্ক দাঁড়ায়। ১৯২৩ সনে ৯,৩ বিলিয়নের সীমাও ছাড়াইয়া যায়। ১৯২৪ সনে এই ধরণের লোন ট্রেজারি বিল বিলুপ্ত করা হয়।

## ১৮৭৫ সনের রাইখ্‌স বাঙ্ক আইন

মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরগুলায় সুবিধা-প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক-চতুষ্টয়ের মোট নোট-প্রচলন দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ১৫-২০ কোটি মার্ক। জার্ম্মাণির লেন-দেনের ক্ষেত্রে ঐ ব্যাঙ্কগুলার কিম্মৎ ছিল অত্যন্ত কম। তাছাড়া ১৮৭৫ সনের আইন অনুসারে ঐ ব্যাঙ্কগুলার নোট কেবলমাত্র রাইখ্‌স বাঙ্কের নিকট কর্জ্জ শোধ দেওয়ার সময় মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত। ১৯২৪ সনের আইন অনুসারেও এই সমস্ত নোটের আইন-সম্মত মুদ্রারূপে (লিগ্যাল্ টেণ্ডার) ব্যবহৃত হওয়ার উপায় নাই। কোনো প্রাদেশিক আইন-কানুনের (ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী প্রভৃতি) মুরোদ নাই যে, এগুলিকে এই মর্য্যাদা দিতে পারে। সুতরাং স্বভাবতই এইগুলার কারবার জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের মুদ্রাব্যবস্থার আলোচনা-ক্ষেত্রে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আসে না বলিলে চলে।

বাস্তব ক্ষেত্রে রাইখ্‌স বাঙ্কই ছিল সাম্রাজ্যিক জার্ম্মাণির একমাত্র নোট-ব্যাঙ্ক। গণতন্ত্রী জার্ম্মাণ যুক্তরাষ্ট্রের আমলেও রাইখ্‌স বাঙ্কের উক্ত অধিকার অটুট আছে। ১৯২৪ সনের আইনে রাইখ্‌স বাঙ্কের এই অধিকার আরও বেশী শক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাইখ্‌স বাঙ্ক একটা আক্‌ট্‌সিয়েনস্‌গেজেল্ শাফ্‌ট অর্থাৎ বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের অধিকারী একটি "সাধারণ" জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটা আইনের চোখে আর পাঁচটা শিল্প বা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মত একই মর্য্যাদাবিশিষ্ট। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে সরকারী ব্যাঙ্ক মনে করিলেও ইহা আসলে তাহা নয়। ১৯২৪ সনের

আইন স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছে যে, ইহা জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্রব-শূন্য। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলিয়া রাখা ভাল যে, ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যণ্ড এবং বাঁক্ ছ ফ্রাঁসও সরকারী প্রতিষ্ঠান নহে।

১৯২৪ সনের পূর্ব্বে কিন্তু ইহার পরিচালন সরকার-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রেসিডেণ্ট থাকিত একজন উচ্চতম সাম্রাজ্যিক কর্ম্মচারী। সুতরাং ইহার কার্য্য-পরিচালনে অংশীদারদের দাবীদাওয়ার কথা বড় একটা আমল পাইত না। সাম্রাজ্যবাসী সর্ব্বসাধারণের সুখ-সুবিধা রক্ষা করাই ছিল ইহার সব চেয়ে বড় ধান্ধা।

১৮৯৯ সনে চার্টার পরিবর্ত্তন করিরা মূলধন ১৮ কোটি মার্ক (প্রায় ১৩½ কোটি টাকা) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯১১ সনে সর্ব্বোচ্চ লভ্যাংশ নির্দ্দিষ্ট হয় ৩½%। লভ্যাংশ বিতরণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা নিম্নলিখিতভাবে বাঁটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়:—¾ অংশ যাইবে রাষ্ট্রের তহবিলে এবং বাদবাকী অংশীদারগণ ভোগ করিবে। প্রত্যেক হিস্যাদারকে প্রাপ্ত লাভের ১০% চাঁদা দিয়া মজুদ তহবিলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৮৭৫ সনে রাইখ্স বাঙ্ককে কেবলমাত্র বেশী দামের নোট জারি করার অধিকার দেওয়া হয়,—যথা ১০০০ ও ১০০ মার্কের নোট। ১৯০৬ সনের আইনে ৫০ এবং ২০ মার্কের নোট বাহির করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯২০ সনের পূর্ব্বে ১০ মার্কের নোট সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল।

১৯০৯ সনে প্রথম আইন করিয়া রাইখ্স বাঙ্কের নোটগুলাকে "লিগ্যাল টেণ্ডার" অর্থাৎ কানুন-মাফিক মুদ্রা রূপে ঘোষণা করা হয়। কার্য্যতঃ কিন্তু আইনের সাহায্যে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি না করা হইলেও ১৮৭৪ সনের পর হইতে নোটগুলা ঐভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।

১৮৭৫ সনের আইন কাগজেকলমে রাইখ্‌স বাঙ্কের নোট বাহির করার গণ্ডী বাঁধিয়া দেয় নাই বা কোনোরূপ প্রতিবন্ধকেরও ব্যবস্থা করে নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ একটা সীমার ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছিল। কারণ ৫৫০,০০০,০০০ মার্কের অতিরিক্ত নোটসমূহের জন্য ইহাকে ৫% হারে ট্যাক্স দিতে হইত।

নোট-প্রচারের ক্ষমতা অসীম হইলেও রাইখ্‌স বাঙ্ক কোন্ কোন্ ধরণের কারবার চালাইতে পারিবে সে সম্বন্ধে আইন করিয়া রীতিমত বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে এই নোট-ব্যাঙ্কের অন্য কোনো ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগিতা করার উপায় ছিল না। সুতরাং এই ঋণ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আপন খেয়াল-খুসী মত নোট বাহির করার বাস্তবিকই কোনো উপায় ছিল না। কাজেই রাইখ্‌স বাঙ্ক আপন কারবারের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে যথেচ্ছ নোট-প্রচারে অধিকারী ছিল মাত্র। আর এইসমস্ত কারবারের হালচালও এমন যে, রাইখ্‌স বাঙ্ক কোনো বিপজ্জনক ঝুঁকি মাথায় লইতে সাহসী হইত না, কারণ তাহা হইলে নোট ভাঙাইয়া নগদ টাকা প্রদানের জন্য ইহার যে সুনাম আছে তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত।

## জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ

আইনে খোলসা করিয়া নোটের জামিন রাখার কথা ছিল। রাইখ্‌স বাঙ্ককে অন্ততঃ পক্ষে প্রচারিত নোটের এক-তৃতীয়াংশের জন্য প্রচলিত দুই দফার এক দফা গ্যারান্টি রাখিতে হইত। গ্যারান্টি বা জিম্মার চিজ্ ইম্পীরিয়্যাল ট্রেজারি বিল সমেত জার্ম্মাণ মুদ্রা হইতে পারিত। অথবা ব্যাঙ্কের সিন্দুকে সোনার তালও রাখা চলিত। বিদেশী মুদ্রার আকারেও সোনা রাখায় কোনো আপত্তি ছিল না। এক পাউণ্ড সোনার দাম ধরা হইত ১৩৯২ মার্ক। সুতরাং সিকিউরিটি

রাখা সম্বন্ধে রাইখ্‌স বাঙ্কের কোনো স্বাধীনতা ছিল না; কাগজী মুদ্রার মজুদ তহবিল রীতিমত সরকারী আইনদ্বারা নির্দ্ধারিত হইত।

ধাতুঘটিত সিকিউরিটি বা জামিন যতখানি ততখানি পর্য্যন্ত নোটগুলা যে আসল স্বর্ণমুদ্রা সেই সম্বন্ধে কোনোরূপ সন্দেহ ছিল না। সোনার তাল এবং বিদেশী মুদ্রা দুই-ই ন্যায্য সিকিউরিটিরূপে গ্রাহ্য হইত। টাকশালে সকলেরই অবাধ অধিকার ছিল, এবং যে-কেহ এখানে সোনা জমা দিয়া মুদ্রা তৈরী করিয়া লইতে পারিত; সুতরাং এই জন্য রাইখ্‌স বাঙ্কের মজুদ্ সোনাও জার্ম্মাণ স্বর্ণমুদ্রার সামিল ছিল।

কিন্তু ঢাকনা বা জামিনের অন্যান্য দফা-বিষয়ক আইনে,—যথা ইম্পীরিয়্যাল ট্রেজারি বিল সহ সাধারণ জার্ম্মাণ মুদ্রার গ্যারাণ্টিতে,—রাইখ্‌স বাঙ্কের ভিতর কাগজী মুদ্রার বিজয়-অভিযানের জন্য ফাঁক ছিল যথেষ্ট। কারণ এই দফায় স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ বাঁধিয়া রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আর ইম্পীরিয়্যাল ট্রেজারি বিলও ছিল কাগজমাত্র। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত জার্ম্মাণ মুদ্রাই স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল না। কারণ নিকেল, তামা এবং রূপার মুদ্রারও চলন ছিল।

সুতরাং যাহারা নোটের জামিন বা আবরণস্বরূপ এক-তৃতীয়াংশ সোনার পক্ষপাতী তাহাদের পক্ষে ১৮৭৫ সনের আইন নিশ্চয়ই গলদপূর্ণ। রাইখ্‌স বাঙ্ক যদি আইনের দৌর্ব্বল্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিত তাহা হইলে আর্থিক জগতে মহা দুর্য্যোগ উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাইখ্‌স বাঙ্ক আপনাকে নিরাপদ্ রাখিবার জন্য আইনসম্মত সোনার পরিমাণ এবং সিকিউরিটি বা কোম্পানীর কাগজ অপেক্ষা অধিকতর সোনা ও বাণিজ্যিক কাগজ-পত্র মজুদ রাখিয়া চলিয়াছে।

জার্ম্মাণির অন্যান্য নোট-ব্যাঙ্কের মত রাইখ্‌স বাঙ্ককেও অবশিষ্ট ⅔ ভাগ ছাপানো নোটের জন্য ভাল ভাল সিকিউরিটি বা কোম্পানীর

কাগজ (যদিও পূর্ব্বোক্ত নগদ টাকা নয়) মজুদ রাখিতে হইত। আইন অনুসারে কাগজগুলি তিন মাসের মধ্যেই শোধ দিতে হইত অর্থাৎ লম্বা মেয়াদী হুণ্ডি জিম্মারূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত না। অধিকন্তু এইগুলিতে যুগ্ম স্বাক্ষর থাকিত অর্থাৎ দুইটা বিশ্বাসযোগ্য কোম্পানীর দায়িত্ব কাগজগুলার গায়ে লেখা থাকিত।

ধরিয়া লওয়া যাউক, রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক ১০০,০০০,০০০ মার্ক মূল্যের নোট ছাপাইয়াছিল। তাহা হইলে ১৮৭৫ সনের আইন অনুসারে সমবেত নোটের জামিন, ঢাক্‌না বা আবরণ নিম্নরূপ দাঁড়াইত :—

১। "নগদ"—
(ক) জার্ম্মাণ মুদ্রা
(১) স্বর্ণমুদ্রা
(২) রৌপ্য মুদ্রা
(৩) নিকেল বা তাম্র মুদ্রা
(৪) ইম্পীরিয়্যাল ট্রেজারি বিল
অথবা
(খ) সোনা
(১) সোনার তাল
(২) বিদেশী মুদ্রা

} ৩৩,৩৩৩,৩৩৩$\frac{1}{3}$ মার্ক

২। "সিকিউরিটি'
বা কোম্পানীর কাগজ
(ক) গিল্ট এজ্‌ড
সোনার কিনারাযুক্ত
(খ) তিন-মাসী
মেয়াদের হুণ্ডি

} ৬৬,৬৬৬,৬৬৭$\frac{2}{3}$ মার্ক

সুতরাং রাইখ্‌স বাঙ্কের সমস্ত নোটের জন্য জামিনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আইন অনুসারে কিছু জামিন-বিহীন বা আবরণ-শূন্য নোট বাহির করার অধিকার ছিল এবং ইহার সর্ব্বোচ্চ সীমানা বাঁধা ছিল ৫৫০,০০০,০০০ মার্ক।

এই অনুগ্রহ-ভোগের সীমানা যদি বাড়াইবার দরকার পড়িত তাহা হইলে সঙ্গে-সঙ্গে সমপরিমাণের নগদ টাকারও ব্যবস্থা করিতে হইত। অন্যথায় যতদিন পর্য্যন্ত এই অতিরিক্ত নোট অর্থাৎ ঢাক্‌না-বিহীন নোট বাজারে চলিত ততদিন ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ৫% ট্যাক্‌স যোগাইতে বাধ্য থাকিত।

কিন্তু মোটের উপর জার্ম্মাণ সিক্কা-ব্যাঙ্কের ব্যবস্থায় প্রত্যেকখানি নোট নগদ টাকারূপে ধার্য্য হইত বা নগদ টাকার স্থলাভিষিক্তরূপে বিবেচিত হইত। পূর্ব্বোক্ত সামান্য সুবিধা বা ব্যতিরেকটুকু ছাড়া "ঢাকনা অভাবে নোট অসিদ্ধ" অর্থাৎ "ঢাক্‌নাহীন নোট অগ্রাহ্য"—রাইখ্‌স বাঙ্কের ইহাই ছিল দস্তুর।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক দুর্য্যোগের ধাক্কা (১৯০৭) ইয়োরোপেও লাগিয়াছিল এবং এজন্য জার্ম্মাণিকেও অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। রাইখ্‌স বাঙ্ককে বাধ্য হইয়া (১) বেশী নোট ছাপাইতে হয়, (২) নগদ টাকা, ও সিকিউরিটি প্রভৃতির পরিমাণও কমাইতে হয়। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সনে নোটের জন্য গড় ঢাকনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪.১% হইতে ৬৮%; ১৯০২ সনে এই পরিমাণ ছিল ৮২·৮%। ১৯০৭ সনে এক সময় নোটের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২৭৫,০০০,০০০ মার্ক এবং নগদ টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৭৭৬,০০০,০০০ মার্ক।

১৮৭৫ সনের আইনে একমাত্র সোনাকেই নগদ টাকারূপে গ্রহণ করা হয় নাই। সুতরাং নোটের জন্য ব্যবহৃত নগদ টাকার ঢাকনা ও সোনার ঢাকনার মধ্যে পার্থক্য ছিল। নগদ টাকার ঢাকনার তুলনায় সোনার

ঢাকনা কমই থাকিত। কারণ নদগ টাকার মধ্যে সোনা ছাড়া অন্যান্য ধাতু এবং ইম্পীরিয়্যাল ট্রেজারী নোটও থাকিত। নিম্নে ঢাকনার (গড়) শতকরা হিস্যার ইতিহাস দেওয়া গেল :—

| সন | গড় সোনার ঢাকনা | গড় নগদ টাকার ঢাকনা |
|---|---|---|
| ১৮৭৬ | ৪১·৯% | ৮২·৫% |
| ১৮৯১ | ৬০·৭% | ৯৫·২% |
| ১৯০৭ | ৪২·৯% | ৬৪·১% |
| ১৯১৩ | ৫৪·৫% | ৭২·০% |
| ১৯১৮ | ১৭·৫% | ... |
| ১৯১৯ | ৫·৩% | ... |
| ১৯২০ | ২·০৮% | ... |
| ১৯২১ | ১·৩৫% | ... |
| ১৯২২ | ০·৩৪% | ... |

১৯১৩ সন পর্য্যন্ত ক্যাশ অর্থাৎ নগদ টাকার জামিন বা ঢাকনা সম্পর্কে "থ্রিট্রেল্‌স্ ডেকুং" অর্থাৎ "এক-তৃতীয়াংশে"র নীতি দস্তুরমত অনুসৃত হইয়াছিল। ১৯০৭ সনের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ (৬৪·১%) ছিল৹ আইনসম্মত ক্যাশের প্রায় দ্বিগুণ। ক্যাশ বা "নগদ" জামিনের সোনার হিস্যা সম্বন্ধে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও এ বিষয়ে রাইখ্‌স বাঙ্ক খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলিত। ১৯০৭ সনে সমস্ত প্রচলিত নোটের জন্য সোনার জামিন ছিল ৪২·৯%; আইন অনুসারে যে পরিমাণে ক্যাশ জামিনের প্রয়োজন ১৯০৭ সনের এই সর্ব্বনিম্ন সোনার জামিনও তদপেক্ষা বেশী ছিল। সুতরাং এক সোনার জামিন দ্বারাই আইনসঙ্গত বাধ্য-বাধকতার স্বচ্ছন্দে পূরণ হইত। ১৯২৪ সনের আইনে সোনার জামিন বাঁধিয়া দেওয়া হয় ৪০%; ১৮৭৬ সন হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত সোনার জামিনের হিসাব সব সময়েই এর চেয়েও বেশী ছিল।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী জার্ম্মাণ সিক্কা-ব্যবস্থার দুইটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার জন্য রাইখ্‌স বাঙ্ক যত খুসী সোনা গ্রহণ করিতে পারিত; দ্বিতীয়তঃ, লোকেরা টাকা-কড়ির পরিবর্ত্তে সেই মূল্যের সোনা লইতে পারিত। স্বর্ণমানের দেশ বা স্বর্ণমানের যুগের ইহাই রীতি।

## রাইখ্‌স বাঙ্কের পুনর্গঠন (১৯২৪-২৯)

উপরে যে বিবরণী দেওয়া হইল তাহা এখন ইতিহাসের সামগ্রী। ১৯২৪ সনের আইন দ্বারা রাইখ্‌স বাঙ্কের কাঠামোটাই বদ্‌লাইয়া ফেলা হইয়াছে,—এক কথায় প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। পুনর্গঠিত রাইখ্‌স বাঙ্কের পরিচালন ও শাসনভার পাঁচটা বিভিন্ন কেন্দ্রের হাতে অর্পিত হইয়াছে, যথা,—

(১) রাইখ্‌স বাঙ্ক ডিরেক্টোরিয়ুম অর্থাৎ রাইখ্‌স বাঙ্কের ডিরেক্টার-সভা, (২) গেনেরালরাট অর্থাৎ বড় সভা, (৩) নোট বাহির করিবার কর্ম্মকর্ত্তা, (৪) অংশীদারদের মহাসভা এবং (৫) অংশীদারদের কেন্দ্রীয় কমিটি।

ব্যাঙ্কের গঠন-প্রণালীর দিক্ হইতে ডিরেক্টার-সভাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, কারণ এই সভা সিক্কা, ডিস্কাউন্ট ও কর্জ্জদাদন-নীতি নিয়ন্ত্রণ করে। ডিরেক্টার-সভায় প্রয়োজনমত যে-কোনো সংখ্যক সদস্যের স্থান হইতে পারে। একজন সদস্য প্রেসিডেন্টরূপে পরিচিত। সদস্যদের প্রত্যেকেরই জার্ম্মাণ নাগরিক হওয়া চাই। সংখ্যা-গরিষ্ঠদের মত মানিয়া চলাই ব্যাঙ্কের বিধিবদ্ধ আইন। দুই পক্ষে ভোট সমান হইলে প্রেসিডেন্ট যে-কোনো একদিকে ভোট প্রয়োগ করিতে অধিকারী।

প্রেসিডেণ্ট বড় সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তি; নয় জনের গরিষ্ঠ-সংখ্যা কর্ত্তৃক তিনি সমর্থিত এবং এই ৯ জনের মধ্যে ৬ জন জার্ম্মাণ। সুতরাং কোনো অ-জার্ম্মাণের পক্ষেই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হওয়ার উপায় নাই। ১৯২৪ সনের পূর্ব্বে অবস্থা ছিল একেবারে বিপরীত। তখন প্রেসিডেণ্ট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাহাল হইত এবং একজন পুরাদস্তুর সরকারী চাকুর্য়েই ছিল। এখন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করে বড় সভা, যার উপর গবর্ণমেণ্টের কোনো প্রভুত্বই নাই। আবার এই বড় সভার অনেক সদস্য যে অ-জার্ম্মাণ তাহা আমরা পরে দেখাইব। বড় সভা কর্ত্তৃক প্রেসিডেণ্ট পদচ্যুত হইতেও পারে। কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, যে নিয়োগপত্রের বলে প্রেসিডেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করে সেই নিয়োগ-পত্রে কেবলমাত্র নির্ব্বাচনে যোগদানকারী বড় সভার সদস্যদের নাম স্বাক্ষরই থাকে এমন নয়, নিয়োগপত্রখানি রাইখ্‌স প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃকও স্বাক্ষরিত হয়। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক এই যে, রাইখ্‌স প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করিলে নিয়োগপত্র স্বাক্ষরে গররাজী হইয়া বড় সভাকে দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচনের জন্য বাধ্য করিতে পারেন। রাইখ্‌সপ্রেসিডেণ্ট যদি দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে তৃতীয় নির্ব্বাচনের জন্য ব্যবস্থা করিতে হয়। এইবারও রাইখ্‌স প্রেসিডেণ্ট যদি স্বাক্ষর করিতে রাজী না হন তাহা হইলে নিয়োগপত্রে রাইখ্‌স প্রেসিডেণ্টের নাম স্বাক্ষর না থাকা সত্ত্বেও রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকালের মেয়াদ ৪ বৎসর। তিনি পুনর্নির্ব্বাচিতও হইতে পারেন।

পুরাতন রাইখ্‌সব্যাঙ্কের কাউন্সিল-মেম্বরগণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইত। কিন্তু নূতন রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের ডিরেক্টোরিয়ম-প্রেসিডেণ্টের

মত সদস্যগণও বড় সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয় অর্থাৎ ৬ জন জার্ম্মাণ সহ ৯ জনের গরিষ্ঠ সংখ্যা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। নিয়োগপত্রে কিন্তু রাইখ স প্রেসিডেণ্টের পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্টের নাম স্বাক্ষর থাকে। প্রথম ডিরেক্টোরিয়ুম যেসমস্ত সদস্য লইয়া গঠিত হয় সেই সমস্ত সদস্য তিনটি বয়সের শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের কার্য্যকালের মেয়াদ ছিল ৪ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত। ইহাদের সকলেরই পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার আছে, এবং পুনর্নির্ব্বাচনের পর প্রত্যেকের ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সদস্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু প্রত্যেক সদস্যই ৬৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য।

গুরুতর আপত্তির কারণ উপস্থিত হইলে প্রেসিডেণ্টকে পদচ্যুত করা যায়; কিন্তু এজন্য পূর্ব্বোক্তরূপে গরিষ্ঠ সংখ্যা কর্ত্তৃক এই পদচ্যুতি সমর্থিত হওয়া চাই। এই একই ধরণে ডিরেক্টোরিয়ুমের অন্যান্য সদস্যদিগকেও জবাব দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু প্রেসিডেণ্টের সমর্থন থাকা চাই।

জার্ম্মাণ রাইখ্সবাঙ্কে মজার ব্যাপার এই যে, গবর্ণমেণ্ট ডিরেক্টোরিয়ুমের উপর কোনো প্রকার খবরদারি করিবারই অধিকারী নয়। আইনের ভাষায় ডিরেক্টোরিয়ুম প্রায় পূর্ণ স্বরাজের অধিকারী। বড় সভারও ডিরেক্টোরিয়ুমের উপর কোনো হাত নাই, যদিও উহা ডিরেক্টোরিয়ুমের জন্মদাতা।

গেনেরালরাট অর্থাৎ বড় সভাকে রাইখ্স বাঙ্কের "কিং-মেকার" রাজা-নির্ব্বাচক বলা যাইতে পারে। এই অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানটির জুড়িদার অন্য কোনো নোটব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চৌহদ্দির মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই প্রতিষ্ঠানের ১৪ জন সদস্যের মধ্যে অর্দ্ধেক মাত্র জার্ম্মাণ। বাকী সাতজন অ-জার্ম্মাণ সদস্য, বিলাত, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড এবং স্বইট্সারল্যাণ্ডের

লোক। সাতজন জার্ম্মাণ সদস্যের মধ্যে একজন প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি বড় সভারও চেয়ারম্যান। সাতজন বিদেশী সদস্যের মধ্যে একজন নোট বাহির করিবার কমিসারের কাজ করেন। জার্ম্মাণ সদস্যদের সংখ্যা বাড়ানো যাইতে পারে বটে, কিন্তু বিদেশী সদস্যদের সংখ্যা একজনও বাড়াইবার উপায় নাই।

দুইটি মহত্ত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কঘটিত কাজে বড় সভার অনুমোদন আবশ্যক। ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি বাবদ লম্বা মেয়াদের সরকারী লোন গ্রহণ করিতে হইলে বড় সভার হুকুম লইতে হয়। তাছাড়া নোটের জন্য ৪০% জামিনের যে আইন আছে তাহা ভঙ্গ করিতে হইলেও বড় সভার অনুমোদন চাই।

রাইখ্‌সবাঙ্কের কেবলমাত্র জার্ম্মাণ অংশীদারগণই বড় সভার জার্ম্মাণ সদস্য নির্ব্বাচন করিতে অধিকারী। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে তাহাদের অধিকার নাই। প্রথমবার বিদেশী সদস্যগণ সংগঠন-কমিটি কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সদস্যদের বেলায় এই নিয়ম করা হইয়াছে যে, শূন্য সদস্যপদ জাতি-হিসাবে পূরণ করিতে হইবে, তবে সাতজন বিদেশী সদস্যকেই ভোট দিতে হইবে। একজন• বাদে সকল সদস্যের অভিমত থাকিলে তবে নির্ব্বাচন সিদ্ধ হয়।

বড় সভা কর্ত্তৃক বিদেশী সদস্যদের মধ্যে একজন নোট-জারি করিবার কমিসার বা কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এজন্য ৯ জনের গরিষ্ঠ সংখ্যা গঠন করা চাই এবং এর মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ৬ জন হইবে বিদেশী সদস্য। বড় সভার সদস্য-শ্রেণীভুক্ত নয় এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কারণে ঘটনাচক্রে নির্ব্বাচিত হয় তাহা হইলে উক্ত নির্ব্বাচিত ব্যক্তির স্বদেশী বড় সভার সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হয়। নির্ব্বাচিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কমিসার ৪ বৎসরের জন্য বড় সভার সদস্য পদবাচ্য হয়।

কমিসারকে প্রত্যেক দিন ডিরেক্টোরিয়ুমের নিকট হইতে নোট ও

জামিন সম্বন্ধে মাপজোক ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়। নোট তৈরী করা, বাহির করা, উঠাইয়া লওয়া এবং ধ্বংস করা সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র কর্ত্তা, এবং আইন অনুসারে তিনিই নোট নিয়ন্ত্রণ করেন। ডিরেক্টোরিয়ুমের সভা-সমিতিতে তাঁহার যোগদানেরও অধিকার আছে।

প্রত্যেক জন রেজেষ্টারি করা অংশীদারকে লইয়া তাহাদের মহাসভা গঠিত হয়। যাহারা সভায় যোগদান করে কেবলমাত্র তাহারাই ভোট দানের অধিকারী। প্রত্যেকের অধিকারে যতগুলি শেয়ার বা অংশ থাকে তাহার কাগজে বর্ণিত মূল্যের উপর ভোটের সংখ্যা নির্ভর করে।

অংশ-প্রতি ভোট। কিন্তু একজন উর্দ্ধ পক্ষে ৩০০টি ভোটের অধিকারী হইতে পারে। সাধারণতঃ গরিষ্ঠ সংখ্যা গঠিত হইলেই গোল চুকিয়া যায়। তবে দুই পক্ষে সমান ভোট হইলে শেয়ারের মূল্য অনুসারে সিদ্ধান্ত করা হয়।

প্রত্যেক বৎসর মহাসভার নিকট শাসন-বিবরণী দাখিল করিতে হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ, লাভক্ষতির হিসাব, লাভ-বিতরণ, সমস্তই আইন অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হয়। বলা বাহুল্য বড় সভার অনুমোদন অনুসারে ডিরেক্টোরিয়ুম যে সমস্ত আইনের নির্দ্দেশ প্রদান করে সেই সমস্ত আইন অনুযায়ী যেসকল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন মহাসভাকে সে সম্বন্ধেও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। তবে মহাসভা এ সম্বন্ধে নিজে কিছু বাৎলাইতে পারে না। আর একটা অধিকার আছে। এই প্রতিষ্ঠান জার্ম্মাণ সদস্যদের দ্বারা বড় সভার জার্ম্মাণ প্রতিনিধিবর্গও নির্ব্বাচন করিতে পারে।

৫সেণ্ট্রাল আউসশুস্ বা কেন্দ্র-কমিটি একটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত বিশেষ কমিটি। মহাসভার জার্ম্মাণ ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর

সদস্যগণ কর্তৃক এই কমিটি নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ একমাত্র জার্ম্মাণ অংশীদারগণই এই কমিটিতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই কমিটি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। প্রয়োজন হইলে ডিরেক্টোরিয়ুম ইচ্ছামত ইহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে। এই বিশেষজ্ঞগণ ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, বাণিজ্য, কৃষি, কুটীর-শিল্প, কারিগরশ্রেণী প্রভৃতির পক্ষ হইতে ডিরেক্টোরিয়ুমের নির্দ্দেশ অনুসারে নির্ব্বাচিত হয়। ডিরেক্টোরিয়ুম এই কমিটির প্রতিনিধিদিগকে উহার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে পারে।

নয়া রাইখ্স বাঙ্কের শাসন-বিভাগে বিদেশীদের স্থান উঁচু বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ইহা চির-প্রচলিত দস্তুর নয়। এই প্রতিষ্ঠানের আজগুবী পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ইহার জন্য দায়ী। মহাযুদ্ধ, ভার্সাই সন্ধি, ডয়েস্ প্ল্যান এবং যুদ্ধ-ক্ষতি-পূরণের কমিশন—এইগুলির জন্যই রাইখ্স বাঙ্কের উপর বিদেশী কর্তৃত্ব দেখা যাইতেছে।

## "এক-তৃতীয়াংশ ঢাকনা" হইতে "সোনার ঢাকনা" (১৯২৪)

ক্নাপ্-লিখিত "ডী ষ্টাট্‌লিখে টেয়োরী ডেস্ গেল্ডেস্" (১৯০৫) প্রকাশিত হওয়ার পর জার্ম্মাণিতে মুদ্রার নমিনালিষ্টিক (নামনিষ্ঠ) থিয়োরির বা তত্ত্বের অতি-প্রচলন হয়। যুদ্ধের মধ্যে ও উহার পর বড় বড়সিক্কা-বিশেষজ্ঞগণ এই তত্ত্বটাকে বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিতে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ডালব্যার্গ-প্রণীত "নয়া জার্ম্মাণ কারেন্সী", ১৯২৪; "স্বর্ণের সিংহাসনচ্যুতি" এবং "মুদ্রার মূল্য-হ্রাস", ১৯১৯, উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবুও মুদ্রা সম্বন্ধে "মেটালিষ্টিক" (ধাতুনিষ্ঠ) মতামত চলিতে থাকে; তবে ইহা সত্য যে, এই মতবাদ অনেকটা ক্ষুণ্ণ ও পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ১৯২৪ সনের ব্যাঙ্ক-আইনের দৌলতে এই তত্ত্বটা আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। সেই জন্য

মুদ্রাব্যবস্থাকে সোনা হইতে মুক্ত করিয়া কেবলমাত্র নোটের উপর উহার ভিত্তিমূল স্থাপন করার খেয়াল জার্ম্মাণি হইতে বিদায় লইয়াছে। নয়া রাইখ্‌স বাঙ্ক স্বর্ণমানের আদর্শকে ঠিক যেন কড়ায় ক্রান্তিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিতে পারি।

প্রথমতঃ, ড্রিট্টেল্‌স্‌ডেক্কুং অর্থাৎ নোটের পরিবর্ত্তে এক-তৃতীয়াংশ ঢাকনা রাখার জার্ম্মাণ রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গোল্ড ডেক্কুং ( স্বর্ণ-ঢাকনা ) পুরাতন রাইখ্‌স বাঙ্কে ছিল ইচ্ছাধীন বা সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা। তাহা ১৯২৪ সনের আইন অনুসারে হইয়াছে রীতিমত বাধ্যতামূলক। আর অনুপাত যতদূর সম্ভব উচ্চ করা হইয়াছে।

নূতন আইন অনুসারে সমস্ত নোটের জন্য নিম্নলিখিত ঢাকনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

১। গোল্ড-ডেক্কুং ( স্বর্ণ জামিন ) ৪০%

(ক) প্রকৃত সোনা ( ৩০% ) :—

(১) সোনার তাল, (২) জার্ম্মাণ স্বর্ণমুদ্রা, (৩) বিদেশী স্বর্ণমুদ্রা।

এইসমস্ত সোনা হয় রাইখ্‌স বাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে, না হয় কোনো বিদেশী সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের চলতি হিসাবে জমা রাখিতে হইবে। খাঁটি সোনার এইরূপ সংজ্ঞা স্থির করা হইয়াছে যে, ১ পাউণ্ড ওজনের খাঁটি সোনায় ১৩৯২টি রাইখ্‌স মার্ক তৈরী হইতে পারে।

(খ) ডেভিজেন ( ১০% ) :—

(১) ব্যাঙ্ক নোট, (২) ঊর্দ্ধ পক্ষে ১৪ দিনের মধ্যে শোধনীয় কাগজ, (৩) চেক, (৪) কোনো ভাল ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক বিদেশী মুদ্রাকেন্দ্রে বিদেশী মুদ্রায় শোধিতব্য দৈনিক বিলসমূহ। এইসমস্ত কাগজী মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারণের সময় সোনার দরে কষিয়া লইতে হয়।

২। ব্যবসার সিকিউরিটি অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাগজ ৬০%।

(১) ঊর্দ্ধ পক্ষে তিন মাসের মধ্যে শোধনীয় বিল। এই সমস্ত

বিলে তিনটি সাহুকার কারবারীর স্বাক্ষর থাকা চাই। ভাল কারবারের প্রমাণ থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে এইগুলি ডিস্কাউণ্ট করিয়া (কিনিয়া) ঢাকনারূপে জমা রাখা যাইতে পারে।

(২) যেসমস্ত চেকে তিনটি সঙ্গতিসম্পন্ন কারবারীর স্বাক্ষর আছে সেগুলিও ডিস্কাউণ্ট করিয়া (কিনিয়া) ঢাকনারূপে রাখা যাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বিল বা চেকের যদি বিশেষত্বপূর্ণ জামিন ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে তৃতীয় পক্ষের স্বাক্ষরের কোনো প্রয়োজন নাই।

গোল্ড ডেকুং নয়া আইনের প্রধান বিশেষত্ব। কিন্তু সোনার ঢাকনা জিনিষটা পুরামাত্রায় স্বদেশী বস্তু নয়। গোল্ড-রিজার্ভের 'ধাতব' ও ডেভিজেন উভয় দফাতেই বিদেশী চিজ রীতিমত স্থান দখল করিয়াছে; তবে এই স্থান দেওয়া ইচ্ছাধীন বটে। আইনে এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, দরকার হইলে রিজার্ভ বিদেশে রাখা যাইতে পারিবে।

অধিকন্তু নোটের কর্ম্মকর্ত্তারূপে বিদেশীকে নিয়োগ করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে। আর বড় সভায় বিদেশী সদস্যদের অবস্থিতি—এই ক্ষেত্রেও বিদেশীদের আধিপত্য চোখে পড়ে।

পুরাতন রাইখ্‌স বাঙ্ক ঊর্দ্ধ পক্ষে ৫৫০,০০০,০০০ মার্ক জামিনহীন নোট প্রচলনের অধিকারী ছিল; তবে জরিমানা দিয়া এইরূপ নোটের পরিমাণ বাড়ানো চলিত।

কিন্তু ১৯২৪ সনের আইন রাইখ্‌স বাঙ্ককে এই অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। "জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" অর্থাৎ "দাও জামিন, ছাড়ো নোট"—এই নীতির এখন জয়জয়কার চলিতেছে।

জামিন (বিশেষতঃ সোনার জামিন) সম্বন্ধে রাইখ্‌স বাঙ্ককে কিছু অনুগ্রহ দান করা হইয়াছে; কিন্তু এই অনুগ্রহ ভোগ করার পূর্ব্বে ব্যাঙ্ককে বড় সভার অনুমোদন লাভ করিতে হয়। যদি কোনো জরুরি অবস্থার উদ্ভব হয়, এবং ডিরেক্টোরিয়ুমের নিকট হইতে নির্দ্দেশ আসে

তবেই, মাত্র একজন বাদে সমস্ত সদস্যের অনুমোদনক্রমে এই বিশিষ্ট সুবিধা ভোগ করা চলিতে পারে।

৪০% সোনার জামিন বিষয়ক নিয়মটা দুইটি সর্ত্তে শিথিল করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আইনসম্মত মাপকাঠি অনুসারে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ককে গবর্ণমেণ্টের নিকট ট্যাক্‌স্ দিতে হইবে। যদি এক সপ্তাহের বেশী জামিন হ্রাস করিতে হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিতরূপ ট্যাক্সের হার বলবৎ হইবে :—

| | | | | প্রতি সন |
|---|---|---|---|---|
| সোনার জামিন শতকরা | ৩৭ | হইতে | ৪০ | ৩% |
| ,, ,, ,, | ৩৫ | ,, | ৩৭ | ৫% |
| | ৩৩⅓ | ,, | ৩৫ | ৮% |

সোনার ঢাকনা ৩৩⅓%এর কম হইলে প্রত্যেক সন ৮% হিসাবে ট্যাক্স এবং ৩৩⅓%এর নীচে শতকরা প্রত্যেকটি ঘাটতির জন্য ১% হিসাবে অতিরিক্ত কর যোগাইতে হইবে।

সোনার ঢাকনা হ্রাস করিবার দ্বিতীয় সর্ত্ত নিম্নলিখিত উপায়ে সিদ্ধ হইতে পারে। প্রথমতঃ, হ্রাস করিবার সময়ের মধ্যে ডিস্কাউণ্টের ( বাণিজ্যিক বিল কিনিবার ) হার ৫%এর কম হইলে চলিবে না দ্বিতীয়তঃ, যখনই ট্যাক্স যোগাইতে হইবে তখনই ট্যাক্সের এক-তৃতীয়াংশ অনুপাতে ডিস্কাউণ্টের হারও বাড়াইতে হইবে।

৩। সোণ্ডার-ডেকুং বা বিশেষ এবং স্বতন্ত্র ঢাকনা ( ৪০% দৈনিক দেনার বা দায়িত্বের )।

নোটের জন্য পূর্ব্বোক্ত ঢাকনা ছাড়া ১৯২৪ সনের আইনে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক উহার দৈনিক দেনাপত্রের জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৪০% ঢাকনা রাখিতে বাধ্য। এই ঢাকনা নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

১। জার্ম্মাণিতে রাইখ্‌স বাঙ্কের দৈনন্দিন ডিপজিট বা আমানত।

২। বিদেশে ,, ,, ,, ,, ,,

৩। রাইখ্‌স বাঙ্কের পক্ষে অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর চেক ( জার্ম্মাণ ও বিদেশী )।

৪। উর্দ্ধপক্ষে ৩০ দিনের মেয়াদ-বিশিষ্ট বিনিময় হুণ্ডি বিল।

৫। রাইখ্‌স বাঙ্কের যে-যে কর্জ্জ প্রতিদিন আদায় হইতে পারে।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাইখ্‌স বাঙ্ক দেশ-বিদেশে অপরের নিকট অল্পদিনের মেয়াদে যেসমস্ত কর্জ্জ দাদন করিয়াছে এইসমস্ত ঢাকনা তাহারই অন্তর্ভুক্ত।

আইনে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, দৈনিক কারবারের জন্য এই ৪০% ঢাকনা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য টাকাকড়ি হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। ক্ষতিপূরণ কমিশনের নামে রাইখ্‌স বাঙ্ককে সকল সময়ে দুই শত কোটি মার্ক জমা রাখিতে হয়।

রাইখ্‌স বাঙ্কের দৈনিক আমানত এবং অন্যান্য দেনাপত্র দৈনিক ও অল্প মেয়াদের দাবীর আকারের স্থায়ী ৪০% রিজার্ভ হইতে মিটানো হইয়া থাকে। এই রিজার্ভ যে কেবলমাত্র রাইখ্‌স বাঙ্কের সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবারের কাজ করে তাহা নহে; ইহা পরোক্ষে নোটের ঢাকনিরও শক্তি বৃদ্ধি করে। এই আইন দ্বারা "নোট-বিভাগের" ঢাকনা, সিকিউরিটি বা সংরক্ষণ হইতে "ব্যাঙ্ক-বিভাগের" ঢাকনা, সিকিউরিটি বা সংরক্ষণকে পৃথক করা হইয়াছে। সুতরাং রাইখ্‌স বাঙ্কের উত্তমর্ণ হিসাবে নোটের অধিকারীদের সহিত আমানতকারী ও অন্যান্য উত্তমর্ণদের প্রতিযোগিতার পথও বন্ধ করা হইয়াছে।

সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবারের দেনাপত্রের জন্য এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা যদি না থাকিত তাহা হইলে আমানতকারী ও অন্যান্য কর্জ্জদাতাদের অধমর্ণ হিসাবে রাইখ্‌স বাঙ্ককে বহু সময় নোটের রিজার্ভে বা ঢাকনায়

হাত দিতে হইত। আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এই সোণার ডেক্কুং বা স্বতন্ত্র "ব্যাঙ্কিং রিজার্ভ" থাকার ফলে নোট বা কাগজী মুদ্রার জন্য রিজার্ভের নূতন এবং নিখুঁত জামিনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯২৪ সনের আইন অনুসারে গঠিত নোট-রিজার্ভের অতিরিক্ত এই পৃথক ব্যাঙ্কিং-রিজার্ভের ব্যবস্থা চিন্তাক্ষেত্রে একেবারে নতুন চিজ নয়। ১৮৯৯ সনে হেল্‌ফেরিথ্‌ তাঁহার "জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক-আইনের নূতনত্বসাধন" নামক গ্রন্থে এই মত বহু পূর্ব্বে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

## বিলাতের নোট-আইন (১৮৪৪-১৯২৮)

আরও একটি বিষয় জানিয়া রাখিতে হইবে যে, নয়া জার্ম্মাণ নোট-ব্যবস্থায় বিলাতী নোট-ব্যবস্থার মূলসূত্রগুলা গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৮৪৪-৪৫ সনের বৃটিশ (পীল) আইন দ্বারা ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যণ্ডের নোট-প্রচার নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। এই আইনের ফলে ব্যাঙ্কের নোট-বিভাগ ব্যাঙ্কিং-বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ব্যাঙ্কের অন্যান্য বিভাগের ঢাকনা হইতে নোট-বিভাগের ঢাকনা পৃথক।

নোটের জামিন বা ঢাকনা সম্বন্ধে উক্ত আইনে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলা দেখিতে পাওয়া যায় :—

১। সিকিউরিটি
  (১) সরকারী
  (২) অন্যান্য
} ১৪,০০০,০০০ পাঃ (বিশ্বাসনিষ্ঠ নোট-প্রচার)

২। সোনা
  (১) সোনার তাল
  (২) মুদ্রা
} ঢাকনার বাকী অংশ, পরিমাণ যতই হউক না কেন

১৮৫৩ সন পর্য্যন্ত সোনার ২৫% রূপায় রাখা চলিত। কিন্তু তাহার পর রূপা রাখিবার প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং বুলিয়ন বা তাল কেবলমাত্র খাঁটি সোনা লইয়াই গঠিত হইয়াছে।

১৮৮৯ সনে সিকিউরিটির পরিমাণ ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১৬,৪৫০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৯১৪ সনের কারেন্সী ও ব্যাঙ্ক আইন দ্বারা নোট-ব্যাঙ্ককে আইন-সম্মত সীমা ছাড়াইয়া যথেচ্ছ ব্যাঙ্ক-নোট প্রচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। আইনটা সামরিক ব্যবস্থারূপে গৃহীত হয়। ১৯১৯ সনে একটা সর্ব্বোচ্চ সীমার নির্দ্দেশ ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। এই সঙ্গে স্থির করা হয় যে, কোনো সনের বাস্তব সর্ব্বোচ্চ "বিশ্বাস-নিষ্ঠ" ( অর্থাৎ স্বর্ণ-বিহীন ) ঢাকনায় প্রচারিত কারেন্সি পরবর্ত্তী সনের ধার্য্য ও নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোচ্চ সীমারূপে গৃহীত হইবে। ১৯২১ সনে এই সর্ব্বোচ্চ সীমা দাঁড়ায় ৩২০,৬০০,৫০০ পাউণ্ড।

১৯২৮ সনের জুলাই মাসে "বিশ্বাস-নিষ্ঠ" নোটের সর্ব্বোচ্চ স্থায়ী সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয় ২৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই নয়া নিয়মে ঢাকনার অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপ :—

১। "বিশ্বাস-নিষ্ঠ-নোট
(১) গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি
(২) অন্যান্য সিকিউরিটি
(৩) ৫,৫০০,০০০ পাঃ মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা
} ২৬০,০০০,০০০ পাঃ

২। স্বর্ণ ঢাকনাযুক্ত নোট
(১) মুদ্রা
(২) বুলিয়ন বা তাল
} প্রচারিত নোটের বাকী অংশ

এই নয়া ব্যবস্থায় ১৮৪৪ সনের নীতিই অটুট রাখা হইয়াছে।

অর্থাৎ সিকিউরিটির বিনিময়ে যতটা সর্ব্বোচ্চ পরিমাণের নোট জারি করা যাইতে পারে তাহা ছাড়া বাকী সমস্ত নোটের জন্য স্বর্ণ জামিনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং বিলাতী নোট-ব্যবস্থাতে জার্ম্মাণ নীতির অর্থাৎ "জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" নীতির জয়-জয়কার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেকখানি নোট মুদ্রার সার্টিফিকেট মাত্র এবং অক্লেশে উহাকে স্বর্ণমুদ্রার সামিল ধরা যাইতে পারে।

কিন্তু পূর্ব্বে জামিনের হালচাল সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ও বিলাতী কায়দার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক ছিল। এ তথ্যটা তলাইয়া দেখার দরকার। বিশেষতঃ, ১৮৪৪ সনের বিলাতী আইনের অনুসরণ করিয়াও ১৮৭৫ সনের জার্ম্মাণ আইন মুদ্রা-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করিবার জন্য কি পরিমাণ চেষ্টা করিয়াছে তাহাও জানিয়া রাখা ভাল।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডকে সোনার বাহিরে নোট প্রচার করিতে দেওয়া হয় না। এই প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ সোনা আছে ঠিক সেই পরিমাণ নোট প্রচলন করিতে দেওয়া হয়। সিকিউরিটিগুলা যতই ভাল হউক না কেন একটি সর্ব্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বিলাতী নোট-ব্যবস্থা কেবল মাত্র "জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" নয়; "স্বর্ণ জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" এই নীতির উপরই উহার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত। সোজা কথায় বিলাতী নোটের রিজার্ভ প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র স্বর্ণদ্বারাই গঠিত। ( কিন্তু ৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য )

পুরাতন রাইখ্স্ বাঙ্ক ( ১৮৭৫ সনের আইন ) কিন্তু বহুল পরিমাণে স্বর্ণের সংস্রব হইতে মুক্ত ছিল। এখানে সিকিউরিটিরই ছিল জয়-জয়কার। রাইখ্স্ বাঙ্কের নোটের বহর যত বেশী হউক না কেন, দুই-তৃতীয়াংশ নোটের পরিবর্ত্তে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করিলেই চলিত।

বিলাতী ব্যবস্থাতে কিন্তু সিকিউরিটি গৌণ স্থানই দখল করিয়া আসিতেছে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যণ্ডের নোটের বহর যতই বেশী হইবে, ব্যাঙ্কের সিন্দুকে ততই বেশী সোনা মজুদ রাখিতে হইবে, এবং নোট বা সোনার তুলনায় সিকিউরিটির (ঊর্দ্ধপক্ষে ২৬০,০০০,০০০ পাঃ) অনুপাত ততই কম হইতে থাকিবে।

রাইখ্স বাঙ্কের ব্যবস্থায় সোনার ঢাকনার স্থান ঢুঁড়িতে হইবে "নগদ সিক্কায়"; ড্রিট্রেলসডেক্কুং নীতি অনুসারে এই "নগদ সিক্কা" বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কিন্তু এখানেও বিকল্পের ব্যবস্থা আছে। তথাকথিত "নগদ সিক্কা" সোনা বা "জার্ম্মাণ মুদ্রা" দুই-ই হইতে পারে। যদি সমস্তই সোনা ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যায়, কারেন্সির এক-তৃতীয়াংশ নোটের জন্য সোনা মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু "নগদ সিক্কার" জামিনের খাতে যদি কেবলমাত্র "জার্ম্মাণ মুদ্রা" রাখার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে কি পরিমাণ সোনা থাকিবে তাহার কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না। আইনটা এমন শিথিল যে, ইম্পীরিয়্যাল ট্রেজারী বিলকে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ মুদ্রার সামিল করা হইয়াছে। অথচ এই ইম্পীরিয়্যাল ট্রেজারি বিল জিনিষটা কাগজী মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে "নগদ সিক্কার" তালিকায় এই চিজটা অতি অল্প পরিমাণে রাখা হয়। ১৮৭৫ সনের আইনে "নগদ সিক্কার" যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও আমরা এই গলদ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

রাইখ্স বাঙ্ক ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড হইতে নীতি গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রয়োগের বেলায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে। জার্ম্মাণ কারেন্সি-ব্যবস্থায় কেবলমাত্র সোনাকেই নোটের প্রধান রিজার্ভ বা জামিনরূপে গ্রাহ্য করা হয় নাই।

১৮৭৫ সনের জার্ম্মাণ আইন আরও এক বিষয়ে বিলাতী দস্তুরকে

ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহার জামিন বা রিজার্ভ ছাড়াও কিছু নোট প্রচলনের (৫০০,০০০,০০০ মার্ক) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অধিকার ব্যাপকতর করারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯২৮ সনের জুলাই মাসের কারেন্সি ও ব্যাঙ্ক-নোট আইন ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডকে "আনুপাতিক" স্বর্ণ-জামিন রাখিবার জন্য বাধ্য করে নাই। এই আইনে "স্বর্ণ-হীন নোট অসিদ্ধ" নীতিটা বিশেষ কঠোরতার সহিত মানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

১৯২৮ সনের ২৮শে নবেম্বর তারিখে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের নোট-বিভাগ নোট ও ঢাকনার নিম্নলিখিতরূপ সাপ্তাহিক বিবরণী প্রকাশ করে :—

নোট (দেনা) :—

| | |
|---|---|
| ১। বাজারে | ৩৬৭,০০১,১৪৮ পাঃ |
| ২। ব্যাঙ্কে | ৫২,০৮৭,৭৯৭ পাঃ |
| মোট | ৪১৯,০৮৮,৯৪৫ পাঃ |

জামিন বা ঢাকনা (সম্পত্তি)

| | |
|---|---|
| ১। বিশ্বাস-নিষ্ঠ বা বিশ্বস্ত (সোনা নয়) | ২৬০,০০০,০০০ পাঃ |
| (১) সরকারী ঋণ | ১১,০১৫,১০০ পাঃ |
| (১) অন্যান্য সরকারী সিকিউরিটি | ২৩৩,৫৬৮,৫৫০ পাঃ |
| (৩) অন্যান্য সিকিউরিটি | ১০,১৭৬,১৯৩ পাঃ |
| (৪) রৌপ্যমুদ্রা | ৫,২৪০,১৫৭ পাঃ |

২। সোনা

(১) মুদ্রা
(২) বুলিয়ন বা তাল } ১৫৯,০৮৮,৯৪৫ পাঃ

অর্থাৎ প্রচারিত ৪১৯,০৮৮,৯৪৫ পাঃ মূল্যের নোটের জন্য বাধ্যতা-মূলক ভাবে মাত্র ১৫৯,০৮৮,৯৪৫ পাউণ্ড মূল্যের "সোনার ঢাকনা" ছিল। সুতরাং মোট নোটের স্বর্ণ-জামিনের পরিমাণ প্রায় ৩৮%। এখন বিশ্বাস-নিষ্ঠ, বিশ্বস্ত বা শ্রদ্ধাসূচক নোটের পরিচালন যদি বাড়াইতে হয়, আর আইনেও যখন এরূপ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে—তখন সোনার ঢাকনার অনুপাত নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাগজে কলমে যেরূপ নীতিরই ব্যবস্থা থাকুক না কেন, এবং বিলাতী আইন যতই সংরক্ষণমূলক ও প্রাচীনতার পক্ষপাতী হউক না কেন, অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর চাপে এবং বিভিন্ন মতবাদের খাতিরে রাইখ্‌স বাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যাণ্ড প্রায় একই ধরণের কার্য্যক্রম মানিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছে। ( ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য )

১৯২৪ সনের আইন অনুসারে জার্ম্মাণিতে গোল্ড ডেক্কুং (সোনার ঢাকনা) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং উহা বাধ্যতামূলক সোনার রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থাও কায়েম করিয়াছে। সোনার জামিনযুক্ত নোটের পরিমাণও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। তবুও নূতন ও পূর্ব্বতন উভয় রাইখ্‌স বাঙ্কের সহিতই বিলাতী নোট-ব্যাঙ্কের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ব্যাঙ্কের কাঠামো বা গঠন হিসাবে জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানে সোনার মজুদ্‌ তহবিল মাত্র গৌণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিলাতের ১৯২৮ সনের আইন ১৮৪৪ সনের আইনের সমান সাবধানী বা সতর্কতাযুক্ত। অন্য পক্ষে ১৮৭৫ সনের জার্ম্মাণ আইনে যে শৈথিল্য প্রকাশ করা হইয়াছে, নয়া রাইখ্‌স বাঙ্ক পত্তনের আইনেও তাহারই প্রাবল্য দেখা যায়।

## নোট-ব্যাঙ্কিংয়ের ফরাসী দস্তুর (১৮০০-১৮৪৮)

জার্ম্মাণির ১৯২৪ এবং ১৮৭৫ সনের নোটবিষয়ক আইন যদি বিলাতী (১৮৪৪,১৯২৮) আইনের তুলনায় যথেষ্ট উদারনীতিক মালুম হয়; তাহা হইলে শত বৎসরের পুরাতন ফরাসী আইন জার্ম্মাণ আইনকেও নেহাৎ রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী ঠাওরাইবে। কারণ বাঁক ছ ফ্রাঁস নোট জারি সম্বন্ধে কোনো ঢাকনা বা জামিনবিষয়ক আইনের ধার ধারে নাই। "স্বর্ণ অভাবে নোট অসিদ্ধ" নীতি চুলোয় যাউক, এমন কি আটপৌরে "জামিন বা ঢাকনা অভাবে নোট অসিদ্ধ" নীতিও ১৮০০ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত ফরাসী কারেন্সি-আইনে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল।

নিম্নে লক্ষ হিসাবে যে কয়েকটি অঙ্ক দেওয়া গেল তাহা হইতেই বাঁক ছ ফ্রাঁসের প্রাথমিক জীবনের কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে :—

| | নগদ | বিল | নোট |
|---|---|---|---|
| ১৮১২ (প্রারম্ভ) | ১১৪০ | ১৫০ | ১১৭০ |
| ১৮১৪ (১৮ই জুন) | ১৪০ | ৩১০ | ৩৮০ |

১৮৪৬-৪৮ সন পর্য্যন্ত সঙ্কটকালে প্রকৃত অবস্থা নিম্নরূপ ছিল :—

| | নগদ | বিল | নোট |
|---|---|---|---|
| ১৮৪৬ (ডিসেম্বরের শেষ) | ৭১০ | ১৮৮০ | ২৫৮০ |
| ১৮৪৭ ,, | ১০৭০ | ১৫৭০ | ২৩৩০ |

আইনের ব্যবস্থা না থাকিলেও, এই ব্যাঙ্কের নোট ও নগদের অনুপাত আধুনিক মাপকাঠি অনুসারেও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে ফরাসী এলাকার বিভিন্ন স্থানে আটটি পৃথক নোট-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং বাঁক ছ ফ্রাঁসের একচেটিয়া

অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। নিম্নে ব্যাঙ্ক কয়টির অবস্থান এবং স্থাপিত হওয়ার সময় উল্লেখ করা হইল :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | ১৮১৭ রুআঁ | ৫। | ১৮৩৫ মার্সেই |
| ২। | ১৮১৮ নাঁৎ | ৬। | ১৮৩৬ লিল্ |
| ৩। | ১৮১৮ বোর্দো | ৭। | ১৮৩৭ হাভর |
| ৪। | ১৮৩৫ লিওঁ | ৮। | ১৮২৮ তুলুজ্ |

প্রতিষ্ঠানগুলি আপন-আপন জনপদে স্বাধীনভাবে কারবার পরিচালনের অধিকারী ছিল।

নিম্নের তালিকায় এই ৮টি ব্যাঙ্কের কারবারের পরিচয় দেওয়া হইল (লক্ষ) :—

| সন | নগদ | বিল | নোট |
|---|---|---|---|
| ১৮৪১ | ৩০০ | ৫১০ | ৬৩০ |
| ১৮৪৬ | ৪৪০ | ৭৭০ | ৮৬০ |
| ১৮৪৭ | ৪২০ | ৮৫০ | ৯০০ |

এইসমস্ত বিভাগীয় বা জেলা নোট-ব্যাঙ্ক বাঁক দ্য ফ্রাঁসের প্রতিযোগিতার মুখেও আপন-আপন নোট-প্রচারের সোনার অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিত।

১৮৪৮ সন ফরাসী নোট-ব্যাঙ্কের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই সনের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ফরাসীমুল্লুকে সর্ব্বপ্রথম নোট-প্রচারের সর্ব্বোচ্চ সীমা (৩৫ কোটি ফ্রাঁ) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। হপ্তায়-হপ্তায় উদ্বর্ত্ত পত্র প্রকাশ করারও রেওয়াজ স্থাপিত হয়। উপরন্তু ২৭শে এপ্রিল ও ২রা মে তারিখের ঘোষণা অনুসারে ৯টি বিভাগীয় ব্যাঙ্কই বাঁক দ্য ফ্রাঁসের সামিল অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।* এই দুই ঘোষণা-বাণী অনুসারে পুঁজি ৯৩,২৫০,০০০ ফ্রাঁতে বর্দ্ধিত করিয়া নোট জারির সর্ব্বোচ্চ সীমা ৪৫২০ লক্ষ ফ্রাঁ নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

* এই সময়কার নবম ব্যাঙ্কটা অর্লেআঁয় অবস্থিত ছিল।

## ফ্রান্সে নোট প্রচারের সর্ব্বোচ্চ সীমা

## (১৮৪৮-১৯২৮)

বাঁক অ্য ফ্রাস কর্ত্তৃক নোট-প্রচলনের সীমা-নির্দ্দেশ নোট-ব্যাঙ্কিংয়ের এক নূতন রেওয়াজরূপে সমঝিতে হইবে।

১৮০৬ সনের ২২শে এপ্রিল তারিখের আইন এবং ১৮০৮ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের ঘোষণাবাণী দ্বারা বাঁক অ্য ফ্রাঁস স্থাপিত বা পুনর্গঠিত হয় বলা যাইতে পারে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া এই ব্যাঙ্ক কোনো সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্দেশের ধার ধারে নাই। পূর্ব্বেও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ১৮৪৮ সনের ১৫ই মার্চ্চ তারিখের ঘোষণা-বাণী দ্বারা সর্ব্বোচ্চ সীমা ৩৫ কোটি ফ্রাঁ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময় সর্ব্বোচ্চ সীমা বাড়াইয়া ২৮০ কোটি করা হয় (১৮৭১ সনের ডিসেম্বর)। ১৮৮৪ সনে আইন করিয়া সর্ব্বোচ্চ সীমা ৩৫০ কোটি নির্দ্ধারণ করা হয়। ১৮৯৭ সনে উহা বাড়াইয়া ৫০০ কোটি, ১৯১১ সনে ৬৮০ কোটি এবং ১৯২৫ সনে ৫,৮৫০ কোটি করা হয়।

নোট-প্রচলন এবং স্বর্ণজামিনের অনুপাত রক্ষা সম্পর্কে কোনোরূপ আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই তথাপি বাঁক অ্য ফ্রাঁসের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই কর্জ্জপ্রতিষ্ঠানের গবর্ণরগণ দেশের বাজার-সম্ভ্রম এবং মজুদ-ভাণ্ডার রক্ষা করিবার বাস্তব উপায় সম্বন্ধে জার্ম্মাণি এবং বিলাত উভয়কেই হার মানাইয়াছে।

সপ্ত দশকের সঙ্কট সময়ে নগদ ও নোটের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ অনুপাতের ব্যবস্থা ছিল :—

| ২৭শে জানুয়ারি | নগদ | নোট |
|---|---|---|
| ১৮৭০ | ১,২০২,০০০,০০০ | ১,৪৭১,০০০,০০০ |
| ১৮৭১ | ৩৯৮,০০০,০০০ | ২,৩৫৯,০০০,০০০ |
| ১৮৭২ | ৬৩০,০০০,০০০ | ২,৬৭৮,০০০,০০০ |
| ১৮৭৩ | ৭০৫,০০০,০০০ | ৩,০৭১,০০০,০০০ |
| ১৮৭৪ | ১,৩৩০,০০০,০০০ | * |
| ১৮৭৫ | * | ২,৬০০,০০০,০০০ |

পরবর্ত্তী সনগুলিতে অনুপাত (লক্ষের হিসাব) নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছিল (দৈনিক গড):—

| | নগদ | নোট |
|---|---|---|
| ১৮৮০ | ১৯৭৪০ | ২৩০৫০ |
| ১৮৯০ | ২৫১৩০ | ৩০৬০০ |
| ১৮৯৭ | ৩১৮৪০ | ৩৬৮৭০ |
| ১৯০০ | ৩২৩৭০ | ৪০৩৪০ |
| ১৯০৫ | ৩৯৫৬০ | ৪৪০৮০ |
| ১৯০৯ | ৪৫২৪০ | ৫০৮০০ |
| ১৯১৩ | ৩৯২৭০ | ৫৬৬৫০ |

উপরের অঙ্কগুলা হইতে দেখা যাইতেছে ১৮৭১-৭৩ সন দুইটা ছাড়া প্রায় সব সময়েই নগদ আর নোট প্রায় সমান-সমান রহিয়াছে। খাঁটি সত্য কথা বলিতে গেলে, অধিকাংশ সময়েই প্রচলিত নোটের জন্য প্রায় ৯০% ধাতব মুদ্রা ঢাকনা বা জামিনস্বরূপ রাখা হইয়াছে। অথচ এইজন্য ১৮৪৪-৪৫ সনের বিলাতী আইন বা ১৮৭৫ সনের জার্ম্মাণ আইনের মত কোনো আইনের বিধিনিষেধ ছিল না।

এই সমস্ত বৎসরের মধ্যে নোটের ঢাকনা বা জামিনের জন্য কেবলমাত্র যে নগদ সিক্কারই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা নহে। মোট নোটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হিস্যার জন্য বাণিজ্যিক কাগজ

ঢাকনারূপে কাজ করিয়াছে। নোট ও কাগজের দৈনিক গড নিম্নলিখিতরূপ ( লক্ষের হিসাব ) :—

| | কাগজ | নোট |
|---|---|---|
| ১৮৯৭ | ১০৮৮০ | ৩৬৮৭০ |
| ১৯০০ | ১৩৬৭০ | ৪০৩৪০ |
| ১৯০৫ | ১১২৪০ | ৪৪০৮০ |
| ১৯১১ | ১৮৪২০ | ৫২৪৩০ |
| ১৯১৩ | ২৩৭৪০ | ৫৬৬৫০ |

এখন যদি আমরা নগদ (৯০%) এবং অন্যান্য সিকিউরিটি ( প্রায় ৩৩% ) এক সঙ্গে যোগ করি, তাহা হইলে আমরা প্রচলিত নোটের জন্য প্রায় ১২৩% অর্থাৎ মোট নোটের চেয়ে অনেক বেশী ঢাকনা বা জামিনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

নোট-প্রচার সম্পর্কে বাঁক দ্য ফ্রাঁসকে নেহাৎ নরমপন্থী বলিতে হয়। নিতান্ত গরজের সময় ছাড়া (১৮৭১-৭৩) এই ফরাসী প্রতিষ্ঠান সির্কুলাসিঅঁ-ব্যাঙ্ক অর্থাৎ নোট-ব্যাঙ্কের কাজ করিয়াছে কি না তাহা রীতিমত সন্দেহজনক। মোটামুটিভাবে যেন ব্যাঙ্কটি সাধারণ ডিপজিট ব্যাঙ্কেরই কাজ চালাইয়াছে। মহাযুদ্ধ (সন ১৯১৪-১৮) এবং যুদ্ধোত্তর যুগের ঘটনাবলীকে অবশ্য অসাধারণ সমঝিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি বিষয়ে জানিয়া রাখা ভাল। মুদ্রা এবং রাজস্বের ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ নোট-ব্যাঙ্কের মূলসূত্র-বিষয়ক তথাকথিত "ঝামকাণ্ড" একরূপ এড়াইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা কারেন্সি-প্রিন্সিপ্‌ল্ বা সিক্কা-নীতি (এই নীতির উপরই পীল ১৮৪৪-৪৬ সনে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের নোট-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন ) বনাম ব্যাঙ্কিং প্রিন্‌সিপ্‌ল্ বা ব্যাঙ্ক-নীতি (অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত) নামক সমস্যাটা পুঁথিগত সমস্যারূপেই সমঝিতে অভ্যস্ত।

ফরাসী কর্ত্তারা পীলের মত ব্যাঙ্ক-নোটকে মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে রাজি নহেন। অ্যাডাম স্মিথ এবং রিকার্ডোর মত ফরাসী অর্থনীতিজ্ঞগণ নোটকে "মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত"রূপেই বিবেচনা করেন। তাঁহাদের মতে নোট-ব্যাঙ্কগুলা এমন হওয়া আবশ্যক, যাহাতে উহাদের প্রচারিত নোটগুলা নোটওয়ালাদের দাবী উত্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গে মুদ্রায় রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয়। আর এই ব্যবস্থা করার জন্য সাধারণ ব্যাঙ্ক-কারবারের যে দস্তুর আছে সেইরূপ মজুদভাণ্ডার ( রিজার্ভ ), নগদ টাকা, সিকিউরিটি ইত্যাদি জমা রাখিয়া নোট-ব্যাঙ্কগুলা সাবধানভাবে চলিলেই হইল। চেক-ভাঙানো, এক্সচেঞ্জ বিল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কাগজপত্রের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কগুলা যেরূপ নীতি অবলম্বন করে নোটের বেলাতেও সেইরূপ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ ফরাসী অর্থশাস্ত্রীরা নোট সম্বন্ধে "ব্যাঙ্কিং-নীতির"ই পক্ষপাতী।

মতবাদ ও আইন-কানুন দুই বিষয়েই বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস "ব্যাঙ্কিং-নীতি" মানিয়া চলিয়াছে ; পক্ষান্তরে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড এবং রাইখ্স্ ব্যাঙ্ক সিক্কা-নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "জ্ঞানকাণ্ড" সম্বন্ধে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্বেও ব্যাঙ্ক তিনটা কার্য্য-ক্ষেত্রে ঢাকনা ও নোটের অনুপাত-নির্ণয়ে মূলতঃ একই নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ঢাকনা, সোনা, সিকিউরিটি ইত্যাদির গড়ন যাহাই হউক না কেন, ইহারা সকলেই ক্রমে-ক্রমে "ঢাকনা বা জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" এই সার নীতিটা মানিয়া চলিয়াছে। ঝুঁকি বা দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করিবার জন্য মামুলি ব্যাঙ্ক-পরিচালনের যে দস্তুর আছে মূলতঃ তাহা হইতেই এই ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বাস্তবতার রাজ্যে ব্যাঙ্কিং-নীতি ও সিক্কা-নীতি দুইটা একই রঙ্গমঞ্চে কোলাকুলি করিতেছে।

১৯১৪ সনের পর যে অসাধারণ ঘটনাবলী উপস্থিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আবশ্যক।

যুদ্ধের সময় দৈনিক গড়গুলি কিরূপ ছিল তাহা নীচের তিন দফা অঙ্ক হইতে বেশ বুঝা যাইবে ( লক্ষ ফ্রাঁ ) :—

| সন | নগদ | বিল | নোট |
|---|---|---|---|
| ১৯১৪ | ৪৪০৫০ | ২৩১৪০ | ৭৩২৫০ |
| ১৯১৫ | ৪৭০৯০ | ৯২৮০+২৩৯৯০ (ঋণ-মকুপের আমলে) | ১২২৮০০ |
| ১৯১৮ | ৫৬৯০০ | ২০৯৮০+১০৮২০ (ঋণ-মকুপের আমলে) | ২৭৫৩৬০ |

যুদ্ধোত্তর যুগে, ১৯২৮ সনের জুন মাসের আইন অনুসারে পুনর্গঠন না হওয়া পর্য্যন্ত বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের নোট ও রিজার্ভের হালচাল নিম্নলিখিত-রূপ ছিল :—

| বিভিন্ন দফা | ১৯২০ (৩১শে ডিসেম্বর) | ১৯২৭ (৩১শে ডিসেম্বর |
|---|---|---|
| ১। নগদ | ৫,৭৬৬,২৭০,১৩০ | ৫,৮৮৭,৭৭২,৮৩৪ |
| (১) ফ্রান্সের সোনা | ৩,৫৫১,৭৮৭,৬৯৪ | ৩,৬৮০,৫০০,৮২১ |
| (২) বিদেশস্থ সোনা | ১,৯৪৮,৩৬৭,০৫৬ | ১,৮৬৪,৩২০,৯০৭ |
| (৩) রূপা | ২৬৬,১১৫,৩৭৯ | ৩৪২,৯৫১,১০৫ |
| ২। ডিস্কাউন্ট-করা কাগজ বৎসরের মধ্যে | ৩২,০২৩,৬১০,৬০০ | ৪৫,২৯১,২৬২,৬০০ |
| ৩। প্রচলিত নোট বৎসরের মধ্যে | ৭,৮০৪৭,১২৫,০০০ | ১৫,১৫৫,০০০,০০০ |
| ৪। মোট চলতি নোট | ৩৭,৫৫২,২৪০,২৯০ | ৫৬,৩০০,৬১০,২৫০ |

১৯২৫ সনের ৪ঠা ডিসেম্বরের আইন দ্বারা নোট প্রচলনের সর্ব্বোচ্চ

সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয় ৫৮,৫০০,০০০,০০০ ফ্রাঁ; পূর্ব্বেও একথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে মোট প্রচলিত নোট ও নগদ ঢাকনা বা জামিনের অনুপাত অবশ্য লড়াইয়ের পূর্ব্বেকার অনুপাত অপেক্ষা কম হইয়াছে। কিন্তু "ভাল" বাণিজ্যিক কাগজের ঢাকনার রেওয়াজ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়াছে। ১৯২০ সনে বিলসমূহের গড় মেয়াদ ছিল প্রায় ২৫ দিন, কিন্তু ১৯২৭ সনে উহা মাত্র ১৮ দিনে পরিণত হইয়াছে।

## "নয়া" বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস

( ১৯২৮ সনের জুন মাস হইতে )

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে মুদ্রাঘটিত পুনর্গঠন অর্থাৎ "স্থিতীকরণ" ১৯২৬ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখের আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই আইনের বলে বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস বিনিময়ের বাজারে সোনার তাল এবং সোনার জামিনযুক্ত সিকিউরিটি, বিল, বিদেশী কাগজী মুদ্রা ক্রয় করিবার অধিকারী হয়। বিনিময়ের বাজারে ফরাসী ব্যাঙ্কের এই প্রভাবের ফলে ১৯২৭ সনে নূতন অবস্থার উদ্ভব হয়। পূর্ব্বে বিদেশে যেসব ফরাসী পুঁজি রপ্তানি করা হইয়াছিল এইবার তাহার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। বাণিজ্যিক কাগজ এবং সোনার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বাঁক্ ঠিক সেই পরিমাণে নোট-প্রচার বাড়াইবারও অধিকারী হয়। নোটের বহর ১৯২৫ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের আইন-মাফিক ৫,৮৫০ কোটির সর্ব্বোচ্চ সীমায় আসিয়া ঠেকে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডে যে ফরাসী সোনা গচ্ছিত ছিল তাহাও ফিরিয়া পাওয়া সম্ভবপর হয়। ১৯২৭ সনে ফ্রান্সের আর্থিক এবং রাজস্ব-ঘটিত জীবন বাস্তবিকই পুনর্জ্জন্ম লাভ করে।

বাঁক ছ ফ্রাঁসের কঁৎ রাঁদু (প্যারি ১৯২৯) নামক বিবরণীতে প্রকাশ, ১৯২৮ সনে "এক নূতন ফ্রাঁ সৃষ্ট হয়। ১৪ বৎসর যাবৎ সরকারী জোরে জীবন ধারণ করার পর ফ্রাঁ পুনরায় খাঁটি মুদ্রায় পরিণত হয় এবং পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুদ্রার সহিত ঢাকনা বা জামিন সম্বন্ধে ইহা সমানে-সমানে প্রতিযোগিতা করিবার অধিকারী হয়।

১৯২৮ সনের ২৫শে জুন তারিখের আইনে সোনাকেই বিধিবদ্ধ মুদ্রা-ধাতুরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। সেই সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী আঠারো মাসের প্রচলিত হারে ফ্রাঁর দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯১৪ সনের ৫ই আগষ্ট তারিখের আইন অনুসারে আইন-সঙ্গতরূপে ঘোষিত নোটগুলা উক্ত আইনের বলে বিলুপ্ত করা হয়। তাহা ছাড়া বাঁক্‌কে উহার প্রচারিত নোটগুলির জন্য সোনা বা মুদ্রা জিম্মা রাখিতে বাধ্য করা হয়।

জনসাধারণকে কতকগুলি নোটের জন্য বাঁকের নিকট হইতে নোটের পরিবর্ত্তে সোনার মুদ্রা বা সোনা আদায় করিবার অধিকারী করা হয়। এইরূপ নোটের সর্ব্বনিম্ন সীমা ২১৫,০০০ ফ্রাঁ বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

এইসমস্ত আইনকানুন দ্বারা কারেন্সির স্থিতীকরণ এবং উহার একটা নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ড নিরূপণ করা হয়। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঠিক এই উপায়েই কারেন্সির সংস্কার বা পুনর্গঠন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষ ফ্রাঁকে উহার পূর্ব্বতন মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়াছে। ফ্রাঁর মূল্য-হ্রাস ফরাসী মুদ্রাসংস্কারের এক বড় কথা। মুদ্রার মূল্য-হ্রাস-নীতি ফ্রান্সের আর্থিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

নোট-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও ১৯২৮ সনের ২৫শে জুন তারিখের আইন সমান বিপ্লবাত্মক। এই আইন দ্বারা ১৮৭৬ সনের পর সর্ব্বপ্রথম

বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসকে নোট-প্রচারের জন্য সর্ব্বনিম্ন জামিন রাখিবার নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হয়। উত্তমর্ণদের চলতি হিসাবসহ মোট প্রচারিত নোটের জন্য কম পক্ষে ৩৫% সোনার মুদ্রা (বাণিজ্যিক কাগজ ছাড়া) রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং আইনসঙ্গত সর্ব্বোচ্চ নোটপ্রচারের নীতির (১৮৪৮ সনে ৩৫ কোটি এবং ১৯২৫ সনে ৫,৮৫০ কোটি) মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়। ৩৫% সোনার ঢাকনা ১৯২৪ সনের রাইখ্‌স বাঙ্ক বিষয়ক আইন-সম্মত সোনার ঢাকনা অপেক্ষাও বেশী, কারণ উক্ত আইনে ঊর্দ্ধ পক্ষে মাত্র ৩০% সোনার ঢাকনা রাখার বাধ্যবাধকতা কায়েম করা হইয়াছে।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, ফ্রান্স শেষ পর্য্যন্ত শতাব্দীর পুরাতন "ব্যাঙ্কিং নীতি" বর্জ্জন করিয়া ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যণ্ড ও রাইখ্‌স-বাঙ্কের "কারেন্সি নীতি" বা সিক্কানীতিই গ্রহণ করিল। তবে বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস বিশ্বস্ত বা "বিশ্বাস-নিষ্ঠ" নোট-প্রচারের আইন-মাফিক সর্ব্বোচ্চ-সীমা-সম্বলিত কঠোর বিলাতী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে রাইখ্‌স বাঙ্কের আনুপাতিক জামিন-বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত শিথিল ব্যবস্থারই পক্ষপাতী হইয়াছে।

১৯২৮ সনের জুন মাসের আইনে উদ্বর্ত্তপত্র তৈরী করা এবং উহার হিসাব-পত্র গ্রহণ সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে। ঐ তারিখে বিনিময়ের নয়া হার অনুসারে ব্যাঙ্কের অধিকারভুক্ত সমস্ত স্বর্ণমুদ্রার দর কষা হয়। রৌপ্যমুদ্রাগুলারও এইভাবে দর কষিয়া ঐগুলিকে মুদ্রার আসন হইতে নামাইয়া সাধারণ চাঁদি হিসাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করা হয়। "কঁৎ রঁাদু" (পারি, ১৯২৯) নামক কার্য্য-বিবরণী ১৯২৮ সনের দ্বিতীয় ছয় মাসের নিম্নলিখিতরূপ (লক্ষ ফ্রঁ) হিসাব প্রকাশ করিয়াছে :—

| তারিখ | স্বর্ণমুদ্রা | নোট | নোট ও চলতি আমানতের অনুপাতে সোনার জামিনের শতকরা হিস্যা |
|---|---|---|---|
| ২৫শে জুন | ২৮৯৩৫০ | ৫৮৭৭২০ | ৪০.৪৫ |
| ৭ই সেপ্টেম্বর | ৩০৪২৬০ | ৬১৫৫২০ | ৩৯.১৭ |
| ২১শে ডিসেম্বর | ৩১৮৩৫০ | ৬১৯১৪০ | ৩৯.৩২ |

এই সময়ের মধ্যে সোনার ঢাকনা বা জামিন দৈনিক বা অল্প মেয়াদের দেনাসমূহের ৩৯.১৭% ও ৪০.৪৫% এর মধ্যে উঠা-নামা করিয়াছে। এই ঢাকনা আইনসঙ্গত ৩৫%এর অনেক উপরে। বাঁকের তহবিলে মজুদ নগদ সোনার সহিত বিদেশে দৈনিক বা অল্প মেয়াদের যে সমস্ত সম্পত্তি আছে তাহা যোগ করিলে অনুপাত আরও বাড়িয়া যাইবে।

"আনুপাতিক ঢাকনা" সম্পর্কেও নয়া রাইখ্‌স বাঙ্ক ও নূতন বাঁক গু ফ্র াঁসের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। দুইটি নোট-আইনের সর্ত্তাবলীর মধ্যে যেসমস্ত পার্থক্য আছে, তাহা মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। ফ্রান্সের ৩৫% সোনার ঢাকনা (১) নোট এবং (২) চলতি ডিপজিট বা আমানত প্রভৃতি সাধারণ বাণিজ্যিক ঋণ উভয়ের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু জার্ম্মাণিতে কেবলমাত্র নোটের জন্যই ৩০% সোনার ঢাকনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ নোট-ব্যাঙ্কের চলতি ডিপজিট প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবারের জন্য বিশেষ ঢাকনার (সোণ্ডারডেকুং) ব্যবস্থা আছে। এই ঢাকনার বরাদ্দ মোট কারবারের ৪০% পর্য্যন্ত, এবং ইহা সোনা না হইলেও চলিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাইখ্‌স বাঙ্ক নোট ও সাধারণ ব্যাঙ্ক-বিভাগের

মধ্যে রীতিমত ভেদরেখা টানিয়া দুইটাকে পৃথক পৃথক ঋণরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রত্যেক দফার জন্য বিভিন্ন ধরণের জামিন কায়েম করিয়াছে। অন্য পক্ষে বাঁক দ্য ফ্রাঁসের ব্যবস্থায় নোট-প্রচার এবং ডিপজিট প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্কের কারবার দুই-ই কেবলমাত্র মামুলি ঋণরূপে গৃহীত হয়। দুই প্রকার কারবারের বা ঝুঁকির জন্য পৃথক পৃথক জামিনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। ৩৫% সোনার ঢাকনা দুই ধরণের কর্জ্জেরই ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম, এইরূপ ধারণা করা হইয়াছে।

বাকী ৭০% নোটের জন্য যে বাধ্যতামূলক ঢাকনার প্রয়োজন জার্ম্মাণ আইনে খোলসা করিয়া তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে: কিন্তু ফরাসী আইন এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। ফ্রান্স আনুপাতিক ঢাকনার বাধ্যতামূলক নীতি স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যত: চির-আচরিত স্বাধীনতাই উপভোগ করিতেছে।

বিলাতী প্রতিষ্ঠানের রক্ষণশীলতা ও হুসিয়ারীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ফরাসী প্রতিষ্ঠান রাইখ্স বাঙ্কেরই মত শিথিল ত বটেই, অধিকন্তু কাগজী-মুদ্রা বা সাধারণ ব্যাঙ্ক-কারবারের ক্ষেত্রে আইনের বালাই সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানকেও অতিক্রম করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এখানে আমরা সেই পুরাণা "ব্যাঙ্কিং প্রিন্সিপ্ল" বা "ব্যাঙ্কিং-নীতিকে" এক নয়া আকারেই দেখিতে পাইতেছি।

## নোট-ব্যাঙ্কসমূহের বাণিজ্যিক, রিজার্ভ ও সরকারী ব্যাঙ্কিং

অন্যান্য জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের মতই রাইখ্স বাঙ্কও সাধারণভাবে আপন ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবার চালাইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্ক অব ইংল্যণ্ডের মত রাইখ্স বাঙ্কেরও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবার জার্ম্মাণির বাঘা-বাঘা ব্যাঙ্কগুলার তুলনায় অত্যন্ত কম।

১৯১৩ সনে রাইখ্স বাঙ্কের সর্ব্বনিম্ন বাণিজ্যিক কারবারের পরিমাণ

৮,৭৪০ লক্ষ মার্ক এবং উহার সর্ব্বোচ্চ কারবার ১৭,৩২০ লক্ষ মার্ক। তুলনায় অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলার, যথা ডয়চে বাঙ্ক, ডিস্কোণ্টো গেজেল্‌শাফ্‌ট, ড্রেসড্‌নার বাঙ্ক প্রভৃতির কারবার অনেক বেশী। এইসমস্ত ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটির পুঁজিপাট্টা ২০ কোটি মার্ক। ডয়চে বাঙ্কের এক আনা-মতের হিসাবেই ১৫৮ কোটি মার্কের কারবার হইয়াছে। ড্রেসড্‌-নারের আমানত-ব্যাঙ্কিংয়ের পরিমাণ ৯৫,৮০ লক্ষ এবং ডিস্কোণ্টোর ৬৭,৪০ লক্ষ।

ডয়চে বাঙ্কের ডিস্কাউণ্ট ও সকল প্রকার কর্জ্জের খাতে কারবারের পরিমাণ ১৫৫ কোটি মার্ক, ড্রেসড্‌নারের ৯৪,২০ লক্ষ এবং ডিস্কোণ্টোর ৭৭,৮০ লক্ষ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের একত্রে ডিস্কাউণ্ট ও কর্জ্জের খাতে মোট কারবারের পরিমাণ ৩২৭ কোটি মার্ক এবং ইহা রাইখ্‌স বাঙ্কের সকল প্রকার বাণিজ্যিক কারবারের প্রায় দ্বিগুণ। এই তিনটি ব্যাঙ্ক ছাড়া আরও অনেকগুলি ব্যাঙ্ক এই সময়ে কারবার চালাইয়াছে।

নিম্নে রাইখ্‌স বাঙ্কের "সক্রিয়" (সম্পত্তি) বাণিজ্যিক কারবারের (বিল, ডিস্কাউণ্ট ও সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে কর্জ্জ দাদন) পরিচয় দেওয়া গেল :—

| তারিখ | বিল | কর্জ্জ |
|---|---|---|
| | মার্ক | মার্ক |
| ১৯০৩, ৩১শে ডিসেম্বর | ১,০৮৯,১৯০,৮৫৫ | ১৪৬,২২২,৭০০ |
| ১৯১৩, ৩১শে ,, | ১,৪৯৭,৮৬০,২৮২ | ৯৪,৪৭২,৮০০ |
| ১৯২৪, ৩১শে ,, | ২,০৫১,৪৬৮,৩২৯ | ১৬,৯৬১,২০০ |

বিলের কারবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্জ্জের কারবার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মোট কারবারের পরিমাণ ১,৫৯২,৩৩৩,০৮২ মার্ক; ইহার সহিত জার্ম্মাণির অন্যান্য ডিপজিট বা আমানত-ব্যাঙ্কের বাণিজ্যিক কারবারের তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে।

নিম্নে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ১৯১৩ সনের (৩১শে ডিসেম্বর তারিখ) কারবারের হিসাব দেওয়া গেল :—

| | | মার্ক |
|---|---|---|
| ডিস্কউণ্ট করা বিল | ... | ৪,২৮৬,২০০,০০০ |
| অধমর্ণদের নিকট দাদন | ... | ১৪,২৪২,৬০০.০০০ |
| সিকিউরিটি খরিদ | ... | ৫,৫৮৮,৫০০,০০০ |
| বন্ধক | ... | ১৪,১৫৭,৫০০,০০০ |
| পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্জ্জদাদন | | ৩,৭০৭,৫০০,০০০ |
| মোট | ... | ৪১,৯৮২.৩০০,০০০ |

অর্থাৎ জার্ম্মাণির ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় রাইখ্‌স্ বাঙ্ক মাত্র ৩·৮% কারবার করিয়াছে।

১৯২৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এইসমস্ত ব্যাঙ্কের "সক্রিয়" কারবার নিম্নরূপ ছিল :—

| | | মার্ক |
|---|---|---|
| বিল | ... | ২,৩০৪,৬১০,০০০ |
| অধমর্ণ | ... | ৫,৪৬৪,০০০,০০০ |
| সিকিউরিটি | ... | ৩১৪,৩০০,০০০ |
| বন্ধক | ... | ১০৪,০০০,০১০ |
| পাবলিক প্রতিষ্ঠানকে ধার | ... | ১৫১,২০০,০০০ |
| মোট | ... | ৮,৩৩৮,১০০,০০০ |

ঐ তারিখে রাইখ্‌স্ বাঙ্কের মোট কারবারের পরিমাণ ২,০৬৮,৪২৮,৫২৯ মার্ক, অর্থাৎ অন্যান্য ব্যাঙ্কের কারবারের ২৪·৮%।

নিম্নে রাইখ্‌স্ বাঙ্কের ডিপজিট ("নিষ্ক্রিয়" অর্থাৎ দেনা) কারবারের পরিচয় দেওয়া গেল :—

| | | মার্ক |
|---|---|---|
| ১৯০০, ১লা জানুয়ারি | ... | ৩৮৫,৩৫৭,২৭৮ |
| ১৯১৩, ,, | ... | ৫৫৮,৪৯৫,৯৫৫ |
| ১৯২৪, ,, | ... | ৪০৩,৭৬৩,৯৮২ |

১৯১৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ডিপজিট কারবারের পরিমাণ ৩৪,৫৭১,৮০০,০০০ মার্ক। ১৯১৩ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে রাইখ্‌স বাঙ্কের ডিপজিট কারবারের তুলনায় ইহা প্রায় ৬২ গুণ। ১৯২৪ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে "অন্যান্য ব্যাঙ্কের" ডিপজিট কারবার ৭,৯৫০,৪০০,০০০ মার্ক; সুতরাং এ হিসাবে ঐগুলির কিম্মৎ রাইখ্‌স বাঙ্ক অপেক্ষা ১৯·৭ গুণ বেশী।

এ সম্বন্ধে ফ্রান্সের কাহিনী জার্ম্মাণিরই জুড়িদার।

ফ্রান্সের "বাঘা-বাঘা তিনটার" অর্থাৎ ক্রেদি লির্ঁনে, সোসিয়েতে জেনের‍্যাল ও কঁতোয়ার ন্যাশনালের "সক্রিয়" (সম্পত্তি) কারবার নিম্নরূপ:—

| | | ফ্রাঁ |
|---|---|---|
| ১৮৯৯, ৩১শে ডিসেম্বর | ... | ১,৬৬৫,০০০,০০০ |
| ১৯০৫ ,, | ... | ২,৭৬০,০০০,০০০ |
| ১৯১৩ ,, | ... | ৪,২০০,০০০,০০০ |

দেখা যাইতেছে, ব্যাঙ্কগুলার কারবার ক্রমে ফাঁপিয়া উঠিতেছে; ১২ বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১৫৮%।

অন্য পক্ষে বাঁক্ দ্য ফ্রাঁন্সের বিল ডিস্কাউণ্ট করিবার কারবার ১৮৮০ সন হইতে ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ক্রমাগত কমিয়া চলিয়াছে। নিম্নে দৈনিক গড়ের হিসাব দেওয়া গেল:—

| | | ফ্রাঁ |
|---|---|---|
| ১৮৮০ | ... | ৭৫৮,৫০০,০০০ |
| ১৮৯০ | ... | ৬৬৯,৬০০,০০০ |
| ১৮৯৫ | ... | ৫৪৩,৬০০,০০০ |
| ১৯০১ | ... | ৫৯২,৪০০,০০০ |
| ১৯০৫ | ... | ৬৪০,৫০০,০০০ |

বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলা বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসকে ক্রমেই এই কারবার হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ১৯১২ সনে ইহার দৈনিক গড় ১,৩৩৩,০০০,০০০ ফ্রাঁ হয় বটে, কিন্তু তবুও এইখাতে বাঘা তিনটার মিলিত কারবার দাঁড়ায় ইহার তিনগুণেরও বেশী। এমন কি, ক্রেদি লিওঁনে নামক ব্যাঙ্কের বিল-ডিস্কাউন্টের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৪১১,০০০,০০০ ফ্রাঁ।

বিগত কয়েক বছরের জন্য বাঁক্ ও বাঘা তিনটা ব্যাঙ্কের ডিস্কাউন্ট কারবারের তুলনামূলক হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

( লক্ষ ফ্রাঁর হিসাব )

| সন | ক্রেদি লিওঁনে | সোসিয়েতে | কঁতোয়ার | বাঁক্ |
|---|---|---|---|---|
| ১৯২০ | ৩২৩৯০ | ৩০৯০০ | ২৬৫১০ | ৩২৭৬০ |
| ১৯২৫ | ৪৭৯৭০ | ৪৭০৬০ | ৫৭৭৭০ | ৩৫৭৩০ |
| ১৯২৬ | ৫২২৬০ | ৫৩৬৯০ | ৪২২০০ | ৪৫৪০০ |

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাঁক "বাঘা তিনটা"র সহিত কোনো রকমে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশের মোট ডিস্কাউন্ট কারবারের ক্ষেত্রে ইহার আসন বড়-বেশী উল্লেখযোগ্য নয়।

রাইখ্‌স বাঙ্ক ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড এবং বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের মত ব্যাঙ্কের বা ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্ক। এই প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সমস্ত ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা জমা রাখে এবং জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অর্থসম্পদ্ কেন্দ্রীভূত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। সুতরাং গোটা দেশের "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"

রূপে ইহার দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। এই জন্য ইহাকে আপন "ঢাক্‌না" অর্থাৎ "নগদ" সোনা ও সিকিউরিটিগুলার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

রাইখ্‌সবাঙ্কের "ঢাকনা'ই প্রকৃত পক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্যের—গবর্ণমেণ্টের তথা অন্যান্য ব্যাঙ্কের "মজুদ তহবিল"। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-রূপে রাইখ্‌সবাঙ্কের কাজকর্ম্ম ঠিক ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কিং-বিভাগের মত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিলাতী প্রতিষ্ঠানের "ইশু" বা নোট বিভাগে কোনো রকম ব্যাঙ্কিং কারবারই চলে না।

রিজার্ভ অর্থাৎ মজুদ অর্থ-ভাণ্ডার রক্ষা করিবার ব্যবস্থা জার্ম্মাণি ও বিলাতে একই ধরণের। দুই দফা আর্থিক পরিস্থিতির জন্য এই আইনসঙ্গত রিজার্ভ কমিয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, শিল্পপ্রসার বা সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অতি-বাড়তির জন্য বিভিন্ন ধরণের বিল অতি-মাত্রায় উদ্ভূত হইতে পারে। এইসমস্ত বাণিজ্যিক কাগজ ডিস্কাউণ্ট বা খরিদ করিবার জন্য রাইখ্‌সবাঙ্ক বাধ্য হইয়া অতিরিক্ত নোট বাহির করিতে পারে, ফলে উহার আইনসঙ্গত ঢাক্‌নাও কমিয়া যাইতে বাধ্য। এই অবস্থার সূত্রপাত হওয়া মাত্র রাইখ্‌সবাঙ্ক ডিস্কাউণ্টের হার চড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ চড়া হারে কর্জ্জ দিতে আরম্ভ করে। ফলে কোম্পানী-স্রষ্টা ও অন্যান্য ব্যবসা-বৃদ্ধিকারকদের উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাণিজ্যিক কাগজপত্র হাতে লইয়া ইহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে আর উৎসাহ থাকে না। ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুঃসময়, কারণ মুদ্রার বাজার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। রাইখ্‌স বাঙ্ক কিন্তু এই সময় আপন সম্পদ্‌ বাড়াইয়া লইয়া দেশের মজুদ-ভাণ্ডারের নিরাপত্তা রক্ষা করে।

দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী এক্সচেঞ্জের (বিনিময়ের) উঠানামার জন্যও আইনসঙ্গত ঢাকনা বিপর্য্যস্ত হইতে পারে। মার্কের তুলনায় পাউণ্ড

ষ্টার্লিং, ডলার বা অন্যান্য বিদেশী কারেন্সীর হার বাড়িতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তথাকথিত "স্বর্ণবিন্দু" বা "সোনার সীমানা" উপস্থিত হইবার জন্য এক্সচেঞ্জ-বিলের (বিনিময় কাগজের) পরিবর্ত্তে সোনার তালে বা মুদ্রায় মার্ক-রপ্তানি লাভজনক হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা তখন নিশ্চয়ই রাইখ্‌স বাঙ্কের নিকট নোট লইয়া আসিয়া সোনার তাল বা মুদ্রার জন্য তাগাদা আরম্ভ করিবে। কাজে কাজেই রাইখ্‌সবাঙ্কের মজুদ সোনা হ্রাস পাইবার উপক্রম হয়। এই অবস্থাতেও নোটের ঝামেলা কমাইবার জন্য রাইখ্‌সবাঙ্ক ডিস্কাউন্টের হার বাড়াইয়া থাকে।

এই কার্য্যক্রম আপনা-আপনি উদ্ভূত হয় এবং ইহা ফরাসী, বিলাতী আর জার্ম্মাণ দস্তুরও বটে। তবে এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যাণ্ড বা রাইখস্‌বাঙ্কের তুলনায় বাঁক্‌ দ্য ফ্রাঁস সকল সময়েই প্রায় পরিবর্ত্তনহীন ডিস্কাউন্টের হার রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। অধিকন্তু, ইংল্যাণ্ড বা জার্ম্মাণি অপেক্ষা ফ্রান্সে ডিস্কাউন্টের হার সাধারণতঃ কমই দেখা যায়।

১৮৯৮ এবং ১৯১৩ সনের মধ্যে ফরাসী বাঁকের ডিস্কাউন্টের হার অধিকাংশ সময় ৩% ছিল।

নিম্নে ব্যতিক্রমের উদাহরণ দেওয়া গেল :—

| হার | সময় |
|---|---|
| ৩.৫% | ১৮৯৯ ডিসেম্বর, ১৯০৭ মার্চ্চ, ১৯০৮ জানুয়ারি, ১৯১১ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ জানুয়ারি, ১৯১২ অক্টোবর |
| ৪% | ১৯০০ জানুয়ারি, ১৯০৭ নবেম্বর, ১৯০৮ জানুয়ারি, ১৯১২ অক্টোবর, ১৯১৩ জানুয়ারি |
| ৪.৫% | ১৮৯৯ ডিসেম্বর |

এই সময়ের মধ্যে রাইখ্‌সবাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার অনবরত উঠানামা ত করিয়াছেই, তাছাড়া উহা বাঁক অপেক্ষা সব সময়েই বেশী ছিল। ফরাসীর ধরাবাঁধা ৩% এর স্থলে জার্ম্মাণির "সাধারণ" হার অনেক সময়েই ৫%, এবং অধিকাংশ সময় ৪%। রাইখ্‌স বাঙ্কে ১৮৯৮ সনে মাত্র ৫১ দিন, ১৯০২ সনে ২৩৩ দিন, এবং ১৯০৫ সনে ১৯৬ দিনের জন্য ৩% হার উদ্ভূত হইয়াছিল। নিম্নের তালিকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইল :—

যে সমস্ত দিন ধার্য্য ছিল

| সন | ৩% | ৩ ১/২% | ৪% | ৪ ১/২% | ৫% | ৫ ১/২% | ৬ | ৬ ১/২% | ৭% | ৭ ১/২% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৮৯৮ | ৫১ | ... | ২০৯ | ... | ৪৮ | ১০ | ৪২ | ... | ... | ... |
| ১৮৯৯ | ... | ... | ৪০ | ১২৬ | ৯০ | ... | ৯২ | ... | ১২ | ... |
| ১৯০০ | ... | ... | ... | ... | ১৬৮ | ১৬৬ | ১৫ | ... | ১১ | ... |
| ১৯০১ | ... | ৯৫ | ১৫৪ | ৫৬ | ৫৫ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ১৯০৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ১৮৬ | ৯১ | ৯ | ২১ | ৫৩ |
| ১৯১০ | ... | ... | ২২৬ | ১৯ | ১১৫ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ১৯১১ | ... | ... | ২১১ | ১২ | ১৩৭ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ১৯১৩ | ... | ... | ... | ... | ১৯ | ৪৫ | ২৯৬ | ... | ... | ... |

১৯১৫-১৯২১ সনের মধ্যে বৎসরে ৩৬০ দিন রাইখ্‌সবাঙ্কের ডিস্কাউণ্ট-হার ৫% ছিল। ফ্রান্সেও ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ সন পর্য্যন্ত হার ৫% নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহার পরবর্ত্তী হার,—যথা মাত্র ১৯২৬ সনের জুলাই মাসে একবার,—৭$\frac{1}{2}$% এর বেশী কখনও হয় নাই। ফ্রান্সের হার শতকরা ৫ হইতে ৬এর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে।

জার্ম্মাণ ডিস্কাউণ্ট হারের ইতিহাস কিন্তু নিম্নলিখিতরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল :—

যে সমস্ত দিন ধার্য্য হইয়াছিল

| সন | ৯% | ১০% | ১২% | ১৮% | ৩০% | ৯০% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯২৩ | ... | ১৭ | ৯৫ | ৯৯ | ৪৫ | ১০৬ |
| ১৯২৪ | ... | ৩৬০ | ... | ... | ... | ... |
| ১৯২৫ | ৩০৫ | ৫৫ | ... | ... | ... | ... |

রাইখ্সবাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠান নয় বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড এবং বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের মত এই প্রতিষ্ঠানও কতকগুলি সরকারী কাজ করিবার জন্য বিশেষ অধিকার ভোগ করে। ইহা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের লেন-দেন এবং ঋণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

সাম্রাজ্যের সমস্ত সরকারী ব্যাঙ্কিং কারবার এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর সম্পন্ন হয়। ১৯২৪ সনের আইন দ্বারা এ-সম্বন্ধে কোনো প্রকার নতুন-কিছু করা হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাইখ্সবাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট পূর্ব্বে একজন ইম্পীরিয়্যাল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের গবর্ণরও এইরূপ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের গবর্ণর মোটেই কোনো সরকারী কর্ম্মচারী নহেন। ডিরেক্টার-বোর্ড কর্ত্তৃক ইনি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। অংশীদারগণ আবার ডিরেক্টারদের নির্ব্বাচন করে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা ফরাসী প্রতিষ্ঠান অধিকতর গবর্ণমেণ্ট-ঘেঁশা। ১৯২৮ সনের পুনর্গঠনের পরও ইহাকে প্রায় সরকারী প্রতিষ্ঠান বলা চলে। নয়া রাইখ্স বাঙ্ক কিন্তু পুরাদস্তুর বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

সাধারণ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্ক (অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) রূপে রাইখ্সবাঙ্ক উহার মক্কেলদের নিকট হইতে সাধারণভাবেই ফি গ্রহণ করিয়া থাকে।

কিন্তু ইম্পীরিয়্যাল গবর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্করূপে পুরাতন ব্যাঙ্কের মত নয়। রাইখ্‌সবাঙ্কও বিনা পারিশ্রমিকে সরকারী কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে গৌণভাবে নিম্নলিখিতরূপ পারিশ্রমিক তাহার ভোগে আসে। প্রথমতঃ, একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানই গোটা সাম্রাজ্যের জন্য আইনসঙ্গত ব্যাঙ্ক-নোট ছাপাইবার অধিকারী। এই ব্যবসা রীতিমত লাভজনক। দ্বিতীয়তঃ, ইহা সরকারী তহবিলের একমাত্র তোষাখানা, এবং এই হিসাবে অজস্র তরলপুঁজির অধিকারী। তৃতীয়তঃ, নির্দ্দিষ্ট ৩½% লভ্যাংশ বাদে ইহা বহুকাল যাবৎ সিকিবরাদ্দ লাভের হিস্যা হজম করিয়াছে।

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টও কম সুবিধা ভোগ করে নাই। প্রথমতঃ, গবর্ণমেণ্টের লেনদেনের এজেণ্টরূপে রাইখ্‌সবাঙ্ক বিনা মজুরীতে কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট এইভাবে বিনা খরচায় রাজস্ব, দেনাপাওনা ইত্যাদি আর্থিক কারবার চালাইয়া লইবার সুবিধা ভোগ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট "নিট" লাভের অর্থাৎ লভ্যাংশ পরিশোধের পর যাহা বাঁচে তাহার বারো আনা পরিমাণ ভোগ করিয়া আসিয়াছে।

১৯২৪ সনের আইনে সর্ব্বনিম্ন লভ্যাংশের হার ৮% বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও রাইখ্‌সবাঙ্কের মধ্যে লাভের হিস্যা বণ্টন করিবারও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম জারি করা হইয়াছে। রাইখ্‌সবাঙ্কের আরও একটি সুবিধা উল্লেখযোগ্য। জার্ম্মাণ ভূমিতে ইহাকে কর্পোরেশন আয় বা ব্যবসায় প্রভৃতির কর হইতে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

## কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে রাইখ্‌স বাঙ্ক ও বাঁক দ্য ফ্রাঁস

ফরাসী ঋণদান-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট বাঁক দ্য ফ্রাঁসের যে স্থান,

রাইখ্‌সবাঙ্ক জার্মাণির বড়-বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্কগুলার কাছে ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সঙ্কট-সময়ে এই প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের আপন-আপন কাগজপত্র পুনরায় ডিস্কাউণ্ট বা খরিদ করার পক্ষে পরম আশ্রয়স্থল। কিন্তু বাঁক দ্য ফ্রাঁস যেমন ফরাসী ব্যাঙ্ক-জগতের কেন্দ্রস্থল, রাইখ্‌স বাঙ্ককে ঠিক সেইভাবে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কজগতের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করা যায় না।

এই দুই দেশের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহার মধ্যেই ইহার কারণ ঢুঁড়িয়া দেখিতে হইবে। সাধারণ ব্যাঙ্ক-কারবারের বেলায় জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক আর ফরাসী সোসিয়েতে দ্য ক্রেদির মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই, অর্থাৎ চলতি হিসাব, ডিস্কাউণ্ট, টাকা পাঠানো, বিনিময়, আদায় প্রভৃতির বেলায় দুই দেশের ব্যাঙ্কগুলার মধ্যে একই ধরণের রেওয়াজ বর্ত্তমান। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্কগুলা সাধারণতঃ এইসব কারবারই চালাইয়া থাকে। কিন্তু এমন কতকগুলা কাজ আছে যেগুলা ব্যাঙ্কিং কারবারের বাইরে, অথচ ব্যাঙ্কগুলাই এই-সব কাজ হাসিল করিয়া থাকে। মুখ্যতঃ বা গৌণভাবে শিল্প-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ এইসমস্ত কাজের সামিল। শিল্পের মোসাবিদা কাজে পরিণত করা এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে পুঁজি জোগানো,—এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক-ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত।

ফরাসী ব্যাঙ্কগুলা এইসমস্ত কাজকর্ম্মের বেলায় অত্যন্ত হুঁসিয়ার অর্থাৎ এইগুলি পরিচালনা করিতে বেশ-কিছু ভয় পায়। চলতি কাজকামে লাগিয়া থাকাই এগুলার দস্তুর। অন্য পক্ষে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কসমূহ শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলায় বুকের পাটা দেখাইয়া পুঁজিপাট্টা ঢালিয়া থাকে। ফরাসী মুলুকে দস্তুর আলাদা। যেসমস্ত ব্যাঙ্ক এই সমস্ত উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বিশেষরূপে গঠিত এবং প্রয়োজনমাফিক পুঁজিপাট্টার অধিকারী, মাত্র সেগুলার পক্ষে এই সব কাজে হাত

দেওয়া সমীচীন বিবেচিত হইয়া থাকে। যেসকল ব্যাঙ্ক বিভিন্ন শ্রেণীর মক্কেলদের আমানতী টাকায় বা গচ্ছিত অর্থে পুষ্ট সেইসব ব্যাঙ্কের পক্ষে এই ধরণের দুঃসাহসিক পরিকল্পনাসমূহের ঝুঁকি বা দায়িত্ব গ্রহণ অতি-কিছু বিবেচিত হয়। কারণ ঐ সমস্ত কারবারে অনেক দিন ধরিয়া পুঁজি রীতিমত বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক। মামুলি ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহা অসম্ভবই বটে। ফরাসীরা ব্যাঙ্কের ঝুঁকি সামলাইবার চিন্তায় অতি-সাবধানী লোক।

প্রায় অধিকাংশ জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কই শিল্প-বাণিজ্যে পুঁজি ঢালিতে অভ্যস্ত, এবং এইভাবে উহারা আপনাদিগকে অনেকটা বিপদ্‌গ্রস্তই করিয়া থাকে। সুতরাং রাইখ্‌সবাঙ্কের পক্ষে উহাদের ঝুঁকি বা দায়িত্বের পরিমাণ ও আকার-প্রকার বুঝিয়া উঠা যার পর নাই কঠিন। ঝুঁকিসমূহ স্ববশে আনা একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু ফ্রান্সে কতকগুলি বিশেষ ব্যাঙ্ক এইরূপ দায়িত্ব বা ঝুঁকি গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে; সেই জন্য বাঁক দ্য ফ্রাঁসের পক্ষে বিপদ্‌-আপদ্‌ কোথায় ঘটিবে না ঘটিবে তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। এইসমস্ত বিষয় বিবেচনা করার পর ফরাসী ব্যাঙ্ক-জগতে বাঁক দ্য ফ্রাঁসের মত রাইখ্‌স বাঙ্ককে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক-জগতের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করা চলে না।

অন্য পক্ষে কিন্তু রাইখ্‌সবাঙ্কের ডিস্কাউন্টের হার জার্ম্মাণির অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলা মানিয়া লইতে বাধ্য। সুতরাং জার্ম্মাণ মুল্লুকের গোটা ব্যাঙ্কিং কারবার হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ হিসাবে রাইখ্‌সবাঙ্ক ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা অধিকতর "কেন্দ্রী-কৃত।" অন্ততঃ পক্ষে এই দফার বেলায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বাঁক দ্য ফ্রাঁসকেও রাইখ্‌সবাঙ্কের নিকট হার মানিতে হইবে।

## নোটব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্ট

বিলাত, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শাসন-পরিচালনে যথেষ্ট গরমিল আছে।

১৮০০-১৮০৮ সনের আইনের পর হইতে বাঁক্ গু ফ্রাঁস ২০০ জন সদস্য লইয়া গঠিত "সাধারণ পরিষদ্" কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। এই সদস্যগণ ব্যাঙ্কের সব চেয়ে বড় অংশীদার। পরিষদের কাজ "কাউন্সিল" ও "কমিটি" নামক দুইটি ছোট ছোট সভা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। "কাউন্সিলে" থাকে ১৫ জন "রিজেণ্ট" আর কমিটিতে ৩ জন "সেন্সার"। রিজেণ্টরাই খাঁটি ডিরেক্টার বা শাসনকর্ত্তা। সেন্সারদের কাজ হিসাবপত্র অডিট করা।

সাধারণ পরিষদ্ কর্ত্তৃক রিজেণ্টগণ নির্ব্বাচিত হয়। ইহাদের মধ্যে ৫ জন আসে অংশীদারদের মধ্য হইতে। তবে কারখানার মালিক বা বণিক্‌রূপে ইহাদের ব্যবসা-জ্ঞান থাকা চাই। পরিষদ্‌কে গবর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক ট্রেজারী অফিসারদের মধ্য হইতে তিনজন রিজেণ্ট বাছাই করিয়া লইতে হয়। বাকী সাতজন সম্পর্কে পরিষদ্ যাহা খুসী তাহাই করিতে পারে।

সমগ্র শাসন-কার্য্যের খবরদারি করে একজন গবর্ণর ও দুইজন ডেপুটি গবর্ণর। এই তিনজন কর্ম্মচারীই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়। সাধারণতঃ বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীকে এইসমস্ত পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। গবর্ণর নিযুক্ত হয় আজীবন কর্ম্মচারিরূপে। ১৮৯৭ সনের ১৭ই নবেম্বরের আইন অনুসারে গবর্ণর বা ডেপুটি গবর্ণরদের চেম্বার অব্ ডেপুটিজ্ এবং সেনেটের সদস্য হওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের কার্য্য-নির্ব্বাহ সম্পর্কে তিনজন রিজেণ্ট ও তিনজন গবর্ণর

গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং এ হিসাবে ইহাকে সরকারী ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ শাখা-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে-সমস্ত আইনকানুন করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে হয়।

বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের শাখাসমূহ ডিরেক্টার-বোর্ড কর্ত্তৃক শাসিত হয়। এইসমস্ত বোর্ডে যাহারা ঠাঁই পায় তাহারা স্থানীয় অংশীদারগণ বা খোদ প্রধান কার্য্যালয়ের অংশীদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। তবে চরমভাবে নিয়োগ করিবার ভার থাকে গবর্ণরের হাতে। সুতরাং শাখাগুলাও সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া এইসমস্ত শাখার গবর্ণরগণও সমগ্র ব্যাঙ্কের গবর্ণরের মত এক একজন সরকারী কর্ম্মচারী।

কাঠামো অর্থাৎ গঠন-প্রণালীর দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, গবর্ণমেণ্টের সহিত পুরাতন রাইখ্‌সবাঙ্কের যোগাযোগ বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর ছিল। রাইখ্‌সবাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট আর "কাউন্সিল" দুই-ই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইত। তবে একটি কমিটির ব্যবস্থা ছিল এবং অংশীদারগণ ইহার ভিতর দিয়া ব্যাঙ্ক-শাসনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত।

অধিকন্তু, লভ্যাংশ প্রদানের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত গবর্ণমেণ্ট তাহার ¾ অংশ গ্রহণ করিত; সুতরাং এই ব্যবস্থা দ্বারা রাইখ্‌স বাঙ্কের কারবার সোজাসুজি সরকারী ব্যবস্থাতেই পরিণত ছিল।

রাইখ্‌স বাঙ্কের নিট লাভের সরকারী হিস্সার নির্দ্দিষ্ট শতকরা বরাদ্দ বহুবার স্থির করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মহা-লড়াইয়ের পূর্ব্বে ১৮৭৫, ১৮৮৯, ১৮৯৯ এবং ১৯০০ সনের সরকারী ঘোষণার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯২৪ সনের ৩০শে আগষ্ট তারিখের আইনেও অবস্থা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিয়া নয়া হারের ব্যবস্থা

করা হইয়াছে। এইসমস্ত আইনের প্রত্যেকটির দ্বারা নিট লাভের নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিলি-বন্দোবস্ত করা হইয়াছে :— (১) মজুদ তহবিল, (২) অংশীদারদের লভ্যাংশ, (ক) নগদ দেয় ও (খ) পরবর্ত্তী সনের হিসাবে জমা এবং (৩) সরকারী হিস্সা।

১৮৭৬ সন হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত রাইখ্‌সবাঙ্কের কারবারে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ মোটা দাঁও মারিয়াছে তাহা নিম্নের অঙ্কগুলার উপর চোখ বুলাইলেই টের পাওয়া যাইবে :—

১৮৭৬-১৯১৩ সন

নিট লাভের শ্রেণীবিভাগ

| | | |
|---|---|---|
| মোট আয় | ... | ১,৩৬৮,০৯৩,৬১১ মার্ক |
| মোট ব্যয় | ... | ৫৮৯,০৬৩,৬১১ ,, |
| নিট লাভ | ... | ৭৭৯,০২৯,৮৬০ ,, |
| নিট লাভের সরকারী হিস্সা | ... | ৩৭৬,২৮০,০৮৩ ,, |
| নিট লাভে অংশীদারদের হিস্সা | | |
| (ক) নগদ দেয় | ... | ৩৬৪,০৬৪,০০০ ,, |
| (খ) জমা | ... | ১,০১৪ ,, |
| মজুদ তহবিল | ... | ৩৮,৬৮৪,৭৬৩ ,, |

সুতরাং গবর্ণমেণ্ট নিট লাভের "সিংহের ভাগই" গ্রহণ করিয়াছে, কারণ সরকারী হিস্সার বরাদ্দ ৪৮·৩% , পক্ষান্তরে অংশীদারদেরকে নগদ প্রদত্ত হিস্সার বরাদ্দ ৪৬·৭% মাত্র।

তবে এ হিসাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে পুরাতন রাইখ্‌সবাঙ্কের বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস অপেক্ষা বেশী বাহাদুরি লওয়ার উপায় নাই। কারণ ১৮৯৭ সনের ১৭ই নবেম্বরের আইন অনুসারে বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসকে নূতন কতকগুলি অনুগ্রহ দান করিয়া তাহার বিনিময়ে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নিজ আর্থিক সুবিধা ভোগের যে ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে তাহা আদৌ

ফেলিতব্য চিজ নয়। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থাদ্বারা ফরাসী রাষ্ট্র ১৮৫৭ ও ১৮৭৮ সনে ব্যাঙ্কের নিকট গৃহীত ১৪ কোটী ফ্রাঁর সুদ হইতে রেহাই পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বাঁক্ যতদিন অনুগ্রহ ভোগ করিবে গবর্ণমেণ্ট ততদিনের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৪ কোটী ফ্রাঁর আর এক দফা বিনা-সুদে কর্জ্জ আদায় করিয়া লইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বাঁক্ যে পরিমাণ ডিস্কাউণ্ট ভোগ করে তাহার এক-অষ্টমাংশ পরিমিত অর্থ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে বাধ্য আছে। এই টাকার পরিমাণ অন্ততঃ পক্ষে ২০ লক্ষ ফ্রাঁ হওয়া চাই-ই। চতুর্থতঃ, ডিস্কাউণ্টের হার যদি ৫% এর বেশী হয় তাহা হইলে অংশীদারদের হিস্যা হইতে অতিরিক্ত লভ্যাংশ কাটিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। যাহা বাকী থাকিবে তাহার সিকি অংশ ব্যাঙ্কের পুঁজিতে যুক্ত হইবার কথা। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রের তহবিলে জমা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসের আইনে তৃতীয় ধারা সম্বন্ধে কিছু রদ-বদল করা হইয়াছে। ডিস্কাউণ্টের হার ৪%এর বেশী হইলে রাষ্ট্রের হিস্যা ⅛ হইতে ⅙ এ পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকন্তু ঐ আইনের জোরে গবর্ণমেণ্ট বিনা সুদে ২ কোটি ফ্রাঁ ধার লইবারও ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

নিম্নের তালিকায় বাঁক্ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রের তহবিলে প্রদত্ত টাকার হিসাব দেওয়া গেল :—

| | ফ্রাঁ | | ফ্রাঁ |
|---|---|---|---|
| ১৮৯৭ | ২,৭৪২,০০০ | ১৯০৬ | ৫,৩৩৩,০০০ |
| ১৮৯৮ | ৩,৩৪৩,০০০ | ১৯০৭ | ৭,৩৫৭,০০০ |
| ১৮৯৯ | ৪,৮৫৭,০০০ | ১৯০৮ | ৫,৫৩৩,০০০ |
| ১৯০০ | ৫,৬৫৫,০০০ | ১৯০৯ | ৪,৭৯০,০০০ |
| ১৯০১ | ৪,১০৭,০০০ | ১৯১০ | ৫,৭৩৩,০০০ |

| | ফ্রাঁ | | ফ্রাঁ |
|---|---|---|---|
| ১৯০২ | ৩,৭৭৭,০০০ | ১৯১১ | ৭,২২৬,০০০ |
| ১৯০৩ | ৪,৩১৪,০০০ | ১৯১২ | ৮,৭২৩,০০০ |
| ১৯০৪ | ৪,৫২১,০০০ | ১৯১৩ | ১৩,৬২৫,০০০ |
| ১৯০৫ | ৪,২২৫,০০০ | | |
| | | মোট | ৯৫.৮৬১,০০০ |

১৯২৮ সনের ২৩শে জুনের চুক্তি অনুসারে নয়া বাঁক্ গবর্ণমেণ্টকে ৩০০ কোটি ফ্রাঁ বিনা সুদে ধার দিয়াছে। এই দেনা ১৯৪৫ সনে শোধ দেওয়া হইবে। সুতরাং বাঁকের নিকট ফরাসী রাষ্ট্রের বিনা সুদে ঋণের পরিমাণ ৩২০ কোটি ফ্রাঁ ( নয়া ফ্রাঁ )।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা পূরাপূরি বে-সরকারী। এর উপর রাষ্ট্রের কোনো ক্ষমতাই নাই। অংশীদারগণই সর্ব্বে-সর্ব্বা। তাহারাই নিজেদের মধ্য হইতে ডিরেক্টার-সভা গঠন করে। এই ডিরেক্টার-সভায় যে সদস্য আছে তাহাদের মধ্যে কাহারই কর্ম্মচারী বা মালিকরূপে অন্য কোনো ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ নাই। একজন গবর্ণর এবং তাঁহার সহকারী ডেপুটী গবর্ণর আছেন; এবং ইঁহারা উভয়ে দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারা উভয়ে খোদ ডিরেক্টার-সভার লোক।

বাঁকের নিকট হইতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে মোটা মোটা আর্থিক সাহায্য ও বিনা সুদে ঋণ ভোগ করিয়া থাকে ১৯২৪ সনের রাইখ্স্-বাঙ্ক আইনের নিকট তাহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বস্তু। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট বড় জোর ১০ কোটী মার্ক ধার লইতে পারে, কিন্তু তাহা সরকারী বৎসরের মধ্যেই শোধ দিতে হয়। সুদও রীতিমতভাবে দিতে হয়। তবে সরকারী ডাক ও রেল বিভাগকে উর্দ্ধপক্ষে ২০ কোটি মার্ক ধার

দেওয়ার জন্য রাইখ্‌সবাঙ্ককে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু নিট লাভের ১২°/. মজুদ তহবিল এবং ৮% অংশীদারদের বাঁটিয়া দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা রাইখ্‌সবাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই ভোগ করে।

তবে রাইখ্‌সবাঙ্কের কারবারে লাভের ভাগ লইতে গিয়া জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট যে খুব বেশী লাভবান্ হইয়াছে তাহা মনে হয় না। মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্থিতিসাধনের পর প্রথম বৎসরের হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। নিম্নে ১৯২৪ সনের যে অঙ্কগুলা দেওয়া হইল তাহা বেশ প্রণিধান-যোগ্য :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| মোট আয় | ... | ৩০৭,০৭৩,৩৫০ | রাইখ্‌স মার্ক |
| মোট ব্যয় | ... | ১৮৪,৫৫৯,১৫৯ | ,, |
| নিট লাভ | ... | ১২২,৫১৪,১৯১ | ,, |
| মজুদ তহবিল | ... | ২৪,৫০২,৮৩৮ | ,, |
| অংশীদারের লভ্যাংশ | | | |
| (ক) নগদ প্রদত্ত | ... | ৯,০০০,০০০ | ,, |
| (খ) জমা | ... | ৩৩,৪০৩,৬০০ | ,, |
| গবর্ণমেণ্টের হিস্যা | ... | ৫৫,৬০৮,৫১৪ | ,, |

নয়া রাইখ্‌সবাঙ্ক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে বটে, তবুও নিট লাভের "সিংহের ভাগ" অর্থাৎ ৪৫·৪% সরকারই ভোগ করিবার অধিকারী।

কিন্তু বাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের বেলায় আমরা যেন আর একটা নয়া জগতে উপনীত হই। সরকারী নিয়ন্ত্রণ, এমন কি উহার সংস্পর্শ হইতেও পূর্ণ অব্যাহতি এই ব্যাঙ্কের গঠনতন্ত্র বা কাঠামোর প্রধানতম সর্ত্তরূপে সমঝিতে হইবে। পূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। নয়া রাইখ্‌স বাঙ্কের চেয়েও ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড এসম্বন্ধে বেশী স্বাধীনতা

ভোগ করে। কারণ রাইখ্‌সবাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের বেলায় জার্ম্মাণ প্রেসিডেণ্টের অনেকখানি হাত আছে। তাহা ছাড়া বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের বিনা সুদে রাষ্ট্রকে কর্জ্জদান, আর ফরাসী ও জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক লাভের মোটা অংশ রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। তবে নোট-বিভাগে প্রতি বৎসর যে লাভ দাঁড়ায় তাহা অবশ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উপভোগ করে; কিন্তু এই টাকার পরিমাণ এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। অন্য পক্ষে গবর্ণমেণ্ট ঋণের জন্য ব্যাঙ্ককে চুক্তি-মাফিক নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিয়া থাকে। সরকারী কাজ-কর্ম্মের জন্য এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের মতই গবর্ণমেণ্টের নিকট পারিশ্রমিক আদায় করিয়া থাকে। সুতরাং দুই পক্ষই কেহ কাহারও অধীন না হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করিতেছে।

# রেল-দুনিয়ায় ভারতের স্থান*

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

বিনয়বাবুর "বাড়তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) গ্রন্থের "রেল-সম্পদের বাড়তি-জরীপ" প্রবন্ধ ( পৃষ্ঠা ২৭৬-৩২৭ ) দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধ প্রথমে জার্ম্মাণ-ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল,—য়েনার "আল্‌গেমাইনেস ষ্টাটিষ্টিশেস্‌ আর্খিফ" নামক সংখ্যাবিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকায় (১৯৩১)। পরে ইহার ইংরেজি সংস্করণ ভারতবর্ষের নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে বাংলা সংস্করণ করা হইয়াছে।

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ :—ভারতীয় রেল-সম্পদের বহর, বিশ্ব-মাপে ভারতীয় রেল, লোহার কারবার ও রেল, রেল-শাসনে ভারত-কথা, সরকারী বনাম বে-সরকারী রেল, যাত্রী ও মাল, মাথা-পিছু ও মাইল-পিছু রেল-জরীপ, তিনপ্রকার সাম্য-সূত্র, বাড়্‌তি কাহাকে বলে? বাড়্‌তির হার। —সম্পাদক

* "আর্থিক উন্নতি" ১৩৩৮ ও ১৩৩৯ ( ১৯৩১ ও ১৯৩২ ) সনের তিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

# ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যে যুক্তিযোগ*

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

## "যুক্তিযোগে"র আবহাওয়া

বর্ত্তমান যুগ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার যুগ। দুনিয়ার বাজার দখল করা এখন সকল উৎপাদনকারীরই প্রধান ধান্ধা। এহেন যুগে ভারতবর্ষ যদি "যুক্তিযোগ" ("র‍্যাশন্যালিজেশন") নীতির ধার না ধারে তবে তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা হইবে। ইয়োরামেরিকার অগ্রগামী দেশগুলির সর্ব্বত্রই যুক্তিযোগ নীতির বোলচাল শুনা যায়। ভারতের ব্যবসায়ী মহলে অবশ্য এই কথাটা তেমন সবল হইয়া উঠে নাই। তবে ভারত একেবারে পিছাইয়াও নাই। ভারতভূমিতে ইতিপূর্ব্বেই শিল্প-বিপ্লবের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং যুক্তিযোগ নীতির কোনো-কোনো অংশ ভারতের ধাতে বেশ সহ্য হইতে পারে।

ভারতভূমিতে শিল্প-বিপ্লব সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু এই শিল্প-বিপ্লবের দৌড় খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। জনসংখ্যা এবং আয়তনের অনুপাতে ভারতীয় শিল্প-বিপ্লবের কিম্মৎ খুব কম। শিল্পোন্নতি হিসাবে ভারত রহিয়াছে এখনও পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ ইয়োরোপের কোঠায়। কিন্তু ভারতের বড়-বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন এত বড় এবং গঠন-প্রণালী এরূপ জটিলতাপূর্ণ যে ঐগুলি অতি-আধুনিক

* "আর্থিক উন্নতি", পৌষ ১৩৪১ (জানুয়ারি ১৯৩৫)। ১৯৩০ সনে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, বিনয়বাবুর সম্পাদিত ত্রৈমাসিকে প্রবন্ধটা প্রথমে ইংরেজিতে বাহির হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর খাড়া রহিয়াছে। সুতরাং ‘যুক্তিযোগ’ নীতি ভারত ভূমিতে একটা খাপছাড়া কিছু নয়। ভারতীয় ধনবিজ্ঞানসেবী এবং ব্যবসা-ধুরন্ধরগণ এই নতুন শব্দটার ব্যবহারে অভ্যস্ত না হইলেও যুক্তিযোগ নীতি ইতিপূর্ব্বেই শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশের তুলাশিল্পের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যাক। ১৯২৫ সন হইতে সকলেরই দৃষ্টি বোম্বাইয়ের উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। বোম্বাই সহরের সাস্থন সঙ্ঘের অধীনে দশটী এবং করিম ভাইয়ের অধীনে ১১টী কল চলিতেছে। এই দুইটী কোম্পানীই অবশ্য ম্যানেজিং এজেন্সি শ্রেণীর সঙ্ঘ। সুতরাং এই দুইয়ের নিকট প্রকৃত ব্যবসা-একীকরণ নীতির প্রত্যাশা করা যায় না। ল্যাঙ্কাশিয়ারের বস্ত্রব্যবসায়ীদের মত, বোম্বাই মিলের মালিকগণ ব্যবসা-একীকরণ ( কার্টেল ) অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটা এখনও বিশেষরূপে রপ্ত করিতে পারে নাই। তবে মিলের আভ্যন্তরীণ কারবারে যুক্তিযোগ নীতি মিল-মালিকদের বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, প্রধানতঃ গুজরাটের মিল-মালিকদের। আমেদাবাদের অনেকগুলি মিলে, বিশেষতঃ আম্বালাল সারাভাইয়ের তাঁবের মিলগুলিতে, কার্য্যকাল, মাল উৎপাদন, মজুরির হার নিরূপণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই মার্কিণ ওস্তাদ টেলারের কার্য্য-প্রণালী কায়েম করা হইয়াছে। ভারতের গোটা কয়েক মিল সাজসরঞ্জাম এবং পরিচালনা সম্বন্ধে বিলাতের মিলগুলির চেয়ে আধুনিকতর। ১৯২৯ সনের বস্ত্রবয়নসম্পর্কীয় টারিফবোর্ডে প্রদত্ত ভারতীয় মিলমালিকগণের সাক্ষ্য হইতে এইরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে।

যুক্তিযোগ নীতির একটা মস্ত বড় দোষ হইতেছে, কর্ম্মচারীর বা মজুরের সংখ্যাহ্রাস। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও এই সামাজিক ব্যাধি দেখা দিয়াছে। এর ফলে কেরাণী এবং মজুরগণ

ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হয়। বোম্বাই সহরে যে ঘন-ঘন ধর্ম্মঘট হইতেছে তাহাও এইজন্য। ১৯২৮ সনের এপ্রিল-অক্টোবরের মাঝামাঝি বোম্বাই সহরে ১৫০,০০০ মজুরের ধর্ম্মঘটের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতেও যুক্তিযোগ নীতি কায়েম হইয়াছে। মিল-মালিকদের মুখে কেবলই শুনা যাইত, "মজুরদের কর্ম্মদক্ষতা চাই"। টারিফ-বোর্ড সুপারিশ করিয়াছিল—(১) সূতা কাটার মজুরকে একখানির পরিবর্ত্তে দুইটি ফ্রেম চালাইতে হইবে, (২) প্রত্যেক তাঁতীকে দুইখানির পরিবর্ত্তে তিনখানি তাঁত চালাইতে হইবে। এই সুপারিশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মিল-মালিকগণ মহা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। শ্রম-লাঘবকারী যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে,—বিলাতের ১৭৭৫-১৮৩০ হইতে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই—দেখা দিয়াছে অসন্তোষ, দাঙ্গাহাঙ্গামা আর ধর্ম্মঘট। বোম্বাই সহরের কাপড়ের কলগুলিতেও এইরূপ ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল-গুলির মালিক এবং পরিচালক সকলেই ভারতীয়। সুতরাং ভারতীয়গণ যুক্তিযোগ নীতি অন্ততঃ পক্ষে আংশিকরূপে পাকড়াও করিতে পারিয়াছে বলিতে হয়।

## রেল-ব্যবসায় যুক্তিযোগ

ভারতের আধুনিক শিল্পসমূহের মধ্যে রেলওয়ের স্থান সর্ব্বোচ্চে। দুনিয়াব্যাপী বর্ত্তমান যুক্তিযোগ নীতির যে জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে তাহার নজীর ভারতের রেল-শিল্পের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে। রেলশিল্পে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, ঐক্য-গ্রথিত হওয়া ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থাতেও যুক্তিযোগ নীতির নিদর্শন দেখা যায়। ১৯০৫ সনে রেলওয়ে বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। সেই সময়ে ভারতভূমিতে সর্ব্বপ্রথম যুক্তিযোগ নীতির গোড়াপত্তন করা হয়।

অ্যাশওয়ার্থ রেলওয়ে কমিটির (১৯২০-২১) সুপারিশ অনুসারে রেলওয়ে বোর্ড যে কেবলমাত্র রেলসড়কগুলিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াই চলিতেছে তা নয়, সঙ্গে-সঙ্গে একীভূত করার দিকেও বোর্ড নজর দিয়াছে ঢের। বর্ত্তমানে ৭০% রেলসড়ক রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত এবং ৪০% রেলপথ রাষ্ট্রপরিচালিত। ১৯২৫ সনে যে বিরাট রেলপথ সম্মেলন হয় তাহাও রেলপথের সরকারী-করণ এবং রেলপথে যুক্তিযোগ প্রয়োগ করার জন্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের (৪,০১১ মাইল) সহিত আউধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের যোগাযোগ এবং গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলপথের (৩,৬৫৬ মাইল) সহিত ই, আই, আর-এর নাইনি-জব্বলপুর সেক্শনের যোগাযোগ মহা-লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগের আর্থিক জগতে যুক্তিযোগ নীতির এক বিরাট নিদর্শন। ১৯২৪ সনের রেলওয়ে আইন যুক্তিযোগ নীতির আর একটী উদাহরণ। ইতিপূর্ব্বে রেলপথের আয় সাধারণ রাজস্বের সামিল ছিল বলিয়া ভারতের সরকারী রাজস্বের বড়ই উঠানামা হইত। রেলপথের আয় এখন পৃথক করিয়া সাধারণ রাজস্বের তহবিলে রেলওয়ে ফাণ্ড হইতে ছয় কোটী টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯০৫ সনের পর হইতে ভারতীয় রেলপথের গতি ইতালিয়ান রেলপথগুলির পথেই চলিয়াছে।

রেলপথের যুক্তিপ্রয়োগ এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও প্রবেশ করিয়াছে। সরকারী রেলওয়ে ওয়ার্কশপসমূহের জন্য ১৯২৫-২৬ সনে একটি কমিটি গঠিত হয়। স্যর ভিন্সেণ্ট র‍্যাভেন্ কমিটির সভাপতি পদে বৃত হন। কমিটি কতকগুলি ওয়ার্কশপ তুলিয়া দিয়া বাকীগুলির উন্নতিবিধান সম্বন্ধে আধুনিক কায়দায় ঐগুলির জন্য পরিচালনের সুপারিশ করে। আধুনিক কায়দায় ঢালিয়া সাজার অর্থ হইতেছে শ্রমলাঘব, আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তন, সঙ্ঘবদ্ধকরণ। এইসকলের ফলে বহু মজুর বেকার হইয়া পড়ে। সেইজন্য বয়নশিল্পের মত রেলপথেও ধর্ম্মঘটের হিড়িক সুরু

হয়। ১৯২৮ সনে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে বিরাট ধর্ম্মঘট দেখা দেয়। মহাসমরের পর শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে যুক্তিযোগের জন্য ইয়োরোপে যে শ্রমিক-চাঞ্চল্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে ভারতবর্ষেও তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।

## টাটার কারখানায় যুক্তিযোগ

যুক্তিযোগ নীতির লেজুড়রূপী ধর্ম্মঘট ভারতের আর একটি বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানেও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড্। ইহার আস্তানা জামশেদপুরে। প্রতিষ্ঠানটী খাঁটি ভারতীয়। কারখানাটা কায়েম করিতে প্রাথমিক খরচ পড়ে ১,৬৩০,০০০ পাঃ। ৮,০০০ ভারতবাসী "কালা আদমী" এই মূলধন যোগায়। এহেন পূরাদস্তুর স্বদেশী প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত লোকজন তাড়াইতে বাধ্য হয়। এই জন্য তাহার জবাব-স্বরূপ দেখা দেয় ধর্ম্মঘট। ১৯২৮ সনে একদিকে কুলি আর কেরাণী করে ধর্ম্মঘট, আর একদিকে কারখানার শাসনকর্ত্তারা কারখানায় লাগাইয়া দেয় তালা-চাবি ("লক্-আউট")। ১৯২৮ সনের এই ব্যাপারে ডিরেক্টারগণ অবশ্য 'যুক্তিযোগ' কথাটা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ১৯২৮ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে চেয়ারম্যান মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতায় যুক্তিযোগ নীতির মূলসূত্রগুলি স্থান পাইয়াছে। তিনি বলেন—"একজনের দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায়, সেই কাজে দুইজন লোক মোতায়েন করিলে মজুরদের তাতে মঙ্গল হইবে না। এইরূপ কার্য্যনীতির অর্থ অযোগ্যতা, সময় নষ্ট করা। ১৯২৬ সনে ঘোষণার দ্বারা আমরা জানাইয়াছিলাম, কর্ম্মখালি হইলে সে পদ খালিই রাখা হইবে। ধীরে ধীরে যোগ্যতার প্রবর্ত্তন করাই এই ঘোষণাবাণীর মূল উদ্দেশ্য। লোক আমাদের হাতে ছিল প্রয়োজনাতিরিক্ত। একেবারে সমস্ত

ফালতো লোকজন তাড়াইলে তাদের খুব বেশী কষ্ট হইবে এই বিবেচনায় আমরা ক্রমশঃ অতিরিক্ত লোকের ভীড় কমাইবার চেষ্টা করিয়াছি। দুষ্ট লোক আমাদের এই ন্যায়নীতির কদর্থ করিয়া অশিক্ষিত মজুরদিগকে কানভাঙানি দিয়া অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে।"

যুক্তিযোগের ফলে মজুরদের কষ্ট হইবে, টাটা কোম্পানীর ডিরেক্টারদের এ সম্বন্ধে যে খেয়াল ছিল না তা নয়, কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে মজুরশ্রেণীর যে সুবিধা বাড়িবে সে সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞান ছিল টন্‌টনে। টাটা কোম্পানীর চেয়ারম্যান্ মহোদয় বলেন—টনপ্রতি মাল উৎপাদনের খরচা-হ্রাস এবং মজুরদেরও মজুরিবৃদ্ধি দুই-ই আমাদের উদ্দেশ্য। কাজ অনুসারে মজুরিবৃদ্ধি,—এ-ছাড়া ভারতীয় মজুরদের অবস্থার উন্নতিসাধনের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

মজুরদের সংখ্যাহ্রাস এবং বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পারিশ্রমিকের চড়া হার এবং দক্ষতাবৃদ্ধি—টাটা কোম্পানীর ডিরেক্টার-গণ সকলশ্রেণীর ভারতসন্তানকে যুক্তিযোগের এই দুমুখো নীতি শিক্ষা দিতেছে। অতএব দেখিতেছি যে, বিশুদ্ধ যুক্তিযোগ নীতি অর্থাৎ শিল্পব্যবসা-পরিচালনের খাঁটি আমেরিকান দস্তুর ভারতীয় ব্যবসা-মহলে বিনাশুল্কে আমদানি হইতেছে। চেয়ারম্যান মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতায় তাহা বিশেষ প্রমাণিত হইতেছে।

মোট কথা ভারতীয় কল-কারখানার মালিকগণ যুক্তিযোগ নীতি বর্জ্জন করিয়া চলিতেছে না। বরং এই নীতি পাকড়াও করিয়া চলিবার জন্য তাহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। যুক্তিযোগের আর একটী নীতি জামশেদপুরের কাজকর্ম্মে দস্তুর হইয়া উঠিতেছে। তাহা হইতেছে গাদায়-গাদায় মাল উৎপাদন। একই ধরণের মাল গাদায় গাদায় উৎপাদন করিলে খরচ কম পড়িতে বাধ্য। এইরূপ বেশী-বেশী পরিমাণে মাল উৎপাদন করার জন্য টাটা কারখানায় ১৯২৪ সনে নূতন্

প্ল্যাণ্ট কায়েম করা হইয়াছে। কোক ও পিগ লোহা এবং রোল করা ইস্পাত তৈরীর জন্য নূতন প্ল্যাণ্ট বসান হইয়াছে। ১৯২৬ সনের মধ্যেই ইহার ফলে উৎপাদনের ব্যয় কিরূপ হ্রাস পাইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকায় টের পাওয়া যাইবে :—

| | | রেল | বার |
|---|---|---|---|
| পুরাতন | ... | ১৫০৲ টাকা | ১৬৩৲ টাকা |
| নূতন | ... | ১১২৲ ,, | ১৩০৲ ,, |

প্ল্যাণ্ট বর্দ্ধিত করিয়া উৎপাদনের ব্যয়হ্রাসকরণ, যুক্তিযোগ নীতির একটী বিশেষ মূর্ত্তি। ভারতীয় কারখানার মালিকগণ যুক্তিযোগের এই দিক্‌টা ক্রমেই পাকড়াও করিয়া লইতেছে। ১৯২৬ সনের টারিফ বোর্ডের নিকট টাটা কোম্পানীর চেয়ারম্যান এই ধরণের কথা বাৎলাইয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা সেকেলে ধরণের সমস্ত রোলিং মিল বন্ধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নূতন মিল বসাইয়া ইস্পাত পিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহা প্ল্যাণ্টের এক দিক্‌কার ব্যবস্থা। প্ল্যাণ্টের আর এক দিক্‌কার ব্যবস্থা আমরা জানিতে পারি নিম্নলিখিত উক্তি হইতে :—

"একটা নূতন ইস্পাতের চুল্লী ( ফার্ণেস ) বসানো হইবে ; পুরাতন চুল্লীর মধ্যে কতকগুলি এমনভাবে রূপান্তরিত করা হইবে যাহাতে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।" জার্ম্মাণই হউক আর মার্কিণই হউক, যুক্তিযোগ নীতি এই উক্তির গোড়ার কথা। বিশেষতঃ মহাসমরের পরে যুক্তিযোগের ধারা দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এই পথেই ঝুঁকিয়াছে। উপরোক্ত মোসাবিদা ৭ বৎসরের জন্য করা হয়। টাটা কারখানার এই আয়তন-বৃদ্ধি এবং সংশোধনের মতলব শুনিয়া টারিফবোর্ড ১৯২৭ সনে সরকারী সাহায্য বন্ধ হইবার পর নূতনভাবে সংরক্ষণ-শুল্কের সুপারিশ করিয়াছে।

এই সপ্তবার্ষিকী মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায়

৩০,০০,০০০ টাকার প্রয়োজন। ডিরেক্টারগণ কিন্তু স্থির করিয়াছিল, পুঁজিও বাড়াইবে না, ধারও করিবে না। ডিপ্রিসিয়েশান-রিজার্ভ (বা পুনর্গঠন-ভাণ্ডার) হইতে কারখানা বাড়াইবার খরচা সঙ্কুলান করা হইতেছে। যুক্তিযোগের এ একটা উত্তম ধারা বটে।

আয়তন বৃদ্ধি, শ্রমলাঘবের উপায় বিধান, উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তন, সেকেলে কার্য্য-প্রণালী ও যন্ত্রপাতির বিতাড়ন—আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের ইহা গোড়ার কথা। এইসমস্ত ব্যাপার ভারতে একদম নতুন কিছু নয়। ১৯২৭ সনের সপ্তম বার্ষিকী নীতি এবং ১৯২৪ সনের 'আয়তন-বৃদ্ধি নীতি'—কায়েম হইবার পূর্ব্ব হইতেই ভারত ভূমিতে ঐসমস্ত ঘটনার অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। ১৯১১-১২ সনে টাটার কারখানার সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই শিল্পসম্বন্ধীয় গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। ১৯১১ সনের জুলাই মাসে অর্থাৎ কোক পোড়াইবার চুল্লী বসাইবার ২।৩ মাস আগে, কারখানা-পরিচালনের আধুনিক কায়দা ভারতীয় শিল্পধুরন্ধরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সময় ইণ্ডিয়ান মাইনিং অ্যাণ্ড জিওলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট-এর সদস্যগণ, প্রেসিডেণ্ট আর, পি, অ্যাশ্‌টন সহ টাটার কারখানা পরিদর্শন করেন। শ্রমলাঘবের উপায়াবলী সম্বন্ধে তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করেনঃ—"যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা ক্রাশারএর অর্থাৎ চূর্ণ করিবার মেশিনের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। তারপর মোটরের সাহায্যে চূর্ণ করা কয়লা এলি-ভেটারের উপর নিক্ষিপ্ত হয়; এলিভেটার হইতে কয়লা গাড়ী বোঝাই হইয়া কোক চুল্লীতে পৌছে। চুল্লীগুলি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫০০ টন কোক উৎপাদন করে। ঝরিয়ার খনি হইতে কাঁচা কয়লা আনার পর ব্লাষ্ট্‌ ফার্ণেসে লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ বৈদ্যুতিক শক্তিতে সম্পন্ন হয়; মানুষের স্পর্শ এই কয়লার গায়ে লাগিতে পারে না।"

মানুষের শ্রমকে ক্রমে ক্রমে অব্যাহতি দেওয়ার এই যুক্তিযোগ

নীতি সমঝিয়া লইলে, বার্লিনের নিকটবর্ত্তী ক্লিংব্যর্গের ইলেকট্রিক্যাল ক্রাফট্ওয়ার্ক এবং ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত আর্ডিং-এর জল-শক্তির বৈদ্যুতিক কারখানার অতি-আধুনিক যুক্তিযোগ নীতি পাকড়াও করা সহজ হইবে। টাটার বর্ত্তমান সপ্তবার্ষিকী মোসাবিদায় কারখানার আয়তনবৃদ্ধির এবং যন্ত্রপাতির পরিবর্ত্তন সাধনের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাও এই অতিআধুনিক যুক্তিযোগ নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য।

১৯২৯ সনে নূতন প্ল্যাণ্টের কাজ অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে। "বি"ব্লাষ্ট ফার্ণেসটী ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে, একটী নূতন ষ্টোভ্ বসানো হইয়াছে, চারটী পুরাতন ষ্টোভ বাড়ানো হইয়াছে। ওর আর কোক তুলিবার এবং গুদামে রাখিবার জন্য নূতন ইলেক্ট্রিক উত্তোলন যন্ত্র এবং ষ্টোরেজ্ বিন কায়েম করা হইয়াছে। ইণ্টারন্যাশনাল জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর একটি নূতন ব্লোয়ার কেনা হইয়াছে এবং "ডি" ব্লাষ্ট ফার্ণেসটী মেরামত করিয়া উহার কার্য্যশক্তি বাড়ানো হইয়াছে।

ইস্পাত তৈরীর জন্য একটী ডুপ্লে ফার্ণেস এবং নূতন নূতন গ্যাস উৎপাদনের যন্ত্র বসানো হইয়াছে। ব্লুমিংমিল এবং রেলের মিলেরও নূতনত্ব সাধিত হইয়াছে। নূতন জন টমসন বয়লার আর নূতন এশার-ভিস ব্লোয়ার তৈয়ার হইয়া রহিয়াছে।

যন্ত্রপাতির এইসমস্ত পরিবর্ত্তন এবং কারখানার আয়তন-বৃদ্ধি সম্পর্কে একটী তথ্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ১৯২৮ সন হইতে টাটা কোম্পানীর ফিউয়েল (ইন্ধন) বিভাগের ভার অর্পিত হইয়াছে একজন জার্ম্মাণের উপর। এই বিশেষজ্ঞ ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণির একটী বাঘা লোহালক্কড়ের কারখানায় অনুরূপ কাজে মোতায়েন ছিলেন। যাহা হউক, পুনর্গঠন এবং আয়তনবৃদ্ধি সম্পর্কে ১৯২৮ সনের চেয়ারম্যান তাঁহার

প্রদত্ত বক্তৃতায় পুনঃ পুনঃ কারখানার ক্রমিক উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।" এই উন্নতির ধারা সম্বন্ধে তিনি বলেন:—"উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের ব্যয়-হ্রাসের জন্যই কারখানার উন্নতি হইয়াছে। কয়লার মূল্য-হ্রাসের জন্য উৎপাদনের খরচা কমিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যয়-হ্রাসের অর্দ্ধেক ঘটিয়াছে অন্যান্য কারণে। কারখানার সন্তোষজনক কাজ, মজুরদের দক্ষতা, ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া চলা, হুঁসিয়ার হইয়া কেনা, মালপত্রের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ এবং তদনুসারে মূল্য প্রদান—এই সমস্ত ব্যবস্থার জন্য খরচা বিশেষরূপে কমিয়াছে। উৎপন্ন মালের উৎকর্ষসাধন এবং খরচা-হ্রাসের জন্য আমরা ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।"

যুক্তিযোগ নীতির আর একটী অতি-গুরুত্বপূর্ণ দিক্ আছে। আন্তর্জ্জাতিক কার্টেল অর্থাৎ ব্যবসা-সঙ্ঘগুলি এই দিক্টার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেছে। উহা হিসাব করিয়া মাল উৎপাদন করিবার এবং অতিরিক্ত মালের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার নীতি। টাটা আয়রন অ্যাণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীও অতিরিক্ত মাত্রায় মাল উৎপাদন বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ষ্টক অর্থাৎ মৌজুদ মালের পরিমাণ-হ্রাস ব্যবসা-পরিচালনের একটী অতি-উল্লেখযোগ্য দস্তুর। চেয়ারম্যান মহাশয়ের ১৯২৭ সনের বক্তৃতায় আমরা শুনিতে পাই, তিনি বলিতেছেন—"বর্ত্তমানে আমাদের মৌজুদ মালের পরিমাণ খুবই অল্প। তিন বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানীর যে আর্থিক টানাটানি পড়িয়াছিল, তাহা আর নাই। মৌজুদ মাল হ্রাস করার ফলে আর্থিক দুর্য্যোগ বিদূরিত হইয়াছে।"

নিম্নের তালিকায় মাল-উৎপাদন এবং মৌজুদ মালের তুলনামূলক পরিচয় প্রদত্ত হইল। বর্ত্তমান সময়ে কোম্পানীর অবস্থা কিরূপ তাহা এই তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে:—

| সন | উৎপাদন | মৌজুদ মাল |
|---|---|---|
| | টাকা | টাকা |
| ১৯২৫ | ৭৬,০০০,০০০ | ১১,৫০০,০০০ |
| ১৯২৬ | ৮০,৪০০,০০০ | ৯,৩০০,০০০ |
| ১৯২৭ | ৮১,২০০,০০০ | ৫,৮০০,০০০ |
| ১৯২৮ | ৬০,৪০২,০০৪ | ৬,৩৭১,৬৭৪ |
| ১৯২৯ | ৪০,৭২১,০৩০ | ৭,০৮২,৫০৯ |

১৯২৫ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত যে অবস্থা দেখা দিয়াছিল ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সনে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অবস্থার এই তারতম্য সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ পাওয়া যায়। ১৯২৮-২৯ সনের রিপোর্টে তাহা বুঝাইয়া বলা আছে। বিবরণীতে প্রকাশ,—"ধর্ম্মঘটের জন্য বিক্রয় বিভাগের কাজ যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়। মাল সরবরাহ যথোপযুক্ত ভাবে হয় নাই; বুক করা অর্ডার নাকচ করিতে হইয়াছে; আবার বুক করা হইয়াছে, আবার নাকচ করা হইয়াছে। কলকারখানার অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্য্যন্ত কাজকর্ম্মের অবস্থা এইভাবে চলিয়াছে।" অবস্থা যাহাই ঘটুক না কেন, মাল-বিক্রয়ের যুক্তিযোগ সম্বন্ধে ডিরেক্টার সঙ্ঘের খুব টনটনে জ্ঞান আছে, বলিতে হয়।

টাটা কারখানায় যুক্তিযোগ নীতির ক্রমোন্নতির আর একটা ধারা এই যে, উচ্চশ্রেণীর টেক্‌নিক্যাল কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিদেশীদের সংখ্যা ক্রমেই কমানো হইতেছে। ইয়োরামেরিকান প্রতিভার দাসত্ব হইতে টাটার কারখানা ক্রমেই রেহাই পাইতেছে। অথচ ইস্পাত উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিদেশ হইতে ইঞ্জিনীয়ার, কেমিষ্ট, মেটালার্জিষ্ট আমদানি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। নিম্নের তালিকায় দেখা যাইবে যে, বিদেশী কর্ম্মচারীর সংখ্যা-হ্রাস সত্ত্বেও মাল-উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে:—

| সন | বিদেশী কর্ম্মচারী | মাল উৎপাদন টন |
|---|---|---|
| ১৯২৫ | ২২৯ | ২৪৮,০০০ |
| ১৯২৬ | ১৬০ | ৩২০,০০০ |
| ১৯২৮ | ১৪৮ | ৪০৮,০০০ |
| ১৯২৯ | ১৩৪ | ২৭৫,০০০ |

ধর্ম্মঘট এবং লক-আউটের (কারখানায় তালা চাবির) জন্য কারখানা বন্ধ থাকার দরুণ ১৯২৯ সনে মাল উৎপাদন কমিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বৎসর মাল-উৎপাদন বাড়তির পথে। অথচ যন্ত্রবিজ্ঞানে বিদেশীদের আধিপত্য ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ভারতীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কোম্পানীর ব্যয়হ্রাসই হইতেছে। জামশেদপুরের টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট এ সম্বন্ধে খুব সহায়তা করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ১৯২৯ সনে চেয়ারম্যান মহাশয় বলেন—"এই প্রতিষ্ঠান হইতে বৎসরের পর বৎসর বহু ভারতবাসী শিক্ষালাভ করিয়া বিদেশীদের স্থান অধিকার করিতেছে। বিদেশ হইতে যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ আমদানি করার চেয়ে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগে খরচ কম হইতেছে। ব্যয়-হ্রাস ছাড়া আর একটী বিষয়েও স্মবিধা হইয়াছে। ভারতবাসী হিসাবে আমরা সকলেই চাই যে, ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতবাসীর দ্বারাই পরিচালিত হউক এবং ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভারতবাসীই কাজ করুক। এই হিসাবে ইস্পাত-শিল্প বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই টাটার কারখানায় কেবলমাত্র ভারতবাসীকেই কার্য্যে মোতায়েন দেখা যাইবে। ষোলআনা ভারতীকরণের "দিন আগত ঐ"। এখন যেমন আমরা জার্ম্মাণিতে গমন করিতেছি, দুনিয়া তখন লোহা-লক্কড় এবং যন্ত্র-বিশেষজ্ঞের জন্য হয়ত ভারতের দ্বারেও সমাগত হইবে।"

টাটা কারখানায় যুক্তিযোগ নীতির আর একটা দিক্ দেখাইতেছি। আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত এই কারখানা আত্মনির্ভরশীল। কাঁচা মালের জন্য কোম্পানীকে পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। কোম্পানীর নিজ খনিসমূহ বর্ত্তমান। চেয়ারম্যান মহাশয়ের ১৯২৮ সনের বিবরণীতে প্রকাশ—কোম্পানীর কয়লাবিভাগ হইতে কোম্পানী যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করিতেছে। তবে কোম্পানীর ব্যবহৃত অনেক কয়লা বাহির হইতে আসে। কারখানায় যেসমস্ত মাল উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই আবার কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কয়লা হইতে কোক উৎপন্ন হয়, এইসমস্ত কোক কারখানার কাজে লাগে। পিগ লোহা তৈরী করার জন্য কোক অত্যাবশ্যক চিজ্।

পিগলোহা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই চিজের জন্য আবশ্যক কুদরতী মাল কোম্পানীর নিজ খনি হইতে আহরণ করা হয়। খনি বিভাগ হইতে কারখানায় কি পরিমাণ কুদরতী মালপত্র আসিয়া থাকে তাহা ১৯২৮-২৯ সনের বার্ষিক বিবরণী পাঠে বুঝা যাইবে, যথা:—

| মাল | | টন |
|---|---|---|
| লোহার ওর | ... | ৮৩১,১২৯ |
| ডলোমাইট্ | ... | ২,২৫৭ |
| চূণের পাথর | ... | ১৬,০২৭ |
| ম্যাঙ্গানিজ ওর | ... | ১২,৬৬০ |
| ম্যাগ্নেসাইট্ | ... | ১,৪১৯ |
| ফায়ারক্লে | ... | ১,৩৭১ |

উল্লিখিত দ্রব্যনিচয় খনিজ পদার্থ হিসাবে তৈরী মাল-বিশেষ। টাটাকোম্পানী স্বয়ং এই সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করে আর ইন্ধন (কয়লা)ও অনেকটা তাহার তাঁবেই আছে। সুতরাং এই বিপুল ট্রাষ্ট বা শিল্পসঙ্ঘের বনিয়াদ যে কত শক্ত তাহা সহজেই অনুমেয়।

পিগ লোহাও তৈরী মাল। উৎপাদিত পিগলোহার কিয়দংশ কোম্পানী রপ্তানি করিয়া থাকে। বাকী পিগলোহা দ্বারা ইস্পাত তৈরী হয়। বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান আয়রণ কোম্পানী এবং মাইসোর আয়রণ ওয়ার্কস পিগ তৈরী করিয়াই খতম। টাটার কারখানা পিগলোহা আর ইস্পাত তৈরী করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত; কিন্তু টাটার কারখানা আরও অগ্রসর হইয়াছে। কোম্পানী পিগলোহা আর ইস্পাত কুদরতী মালরূপে ব্যবহার করিয়া রেল, ফিশপ্লেট্, বার, প্লেট্, শীট্ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। এইসমস্ত চাদর, বার ইত্যাদি হইতে রেল, মোটরগাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি বস্তু তৈরী করিতে পারিলে কোম্পানী ষোলকলায় পূর্ণ হইত। এদিকেও যে কোম্পানীর খেয়াল নাই তা নয়। 'অ্যাগ্রিকো' বিভাগে কৃষিকার্য্যের হালহাতিয়ার, যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইতেছে।

কোক তৈয়ারি বিভাগের বর্জ্জিত ("ওয়েষ্ট") মালপত্রও কাজে লাগানো হইতেছে। এইসমস্ত ফেলিয়া-দেওয়া জিনিষ সাল্ফিউরিক অ্যাসিড্ বিভাগে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে সালফেট অব্ অ্যামোনিয়া এবং আলকাতরা তৈরী করা হইতেছে। এইসমস্ত বাই-প্রডাক্ট (গৌণ মাল) বিক্রয় করিয়া বেশ পয়সা আসে। কাজেই কোক আর পিগলোহা তৈরীর খরচা অনেক কম হইয়া যায়। সুতরাং দুনিয়ার বাজারে প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা কোম্পানীর বেশ আছে।

টাটাকোম্পানী যুক্তিযোগ নীতির সব কয় দফাই কাজে লাগাইয়াছে,—যন্ত্রপাতি, খরচা, মজুর-কর্ম্মচারী নিয়োগ, মাল-বিক্রয় কোন দফাই বাদ যায় নাই। এইসমস্ত কাজ পর্য্যালোচনা করিলে ধনবিজ্ঞানসেবীদের চোখ ফুটিবে। দেশের ব্যবসাদার আর করিৎকর্ম্মা লোকেরা তো এই ব্যাপার বিশেষ উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেনই।

প্রতিষ্ঠানটার উপর ইয়োরামেরিকার পর্য্যন্ত চোখ পড়িয়াছে। "পশ্চিমাদের" ধারণা ভারতবাসী লোহা-লক্কড়ের বিরাট কারখানা চালাইতে পারে না। টাটার কারখানা একটা অদ্ভুত ব্যাপার—ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে; সুতরাং ইহা বেশী দিন টি ঁকিতে পারে না—উহাদের মনে এইরূপ সন্দেহ জাগিয়াছে। টাটার ডিরেক্টরগণ দেশ-বিদেশের এই "চ্যালেঞ্জ" বা লড়াইয়ের ডাকে সাড়া দিয়াছে। টারিফ বোর্ড আর ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদকে উহারা বলিতেছে যে—১৯৩৪ সনের মধ্যে তাহারা কারখানাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল করিতে পারিবে। তখন আর সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না। ১৯২৬ সনের চেয়ারম্যান দেশবাসীর নিকট বাণী প্রচার করিয়াছেন—"টাটা কোম্পানী যদি কৃতকার্য্য হয় তবে অন্যান্য আরও পাচ-দশটা কোম্পানী গজাইয়া উঠিবে। জামশেদপুরের আশেপাশে তখন ভারতীয় পিটুসবার্গ গড়িয়া উঠিবে। ভারতের মোটরশিল্প, জাহাজশিল্প এবং রেলশিল্পের উপযোগী সমস্ত উপাদান ভারতেই পাওয়া যাইবে। তখন জামশেদপুর ভারতীয় সম্পদ্-সামর্থ্যের এক বিপুল কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া যাইবে।

## মাইসোর লোহার কারখানায় যুক্তিযোগ

মাইসোর আয়রণ ওয়ার্কসেও (ভদ্রাবতী) রীতিমতভাবে যুক্তিযোগ নীতি কায়েম হইয়াছে। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট উহার মালিক। তবে টাটার মত ইহা বাঘা কোম্পানী নয়। ইহা একটা ছোট-খাট প্রতিষ্ঠান। এই কারখানায় ইস্পাত উৎপাদনের চেষ্টাচরিত্র চলিতেছে বটে, তবে পিগলোহা উৎপাদনই উহার প্রধান ধান্ধা। এই কারখানায় কোক ব্যবহৃত হয় না। স্থানীয় বন-জঙ্গল হইতে সংগৃহীত কাঠ হইতে কয়লা নিষ্কাশিত করিয়া কারখানা চালানো হয়। কারখানায় প্রতিদিন ৬০।৬৫ টন কাঠ-কয়লা এবং ৮০ টন পিগলোহা উৎপন্ন হইতেছে।

প্রতিষ্ঠানটা ছোটখাট ধরণের ; সুতরাং ইহা এতদিন ফেল মারিয়া যাইত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এবং কাজকর্ম্মে শ্রমলাঘব পন্থা অবলম্বন করায় ইহা এখনও টিঁকিয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ ইস্পাতের দড়ি-নির্ম্মিত রাস্তার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই রাস্তা তিন মাইল লম্বা, মাধ্যাকার্ষণের সাহায্যে ইহা চলে। ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে পর্ব্বতমূলে অবস্থিত কারখানায় লোহার ওর এই রশির সাহায্যে আনীত হয়। তারপর ১০০ মাইল লম্বা ট্রামপথ আছে। এই ট্রামপথে জঙ্গল হইতে কাঠ কারখানায় চালান করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে, মাল চলাচলের সুব্যবস্থা এবং সুবিধাদি না থাকার জন্য রত্নপ্রসূ ভারতভূমির অনেক কুদরতী মাল নানা জনপদে একদম মাঠে পড়িয়া মারা যাইতেছে।

জঙ্গল হইতে কাঠ আনার পর শক্তি-চালিত করাত-কলের সাহায্যে চিরিয়া এবং আবশ্যকমত কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করা হয়। কাঠ ডিষ্টিল করার সময় যে-সমস্ত গ্যাস জমানো যায়-না তৎসমুদয় চুল্লীর তলায় লইয়া যাওয়া হয়, এবং এই সমস্ত গ্যাস পোড়াইয়া কয়লার খরচ কমানো হয়।

এই কারখানায় প্রস্তুত পিগলোহা হইতে বৃটিশ এঞ্জিনীয়ারিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ ডিজাইন অনুযায়ী লোহার পাইপ তৈরী করা হয়। পাইপ করার কারখানা আধুনিক ধরণের। এই কাজে মানুষের শ্রমকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত কাজ বিদ্যুতের সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে।

জামশেদপুরের মত, ভদ্রাবতীতেও ( মহীশূর ) নানাপ্রকার বাই-প্রোডাক্ট্ ( গৌণমাল ) কারখানার এক মস্ত বড় লাভের উপায়ে পরিণত হইয়াছে। কাঠ ডিষ্টিল করিবার সময় যে সমস্ত জমানো গ্যাস নিষ্কাশিত হয় সেই সমস্ত গ্যাস কারখানার কেমিক্যাল বিভাগে লইয়া যাওয়া হয়।

এইস্থানে অ্যাসিটেট্ অব্ লাইম, মেথানল, মেথিল্ অ্যাসিটোন ইত্যাদি বস্তু প্রস্তুত হয়।

এত হুঁসিয়ার হইয়া ৬।৭ বৎসর ধরিয়া কারখানা পরিচালনের পরও মাইসোর আয়রণ ওয়ার্কস্‌এর দুশ্চিন্তা দূর হয় নাই,—কারখানা চলিবে কিনা সন্দেহ চলিতেছে। যুক্তিযোগের বলে কারখানা টিঁকিয়া আছে। বর্ত্তমান যুগে, ভারতেই হউক আর ভারতের বাহিরেই হউক সস্তায় মাল ছাড়িতে না পারিলে কোনো কারখানার টিঁকিয়া থাকিবার উপায় নাই। দাম সস্তা করার পক্ষে যুক্তিযোগ নীতি অমোঘ অস্ত্র-বিশেষ। বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার যুগে, আত্মরক্ষার উপায় এবং জীবনী-শক্তি জাহিরের পক্ষে যুক্তিযোগই একমাত্র কার্য্যকরী নীতি,—কেননা যুক্তিযোগের ফলেই মাল যোগানের খরচা যৎপরোনাস্তি কম করা সম্ভব হয়।

ভারতীয় শিল্প-গগনেও যুক্তিযোগের ভাস্বর দীপ্তি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেসমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এই নীতি অবলম্বিত হয় নাই সেগুলির অবস্থা বাস্তবিকই কাহিল। আর যেগুলিতে এই ব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে সেগুলির প্রায় ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। টাটা এবং মহীশূরের কারখানা দুইটা টিঁকিয়া আছে কেবল মাত্র যুক্তিযোগের জোরে।

## বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীতে যুক্তিযোগ

বর্ত্তমান আলোচনায় বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীরও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। গঠন, পরিচালনা, এবং মূলধন হিসাবে ইহা ভারতীয় নয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে যুক্তিযোগ নীতির বহু নজীর মিলিবে। বি-ও-সি কোম্পানী পাকাপাকি ট্রাষ্ট ধরণের সঙ্ঘ। টাটা কোম্পানীর মতন ইহাও কেবলমাত্র কুদরতী মালের অধিকারী নয়, অর্থাৎ কেবল-

মাত্র ক্রুড্ তেলের মালিক নয়; ইহা কেরোসিন, বেন্‌জিন প্রভৃতি তৈরী মালেরও নির্ম্মাতা। বি-ও-সির মালপত্র দেশ-বিদেশে চালান দেওয়ার জন্য নিজ নৌবহর আছে। মাল বাজারে বিক্রয় করিবার এজেন্ট আছে, ভারতের বড়-বড় শহরে ষ্টোর আছে। আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর (সোকোনির) সহিত টক্কর দেওয়ার জন্য বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী এসিয়াটিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। এই দলে রয়্যাল ডাচ্ শেল কোম্পানীও যোগদান করিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে ভারতের বাজারে অতি সস্তায় সোভিয়েট রুশিয়ার কেরোসিন চালান করিবার সময় আমেরিকান কোম্পানী বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর সঙ্গে তেলের লড়াই সুরু করে। সেই সময়ে বি-ও-সি পূর্ব্বোক্তরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই সময় ইহারা ভারতীয় টারিফ বোর্ডের নিকট সংরক্ষণ-শুল্কের জন্য আবেদন করে। বোর্ড কিন্তু এই দাবী উড়াইয়া দেয়। কলকারখানার পরিচালন সম্পর্কেও বি-ও-সি যথেষ্ট যুক্তিযোগ প্রয়োগ করিয়াছে। তৈলক্ষেত্র বা তেলের খনিগুলি বিদ্যুৎ-পরিচালিত। রেঙ্গুনের তেলের কারখানাগুলির সঙ্গে বহু দূরস্থ তৈলকূপগুলির যোগাযোগ পাইপের সাহায্যে কায়েম করা হইয়াছে।

## কয়লার কারবারে যুক্তিযোগের অভাব

খনিজ তেলের কারবারে যুক্তিযোগ নীতির জয়জয়কার দেখা যাইতেছে, কিন্তু ইন্ধন হিসাবে তেলের মাসতুত দাদা যে-কয়লা তাহার কারবারে যুক্তিযোগের অভাব খুব বেশী। গভর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত ১৯২৫ সনের ভারতীয় কয়লা তদন্ত কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিবরণীতে ইহা বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কি ম্যানেজমেণ্ট, কি কলকারখানা,—সমস্ত ব্যাপারেই ভারতীয় কয়লা-শিল্প পশ্চাতে পড়িয়া

আছে। অনেক কয়লার খনিতেই কয়লা-কাটা কলের ব্যবস্থা নাই। কয়লা কমিটি খনিসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইবার জন্য সুপারিশ করে। কমিটি আরও একটা খুঁৎ ধরে যে, কয়লা তোলার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ী-বোঝাই করা হয় না। কিছুক্ষণ যাবৎ বস্তাবন্দী করিয়া রাখার পর হাতের সাহায্যে গাড়ীতে তোলা হয়। যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা গাড়ী বোঝাই করিবার জন্য এবং উত্তোলিত কয়লা সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ীতে বোঝাই করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছে। যন্ত্রপাতির এই দুই দফা ত্রুটি ছাড়া আরও একটা তৃতীয় ত্রুটি আছে, যাহার জন্য ভারতীয় কয়লা ভারতের বাজারেই ঠাঁই পাইতেছে না। নারী-মজুরেরা খাদ হইতে কয়লা ঝুড়িবোঝাই করিয়া রেলগাড়ীতে পৌছাইয়া দেয়। কোল কমিটির মতে কয়লার খাদ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত করিয়া মানুষের ঘাড় হইতে এই বোঝা নামাইয়া লওয়া উচিত। কোল কমিটির এই সমস্ত সুপারিশ কার্য্যে পরিণত হইলে শ্রমলাঘবের সঙ্গে-সঙ্গে কয়লা-শিল্পে ব্যয়ের অঙ্কও কমিয়া আসিবে। খনি হইতে কয়লা উত্তোলনে যন্ত্রপাতির এইসমস্ত ত্রুটি ছাড়া কয়লা-চালানিরও ত্রুটি রহিয়াছে। এবিষয়ে রেল-কোম্পানীগুলির ঔদাসীন্য এবং অসহযোগিতা সম্বন্ধে ভারতীয় কলিয়ারিগুলি ক্রমাগত অভিযোগ করিয়া আসিতেছে।

কয়লা-শিল্প সম্বন্ধে আর একটা প্রয়োজনীয় বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষে এখনও এই শিল্প কতকটা কুটীর-শিল্প গোছের। এইজন্য ভারতীয় কয়লার খনিসমূহে এখনও উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রপাতির রেওয়াজ আরম্ভ হয় নাই এবং টেকনলজিক্যাল বা যন্ত্র-ঘটিত ব্যয়-সংক্ষেপও দেখা দেয় নাই। এইজন্য ভারতীয় কলিয়ারিসমূহের ম্যানেজারগণ খনি-পরিচালন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উন্নতি-বিধানে এত নারাজ। কলিয়ারি-গুলার আকার এত ছোট যে, এই সবকে ঐ সমস্ত আধুনিক কায়দায় ঢালিয়া সাজানো অসম্ভব ব্যাপার। ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ২

কোটী টন কয়লা উঠানো হয়; কিন্তু কলিয়ারির সংখ্যা ৯০০ হইতে ১০০০টী। সেইজন্য বি-ও-সি বা টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কাজ-কর্ম্মে যে আধুনিকতার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে কয়লা-শিল্পে তাহার সম্পূর্ণরূপে অভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯২৬ সন হইতে কোল গ্রেডিং বোর্ডের কাজ সুরু হইয়াছে। কোল গ্রেডিং বোর্ড, কোল কমিটি এবং টারিফ বোর্ডের সুপারিশ (১৯২৬), তথা ১৯২৯ সনে কয়লা সম্বন্ধে গবেষণা-বোর্ড গঠনের প্রস্তাবলিপি—এইসমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কয়লা-শিল্পে যান্ত্রিক যুক্তিযোগ আনয়নেরই সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতীয় কলিয়ারিগুলি এসম্বন্ধে মাথা ঘামাইলে ঐগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে, সঙ্গে-সঙ্গে ঐগুলির টিঁকিয়া থাকিবার ক্ষমতাও বাড়িয়া যাইবে।

## বিলাতী বস্ত্র-শিল্পে যুক্তিযোগের অভাব

ভারতীয় কোল কমিটির সুপারিশে ১৯৩০ সনে বিলাতী তূলা-শিল্পের জন্য গঠিত কমিটির প্রদত্ত বিবরণীর প্রতিধ্বনিই শুনা যায়। বৃটিশ কমিটি বলে—সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে অপারগ হওয়ার জন্যই বিলাতী বস্ত্র-শিল্পের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য বিলাতের কলওয়ালারা সস্তায় কাপড় বেচিতে পারিতেছে না, বাজারে মাল ছাড়ার কাজে উহাদের দক্ষতা নাই। অথচ গাদায়-গাদায় মাল বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে হইলে এই দুইটী অস্ত্র প্রয়োগ করায় বিশেষরূপে সমর্থ হওয়া চাই। কমিটির মতে মালিক এবং মজুর সকলকে সমবেতভাবে কারখানার মুরদ বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই জন্য প্রয়োজন—(১) সুতাকাটা এবং তৈরী বিভাগের যন্ত্রপাতির উন্নতি-বিধান, এবং স্থানে-স্থানে পুনর্গঠন; আর (২) বস্ত্রশিল্পের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ইউনিট বা এককগুলির আকার-বর্দ্ধন।

যন্ত্রপাতি এবং ব্যবসা-হিসাবে কয়লাশিল্পের সহিত বস্ত্রশিল্পের বিশেষ কোনো মিল নাই। বিলাতের শিল্প ভারতীয় শিল্পের মত বৃদ্ধি চিজও নয়। সুতরাং "উন্নতিবিধান", "বৃহত্তর ইউনিট বা একক" ইত্যাদি বুলি বিলাত আর ভারতে এক দরের বস্তু হইতে পারে না। তবুও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় কয়লাশিল্পের উন্নতিবিধানের আসরে বিলাতী বস্ত্রশিল্পের উপযোগী বোলচালেরই ডাক পড়িয়াছে। মজার কথা, অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভারতীয় তুলাশিল্প এবং বিলাতী কয়লাশিল্পের বেলা ঐ একই কথা বলা হইয়াছে। যুক্তিযোগ এমন বিশ্বজনীন চিজ্ যে, দেশ উন্নতই হউক আর অবনতই হউক, এবং যে-কোনো প্রকার শিল্পই হউক না কেন, উহার বুখ্নি সকল সময়ে সকল শিল্পে সমান প্রযোজ্য। শিল্প-বিপ্লবের এই নয়া মূর্ত্তি অর্থাৎ "দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব" প্রাচীন-নবীন সকল দেশে সকল প্রকার শিল্প-বাণিজ্যে একই রূপে প্রকটিত হইয়া চলিয়াছে।

## হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক কারবারে যুক্তিযোগ

তেল আর কয়লা, দুইটাই ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প। কয়লা-শিল্প বহুদিন হইতে কায়েম রহিয়াছে; কিন্তু তেল-শিল্প পূরাদম একালের চিজ। আশ্চর্য্যের বিষয়, অপেক্ষাকৃত নবীন তেল-শিল্পে যুক্তিযোগ যথারীতি প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রাচীনতর কয়লা-শিল্পে মাত্র উহার অ, আ, ক, খ সুরু হইয়াছে। হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক অর্থাৎ জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ ভারতবর্ষে আধুনিকতম ইন্ধন-শিল্প এবং শক্তি-শিল্প। এই নয়া শিল্পেও পুঁজিপাটা, যন্ত্রপাতি ও পরিচালন সম্বন্ধে অনেক নয়া তত্ত্ব মজুদ আছে। যুক্তিযোগের উপরেই হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক শিল্পের উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের মতই জলশক্তিও আত

সস্তায় সরবরাহ্ করার প্রয়োজন। উৎপাদনের খরচ যতদূর সম্ভব হ্রাস করা এবং গাদায়-গাদায় মাল তৈয়ারি আর সস্তায় মাল সরবরাহ্ করা জল শক্তির বেলায়ও মহা জরুরি। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং তাহা হইতেছে বাজার ঢুঁড়িয়া বাহির করা,—অথবা বাজার অর্থাৎ খরিদ্দারদের উপর দখল বা প্রভাব থাকা। টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানী এবং বি-ও-সি এইভাবেই সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে, এবং সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক এই দস্তুরই মানিয়া চলে। হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক শিল্পের বাজারের সন্ধান মিলিবে শহর এবং পল্লীর আলোক-সরবরাহ, কলকারখানা এবং যানবাহন-শিল্প, পয়ঃপ্রণালী-খনন ইত্যাদি কারবারে। এইসমস্ত সুবিধা না থাকিলে বা এইসমস্ত সুবিধা প্রয়োজন-মাফিক প্রচুর না হইলে, অর্থাৎ এই ধরণের বাঁধা খরিদ্দার না মিলিলে হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক শিল্প কায়েম করা সম্ভবপর হইতে পারে না। হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক শিল্প পত্তন করিবার পূর্ব্বে এই ধরণের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী মক্কেলের সহযোগিতার প্রয়োজন। হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক শিল্প পত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এমন কতকগুলি শিল্প কায়েম করা আবশ্যক অথবা হাজির থাকা চাই যাহাতে উৎপন্ন বিজলী-শক্তি সঙ্গে-সঙ্গে কাজে লাগানো যাইতে পারে।

বাই-প্রডাক্ট অর্থাৎ গৌণ মাল এবং ওয়েষ্ট অর্থাৎ ফেলিতব্য চিজ কাজে লাগানো লোহা-লক্কড় শিল্পের আনুষঙ্গিক কার্য্য। হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক শিল্পের বেলায়ও এইরূপ আনুষঙ্গিক শিল্প ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। গৌণ এবং বর্জ্জনীয় বা ফেলিতব্য চিজগুলি কাজে লাগানো এইসমস্ত আনুষঙ্গিক বা সহকারী শিল্পগুলার অন্যতম প্রধান ধান্ধা। লোহা-লক্কড় শিল্প বা হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক শিল্প এইরূপ সহকারী শিল্পনিচয়-সমন্বিত এক-একটা শিল্প-চক্রে বা শিল্প-জগতে বা শিল্প-

পরিবারে পরিণত না হইয়া পারে না। সহকারী শিল্পগুলির পরিচালন ও মূলধন, সমস্তই পৃথক হইতে পারে, বা মূল শিল্পের সহিত একত্র গ্রথিতও থাকিতে পারে, তাহাতে বিশেষ-কিছু আসে যায় না। আসল কথা হইতেছে এই যে, চক্রের অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলির মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকা চাই। ওগুলা যেন একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সস্তায় মাল-বিক্রয়ের আধুনিকতম কায়দা যে যুক্তিযোগ তাহার আসল কথা শিল্প-চক্র বা শিল্প-পরিবারের প্রতিষ্ঠা।

ভিন্ন-ভিন্ন কারখানা বা শিল্পের মধ্যে সহযোগিতা বা সমন্বয়-সাধন, মালের মূল্য হ্রাস করার পক্ষে যে কতখানি কার্য্যকর তাহা ভারতের হাইড্রো-ইলেকৃট্রিক শিল্পের মালিকগণ পূর্ব্বেই বিশেষরূপে সমঝিয়া লইয়াছেন। আসামের শিলং শহরের ছোট্ট বিজলী-কারখানাটা (১৯২৩-২৯) এইজন্যই জোর করিতে পারিতেছে না, কারণ শিলং শহরের আশেপাশে কলকারখানার ভিড় জমিয়া উঠিতে পারে নাই। সহযোগী বা সহকারী কলকারখানার মেলা বসানো চাই, নতুবা হাইড্রো-ইলেকৃট্রিক শিল্প অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এ দেশের লোকজন ইলেকৃট্রিকের কদর এখনও বুঝিতে পারে নাই, আবার হাইড্রো-ইলেকৃট্রিক শিল্পের মালিকদের পয়সারও জোর নাই যে তাহারা নিজেরাই আনুষঙ্গিক শিল্পগুলি কায়েম করিয়া লইবে।

বোম্বাই অঞ্চলে কিন্তু অন্যরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বোম্বাই-বাসীরা এবিষয়ে সত্য-সত্যই অগ্রগামী। তাহারা হাইড্রোইলেকৃট্রিক শিল্পে যুক্তিযোগ কায়েম করিয়া উহার পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিতেছে। লোনাওলার আদিম হাইড্রোইলেকৃট্রিক মোসাবিদায় (১৯১০) মাত্র ৩০,০০০ "ঘোড়ার জোর" বা অশ্বশক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় কাপড়ের কলগুলির চাহিদা সরবরাহ করার জন্য

(১৯১১-১৩) ইহার কার্য্যকারিতা ৪০,০০০ অশ্বশক্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে হয়। কিন্তু মাত্র ৪০,০০০ অশ্বশক্তি দ্বারা বোম্বাইয়ের বিজলী-ক্ষুধা মিটে নাই। কাপড়ের কলগুলার দেখাদেখি ময়দার কলগুলাও বিদ্যুৎ কাজে লাগাইয়াছে। তাছাড়া, বোম্বে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই অ্যাণ্ড ট্রাম কোম্পানী লিমিটেড, গ্রেট্‌ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ের হারবার ব্র্যাঞ্চ এবং বোম্বে-কল্যাণ শাখা রেলপথ এই হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক প্রতিষ্ঠান হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রহণ করিতেছে। এর ফলে ১৯১৫ সনে প্রথম কারখানা পত্তন করার পর আর তিন-তিনটী মোসাবিদা (১৯১৬, ১৯১৯, ১৯২৮) সত্বর কাজে পরিণত করিতে হইয়াছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ মোসাবিদার কাজ শেষ হইলে মোট ১৪০,০০০ অশ্বশক্তি যোগান দেওয়া চলিবে। কেবলমাত্র বোম্বাই অঞ্চলের কলকারখানা এবং যানবাহন-শিল্পগুলির চাহিদা সরবরাহের দিকে নজর রাখিয়াই এইসমস্ত বড়-বড় মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করা হয় নাই। কর্ম্মকর্ত্তাদের মতলব আরও দূর-প্রসারী। বোম্বাই অঞ্চলের শিল্পবহুলতা আরও বেশী বর্দ্ধিত কবিরার জন্য নূতন-নূতন শিল্প কায়েম করার দিকেও তাহাদের নজর পড়িয়াছে। হাইড্রোইলেকট্রিক কোম্পানীগুলা নিজেরাই কতকগুলি শিল্প পত্তন করিবার অভিলাষী। এইসমস্ত শিল্প অবশ্য বিজলী-রাসায়নিক ধরণের হইবে। কোনো-কোনো জনপদে নানা-প্রকার শিল্প আসিয়া জুটে। এইরূপ জনপদগত বা জনপদে কেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থা বিজলী-শিল্পের প্রভাবে বোম্বাই অঞ্চলে বেশ জমিয়া উঠিতেছে।

যুক্তিযোগের ফলে কতকগুলি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত শিল্পের সঙ্ঘ বা সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই অঞ্চলের হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক শিল্প-প্রচেষ্টায় যুক্তিযোগের এই মূর্ত্তি বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দুইটী কারণে বোম্বাই অঞ্চলে এইরূপ যুক্তিযোগ সম্ভবপর হইয়াছে। প্রথম কারণটী প্রাকৃতিক অর্থাৎ ভৌগোলিক; দ্বিতীয়টী পুঁজিওয়ালাদের নিবিড় সহযোগিতা। ২নং এবং ৩নং হাইড্রো-ইলেকৃট্রিক মোসাবিদা ১নংএরই বিস্তার-সাধন ছাড়া আর কিছুই নহে। এই ভৌগোলিক কারণবশতঃ বেশ-কিছু যান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ এবং যথেষ্ট ব্যয়-লাঘব হইয়াছে। আবার টাটা সন্স লিমিটেড্ এই চার-চারটী মোসাবিদার মালিক হওয়ার জন্য কম স্থবিধা হয় নাই। টাটা সন্স এই ব্যাপারে মোট ২২,২০,০০,০০০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়াছে। ১৯২৯ সনে ইহার সহিত আবার মার্কিণ পুঁজির সমন্বয় সাধিত হওয়ায় বোম্বাইয়ের হাইড্রোইলেকৃট্রিক শিল্প যান্ত্রিক ও আর্থিক একক হিসাবে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি করিতেছে।

## রাসায়নিক কারবারে যুক্তিযোগের অভাব

অনেকগুলি সহকারী এবং পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত শিল্পের সমন্বয়বশতঃ বোম্বাই অঞ্চলের হাইড্রোইলেকৃট্রিক শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইতেছে। যুক্তিযোগই ইহার মূলীভূত কারণ। এই যুক্তিযোগের অভাববশতঃ ভারতের কেমিক্যাল শিল্প মোটেই মাথা তুলিতে পারিতেছে না এবং দুনিয়ার বাজারে উহা হেয় এবং অবজ্ঞাত হইয়াই রহিয়াছে। অন্যান্য শিল্পের সহিত ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পকেও একই পথের পথিক হইতে হইবে। ভারতীয় কেমিক্যাল শিল্পকেও দুনিয়ার বাজারে প্রতি-যোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে হইবে। দুনিয়ার বাজারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে যৎপরোনাস্তি কম মূল্যে মাল ছাড়া আবশ্যক। এর জন্য হাইড্রোইলেকৃট্রিক শিল্পের মত বা লোহা-লক্কড় শিল্পের মত রাসায়নিক শিল্পেরও একটী পরিবার বা গোষ্ঠি গড়িয়া তোলা চাই।

এমন অঞ্চল ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে যেখানে এইরূপ একটা কেমিক্যাল শিল্প-সঙ্ঘ বা শিল্প-পরিবার কায়েম হইতে পারে। সুতরাং কেবলমাত্র দু-একটা কেমিক্যাল শিল্প কায়েম করিলেই চলিবে না। সঙ্গে-সঙ্গে ফেলিতব্য এবং গৌণ চিজগুলা হইতেও যাহাতে আরও পাঁচ-দশটা শিল্প গজাইয়া উঠিতে পারে সেদিকেও নজর দিতে হইবে। চাই বিরাট শিল্প-প্রচেষ্টা যাহার আয়োজনে মূল-শিল্পের সঙ্গে-সঙ্গে বাইপ্রডাক্ট, আধাআধি তৈরী মাল ইত্যাদির সদ্ব্যবহার ঘটিতে পারে। তাহা যদি সম্ভবপর না হয় তবে কতকগুলি পৃথক-পৃথক কোম্পানী গঠন করিয়া ঐগুলির সুরাহা করা আবশ্যক। তবে কথা এই যে, এই বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা নিবিড় সহযোগ থাকা চাই। মোট কথা লোহা-লক্কড় চক্রের মত কেমিক্যাল কম্প্লেক্স্ বা রাসায়নিক চক্র কায়েম করা চাই। ইতালির তুরিণ শহরের ইতালগাজ কেমিক্যাল শিল্পসঙ্ঘ একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। আল্‌গা-আলগা ভাবে কতকগুলা রাসায়নিক শিল্প কায়েম করিতে গেলে সে-সব পটল তুলিতে বাধ্য।

ভারতের তৈল-শিল্প এখনও আদিম অবস্থায় রহিয়াছে। এই শিল্পের উন্নতি আজ পর্য্যন্ত বিশেষ-কিছু হয় নাই। যুক্তিযোগ অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পের সমন্বয়সাধন ব্যাপারে ভারতের তৈল-শিল্প বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারত হইতে তৈলবীজ বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। রপ্তানি হওয়াও উচিত, যেহেতু মূল তৈল-শিল্পের সহকারী শিল্পাদি আদৌ গজাইয়া উঠে নাই। সুতরাং স্বদেশ-প্রেমের খাতিরে তৈলবীজের রপ্তানি বন্ধ করার বাস্তবিকই যুক্তিযুক্ত কোনো কারণ দেখা যায় না। ভারতীয় তৈল-শিল্পে যুক্তিযোগ কায়েম করিতে হইলে তৈল-চক্রের অন্তর্ভুক্ত শিল্পসমূহ সঙ্গে-সঙ্গে কায়েম করার দরকার। প্রথমতঃ আধুনিকতম উপায়ে বীজ হইতে তেল নিষ্কাশন করা চাই।

তেল বাহির এবং পরিষ্কার করিবার সময় যে খইল উদ্ভূত হইবে তাহা হইতে সার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তেলও একপ্রকার কুদরতী মাল-বিশেষ, সুতরাং তেল হইতে যেসমস্ত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহাও প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে; অর্থাৎ ভেজিটেব্‌ল বা উদ্ভিজ্জ ঘী এবং অন্যান্য প্রকার তৈলে প্রস্তুত আহার্য্য দ্রব্য তৈরীর কারখানা কায়েম করার প্রয়োজন। মোমবাতি আর একটী সহকারী শিল্পে পরিণত হইতে পারে। নানাপ্রকার রং, বার্ণিশ ইত্যাদিও এই একই শিল্প-চক্রের অন্তর্ভুক্ত। শেষ পর্য্যন্ত সাবান-শিল্পও এই পরিবারের কোঠায় আসে। সাবান-শিল্পে সফলকাম হইতে হইলে গোটা তৈল-শিল্পে যুক্তিযোগ কায়েম হওয়া চাই। অর্থাৎ তৈল-শিল্পের সহিত সমস্ত সহকারী শিল্পকে তালে-তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে। এইসমস্ত শিল্প যদি ফেল মারে বা ঐগুলি আংশিক সাফল্য অর্জ্জন করে সাবান-শিল্পের বেলাও ঠিক তেমনি ঘটিবে, ভিন্ন-ভিন্ন শাখা-শিল্পের ভাগ্যসূত্র ঠিক এমনি ভাবে গ্রথিত। কেমিক্যাল শিল্পগুলি বাস্তবিকই পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ১৯১৯ সনে ইণ্ডিয়ান মিউনিশন বোর্ড হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ বাহির হইবার পর হইতে কেমিক্যাল শিল্পের নয়ামূর্ত্তি ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের ধুরন্ধরদিগের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাসায়নিক শিল্পে যুক্তিযোগের ব্যবস্থা এখনও বেশ দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতেছে।

সোডা হইতে ভিন্ন ভিন্ন মিশ্র দ্রব্য প্রস্তুতকরণ আর একটি বড়-গোছের রাসায়নিক শিল্প। এই শিল্পেও আজ পর্য্যন্ত যুক্তিযোগ কায়েম করা হয় নাই। ১৯২৭-২৮ সনে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কেমিক্যাল দ্রব্য আমদানি হয় তাহার ৪২% সোডা-জাতীয় এবং ইহার দাম ১,১২,০০,০০০ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে সোডা-মিশ্রণ অর্থাৎ

কম্পাউণ্ড তৈরী ভারতবর্ষের একটা মূল্যবান শিল্পে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানি করা সোডা-কম্পাউণ্ডের সঙ্গে টক্কর দিতে হইলে ভারতীয় কারখানার মালিকদিগকে সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন, ক্লোরিণ, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি চিজও তৈরী করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সবকয়টা কেমিক্যাল দ্রব্যকে একই দলের বাইপ্রডাক্ট বা সহকারী বা বন্ধু সমঝিবার প্রয়োজন। সস্তায় কেমিক্যাল মাল বিক্রয় করিবার জন্য এইসমস্ত একজাতীয় কেমিক্যাল শিল্পের পারস্পরিক যোগাযোগ কায়েম করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কেমিক্যাল-শিল্প-দুনিয়ায় কুটীর-শিল্পের ঠাঁই একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ইহা একটা নির্ম্মম জবরদস্ত সত্য। লড়াইয়ের সময় বা তাহার পর হইতে ভারতবর্ষে কয়েকটি কেমিক্যাল কারখানা বেশ-একটু উন্নতি করিয়াছে বটে। কিন্তু সহকারী শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বা সম্বন্ধস্থাপনের অভাবহেতু ঐগুলা মোটেই মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

উদ্ভিজ্জ এবং খনিজ এই উভয় প্রকার কেমিক্যাল শিল্পের উপযোগী কুদরতী মাল ভারতবর্ষের অঞ্চলে-অঞ্চলে বহুৎ জমা রহিয়াছে। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে কেমিক্যাল-শিল্পের উপযোগী শ্রমিক এবং এঞ্জিনীয়ারও অনেক তৈরী হইয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখি যে, ইয়োরোপে এবং ভারতবর্ষেও, অধিকাংশ লোকেরই ধারণা যে,—ইয়োরামেরিকার রাসায়নিক দ্রব্য এবং ঔষধ-তৈরীর কারখানায় মোতায়েন শাদা চামড়ার কর্ম্মী, বিশেষজ্ঞ এবং এঞ্জিনীয়ারগণ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেকনলজিক্যাল কলেজের পাশ-করা যুবকদের চেয়ে ঢের বেশী ওস্তাদ। কিন্তু এ ধারণা অনেকটা কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত খেয়াল মাত্র। রসায়ন এবং এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার ভারতীয় গ্র্যাজুয়েটগণ কলকারখানা এবং গবেষণা-মন্দির পরিচালনের সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। তবে এখনও কিছু-

দিন হয়ত ভারতীয় গ্র্যাজুয়েটদের পক্ষে ইয়োরামেরিকা এবং জাপানের বড়-বড় কলকারখানার অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট ডিরেক্টারদের নির্দ্দেশ মানিয়া চলা আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন, কেমিক্যাল শিল্পে যুক্তিযোগ আনয়নের ব্যবস্থা করার। টাটা কোম্পানী যেভাবে আপন পুঁজিপাট্টার সদ্ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে তাহা হইতেই ভারতীয় কেমিক্যাল শিল্পীদের পক্ষে যথেষ্ট নজীর মিলিবে।

ব্যয়-সংক্ষেপ, প্রতিযোগিতা-মাফিক পণ্য দ্রব্যের মূল্য-ব্যবস্থা এবং সমগ্র দুনিয়ার বাজারে মাল বিক্রয় সম্বন্ধে,—সহকারী শিল্পসমূহ গড়িয়া তোলা যে কতখানি প্রয়োজনীয় তাহা টাটা সন্স লিমিটেড্ বিশেষরূপ সমঝিয়া লইয়াছে। একমাত্র হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক প্রচেষ্টার বেলাতেই যে তাহাদের এই ব্যবসা-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে। অন্যান্য শিল্প-প্রচেষ্টায়ও দেখা যাইতেছে যে, তাহারা নিজেরাই নানারূপ নয়া-নয়া শিল্প কায়েম করিয়া নিজেদের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া চলিতেছে। আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা একটা বিপুল এঞ্জিনীয়ারিং এবং মেকানিক্যাল শিল্পের দুনিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রয়াসী। তাহাদের নিজের এলাকার ভিতর বহু এঞ্জিনীয়ারিং কারখানা কায়েম হইয়াছে যেখানে টাটা কোম্পানীর ইস্পাত কুদরতী মালরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এইসমস্ত এঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় টাটা সন্সই মুখ্যতঃ কি গৌণভাবে মূলধন যোগাইতেছে। জামশেদপুর অঞ্চলে সহকারী শিল্পাদি স্থাপন সম্পর্কে আর একটী ঘটনা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করার প্রয়োজন। টাটা-চক্র বি-ও-সির সহযোগিতায় টিনপ্লেটের ফ্যাক্‌টরি কায়েম করিয়াছে। সমসাময়িক আর্থিক দুনিয়ায় ভিন্ন-ভিন্ন জাতি এবং দেশের মধ্যেও শিল্প-বাণিজ্যের সহযোগিতা স্থাপন অন্যতম দস্তুর। ভারতীয় টাটা-চক্র

এবং অভারতীয় বি-ও-সি ট্রাষ্টের মধ্যে সহযোগিতায় আমরা ভারত-ভূমিতেও আন্তর্জ্জাতিক যুক্তিযোগের এই নয়ামূর্ত্তির সন্ধান পাইতেছি।

## চাষ-আবাদে যুক্তিযোগের নমুনা

কৃষিকার্য্যেও যে যুক্তিযোগ সম্ভবপর, তাহা প্রেসিডেণ্ট হুভার ১৯২৯ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ফেডার্যাল ফার্ম্মবোর্ড স্থাপন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। চাষ-আবাদের আয়তন-বৃদ্ধি বা হ্রাস, উহাতে আবশ্যক মত পুঁজি ঢালিবার ব্যবস্থা, শস্যের জন্য গুদাম-প্রতিষ্ঠা, এবং সুযোগ মত বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া কৃষিকার্য্যে বাস্তবিকই যুগান্তর আনয়ন করা চলে। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এইসকল কাজের জন্য বোর্ডের হাতে ৫০০,০০০,০০০ ডলার ন্যস্ত করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কৃষিকার্য্যের উপর জাতীয় ধনসম্পদ্ অনেকখানি নির্ভর করে। মার্কিণ রাষ্ট্রে ব্যাঙ্ক এবং কারেন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত ফেডার্যাল রিজার্ভ বোর্ডকে যে চোখে দেখা হয়, ফেডারেল ফার্ম্ম বোর্ডকেও ঠিক সেই চোখেই দেখা হইতেছে।

কৃষিকার্য্যে যুক্তিযোগ ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে অজ্ঞাত বস্তু নয়। কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ অন্যান্য দেশের মত ভারতেও সমবায়-ঋণদান সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমবায়-সমিতিগুলি অল্পদিনের মেয়াদে অপেক্ষাকৃত নিম্ন সুদে ঋণদান করিয়া কৃষকদিগকে সুদখোর মহাজনদের কবল হইতে কিছু-কিছু মুক্ত করিতেছে। ১৯০৪ সনের কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটীজ্ অ্যাক্ট অর্থাৎ সমবায় ঋণদান সমিতি বিষয়ক আইনকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া ১৯১২ সনে নূতন কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীজ্ অ্যাক্ট জারি করা হইয়াছে। ১৯০৪ সনের আইনে কৃষকদিগকে কেবলমাত্র ঋণদান করার ব্যবস্থা ছিল; ১৯১২ সনের আইনে কৃষকদিগকে ভূমিকর্ষণ, জিনিষপত্র খরিদ

এবং বিক্রয় করিবার স্থবিধা প্রদান করার জন্তও ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯১২ সনের ব্যবস্থা কৃষিকার্য্যে আংশিকভাবে যুক্তিযোগ আনয়ন করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করা সম্বন্ধেও ভারতবর্ষে যুক্তিযোগের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯১৭ সনে সাময়িক আইনরূপে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একটী কেন্দ্রীয় তূলাসমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিটী পরে দুইটী আধা-সরকারী সমিতিতে বিভক্ত হইয়াছে। সমিতি দুইটী দুনিয়ার তূলা-ব্যবসায় এবং তূলাশিল্পে আশ্চর্য্যজনক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রথম সমিতিটী ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটী অর্থাৎ ভারতের কেন্দ্রীয় তূলা কমিটীরূপে খ্যাত। ভারত-গবর্ণমেণ্টের কৃষি-পরামর্শদাতা তাহার চেয়ারম্যানগিরি করিয়া থাকেন। দুষ্টলোকে নানাপ্রকার ভেজালদ্রব্য মিশ্রণ করিয়া বিদেশের বাজারে যাহাতে ভারতীয় তূলার ইজ্জৎ নষ্ট না করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করাই কমিটির প্রধান ধান্ধা। তূলার চাষবৃদ্ধি এবং উন্নত শ্রেণীর তূলার প্রবর্ত্তনও কমিটির অন্যতম কাজ। কমিটি বোম্বাইস্থ আপন টেকনলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে যন্ত্র বসাইয়া স্থতা কাটার উন্নতি বিধানের জন্তও গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইন্দোরের ইনষ্টিটিউট্ অব্ প্ল্যাণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রি নামক প্রতিষ্ঠানকে কমিটি মোটা অর্থ যোগাইয়া থাকে। তূলা-গবেষকদিগকে অর্থ-সাহায্য-প্রদানের সঙ্গে-সঙ্গে তূলার আবাদের উন্নতিবিধানের জন্তও কমিটি চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তূলা-সম্পর্কীয় এইসমস্ত প্রচারকার্য্যের ব্যয় সরকারী তহবিল হইতেই বহন করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই জন্ত ১৯২৩ সনে কটনসেস্ অ্যাক্ট জারি করিয়াছে।

দ্বিতীয় সমিতিটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন অ্যাসোসিয়েশান রূপে স্থপরিচিত। গবর্ণমেণ্ট ১৯২২ সনে একটী বিশেষ আইনের বলে এইটী

প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রথম সমিতিটীর মত ইহা তত দূরপ্রসারী নয়। দুই নম্বর সমিতির লক্ষ্য কেবলমাত্র তুলা-ব্যবসার দিকে। মহা-যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং উহার প্রথম-প্রথম বোম্বাইয়ের তুলা-ব্যবসা ন্যস্ত ছিল অনেকগুলি স্ব-স্ব-প্রধান স্বাধীন ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের হাতে। সঙ্ঘ-গুলির মধ্যে আদৌ মিতালী ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কটন অ্যাসোসিয়েশান এইসমস্ত যুযুধান সঙ্ঘগুলি ভাঙিয়া দিয়া বা উহা-দিগকে একত্র করিয়া একটা বিরাট কেন্দ্রীয় তুলা ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের পত্তন করিয়াছে। এই অ্যাসোসিয়েশানের অধীনে একটা নিয়মিত তুলার বাজার (কটন একস্‌চেঞ্জ) স্থাপিত হইয়াছে। গুণানুসারে তুলার জাতি-গোত্র নির্ণয় করাও সমিতির আর একটী প্রধান ধান্ধা। সমিতিটী ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম সুশৃঙ্খলার সহিত এবং নিয়মিতভাবে তুলা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে।

যুক্তিযোগ ক্রমে-ক্রমে সকলের দৃষ্টিই আকর্ষণ করিতেছে। তুলার বেলায় যুক্তিযোগের সাফল্য পরিদর্শন করিয়া বাংলার পাট-ব্যবসায় যুক্তিযোগ কায়েম করিবার জন্য অনুরূপ চেষ্টা-চরিত্র চলিতেছে। ১৯২৯ সন হইতে গবর্ণমেণ্ট এই জন্য বিশেষরূপে মাথা খেলাইতেছে।

## ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় যুক্তিযোগ

বিগত মহালড়াই (১৯১৪-১৮) যুক্তিযোগ সম্বন্ধে ইয়োরামেরিকা এবং জাপানের মত ভারতবর্ষেরও চোখ ফুটাইয়াছে। মহাযুদ্ধ অন্যান্য শিল্প-ব্যবসার মত ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ও ভারতবর্ষে যুক্তিযোগের ইন্ধন যোগাইয়াছে। ১৮৭৬ সনের আইনে বাংলা, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে তিন-তিনটী প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্ক তিনটীর কাহারও সহিত কাহারও কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এবং এইগুলি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোনো ধার ধারিত না। মহাযুদ্ধ যেমন একদিকে ব্যাঙ্কগুলির

পারস্পরিক নির্ভরতা বাড়াইয়াছে তেমনি অপর পক্ষে ঐগুলিকে সরকারী তহবিলের সহিত নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত করিয়াও ছাড়িয়াছে। সিক্কার বাজারের চাপে এবং পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থায় বাধ্য হইয়া জার্ম্মাণি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বিলাত এবং জাপানের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কগুলি যেরূপ একত্র মিলিত এবং কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ভারতবর্ষেও আংশিকভাবে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২০ সনে তিনটা প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের স্থানে একটা ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা এশিয়ায় যুক্তিযোগ-আন্দোলনের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিবে।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত সরকারী তহবিলের যোগাযোগ থাকিলেও উহা ইশু-ব্যাঙ্ক নয়; অথচ ইয়োরামেরিকার বিশেষজ্ঞ মহলে পর্য্যন্ত ধারণা, এই যে, ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক একটী পহেলা নম্বরের ইশু ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কটী নোট-ব্যাঙ্ক নহে। সাধারণ বেসরকারী ব্যাঙ্কের মত ইহাও মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্জ্জ প্রদানের প্রতিষ্ঠান। তিনটী ব্যাঙ্কের একত্রে মিলনে ইহা গঠিত। অতএব এই মিলন-ব্যাঙ্ক ব্যবসা-ক্ষেত্রে সাধারণ যুক্তিযোগের নিদর্শন মাত্র। ইহা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান বটে। কিন্তু যুদ্ধের পরে বে-সরকারীসেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্ যেভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক প্রায় সেই-রূপেই কেন্দ্রীকৃত। ১৯১৮ সনে টাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। ঐ ব্যাঙ্কের ভিত্তিমূলের উপরেই ১৯৩২ সনে সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক গজাইয়া উঠিয়াছে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া পূরাপূরি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাঙ্কটী যুক্তিযোগের দৃষ্টান্ত দেশবাসীর চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেও, দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ব্যাঙ্কারগণ আদৌ উহার সুবিধা গ্রহণ করে নাই। বাংলায় প্রায় ৮০০টী লোন অফিস

আছে। ইতালি দেশে ১৯২৬ সনে কারেন্সি-সংশোধক আইন জারি করিয়া এই ধরণের ৪৩৫টী কুটীর-ব্যাঙ্ককে হয় কারবার গুটাইতে অথবা একত্র মিলিত হইতে বাধ্য করা হয়। বাংলাতেও এইরূপ ব্যবস্থা কায়েম হইবার আশু প্রয়োজন। ভারতীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির অনুসন্ধান ( ১৯২৯-৩১ ) এবং নানাপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা হইতে এইরূপ কেন্দ্রীকরণের পাঁতিই পাওয়া যায়। অদূর ভবিষ্যতে ছোট-ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে ঢালিয়া সাজাইয়া কতকগুলি বাঘা-বাঘা ব্যাঙ্কের পত্তন করা দেশের পুঁজিপাট্টা সম্বন্ধে যুক্তিযোগ কায়েমের দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারিবে আশা করা যায়। ১৯২৬ সন হইতে বর্ত্তমান লেখক সর্ব্বদাই এইরূপ কেন্দ্রীকরণের পরামর্শ দিয়া আসিতেছেন।

## বণিকসঙ্ঘের যুক্তিযোগ

ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন চেম্বার অব্ কমার্স অর্থাৎ বণিক-সভার মধ্যে ফেডারালিজেশানের চেষ্টা যুক্তিযোগ প্রচেষ্টার শেষ উদাহরণরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। অ্যাসোসিয়েটেড্ চেম্বার্স অব্ কমার্স অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড সিলোনের নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় কিংবা প্রধানতঃ ইয়োরোপীয় বাণিজ্য-সভাগুলির সমবেত স্বার্থরক্ষা এই কেন্দ্রীয় সভার প্রধান ধান্ধা। ১৯২৭ সনে প্রধানতঃ ভারতীয় বণিক-সভাগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য "অ্যাসোসিয়েটেড্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স" নামে আর একটি কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-সভা গঠিত হইয়াছে। লড়াইয়ের পরে ১৯১৯ সনে প্রতিষ্ঠিত প্যারিস শহরস্থ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স এবং অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দেখাদেখি ভারতীয় চেম্বারগুলির মনে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার ধারণা বদ্ধমূল হয়। অ্যাসোসিয়েটেড্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার

ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে যুক্তিযোগের অগ্রদূতরূপেই আজ খাড়া রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই প্রবন্ধের "যুক্তিযোগ" সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে লেখকের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থের প্রথম ভাগে ( ১৯৩০ ) শিল্পবাণিজ্যের কার্টেল ও ট্রাষ্ট অধ্যায়ে ( ২৫৩-৩০৩ পৃষ্ঠা )।

# দেশ-বিদেশের জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধির হার*

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

এই প্রবন্ধ বিনয়বাবুর "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) গ্রন্থের ৩৫০-৪৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয় বাবু রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক লোকবিদ্যা-কংগ্রেসের অন্যতম প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সেই কংগ্রেসের জন্য তিনি ইতালিয়ান ভাষায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। কংগ্রেসের গ্রন্থাবলীর ভিতর তাহা নয়টা চিত্র-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। বিনয়বাবু ইতালিয়ান রচনার ইংরেজি সংস্করণ ১৯৩২ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলনে পাঠ করেন।

ইংরেজি রচনাটা জার্ণাল অব্ দি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৩২ মে)। পরে তাহা হইতে "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা হয় (১৯৩৩-১৯৩৪)। প্রবন্ধের ভিতর যেসকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার সূচীপত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম অধ্যায়,—১৯২২-২৬ সনের জন্ম-হার, ১৯২৭ সনের আন্তর্জ্জাতিক জন্মহার, জলবায়ু ও জন্মহার, জন্মহারে "জাতি"-তত্ত্ব, রাজনীতি ও জন্মহার, একালের নিম্ন জন্মহার, জন্মহারের সমাজ-তত্ত্ব, জন্মহারের গতি-ভঙ্গী, জন্মহারের উঠানামায় দেশ-বিদেশের ইতিহাস (১৮২৯-৭১-১৯২৮), তুলনা-মূলক জন্মহারের "সাম্য-সম্বন্ধ", পৃথিবীব্যাপী ক্ষয়িষ্ণু জন্মহার।

---

* "আর্থিক উন্নতি" ১৩৪০, ১৩৪১ (১৯৩৩, ১৯৩৪)।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ভারতে মৃত্যুহার, নানা জাতির মৃত্যুহার ও আর্থিক কর্ম্মপটুত্বের সাম্যসম্বন্ধ, মৃত্যুহারের ঘাটতি, আন্তর্জ্জাতিক মৃত্যুরেখা, আন্তর্জ্জাতিক মৃত্যুহারে ভারতের স্থান, জাতিসমূহের শিশুমৃত্যু, শিশুমৃত্যুর ইতিহাস, শিশু-মৃত্যুহারে উন্নতি-অবনতির মাপ।

তৃতীয় অধ্যায়—দুনিয়ার মাপে ভারতের লোকবৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার "অতি-বৃদ্ধি", জন্মবৃদ্ধির হারের সাম্য বনাম আর্থিক সম্পদের সাম্য, বৃদ্ধিহারের তুলনা।

চতুর্থ অধ্যায়—ভারতের জন্য কিরূপ লোক-সংখ্যা নীতি চাই।

—সম্পাদক

# অটাওয়া-সম্মেলনের শুল্ক-তত্ত্ব*

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

অটাওয়া-সম্মেলনের চুক্তিমাফিক ভারতেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে পারস্পরিক পক্ষপাতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার প্রভাবে ইংরেজরা তাহাদের বাজারে বিদেশী মালের উপর যে-হারে আমদানি-শুল্ক বসাইয়া থাকে, তাহার চেয়ে কম হারে বাঙালীর এবং অন্যান্য ভারতবাসীর পাঠানো মালের উপর আমদানি-শুল্ক বসাইতেছে। এই ব্যবস্থায় বিলাতে বাঙালীর মালের কাটতি বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। বিলাতে এইরূপ পক্ষপাত না পাইলে বাঙালী চাষীর ক্ষতি হইত। বিশ্বব্যাপী আর্থিক দুর্যোগ খানিকটা কাটিয়া গেলে বাঙালী চাষীর সম্পদ্‌বৃদ্ধির নতুন-নতুন লক্ষণ চোখে পড়িবে। ১৯৪০ সনের সম-সম কালে এই কথার ইজ্জৎ মালুম হইবে।

আমাদের দেশে অটাওয়া চুক্তি সম্পর্কে নানা প্রকার আলোচনা চলিয়াছে। এইসকল আলোচনার অধিকাংশ রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্য প্রকারে পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট। কেবল অর্থনৈতিক ন্যায়ের বাটখারায় অটাওয়া চুক্তিকে মাপিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখানে নিছক অর্থনীতির তরফ হইতে দু'-একটা বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, বিদেশী মালের ক্রেতা হিসাবে অর্থাৎ আমদানি-কারক হিসাবে ভারতবাসীর ক্ষতি হইবে কি? দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে ভারতীয় মালের রপ্তানির তরফ্‌ হইতে ভারতের ক্ষতি হইবে কি?

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেঙ্গল ইকনমিক সোসাইটির অধিবেশনে (১৯৩২, ১৭ নবেম্বর) প্রদত্ত বক্তৃতার কিয়দংশের সারমর্ম। "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত, কার্ত্তিক ১৩৩৯ (অক্টোবর ১৯৩২)।

আমার মতে কোন তরফেই ভারতবাসীর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।*

## আমদানি-বাণিজ্যের লাভালাভ

প্রথমতঃ, আমদানির কথা। ভারতবাসীকে কতকগুলা জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। আগেও হইত, এখনও হইতেছে, ভবিষ্যতেও হইবে। এই বিদেশী মালগুলার ভিতর এক অংশ বিলাতী, অপর অংশ বিলাতী নয়—যথা জাপানী, আমেরিকান, জার্ম্মাণ, বেলজিয়ান, ফরাসী, ইত্যাদি। যেসকল অ-বিলাতী কিন্তু বিদেশী মালের উপর এতদিন শুল্ক চাপানো ছিল, সেইসকল মালের উপর ভবিষ্যতেও শুল্ক চাপানো থাকিবে। বরং শুল্কের হার কিছু বাড়ানো হইল। আর, যে-সকল বিলাতী মালের উপর শুল্ক চাপানো ছিল, সেইসকল মালের উপরও শুল্ক থাকিবে। বিলাতী মালকে শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়া হইবে না। তবে, এতদিন বিলাতী মালের উপর যে হারে শুল্ক ছিল, ভবিষ্যতে তাহা হইতে কিছু কম হারে হইবে। ফলতঃ, দেখিতে পাইব যে, ভারতীয় বাজারে বিলাতী মালের সঙ্গে টক্কর চলিবে অ-বিলাতী মালের। ইহাতে স্বদেশী মালের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। কেননা, আগেই ধরিয়া লইয়াছি যে, বিদেশী মাল আরও বেশ কিছুকাল ধরিয়া, বস্তুতঃ চিরকালই ভারতে আমদানি হইবে। সুতরাং, বিলাতী জিনিষের সঙ্গে অ-বিলাতী জিনিষের প্রবল লড়াই দেখা দিবে। ইহাতে ক্ষতি যদি কাহারও হয় তাহা হইলে অ-বিলাতী মালেরই হইবার সম্ভাবনা। কেননা, পক্ষপাত-মূলক শুল্কের সাহায্যে বিলাতী মাল অল্প দরে ভারতের বাজারে প্রবেশ করিতে পারিবে।

* বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্স ভিজ্-আ-ভি ওয়ার্লড-ইকনমি" (১৯৩৪) গ্রন্থে এই সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে।

এই টক্করে বেশী হারে শুল্ক দিয়া যে সব অ-বিলাতী মাল ভারতীয় বাজারে ঢুকিবে তাহাদের অবস্থা কথঞ্চিৎ কাহিল হইবারই কথা। কোনো এক বাজারে এক রকম জিনিষের জন্য দুই প্রকার দাম থাকিতে পারেনা। সস্তা দামের বিলাতী মালের প্রভাবে ভারতের বাজারে সকল প্রকার বিদেশী মালের দাম নির্দ্ধারিত হইতে থাকিবে। অতএব, খরিদ্দার হিসাবে ভারতবাসীকে বেশী দাম দিতে হইবে না। অপর দিকে অ-বিলাতী মালকে সরাইয়া বিলাতী মাল ভারতের বাজারে খানিকটা জাঁকিয়া বসিবে। অর্থাৎ আমাদের আমদানি-বাণিজ্যের উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইব। জাপানী, জার্ম্মাণ, মার্কিণ মালের ঠাঁইয়ে বিলাতী মাল আত্মপ্রকাশ করিবে। মোটের উপর, হয়তো যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় বাজারে অ-বিলাতী মালের সঙ্গে বিলাতী মালের অনুপাত যেরূপ ছিল, আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর প্রায় সেইরূপ অথবা তাহার কাছাকাছি কোনো অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

## রপ্তানি-বাণিজ্যের লাভালাভ

এইবার রপ্তানির কথা। অটাওয়া চুক্তিতে এমন কোনো কথা নাই যাহার দরুণ ভারতবাসীরা বিলাত ছাড়া অন্যদেশে মাল রপ্তানি করিতে পারিবে না। ভারতবাসীর জাপানী বাজার, মার্কিণ বাজার সবই যথাপূর্ব্বং তথাপরং থাকিবারই কথা। নতুন কথা এই যে, বিলাতে মাল চালান করিলে ভারতবাসীরা ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে খানিকটা "পক্ষপাত" পাইবে। কথাটা তলাইয়া বোঝা আবশ্যক। বিলাতী গভর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানি-করা বহুসংখ্যক মালের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপাইয়াছে। এই বৎসর (১৯৩২) মে মাসে যে আমদানি-শুল্ক জারি হইয়াছে তাহা বিলাতী বাণিজ্য-শাসনে এক

যুগান্তর-বিশেষ। এই চড়া হারে শুল্ক দিয়া ভারতীয় মালকে বিলাতী বাজারে প্রবেশ করিতে হইবে। এই অবস্থায় বিলাতী গভর্ণমেণ্ট বলিতেছে,—"ভারতীয় মাল, তুমি যদি আমাদের বাজারে আসিতে চাও তাহা হইলে চীনা, জাপানী, ব্রাজিলিয়ান, মেক্সিকান, আমেরিকান ইত্যাদি অন্যান্য বিদেশী মালের উপর যে-হারে শুল্ক বসাই, তাহার চেয়ে কম হারে তোমার উপর শুল্ক বসাইব।" এইরকম পক্ষপাত বিলাতী গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছোট-বড়-মাঝারি গোটা চল্লিশেক 'কলোনি' বা উপনিবেশকেও দান করিয়াছে। ভারতে যে-ধরণের মাল তৈয়ারী হয়, তাহার অনেকগুলাই এইসকল উপনিবেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধিকন্তু সরকারী সাহায্য পাইলে অল্প কয়েক বৎসরের ভিতরই এই ধরণের আরও মাল এইসকল কলোনিতে বিস্তর উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। কলোনিগুলিতে প্রায় পাঁচ কোটী নরনারীর বাস। দেখা যাইতেছে যে, কলোনিগুলা যদি বিলাতী বাজারে 'পক্ষপাত' পায় আর ভারতবর্ষ যদি বিলাতী পক্ষপাতকে কলা দেখায় তাহা হইলে পাঁচ-সাত-দশ বৎসরের ভিতর কলোনিগুলার মাল ভারতীয় মালকে বিলাতী বাজারে জবরদস্তরূপে ঘায়েল করিতে সমর্থ হইবে। কাজেই, বিলাতের বাজারে "পক্ষপাত" ভারতীয় চাষী আর কৃষিজ দ্রব্যের রপ্তানিকারকের পক্ষে একটা উড়াইয়া দেবার বস্তু নয়। বিলাতী পক্ষপাত পাইলে বিলাতী বাজারে ভারতীয় মালের কাট্‌তি কিছু-কিছু বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। বিলাতী বাজারে ভারতীয় মালের জন্য আত্মরক্ষার উপায় হইতেছে পক্ষপাত। বিনা পক্ষপাতে, ভারতীয় মালের বিলাতী চাহিদা কমিতে পারে। আসল কথা, কোনো মতে বিলাতী বাজারে টিঁকিয়া থাকিবার জন্যই চাই পক্ষপাত। কাজেই পক্ষপাতের ব্যবস্থায় ভারতবাসীর, বিশেষতঃ ভারতীয় চাষীর, লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

# বিশ্ব-সঙ্কটের অর্থশাস্ত্র*

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

## সঙ্কটের অর্থ সর্ব্বনাশ নয়

আর্থিক "মন্দা","দুর্য্যোগ" বা "সঙ্কটের" কথা আজ আর নতুন-কিছু নয়। এই "দুর্য্যোগ" বা "সঙ্কট" খাঁটি পাশ্চাত্য চিজ, ইয়োরামেরিকার উহা বিশেষ সহচর,—ভারতবাসী আমরা এইরূপ সমঝিতেই অভ্যস্ত। এইরূপ সমঝিয়া রাখা ঠিক কিনা সন্দেহ। আসল কথা, আর্থিক জগতের এই আধুনিকতম সমস্যাটা তলাইয়া বুঝিবার প্রয়োজন।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ইয়োরামেরিকা যে আর্থিক সর্ব্বনাশের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে এই ধারণাটা ভুল। ১৯২৯ সনের পর হইতে ইয়োরোপে এবং বিলাতে যে আর্থিক মন্দা সুরু হইয়াছে, দারিদ্র্য তাহার কারণ নয়। বিলাত ও ইয়োরোপের বাসিন্দাদের কর্ম্ম-দক্ষতারও অভাব হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে গোটা সমাজ ঝড়ের বেগে একটা বিরাট রূপান্তরের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানের এই দুর্য্যোগ নবজীবনের অন্যতম পরিচায়ক-বিশেষ। দুনিয়ার "প্রবীণ" শিল্পপ্রধান দেশগুলি আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের প্রত্যেক অলিগলিতে নয়া পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে।

---

* আর্থিক উন্নতি জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ (মে ১৯৩৭)। এই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল ১৯৩২ সনে ইংরেজিতে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং বিনয়বাবুর সম্পাদিত ইংরেজী ত্রৈমাসিকে মূল প্রবন্ধ বাহির হয় (১৯৩২)।

পহেলা নম্বরের শিল্প-প্রধান দেশগুলির এই রূপান্তরসাধনের দৃষ্টান্ত হইতে আর্থিক ভারতেরও অনেক-কিছু শিখিবার আছে।

## মন্দার চৌহদ্দি

সকল দেশেরই ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রিক মহলের বিশ্বাস, গোটা জগৎ জুড়িয়া এই আর্থিক মন্দা উপস্থিত হইয়াছে। কতকাংশে ইহা সত্য বটে; কিন্তু রীতিমত বিচার করিয়া দেখিলে অবস্থা অন্যরূপ বলিয়াই মনে হইবে। গোটা জগৎ জুড়িয়া বাস্তবিকই আর্থিক মন্দা দেখা দেয় নাই। তবে, বর্ত্তমানে আর্থিক দুনিয়া এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, যে-কোনো স্থানেই উল্লেখযোগ্য কোনো আর্থিক ঘটনা ঘটুক না কেন, গোটা দুনিয়াতেই তাহার দাগ পড়িয়া যায়। এই হিসাবে বর্ত্তমান আর্থিক মন্দাকে আন্তর্জ্জাতিক বলা চলিতে পারে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দুই গোলার্দ্ধের প্রত্যেক গলি-ঘুঁজিতে দেখা যাইতেছে মালপত্র বিক্রী হইতেছে না, কল-কারখানাজাত এবং কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য মৌজুদ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, জিনিষপত্রের দাম অসম্ভব রকম কমিয়া গিয়াছে, টাকাকড়ির টানাটানি পড়িয়াছে এবং বহু-বহু মজুরকে কাজ থেকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু খাঁটি সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে জার্ম্মাণি, বিলাত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই তিনটী শিল্পপ্রধান দেশে। সঙ্কটের আর একটী রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে ধান, পাট, তুলা গম, রবার ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্যের দেশগুলিতে। সুতরাং বর্ত্তমান আর্থিক দুর্য্যোগকে বুঝিতে হইলে কোন্ কোন্ অঞ্চলে উহা সংক্রামিত হইয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

গোটা দুনিয়ায় কতগুলা লোক যে বেকার হইয়া বসিয়া আছে তাহার প্রকৃত সংখ্যা স্থির করা মুস্কিল ব্যাপার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এ সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামায় নাই। বিলাত এবং জার্ম্মাণিই এই

সংখ্যা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বিশেষ হুঁসিয়ার। অন্যান্য দেশের বেকার-সংখ্যার যে হিসাব পাওয়া যায় তাহার উপর নির্ভর করা চলে না।

## বেকার-দুনিয়া

১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-সেক্রেটারি যে হিসাব দেন তাহাতে দেখা যায় মার্কিণ মুল্লুকে তখন বেকারের সংখ্যা ছিল ৬,০০০,০০০। উনিশটা শহরের বেকার-সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া মার্কিণ সেক্রেটারি গোটা মার্কিণ মুল্লুকের বেকার-সংখ্যার উক্তরূপ হিসাব স্থির করেন। এই সনের মাঝামাঝি জেনীভার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক দপ্তর হইতে গোটা দুনিয়ার বেকার-সংখ্যা দুই কোটী বলিয়া প্রচার করা হয়। ১৯২৯ সনের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বেকারবাহিনী গোটা দুনিয়ার ৩০%। ১৯২৯ সনের তুলনায় ডেন্মার্ক, এস্থোনিয়া, লাটভিয়া, নরওয়ে, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং সোভিয়েট রুশিয়া বাদে সকল দেশেই বেকার সংখ্যা বাড়িয়াছে।

নিম্নের তালিকায় ১৫টা দেশের বেকার-সংখ্যা দেওয়া হইল (যেসমস্ত মজুর পূরা সময় খাটে নাই বা যাহারা বছরের কোনো কোনো সময় খাটিয়াছে তাহাদের সংখ্যা বাদ দেওয়া হইয়াছে):—

| দেশ | ১৯৩০ সনের ডিসেম্বরে বেকার | ১৯২৭ সনে ট্রেড্ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত | জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র | ৬,০০০,০০০ | ৩,০৫১,৬১৮ | ১০৫,৭১০,৬২০ |
| জার্ম্মাণি | ৪,৮৯৪,০০০ | ৮,১৯৬,০৩৫ | ৬৩,৩৩৮,৭৫৩ |
| বিলাত | ১,৮৫৩,৫৭৫ | ৪,৫০১,০০০ | ৪২,৭৬৯,১৯৬ |
| ইতালি | ৬৪২,১৬৯ | ২,৯০৫,৬৩১ | ৩৮,৭৫৫,৫১৬ |

| দেশ | ১৯৩০ সনের ডিসেম্বরে বেকার | ১৯২৭ সনে ট্রেড্ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত | জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| পোল্যাণ্ড | ৩৪৫,২৯৫ | ১,১৮৪,৩১৪ | ২৭,১৪২,৬৭৪ |
| অষ্ট্রিয়া | ৩৩১,২৩৯ | ৮৬২,৭১৬ | ৬,৫৩৬,৮৯৩ |
| ফ্রান্স | ৩৫০,০০০ | ১,৬৬৩,৩৪৬ | ৩৯,২০৯,৫১৮ |
| জাপান | ৩২২,০০০ | ২২৫,৭৭০ | ৫৯,৭৩৬,৭০৪ |
| রুমানিয়া | ৪২,৬৮৯ | ৪২,৬০৪ | ১৬,২৬২,১৭৭ |
| জুগোস্লাভিয়া | ৯,৯৮৯ | ৩৫,৫৯০ | ১২,০১৭,৩২৩ |
| চেকো-স্লোভাকিয়া | ২৩৯,৫৬৪ | ১,৬৫১,০১৩ | ১৩,৬১৩,১৭২ |
| অষ্ট্রেলিয়া | ৯০,৩৭৬ | ৭২৯,১৫৫ | ৫,৪৩৫,৭৩৪ |
| সুইডেন | ৮০,৫৭৮ | ৪৭৮,৪৬৯ | ৫,৯০৪,৪৮৯ |
| হল্যাণ্ড | ৭২,১৯১ | ৫১৭,৯১৪ | ৬,৮৬৫,৩১৪ |
| বেলজিয়াম | ৬৩,৫৮৫ | ৭৩২,৯৩৫ | ৭,৪৬৫,৭৮২ |

সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুনিয়ার মোট দুই কোটী বেকারের মধ্যে অর্দ্ধেকের বাস মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্ম্মাণিতে। মাকিণ, বিলাত এবং জার্ম্মাণি এই তিন দেশে দুনিয়ার মোট বেকার-সংখ্যার ৬৩·২% বর্ত্তমান। সুতরাং বেকার-সমস্যা গোটা দুনিয়ার সঙ্কট বলা চলে না; উপরোক্ত তিন দেশের পক্ষেই উহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। এই মাপজোক আরও বিশেষ করিয়া তলাইয়া দেখার দরকার। তালিকার তৃতীয় কলমে ট্রেড্ ইউনিয়নের সদস্যদের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন সকল দেশে সমানভাবে অগ্রসর হয় নাই। কাজেই ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে বেকার সমস্যার যোগাযোগ কায়েম করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং বেকার-সংখ্যাকে সমগ্র লোক-সংখ্যার অনুপাতে বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক, ফল কিরূপ

দাঁড়ায়। নিম্নের তালিকায় কতকগুলি দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা কয়জন বেকার তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—

| | | |
|---|---|---|
| জার্ম্মাণি | ... | ৭.৭% |
| মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র | ... | ৫.৭% |
| অষ্ট্রিয়া | ... | ৫.০% |
| বিলাত | ... | ৪.২% |
| ইতালি | ... | ১.৬% |
| অষ্ট্রেলিয়া | ... | ১.৬% |
| চেকোস্লোভাকিয়া | ... | ১.৪% |
| সুইডেন | ... | ১.৩% |
| পোলাণ্ড | ... | ১.২% |
| হল্যাণ্ড | ... | ১.০% |
| ফ্রান্স | ... | ০.৯% |
| বেলজিয়াম | ... | ০.৮% |
| জাপান | ... | ০.৫% |
| রুমানিয়া | ... | ০.২% |
| জুগোস্লাভিয়া | ... | ০.০৮% |

জার্ম্মাণি, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রিয়া এবং বিলাত এই চার দেশেই লোক-সংখ্যার অনুপাতে খুব বেশী বেকার দেখা যায়। ফ্রান্সে বেকারের হিস্যা শতকরা ১ এরও নীচে।

ফ্রান্সের নজীর থেকেই টের পাওয়া যাইতেছে, আর্থিক দুর্য্যোগ সকল দেশে সমানভাবে দেখা দেয় নাই। আর্থিক দুর্য্যোগের ঢেউ ফ্রান্সের গায়ে লাগিয়াছে বটে, ঐদেশেও লোক বেকার হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দুই আঘাতের চোট ফ্রান্সের বুকে অন্য দেশের মত বিষম-ভাবে বাজে নাই।

ফ্রান্স দেশটাকে পূরাদস্তুর শিল্পপ্রাণ বা শিল্প-প্রধান দেশ বলা চলে না। ফ্রান্সের খনি-শিল্প এবং ধাতু-শিল্প অবশ্যই পহেলা নম্বরের। এই দুই শিল্পের কথা ছাড়িয়া দিলে ফ্রান্সকে শিল্পের দেশ হিসাবে মাঝারি শ্রেণীর অন্তর্গত বলা চলে। এইসমস্ত শিল্প আবার কৃষিকার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত। এই জন্য ফ্রান্সের মজুররা আধাআধি কলকারখানার মজুর এবং আধাআধি চাষী-মজুর। ফ্রান্সের কতকগুলি শিল্প আবার ঘর-গৃহস্থালীর চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সেই জন্য উত্তর এবং মধ্য ফ্রান্সের মজুরগণ শিল্পকার্য্যের সঙ্গে-সঙ্গে চাষবাসের কাজও চালাইয়া থাকে। মহাযুদ্ধের সময় উত্তর ফ্রান্সের কারিগর-কৃষক বা চাষী-কারিগরদের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। কিন্তু ১৯২০ সনে ফ্রান্সের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের যখন পুনর্গঠন আরম্ভ হয় তখন আবার ঐ পুরাতন চাষী-কারিগর-শ্রেণী পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন এইরূপ মিশ্রিত ধরণের হওয়ার জন্য ঐ দেশে বেকার-ব্যাধি অন্যান্য দেশের মত প্রবল এবং মারাত্মক আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

আর্থিক ফ্রান্সের আর একটা দিক্‌ও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই ফরাসী পুঁজিপতিরা আপন-আপন কারখানাকে পল্লীমুখো করিয়াছে। সস্তায় মজুরও মিলিবে আবার শহরের সিণ্ডি-ক্যালিজ্‌ম্ এর ( ট্রেড ইউনিয়ন-নিষ্ঠার ) ছোঁয়াচ হইতেও মজুরদিগকে দূরে রাখা যাইবে,—এই ভাবিয়া ফরাসী পুঁজিপতিগণ সুদূর পল্লী-অঞ্চলে যাইয়া কারখানা গড়িতে আরম্ভ করে। এইভাবে ফ্রান্সের এক-একটী অঞ্চল এক-একটী বিশেষ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। তারপর জার্ম্মাণি যখন উত্তর ফ্রান্স আক্রমণ করে, তখন এই অঞ্চলের কলকারখানাগুলি মধ্য, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অপসারিত হয়। মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে বিদ্যুতের রেওয়াজ আরম্ভ

হইয়াছে। এর জন্তও আগেকার কৃষিপ্রধান পল্লীগুলি সঙ্গে-সঙ্গে শিল্প-বহুলও হইয়া উঠিয়াছে। মোটকথা, ফ্রান্সের শিল্প-প্রচেষ্টা সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সে কোনো বিশেষ-বিশেষ কেন্দ্রে বাঘা-বাঘা শিল্পসমূহ কায়েম হইতে পারে নাই। শিল্প-কারখানাসমূহও কোনো বিপুল কারবারে কেন্দ্রীকৃত নয়। কাজেই আর্থিক দুর্য্যোগের সঙ্গে-সঙ্গে বেকার-সংখ্যাও অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ফ্রান্স দেশে বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জার্ম্মাণ মজুরদের মতে ফ্রান্সের বিচিত্র অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থাই ইহার কারণ। জার্ম্মাণ মালিকগণ এসম্বন্ধে ফরাসী মালিকদের নিকট হইতে অনেক-কিছু শিখিয়া লইতে পারে। ফ্রান্সের ধাতু ও খনিশিল্পের ইউনিয়ন ফরাসী পুঁজিপতিদের সেরা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৩১ সনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী জার্ম্মাণ পুঁজিওয়ালাদের বাস্তবিকই চোখ ফুটাইতে পারে,—জার্ম্মাণির ধাতুশিল্পের মজুরগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। ১৯৩০ সনের পহেলা ডিসেম্বর হইতে ১৯৩২ সনের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের রেল এবং জাহাজের মজুর ছাড়া বড়-বড় শিল্প হইতে মাত্র ৪৮০,০০০ জন মজুর কর্ম্মচ্যুত হয়। ফ্রান্সে ছাঁটাইয়ের মধ্যে এত কম মজুর পড়িবার কারণ এই যে, ফরাসী মালিকগণ যতদূর সম্ভব বেশী লোককে খাটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে; এমন কি আধা হপ্তা কাজ দিয়াও এইভাবে বেশী লোক খাটানো হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, নিতান্ত যখন টানাটানি পড়িয়াছে তখন বেতন কমাইয়া দিয়াও তাহারা লোকজনকে কাজে মোতায়েন রাখিয়াছে।

## উৎরাই-চড়াইয়ের ধারা

ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেকবার ভাটার পর উত্থান দেখা গিয়াছে। কতক-গুলি শিল্প বা বৃত্তির ঋতু-মাফিক উঠানামা বা চড়াই-উৎরাই যেন

দস্তুরমাফিক ঘটনা বিশেষ। এইসকল শিল্পে ভাটা দেখা দিলেই মনে হয় অল্পকালের মধ্যে ঋতু বদলাইবামাত্র আবার পূর্ব্বের অবস্থা উপস্থিত হইবে। আর্থিক মন্দা চক্রাকারে ঘুরিয়া আরোগ্যের পথে চলিয়া থাকে। বর্ত্তমানের আর্থিক মন্দা গোটা জগৎ ব্যাপিয়াই হউক বা উহা কয়েকটী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকুক, উহার সম্বন্ধেও মনে হয় বাজারের অবস্থা আবার আপনা-আপনিই ভাল হইবে। বিশেষ চিন্তা না করিয়াও যেন এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

ব্যাখ্যাটা নেহাৎই সাদাসিধা, যেন কলের সাহায্যে সমস্ত মুস্কিলের আশান হইয়া যায়। আর্থিক উন্নতি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত, একধাক্কায় উঠিতেছে, উল্টা ধাক্কায় পড়িতেছে। বাস্তব আর্থিক জীবনে একটানা স্থিতি বলিয়া কোনো বস্তু নাই। শৃঙ্খলাহীনতা, অসামঞ্জস্য এবং অসাম্য যেন প্রত্যেক অর্থনৈতিক অবস্থার স্বাভাবিক দস্তুর। আর্থিক জীবনের গতিশীলতাই ইহার কারণ। প্রথমতঃ, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এবং খাদনের মধ্যে সময় সময় অসামঞ্জস্য দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রা-কর্জ্জ-পুঁজি এবং পণ্যদ্রব্যের বা মেহনতের কেনা-বেচার মধ্যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। তার জন্য দ্রব্য-মূল্য, মজুরি, নিয়োগ ইত্যাদিরও উঠানামা উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায়ও এই দুই ধরণেরই অসামঞ্জস্য বা সাম্যহীনতার যথেষ্ট নজির পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক ব্যারোমিটার বা চাপ-মান যন্ত্র অনুসারে এখন বেশ বুঝা যায় যে, অল্প সময়ের মধ্যেই জিনিষপত্রের দাম চড়িবে, বেকারের সংখ্যাও কমিবে।

এখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে,—বর্ত্তমান মন্দা তাহ'লে কি সাময়িক? জবাবে বলিব যে, বর্ত্তমান মন্দা যদি চক্রাকারে উঠানামা করে তবে নিশ্চয়ই উহা সাময়িক ঘটনা। কিন্তু বর্ত্তমান আর্থিক দুর্য্যোগের মধ্যে আবর্ত্তনশীলতা ছাড়া আরও কিছু নিহিত আছে,

এরূপ ধারণা নিতান্ত যুক্তিহীন নয়। সুতরাং বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে কেবলমাত্র স্বল্পকালস্থায়ী সমঝিলে চলিবে না। অতএব উহা আপনা হইতেই আরোগ্যের পথে ছুটিবে এরূপ ধারণা করাও পূরাপূরি ঠিক নয়। অন্যান্য ব্যবসা-চক্রের বেলায় সুদিনের "আশা" আপনা হইতেই মনের মধ্যে আসিয়া পড়ে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ চিন্তার দিকে অতিমাত্রায় লাগাম ঢিল দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

বর্ত্তমান সঙ্কট আংশিকভাবে কতকটা চক্রাকারের বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে উহা যুগ-প্রবর্ত্তকও বটে। বর্ত্তমান সঙ্কটের কতকগুলা উপসর্গ ব্যবসা-বাণিজ্যের আরোগ্য-লাভের সঙ্গে-সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে; কিন্তু কতকগুলা উপসর্গ থাকিয়া যাইবে। গোটা দুনিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতির তালে-তালে ওগুলা হয়ত তরলীভূত হইতে থাকিবে। আর্থিক দুনিয়ার ইহা একটা "বহুকালব্যাপী" দৃশ্যধারা; এবং ইহা আধ-পুরুষ বা এক পুরুষকাল ধরিয়া চলিতে বাধ্য।

সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, আমাদের চোখের সামনে দুনিয়ার আর্থিক এবং সামাজিক কাঠামোর একটা বিরাট্ রূপান্তর ঘটিতেছে। দুনিয়াটা যেন উহার পরবর্ত্তী সমৃদ্ধির স্তর বা যুগের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান ক্রিয়াকাণ্ডের ভিন্ন-ভিন্ন ধারাগুলা যেন এক-একটা পথ; এইসমস্ত পথগুলা একত্রিত হইয়া কোনো-কোনো অঞ্চলে "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব" এবং অন্যান্য স্থানে প্রথম শিল্পবিপ্লব আনয়ন করিতেছে। দুনিয়াটা নিম্নতর হইতে মানুষের উচ্চতর জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং ক্রয়-ক্ষমতার বাড়তির পথে অভিযান সুরু করিয়াছে। বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কট এইসকল রূপান্তর ও পুনর্গঠনের সাক্ষী বা চিহ্নস্বরূপ। মানব-জাতিকে যোগ্যতা এবং সংস্কৃতির উচ্চতর উপত্যকায় ঠেলিয়া তোলা হইতেছে।

## মজুর-সঙ্ঘ ও বেকার-সংখ্যা

একটা প্রশ্ন কিন্তু আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। গোটা জাতীয় জীবন ব্যাপিয়া বেকার-সঙ্কট উপস্থিত। অথচ এই সঙ্কটকে লক্ষ-লক্ষ মানবের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে উৎকর্ষ এবং উচ্চতর স্তরে অগ্রসর হইবার যুগরূপে কল্পনা করিতেছি। ইহা কি অসঙ্গত নহে? এর উত্তর, —"বোধহয় খানিকটা অসঙ্গতই বটে, কিন্তু একেবারে অযৌক্তিকও নহে"। বেকার সমস্যাটা তন্ন-তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখার দরকার। কয়েকটা কারণের জন্য সমসাময়িক বেকারসমস্যার বহর খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। এ সম্পর্কে মহাযুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সময় লক্ষ লক্ষ নরনারীর জন্য নতুন-নতুন কাজ সৃষ্টি করা হয়। ১৯১৪ সনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ট্রেড-ইউনিয়নের সংজ্ঞা অনুসারে এইসমস্ত নরনারীর ঠিক কাজ ছিল বলা যায় না। লড়াইয়ের যুগে রীতিমত হাজিরার খাতায় ইহাদের নাম উঠানো হয় এবং সরকারী নথিপত্রে ইহাদিগকে কাজে মোতায়েনরূপে ধরা হয়। লড়াইয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প-সমূহের কল্যাণে যেন একটা "অতিমাত্রায় কাজে ভর্ত্তি করার", "অতি-নিয়োগ", "অতি-বাহাল" বা "অতি-কর্ম্মের" যুগ আরব্ধ হয়। দেখিতে গেলে ইহা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। লড়াইয়ের পর এইসমস্ত লোকজনকে কাজে মোতায়েন রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং ১৯১৯-২২ সনের বেকারসমস্যা উল্লেখযোগ্য "ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল" অর্থাৎ সংখ্যা-দপ্তরের অন্তর্গত ব্যাপারে পরিণত হয়; কারণ লড়াই-মজুরদিগকে দলে দলে কাজ হইতে বিদায় দিতে হয়। আর এইসমস্ত কর্ম্মবিচ্যুতির নজির রীতিমত সরকারী নথিপত্রে স্থান লাভ করে।

লড়াইয়ের যুগে অসম্ভবরূপে লোকজনকে কাজে মোতায়েন রাখা

হইয়াছিল ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। কাজেই লড়াইয়ের পর বিলাতী ট্রেড্ ইউনিয়নগুলার সম্প্রসারণ ঘটে। এই বাড়তিকে লড়াইয়ের যুগের নিয়োগ-বাড়তির সূচীসংখ্যারূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

লড়াইয়ের আগে ট্রেড্ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯১০ | ১,৬৪৭,৭১৫ | ১৯১২ | ২,০০১,৬৩৩ |
| ১৯১১ | ১,৬৬২,১৩৩ | ১৯১৩ | ২,২৩২,৪৪৬ |

এইসমস্ত অঙ্কে ধীরপদে সদস্যদের বাড়তির পরিচয় পাই। তারপর লড়াই আরম্ভ হয়। লড়াইয়ের অবসানে নিম্নলিখিতরূপ হিসাবপত্র পাওয়া যায় :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯১৮ | ৪,৫৩২,০৮৫ | ১৯২০ | ৬,৫০৫,৪৮২ |
| ১৯১৯ | ৫,২৮৩,৬৭৬ | ১৯২১ | ৬,৪১৭,৯১০ |

১৯১০-১৩ সনসমূহের সংখ্যাগুলির তুলনায় ১৯১৮-২১ সনগুলার সংখ্যাপত্র নিশ্চয়ই অসাধারণ। সুতরাং ১৯২১-২৩ সন নাগাদ কর্ম্ম-হীনতা বা বেকার যেন অর্থনৈতিক সমাজভিত্তির স্বাভাবিক লক্ষণে পরিণত হয়। আরও একটী লক্ষ্য করিবার বস্তু এই যে, ট্রেড-ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যার কম্‌তির সঙ্গে-সঙ্গে কর্ম্মহীনতার শতকরা হিস্যা কমিতে থাকে। ১৯২২ হইতে ১৯২৫ সনের অঙ্কগুলায় ইহা বেশ টের পাওয়া যায় :—

| সন | কর্ম্মহীনতার শতকরা হিস্যা | ট্রেডইউনিয়ন সদস্য সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১৯২২ | ১৪·৩ | ৫,১২৮,৬৪৮ |
| ১৯২৩ | ১১·৭ | ৪,৩৬৯,২৬৮ |
| ১৯২৪ | ১০·৩ | ৪,৩২৮,২৩৫ |
| ১৯২৫ | ১১·৩ | ৪,৩৪২,৯৮২ |

যুদ্ধের আগেকার যুগে কর্ম্মহীনতার যে স্বাভাবিক সূচীসংখ্যা ছিল তাহার পরিমাপে ১৯২২ সনের সূচীসংখ্যা অর্থাৎ ১৪.৩ অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত আমরা নিম্নলিখিতরূপ অঙ্ক দেখিতে পাই :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯১১ | ৩.০% | ১৯১৩ | ২.১% |
| ১৯১২ | ৩.২% | ১৯১৪ | ৩.৩% |

একদিকে যেমন বেকারদের সূচীসংখ্যা নিচু অপরদিকে তেমন ট্রেড-ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যাও নিচু।

জার্ম্মাণিতেও "অতিমাত্রায়" কাজে নিযুক্তির অর্থাৎ অতি-নিয়োগের বা "অতি-কর্ম্মের" একই মূর্ত্তি নজরে পড়ে। এখানেও আমরা ট্রেড্ ইউনিয়ন সদস্যভুক্ত করার নথিপত্র পাই। স্বাধীন ট্রেড্ ইউনিয়নগুলার ১৯১৩ সনের অঙ্কসমূহের পাশাপাশি লড়াইয়ের পরবর্ত্তী বৎসর কয়েকের অঙ্কগুলা রাখা গেল, যথা :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯১৩ | ২,৫২৫,০০০ | জন সদস্য | ১৯২০ | ৮,০২৬,০০০ | জঃ সঃ |
| ১৯১৯ | ৭,৩৩৮,০০০ | ,, | ১৯২১ | ৭,৭৫২,০০০ | ,, |
| | ১৯২২ | | ৭,৮২২,০০০ জন সদস্য। | | |

১৯১৩ সনের ২,৫২৫,০০০ হইতে ১৯২০ সনে ৮,০২৬,০০০ সংখ্যায় আরোহণ যেন খাড়া পাহাড় ডিঙাইবার কাণ্ড। ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জীবন যেরূপ ছিল তাহার তুলনায় এই অতি-নিয়োগ অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই। তথাপি জার্ম্মাণিতে লড়াইয়ের পরবর্ত্তী সনগুলাকে (১৯১৯-২২) ঠিক কর্ম্মহীনতার সময় বলা যায় না। সেই কয় বৎসর মার্কের মূল্য-হ্রাসের জন্য কারেন্সি বা টাকাকড়ি ফাঁপিয়া উঠে, রপ্তানি-বাণিজ্যও বাড়িয়া যায়। জার্ম্মাণির কলকারখানাগুলা জার্ম্মাণির অসাধারণ বিরাট মজুর-বাহিনীকে কাজে নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হয়। সুতরাং ১৯১৩ সনের তুলনায় এই যুগের

কর্ম্মহীনতার অঙ্কগুলা এমন-কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। নিম্নের তালিকায় অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝা যাইবে :—

| সন | কর্ম্মহীনতা | সন | কর্ম্মহীনতা |
|---|---|---|---|
| ১৯১৩ | ২·৯% | ১৯২০ | ৩.৮% |
| ১৯১৯ | ৩·৭% | ১৯২১ | ২·৮% |
| ১৯২২ | | ১·৫% | |

আমরা দেখিতে পাইতেছি,—লড়াইয়ের পরবর্ত্তী সনগুলায় জার্ম্মাণির মজুর-বাজারের হালচাল বিলাতী মজুর-বাজারের ঠিক বিপরীত অবস্থায় রহিয়াছে। এই সময়ে জার্ম্মাণিতে কর্ম্মহীনতা একরূপ নাই বলিলেই চলে। কারেন্সির অতি-বাড়তির দরুণ জার্ম্মাণির প্রকৃত কর্ম্মনিযুক্তির অবস্থা দুনিয়ার লোক বুঝিতে পারে নাই। মুদ্রাব্যবস্থার স্থিতি-প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে জার্ম্মাণিতেও বিলাতী মজুর-বাজারের হালচাল সুরু হয়। ১৯২৩ সনের অক্টোবর হইতে ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরকাল জার্ম্মাণির মুদ্রাস্থিতির প্রারম্ভকালরূপে ধরা যাইতে পারে। এই সময়টা জার্ম্মাণির পক্ষে কর্ম্মহীনতার প্রথম যুগও বটে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে কতকগুলা অঙ্ক দেওয়া হইল :—

| মাস | | কর্ম্মহীনতা |
|---|---|---|
| ১৯২৩ অক্টোবর | ... | ১৯·০% |
| নবেম্বর | ... | ২৩·৪% |
| ডিসেম্বর | ... | ২৮·২% |
| ১৯২৪ জানুয়ারি | ... | ২৬·৫% |
| ফেব্রুয়ারি | ... | ২৫·১% |
| মার্চ্চ | ... | ১৬·৬% |
| এপ্রিল | ... | ১০·৪% |

| মাস | | কৰ্ম্মহীনতা |
|---|---|---|
| মে | ... | ৮·৬% |
| জুন | ... | ১০·৫% |
| জুলাই | ... | ১২·৫% |
| আগষ্ট | ... | ১২·৪% |
| সেপ্টেম্বর | ... | ১০·৫% |

বৰ্ত্তমানে মুদ্রা-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উপরোক্ত মাপজোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, (১) ১৯২২ সনের বিলাতী বেকার-অবস্থা ঠিক এক বৎসর পর জার্ম্মাণিতে সুরু হয় এবং (২) বিলাত ও জার্ম্মাণি উভয় দেশেই বেকার-অবস্থার সহিত পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী অতি-কর্ম্মের অর্থাৎ অত্যধিক কৰ্ম্মে নিযুক্তিরও যোগাযোগ দেখা যায়। এই কৰ্ম্মনিয়োগের নিদর্শন মিলে ট্রেড্ইউনিয়নের সদস্য-তালিকায়। লড়াইয়ের পরবর্ত্তী সনগুলায় ট্রেড্ইউনিয়নের সদস্য-সংখ্যা অত্যধিক বাড়িতে থাকে। লড়াইয়ের সময় যেমন লক্ষ-লক্ষ নরনারীর জন্য কাজের সংস্থান এবং উহাদিগকে ইউনিয়নের সদস্য-শ্রেণী-ভুক্ত করা সম্ভবপর হইয়াছিল, স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ লড়াইয়ের পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী বা পরবর্ত্তী যুগে বিলাত বা জার্ম্মাণি কোনো দেশের পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হয় নাই।

লড়াইয়ের পূৰ্ব্বে হইলে এরূপ অবস্থা লোকে বিশেষ ধৰ্ত্তব্যের মধ্যেই গণনা করিত না। লোকে বড় জোর কাজ-কর্ম্মের অভাব, অল্পলোকের জন্য কাজের ব্যবস্থা কিংবা শুধু দারিদ্র্য বলিয়াই চুপ থাকিত। পারিভাষিক হিসাবে যাহাকে বেকার বলে সেরূপ বলিতে কেহই সাহসী হইত না। কৰ্ম্মে-নিয়োগ-বিষয়ক সংখ্যা-দপ্তরের কৰ্ম্মচারীরা এই অবস্থা লইয়া মাথা ঘামাইত না। এইরূপ বিবেচনা করিলে কেবলমাত্র বেকার-সংখ্যা দেখিয়া কোনো জাতিকে বা

দেশকে এক তারিখের তুলনায় অপর তারিখে অপেক্ষাকৃত গরীব বা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বলা চলে না। যখন বেকার-সমস্যা ছিল না তখন দেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল আর এখন বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া উহা গরীব হইয়া পড়িয়াছে এরূপ মতবাদও দাঁড় করানো সম্ভবপর নয়। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, মোটের উপর বর্ত্তমানে নকরি-প্রার্থীদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। তবে ইহাও বুঝিয়া রাখা আবশ্যক যে, যেমন করিয়াই হউক ইহাদের জন্য কাজের সংস্থান করিতে হইবে। ইহা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, সামাজিক সমস্যাও বটে।

## মুদ্রার মূল্য-হ্রাস

জার্ম্মাণি, বিলাত বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বেকার-সমস্যা বুঝিতে হইলে উহাকে একমাত্র লড়াইয়ের যুগের "অতি-নিয়োগে"র প্রতিক্রিয়া-রূপে বিবৃত করিলেই কি ঠিক হইবে? না। দুই নম্বর আর একটা কারণও আছে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী মুদ্রার মূল্য-হ্রাস বা সম্প্রসারণের জন্য কোনো-কোনো দেশে শিল্প-সমৃদ্ধি উপস্থিত হয়। ১৯২৩ সন (সেপ্টেম্বর) অর্থাৎ মুদ্রাস্থিতির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত নিম্ন-কারেন্সির বা সস্তা টাকাকড়ির দেশগুলার,—বিশেষতঃ মাল-রপ্তানি যেগুলার প্রধান ধান্ধা, সেইসমস্ত দেশের,—অর্থনৈতিক কাজকর্ম্ম খুব বাড়িয়া যায়। "অতি-নিয়োগ" এই দেশগুলার দস্তর হইয়া পড়ে। তারপর হইতে অবশ্য কলকারখানা বা অন্যান্য আর্থিক কারবার ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়া আসিতেছে। কাজ হইতে মজুরদিগকে বিদায়-প্রদান বা চাকুরেদের সংখ্যা-হ্রাস আজ যেন আটপৌরে ঘটনা। গত কল্যকার মুদ্রা-বাড়তির ফলে যে বেকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহারই মাপজোক লিখিয়া রাখা অদ্যকার সংখ্যা-দপ্তরের বড় ধান্ধা। অসাধারণ ঐতিহাসিক

ঘটনাবশতঃ অতিমাত্রায় কর্ম্মে নিযুক্তির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অসম্ভব রকমের বেকার অবস্থা দেখা দিয়াছে। বেকার-সমস্যার অন্ততঃ পক্ষে এই দিক্‌টা অল্পবিস্তর ঋতুপরিবর্ত্তনের সমধর্ম্মী এবং ইহাকে বর্ত্তমান যুগের অর্থ-নৈতিক কাঠামোর মূলগত স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। ঋতুমাফিক এই তেজী-মন্দা বা চড়াই-উৎরাইকে যদি একটা চক্ররূপী ঘটনারূপে ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে মুদ্রাবাড়তির দরুণ যে বেকার অবস্থা উপস্থিত হয় তাহাকে ধন-বিজ্ঞানের দিক্‌দিয়া প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ আর্থিক বা সামাজিক অবস্থারূপে কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। ভিন্ন-ভিন্ন দুইটা সময়ের আপেক্ষিক দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধি সম্পর্কেও এই ধরণের বেকারকে নির্ভুল বা চরম বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী বিবেচনা করা চলিবে না।

## যুক্তিযোগ

এইসমস্ত আলোচনা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, বর্ত্তমান বেকার অবস্থার ভিতর অসাধারণ কিছুই নাই। অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই আছে। ১৯২৬-২৮ সনগুলার শিল্পবাণিজ্যে এবং কৃষিকার্য্যে খুব বেশী "যুক্তিযোগ" ( র‍্যাশন্যালিজেশন ) কায়েম করা হয়। উন্নততর যন্ত্রপাতি এবং হালহাতিয়ার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পুঁজিপাট্টা এবং পরিচালনের দিকেও ব্যয়-সঙ্কোচ নীতি সকল প্রকার আর্থিক কারবারের দস্তুরে পরিণত হয়। অবশ্য অর্থনীতির ইতিহাসে যুক্তিযোগ এক হিসাবে এমন নতুন-কিছু নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্পবিপ্লবের সূচনাকাল হইতে প্রত্যেক আর্থিক কারবারেই কিছু-না-কিছু ভাবে যুক্তিযোগ চলিয়া আসিতেছে। তবে মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তারপর হইতেই যুক্তিযোগ খাঁটি বিপ্লবমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। শ্রমলাঘব এবং লোকজনকে কাজ থেকে বিতাড়ন চিরদিনই র‍্যাশন্যালিজেশন বা যুক্তিযোগের বিশেষত্ব।

বর্ত্তমানে যে বিরাট বেকার অবস্থা দেখা দিয়াছে যুক্তিযোগ তাহার ৩নং খুঁটা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে,—১৯২২-২৭ সনে মাথাপিছু মাল তৈরী বাড়তির পরিমাণ ৩·৫%। কিন্তু ১৯২২ সনের অঙ্ক ১৯০৫ সনের চেয়ে খুব বেশী নয়। সুইডেনে ১৯১৫ সন হইতে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত বাড়তির হার যৎসামান্য; কিন্তু ১৯২০ হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত বার্ষিক বাড়তি ৩·৯%। জার্ম্মাণিতে ১৯২৫ সনের তুলনায় ১৯২৯ সনে উৎপাদনের সূচী-সংখ্যা ২৭·৫% বেশী; কিন্তু মজুর-সংখ্যা মাত্র ৫% বেশী। বাৎসরিক মাথা-পিছু মাল-তৈরী বৃদ্ধি ৫%। বিলাতে ১৯০৭ হইতে ১৯২৪ সন নাগাদ মাথা-পিছু মাল-উৎপাদন বৃদ্ধি ১০%; এবং ১৯২৪ সন থেকে ১৯২৯ নাগাদ ১১%। যুক্তিযোগকৃত বেকার-অবস্থার আকার-প্রকার অভূতপূর্ব্ব বটে, কিন্তু তথাপি কোনো আলোচ্য দুই সনে উহা অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধির সূচী-চিহ্ন নহে।

সম্পদ্ বা দারিদ্র্য-বিষয়ক প্রকৃত অবস্থা যাহাই হউক না কেন, বিগত দুই তিন বৎসরের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে বিশেষত্ব যে কিছু আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। খাঁটি নজীর এবং তথ্য ইহার সমর্থন করিতেছে, সেইদিকে নজর দেওয়া যাউক।

## পণ্য-দ্রব্যের মূল্য-হ্রাস

১৯৩২ সনের জুন মাসের বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের অর্থনৈতিক কমিটির বিবরণীতে প্রকাশ (জেনীভা), ১৯২৯ সনের প্রথম তিন মাসের তুলনায় অদ্যকার বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিমাণ মাত্র ৫০% (মূল্য হিসাব)। অর্থাৎ মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে আধা-আধি। ওজন খুব বেশী না কমিলেও কমিয়াছে। বিলাত হইতে কয়লা রপ্তানি ১৯২৮ সনের ৫০,০৫১,০০০ টন হইতে ১৯৩১ সনে ৪২,৭৪৯,০০০ টন দাঁড়াইয়াছে। আরও

বহু জিনিষের রপ্তানি কমিয়াছে ; তন্মধ্যে নিম্নের তালিকায় কয়েকটীর হিসাব দেওয়া হইল :—

| রপ্তানি মাল | ১৯২৮ সনে | ১৯৩১ সনে |
|---|---|---|
| ১। বিলাতের তুলা শিল্প | ৪১৫,০০০ টন | ২১৪,০০০ টন |
| ২। মার্কিণ মোটর গাড়ী | ৫০৭,০০০ গাড়ী | ১২০,০০০ গাড়ী ( দশ মাসে ) |
| ৩। জার্ম্মাণ কেমিক্যাল | ৪,৬৫৮,০০০ টন | ৩,১৮৪,০০০ টন |
| ৪। বেলজিয়ান ধাতু-শিল্প | ৫,৩৩০,০০০ ,, | ৪,৩৩৬,০০০ ,, |
| ৫। ফরাসী বস্ত্র | ২৩৫,০০০ ,, | ১৮০,০০০ ,, |

১৯২৯ সনের পর হইতে দুনিয়া জুড়িয়া সর্ব্বত্র কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য-হ্রাসের জন্য বড়-বড় শিল্প-প্রধান দেশগুলার রপ্তানি-বাণিজ্য অত্যন্ত বাধা পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের তরফ হইতে বিচার করিলেও বিষয়টা পরিষ্কার হইয়া আসিবে। ১৯১৪ সনের জুলাই শেষের সূচী সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯২৯ এবং ১৯৩২ এই দুই সনে দ্রব্য-মূল্যের সূচী-সংখ্যা নিম্নরূপ দাঁড়ায় :—

| | খাদ্য শস্য | ডাইল | চিনি | চা | অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য | তৈল বীজ | কাঁচা পাট | কাঁচা তূলা | সকল পণ্য দ্রব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ১২৮ | ১৫৫ | ১৬৪ | ১২৯ | ১৭০ | ১৭৫ | ৯০ | ১৪৬ | ১৪৮ |
| † | ৬৬ | ৮৩ | ১৪৭ | ৫৯ | ১০৭ | ৭১ | ৪৫ | ৮৯ | ৯২ |

দুনিয়ার সর্ব্বত্র দ্রব্য-মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩২ সনের এপ্রিলে মূল্য-হ্রাসের শতকরা হিস্যা ১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বরের সূচী-সংখ্যার তুলনায় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

* সেপ্টেম্বর ১৯২৯। † এপ্রিল ১৯৩২।

| | | |
|---|---|---|
| চিনি | ... | ১১'৪% |
| অন্যান্য পণ্যদ্রব্য | ... | ৩৭'১% |
| সকল প্রকার পণ্যদ্রব্য | ... | ৩৭'৯% |
| কাঁচা কার্পাস তুলা | ... | ৩৯'১% |
| ডাইল | ... | ৪৬'৫% |
| খাদ্য শস্য | ... | ৪৮'৫% |
| কাঁচা পাট | ... | ৫০'০% |
| চা | ... | ৫৪'৩% |
| তৈলবীজ | ... | ৫৯'৫% |

সাধারণ মূল্য-হ্রাস ৩৭'৯% দাঁড়াইয়াছে, দেখা যাইতেছে। ডাইল, খাদ্যশস্য, কাঁচাপাট, চা ও তৈলবীজ উৎপাদকদের ক্রয়ক্ষমতা যে অত্যধিক কমিয়া গিয়াছে (৪৬'৫ হইতে ৫৯'৫%) তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান। বলাবাহুল্য ইহাদের বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিবার ক্ষমতাও হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নের তালিকায় ১৯২৮-২৯ সন হইতে ১৯৩০-৩১ পর্য্যন্ত ভারতের আমদানি-বাণিজ্য-হ্রাসের হিসাব দেওয়া গেল :—

| | | টাকা |
|---|---|---|
| ১৯২৮-২৯ | ... | ৩,০০৬,৯০০,০০০ |
| ১৯২৯-৩০ | ... | ২,৬৮৪,০০০,০০০ |
| ১৯৩০-৩১ | ... | ১,৯১৫,৩০০,০০০ |

প্রত্যেকটী কৃষিপ্রধান দেশের আমদানি-বাণজ্যের একই দশা ঘটিয়াছে।

শিল্প-প্রধান দেশসমূহে কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলা হইতে মালপত্রের অর্ডার জলের গতিতে আর আসে নাই, কারণ ঐগুলার ক্রয় করার মত অবস্থা ছিল না। ফলে শিল্পপ্রধান জনপদগুলার অবস্থাও ঠাণ্ডা হইয়া আসে, লোকজন ও মজুরদের কর্ম্মচ্যুতিও ঘটিতে থাকে।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য-হ্রাস প্রধানতঃ প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়াছিল। তবে চাষ-আবাদের পরিধি-বৃদ্ধি এবং কৃষিকর্ম্মে যন্ত্রপাতি-প্রয়োগ ( অর্থাৎ যুক্তিযোগ )ও ইহার অন্যতম কারণরূপে ধরা যাইতে পারে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯২৯ সনের ৮,৬৭৫,৪২০,০০০ ডলার হইতে ১৯৩০ সনে ৬,২৭৪,৮২৪,০০০ ডলারে নামিয়া যায়। কানাডার ৪০% লোক কৃষিজীবী; ১৯২৮ সনের তুলনায় কানাডাবাসী চাষীদের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া যায় ৪৪%। প্রায় তিন ডজন কৃষিপ্রধান দেশের আমদানি-বাণিজ্য হ্রাস পায় ২০% এবং তাহারও উপর ( যথা ভারতের ৩৭.৯% )।

শিল্পপ্রধান জনপদগুলার বেকার-সমস্যার এই ৪নং কারণ—অর্থাৎ কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য-হ্রাস,—দেখিতে গেলে সাময়িক এবং আকস্মিক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু এই চার-চারটী কারণের সমবেত প্রভাব রীতিমত বিশাল ও ভয়াবহ। তার উপর আর একটী কারণও জুটিয়াছে। চীন ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনকে পঞ্চম বিক্ষোভ বলা চলে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কম বিপদ উপস্থিত করে নাই।

## দারিদ্র্য-সমস্যা

বর্ত্তমান আলোচনায় সামাজিক অর্থনীতিক্ষেত্রের আর একটি প্রাসঙ্গিক ও মহত্ত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসিয়া জুটিতেছে। তাহা হইতেছে এই :—দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধির আলোচনা হইতে কেমন করিয়া বেকার প্রশ্নটা বাদ দেওয়া যায়?

মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় যখন কম হয় তখন সেই জাতিকে দরিদ্র বলা হয়। কিন্তু যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯২৯-৩২ সনের

বেকার-সঙ্কট উপস্থিত হয় তাহাতে এমন-কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা বলা যায় যে, ১৯০৫-১৪ যুগের চেয়ে মুদ্রার মাপে, মালপত্রে বা কাজকর্ম্মের পরিমাণে লোকজনের আয় মাথা-পিছু খানিকটা কম দাঁড়াইয়াছে। বরং মজুরির হার, জিনিষ-পত্রের খাদন প্রভৃতি সকল বিষয়েই বিলাত, জার্ম্মাণি এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোটী-কোটী নরনারীকে ক্রমোন্নতির পথে ধাবমান দেখা যাইতেছে। তবে একথা সত্য যে, কৃষিজীবী, মজুর, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি কোনো-কোনো শ্রেণীর লোক-জনকে অন্যান্য "শ্রেণী"র তুলনায় একটু বেশী অসুবিধা বা কষ্টভোগ করিতে হইতেছে।

সমস্যাটা মোট জাতীয় সম্পদের "বণ্টন" বা অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা-সমূহের ভিন্ন-ভিন্নমুখী গতিবিষয়ক। মোট জাতীয় আয় অর্থাৎ ধন-দৌলত হইতে পৃথকভাবে এইসমস্ত লইয়া আলোচনা-গবেষণার প্রয়োজন। লড়াইয়ের পর থেকে এপর্য্যন্ত বহুদিন ব্যাপিয়া মন্থর কিন্তু স্থির গতিতে শ্রেণী-বিপ্লব চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে যে বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে আথিক মন্দা উহার অন্যতম কারণ বটে। কিন্তু নানা-শ্রেণী-সমন্বিত সমগ্র দেশের বা জাতির দিক্ হইতে বিচার করিলে উহাকে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় বা অবনতি ইত্যাদি আখ্যায় বর্ণিত করা যায় না।

বিলাতের "প্রকৃত মজুরি" ("মালের মাপে মজুরি") সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯১৪ হইতে ১৯২২ সনের মধ্যে প্রকৃত সাপ্তাহিক উপার্জ্জন প্রায় ১১% বাড়িয়াছে এবং "বার্ষিক প্রকৃত উপার্জ্জন" (বেকার অবস্থা সহ) বর্দ্ধিত হইয়াছে ৫%। মজুরি-ষ্টাটিষ্টিকস্‌এর নিম্নলিখিত তথ্যাবলী হইতে এই মন্তব্যের সন্ধান মিলিয়াছে :—

১। নামমাত্র ("টাকার মাপে") সাপ্তাহিক মজুরি :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৫০ : | ১০০ | ১৯২০ : | ৫০০ |
| ১৯১৪ : | ২০০ | ১৯২৮ : | ৩৫০ |

২। জীবন-যাত্রার খরচ :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৫০ : | ১০০ | ১৯২০ : | ২৭৫ |
| ১৯১৪ : | ১১০ | ১৯২৮ : | ১৭৫ |

৩। প্রকৃত ("মালের মাপে") মজুরি ( পূর্ণরূপে কার্য্যে নিযুক্ত মজুরদের )

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৫০ : | ১০০ | ১৯২০ : | ১৮০ |
| ১৯১৪ : | ১৮০ | ১৯২৮ : | ১৯০ |

৪। প্রকৃত ( "মালের মাপে" ) বার্ষিক মজুরি আয় ( কর্ম্মবিরতির হিসাব সহ, কিন্তু অতিরিক্ত খাটুনি বা অন্যান্য কারণবশতঃ অতিরিক্ত উপার্জ্জনের হিসাব বাদে ) :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৫০ : | ১০০ | ১৯২০ : | ১৮৫ |
| ১৯১৪ : | ১৮০ | ১৯২৮ : | ১৮০ |

জার্ম্মাণ অঙ্কগুলাও একই ভাবোদ্দীপক। নিম্নের তালিকাদৃষ্টে সাপ্তাহিক মজুরিহারের উর্দ্ধগতি বেশ বুঝা যাইবে :—

| মজুরদের রকমফের | ১৯১৩ | ১৯২৮ জুলাই | সূচী-সংখ্যা (১৯১৩=১০০) |
|---|---|---|---|
| | মার্ক | মার্ক | |
| নিপুণ মজুর | ৩৫.৩৩ | ৫১.৪৬ | ১৪৫.৬ |
| মামুলি মজুর | ২৩.৫২ | ৩৮.৯০ | ১৬৫.৩ |

এই সময়ের প্রচলিত মূল্য-বৃদ্ধির স্বরূপ নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল :—

| সূচী-সংখ্যা | ১৯১৩ | ১৯২৮ জুলাই |
|---|---|---|
| সকল প্রকার দ্রব্য মূল্যের পাইকারী সূচী-সংখ্যা ... | ১০০ | ১৪১.৬ |
| জীবনযাত্রা খরচের সূচী সংখ্যা ... | ১০০ | ১৫২.৬ |

১৯২৫ সনের জুলাই মাসের মামুলি মজুরদের মজুরির সূচী-সংখ্যা (১৬৫·৩) ১৪১·৬ ও ১৫২·৬ দু-দুটো মূল্য-সূচী সংখ্যার চেয়েই বেশী। নিপুণ মজুরদের মজুরির সূচী-সংখ্যা (১৪৫·৬) পাইকারী সূচী-সংখ্যা ১৪১·৬ অপেক্ষা বেশী হইলেও জীবনযাত্রার সূচী-সংখ্যা ১৫২·৬ অপেক্ষা কম। মোটের উপর বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণিতে দারিদ্র্য-বৃদ্ধি হইয়াছে একথা মোটেই বলা চলে না।

## সরকারী বেকার-সাহায্য

আর্থিক মন্দা ও বেকার-ভীতির বর্ত্তমান যুগে সরকারী বাজেটগুলা ঘাঁটিলে জাতীয় সমৃদ্ধির কাহিনীই পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

এখন একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। সভ্য দেশগুলার রাষ্ট্রকে বেকার লোকগুলাকে পুষিতে হইতেছে। ঐসমস্ত দেশের সরকারী রাজস্ব লক্ষ লক্ষ বেকার নরনারী প্রতিপালনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। অবস্থা সঙ্গীন হওয়া সত্ত্বেও করদাতাদের বিশেষতঃ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান-গুলার অবস্থা বেশ ভাল। তবে মজুররূপে নয়, নাগরিকরূপেই লোকেরা মজুরি বা অন্নবস্ত্র পাইতেছে। খাঁটি গরীব দেশের লোকেরা সমাজ-সেবা বাবদ এই সরকারী ব্যয়, "সঙ্কট-চাঁদা" ও বেকার-বীমার রহস্য বুঝিতেই পারিবে না আর সন্তোষজনকভাবে দুর্ভিক্ষ দূর করিতেও পারিবে না। যত বেশী ব্যয়সঙ্কোচ এবং টানাটানিই করুক না কেন, জার্ম্মাণ বা বিলাতী বাজেট বুভুক্ষিত বা অনশনক্লিষ্ট জাতির বাজেট নয়। আরও একটি ব্যাপার বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। এত বেকার-সমস্যার হুড়াহুড়ি, তবুও জার্ম্মাণি এবং বিলাতের সঙ্ঘবদ্ধ মজুরকুল মজুরি-হ্রাসের পক্ষপাতী নয়। এই দুই দেশ উচ্চ মজুরির হার দিতে সমর্থ এবং মজুরদেরকে ভালভাবে রাখিতেও সমর্থ। অর্থাৎ লোকের ধারণা, গবর্ণমেণ্ট এবং কারবারের মালিকগণ আইনসঙ্গত আর্থিক ভাতা

অথবা পারিশ্রমিক দ্বারা গোটা জাতিকে ভালভাবে পালন করিতে পারে। বুঝা যাইতেছে যে, আর্থিক ব্যবস্থার কোথাও-কোথাও নড়চড় বা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিলেও বেকার-গ্রস্ত দেশগুলার সরকারী রাজস্ব বা জাতীয় সম্পদ্ আদৌ বিপন্ন হয় নাই।

বেকারবীমা সম্পর্কে বিলাতে যে রাজকীয় কমিশন বসিয়াছিল তাহার প্রথম বিবরণীতে সরকারী খরচপত্রের আনুমানিক বরাদ্দ বাহির হইয়াছে। নিম্নে এই বরাদ্দটা প্রকাশ করা গেল। তাহা দেখিলে বুঝা যাইবে বিলাতী রাষ্ট্র বেকারবীমার তহবিলে কি পরিমাণ অর্থ-সাহায্য করিয়াছে। হিসাব নিম্নরূপ :—

| | পাউণ্ড |
|---|---|
| ১। বীমা তহবিলে দেয় চাঁদা | ১৪,৮০০,০০০ |
| ২। "ট্র্যাঞ্জিশনাল্" বা সাময়িক সহায়তাদানের খরচা (বেকার হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের ভিতর যেসমস্ত বেকার-মজুর ৩০ বার চাঁদাও দেয় নাই, সুতরাং যাহারা প্রকৃতপক্ষে বীমা গ্রহণের অধিকারী নহে) ... | ৩৫,০০০,০০০ |
| সরাসরি চাঁদা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের মোট খরচা ... | ৪৯,৮০০,০০০ |
| বৎসরের মধ্যে কর্জ্জ ... | ৩৯,৫০০,০০০ |
| মোট ... | ৮৯,৩০০,০০০ |

মোট সরকারী খরচার তুলনায় বিলাত একমাত্র সমাজ-বীমার জন্য সাধারণতঃ কি পরিমাণ খরচা করিতে অভ্যস্ত নিম্নে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল :—

| সন | চাঁদা | মোট ব্যয় | শতকরা হিসাব |
|---|---|---|---|
| | পাঃ | পাঃ | |
| ১৯২৭-২৮ | ১২,১০৩,১০৫ | ৮৩৮,৬০০,০০০ | ১'৪% |
| ১৯২৮-২৯ | ১২,০৭৭,৬৫১ | ৮১৮,০০০,০০০ | ১'৪% |

বেকার বীমা আইন (১৯২৭) জারি হওয়ার পূর্ব্বে জার্ম্মাণিকে বেকারদের মোটা অর্থ-সাহায্য করিতে হইয়াছে। ১৯২৫-২৬ সনে জার্ম্মাণি নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় করিয়াছে :—

| | | রাইখ্‌স্ মার্ক |
|---|---|---|
| ১। | বেকারদিগকে সরকারী সাহায্য ... | ৪৮৯,৮০০,০০০ |
| ২। | মোট সরকারী ব্যয় | ১৪,৪৭৭,৯০০,০০০ |
| ৩। | (২) ও (১) এর শতকরা হিস্যা ... | ৩'৩% |

জার্ম্মাণিতে বেকার বীমা আইনের প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৭ সনের অক্টোবর হইতে ১৯২৮ সনের সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোট বীমাকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫,৯০৪,৯৩৫ জন। ইহার মধ্যে ৯৬৯,০৩৯ জন বীমাকারীকে ৯৭০,০০০,০০০ রাইখস্ মার্ক সাহায্য করিতে হইয়াছিল। জার্ম্মাণিতে বেকার বীমা তহবিলে রাষ্ট্রকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় না। সমস্ত চাঁদা মজুর এবং মালিককেই দিতে হয়। কিন্তু জার্ম্মাণ বেকার-বীমা আইনে একশ্রেণীর মজুরের উল্লেখ আছে যাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টই রক্ষা করিয়া থাকে। "সঙ্কট"কালে যেসমস্ত মজুর বিপন্ন হয় তাহারা এই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে সঙ্কট-সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩৭,৯২২,৯৫৮ রাইখস্ মার্ক। এই টাকা মোট সরকারী ব্যয়ের প্রায় ১%।

উপরে যেসব বেকার-অবস্থা বিশ্লেষণ করা গেল সেসব যদি আপেক্ষিক দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধির নিশ্চিত চিহ্নোৎ বা সাক্ষী না হয়

তবে আর্থিক দুনিয়ায় আজ এত বেশী চাঞ্চল্য, অধীরতা বা ভীতি-বিহ্বলতা কিসের জন্য ?

অবস্থাটা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। আমরা প্রথমেই বলিতেছি যে, বেকারব্যাধিগ্রস্ত অঞ্চলগুলা উক্ত সামাজিক ব্যাধি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় পূর্ব্বেকার চেয়ে দরিদ্রতর হইয়া যায় নাই ; দ্বিতীয়তঃ, যেসমস্ত দেশে এখন বেকারের নাম-গন্ধ নাই সেসব দেশের চেয়েও এরা দরিদ্রতর নয়। এই আলোচনার ভিতর ভারতীয় জীবনযাত্রার মাপকাঠি বা ভারতীয় কর্ম্মদক্ষতা ও মুরোদ-সম্পর্কীয় আলোচনার অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন। অন্যপক্ষে ইহা স্বীকার করা আবশ্যক যে, আমূল তলাইয়া দেখিতে গেলে বলিতে হয়, দারিদ্র্য মানবজীবনের শাশ্বত এবং সার্ব্বজনীন অভিব্যক্তি। দারিদ্র্য নাই এমন কোনো জাতির কল্পনা করাও যায় না। তাছাড়া অর্থ নৈতিক ক্রমবিকাশের প্রত্যেকটী স্তরে সেই স্তরের অনুযায়ী দারিদ্র্যের আকার-প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্থিক জীবনের কোনো-কোনো অবস্থায় দারিদ্র্য বেকারের রূপ ধারণ করে। এই একই দারিদ্র্য ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন-ভিন্ন আকারে দেখা দেয়,—যথা "আধা-আধি বেকার", দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। সভ্যতার কোনো এক স্তরে নরনারীকে দুর্ভিক্ষের সাথে লড়াই করিতে হয়, অন্য অবস্থায় তাহাকে বেকারব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয়। একথা ভুলিলেও চলিবে না যে, বেকার তথা দুভিক্ষেরও কমবেশী বা উনিশ-বিশ আছে। দারিদ্র্য যে আকারের এবং যে পরিমাণেরই হউক না কেন, পুঁজিতান্ত্রিক আর "সমাজতান্ত্রিক" সকল প্রকার আর্থিক ব্যবস্থাতেই এই সামাজিক ব্যাধির প্রকোপ অনিবার্য্য। এই জন্যই রামা, শ্যামা, আবদুল, মজিদ ইত্যাদি মামুলি মানুষ থেকে অর্থনীতি ও রাজনীতির বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি সকলের মধ্যে অশান্তি, অধীরতা ও বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে।

## মন্দা-চিকিৎসা

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, বর্ত্তমান আর্থিক মন্দা অংশতঃ "চক্রাকারের", সুতরাং ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ইহার খানিকটা "যুগব্যাপী" সুতরাং বহু সময় ব্যাপিয়াও ইহার অস্তিত্ব চলিতে পারে। যুক্তিযোগ-প্রসূত বেকারত্বের পক্ষে দ্বিতীয় লক্ষণটাই বিশেষরূপে কার্য্যকর। অর্থাৎ আধুনিক দারিদ্র্যের অঙ্গীভূত বেকারব্যাধি সমাজদেহ হইতে কোনোকালেই সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাই বলিয়া ইহার চিকিৎসা যে চলে না, এমন নয়। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে, দারিদ্র্য চিরন্তন, এই জন্য দুর্ভিক্ষ বা বেকার-ব্যাধিও মানব-সভ্যতার নিত্য সহচর। এই নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর সত্যটা সোজাসুজি বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। মোলায়েম বুলি আওড়াইলে পেট ভরিবে না। সকল যুগে, সকল দেশে কতকগুলা লোক, জাতি বা শ্রেণীর পক্ষে কষ্টভোগ করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। অর্থনীতিবিদ্ রাষ্ট্রবীরদিগকে এজন্য যুগে-যুগে নতুন-নতুন দাওয়াই আবিষ্কার করিতে হইবে। অর্থাৎ যতদূর সম্ভব, দুনিয়াকে চিরকাল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুঝিবার জন্য অঞ্চল হইতে অঞ্চলান্তরে নয়া-নয়া ঢঙের "পঞ্চবার্ষিক" কর্ম্মকৌশলে অভ্যস্ত হইতে হইবে। আর এই চিকিৎসা চালাইতে হইবে যেমনি সজ্ঞানে, ও সতর্কভাবে তেমনি সার্ব্বজনীনভাবে।

দুইটী সমস্যা সম্বন্ধে নাড়াচাড়া করা আবশ্যক। প্রথমতঃ বেকার ব্যাধি যখন বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তখন রাষ্ট্রকে যেমন করিয়াই হউক বেকারদিগকে পালন করিতে হইবে। প্রাচীন কালে বা মধ্যযুগে পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, গীর্জ্জা বা ধর্ম্মকেন্দ্র যেভাবে "দরিদ্র-নারায়ণে"র সেবা করিয়াছে আধুনিক রাষ্ট্রকে ঠিক সেইভাবে দরিদ্র-রক্ষক হইতে হইবে। নিতান্ত সেকেলে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত

দরিদ্রসেবা ও দানখয়রাৎ আধুনিক যুগেও সকল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাত ও জার্ম্মাণি দুই দেশেই সেকেলে "দরিদ্রসেবার" রেওয়াজ সমান বর্ত্তমান। বর্ত্তমান যুগেও জার্ম্মাণিতে ভ্রাম্যমাণ সহুরে রন্ধনশালা হইতে শত সহস্র মজুর ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকজনকে ঝোল-তরকারী পরিবেষণ করার ব্যবস্থা আছে। মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে বিনা পয়সায় অভাবগ্রস্ত নরনারী ও ছেলেমেয়েদের ঘরে-ঘরে আহার্য্য সরবরাহের ব্যবস্থা জার্ম্মাণ-অষ্ট্রিয়ান সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম মামুলি কথা।

মোটের উপর সেকেলে দরিদ্রসেবার পন্থাগুলা এখনও বহুদিন চলিবে। আধুনিক যুগের দরিদ্রসেবা কিন্তু ক্রমেই রাষ্ট্র-পরিচালিত ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজবীমায় পরিণত হইতে থাকিবে। এমন কোনো সভ্যতার কল্পনা করা যায় না, যেখানে দরিদ্র-সেবার কোনো স্থান থাকিবে না। সময়-সময় দানখয়রাতের রূপান্তর উপস্থিত হয় মাত্র। নয়া আকার-প্রকারের মধ্যে সম্প্রতি দেখা যাইতেছে সরকারী "সাহায্য" বা রাষ্ট্র-পরিচালিত বীমা। যে-কোনো আকারেই হউক না কেন, যাহারা যে-কোনো কারণ বশতঃ উপার্জ্জনে অক্ষম এমন লক্ষ-লক্ষ নরনারীকে নির্জ্জলা দান-খয়রাতের উপরই ভবিষ্যতেও নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু রাষ্ট্র যতদিন পর্য্যন্ত করদাতাদের অর্থাৎ যে-সব ধনী করপ্রদানে সমর্থ তাহাদের নিকট আবশ্যকমত কর সংগ্রহ করিতে পারে ততদিন পর্য্যন্ত এই সমস্ত লক্ষ-লক্ষ নরনারী রাষ্ট্রের নিকট তাহাদের ভাত-কাপড়ের দাবী সার্থকভাবে উত্থাপন করিতে পারিবে। কেন না শেষ পর্য্যন্ত সরকারী তহবিলে ধনদৌলতের মালিকগণই অর্থ যোগাইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে যদি লাভ না হয় তাহা হইলে সরকারী তহবিলে অর্থ যোগানো কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের মালিকদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

## পাইকারী দরের ঘাটতি

এইবার আবার বর্ত্তমান অবস্থার বিশ্লেষণে প্রবেশ করা যাউক। পাইকারী দর দেখিয়া ভিন্ন-ভিন্ন আর্থিক জনপদ সঙ্কটদ্বারা কিরূপ অভিভূত হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। অবশ্য ভিন্ন-ভিন্ন জনপদে সঙ্কট ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রায় ডজন তিনেক দেশ তাহাদের সূচী-সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, ১৯২৯ সনের আগষ্ট হইতে ১৯৩০ সনের নবেম্বর পর্য্যন্ত মাত্র তিনটী দেশে সূচী-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ বাড়িয়াছে :—

| | | |
|---|---|---|
| স্পেন | ... | ২·৯% |
| রুশিয়া | .. | ৩·৩% |
| চীন | ... | ৭·৯% |

এই তিনটী দেশছাড়া দুনিয়ার সর্ব্বত্র পাইকারী দর হ্রাস পাইয়াছে। সর্ব্বত্র একভাবে হ্রাস পায় নাই; নিম্নলিখিত দশটী দেশের হিসাব হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। ১৯২৯ সনের আগষ্ট হইতে ১৯৩০ সনের নবেম্বর পর্য্যন্ত ঘাট্‌তির হার এইরূপ :—

| | দেশ | | হ্রাসের হার |
|---|---|---|---|
| ১। | জার্ম্মাণি | ... | ১৩·০% |
| ২। | পোল্যাণ্ড | ... | ১৭·০% |
| ৩। | ফ্রান্স | ... | ১৭·৩% |
| ৪। | ইতালি | ... | ১৭·৫% |
| ৫। | বিলাত | ... | ১৭·৬% |
| ৬। | মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র | ... | ১৭·৭% |
| ৭। | অষ্ট্রিয়া | ... | ২১·৩% |
| ৮। | ইংল্যণ্ড | ... | ২২·৫% |

| | দেশ | | হ্রাসের হার |
|---|---|---|---|
| ৯। | ভারত | ... | ২৪·৫% |
| ১০। | জাপান | ... | ২৪·৭% |

পাইকারী দরহ্রাসের প্রভাব ষ্টক একস্‌চেঞ্জ বা কোম্পানীর কাগজের বাজারেও পৌঁছিয়াছে। ১৯২৯ সনে কলকারখানার শেয়ারের দাম সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তাহার পর ১৯৩০ সনের শেষাশেষি এই দর কিভাবে কমিয়াছে তাহা নীচের তালিকার উপর চোখ বুলাইলে টের পাওয়া যাইবে ঃ—

| | দেশ | | হ্রাসের হার |
|---|---|---|---|
| ১। | চীলি | ... | ৫% |
| ২। | নরওয়ে | ... | ১১% |
| ৩। | ডেন্মার্ক | ... | ১৪% |
| ৪। | সুইডেন | ... | ২৯% |
| ৫। | চেকোশ্লোভাকিয়া | ... | ২৯% |
| ৬। | সুইট্‌সারল্যাণ্ড | ... | ৩১% |
| ৭। | বিলাত | ... | ৩১% |
| ৮। | অষ্ট্রিয়া | ... | ৩৪·৫% |
| ৯। | জার্ম্মাণি | ... | ৪৪% |
| ১০। | হল্যাণ্ড | ... | ৪৬% |
| ১১। | মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র | ... | ৫৩% |
| ১২। | ক্যানাডা | ... | ৫৯% |
| ১৩। | বেলজিয়াম | ... | ৫৯·৭% |
| ১৪। | পোল্যাণ্ড | ... | ৬০% |

কলকারখানার শেয়ার সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইবার পর বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে শতকরা নিম্নলিখিতরূপে হ্রাস পাইয়াছে ঃ—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। জার্ম্মাণি | ১৯২৭ এপ্রিল | হইতে | ১৯৩১ জুন | ৬১·৭% |
| ২। হল্যাণ্ড | ১৯২৯ মার্চ্চ | ,, | ,, | ৬০·০% |
| ৩। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র | ১৯২৯ সেপ্টেম্বর | ,, | ,, | ৫৯·৭% |
| ৪। ফ্রান্স | ১৯২৯ ফেব্রুয়ারি | ,, | ,, | ৫৫·৭% |
| ৫। বিলাত | ১৯২৯ জানুয়ারি | ,, | ,, | ৪৫·০% |
| ৬। সুইডেন | ১৯২৯ জুলাই | ,, | ,, | ৩০·৬% |
| ৭। সুইট্সারল্যাণ্ড | ১৯২৮ সেপ্টেম্বর | ,, | ,, | ২৯·৩% |

কোম্পানীগুলার দেউলিয়া হওয়া ও ব্যাঙ্কসমূহের ফেল-মারা যেন দস্তুরে পরিণত হইয়াছে। ১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় যে দুর্য্যোগ দেখা দেয় তার ঢেউ ইয়োরোপেও আসিয়া লাগে এবং অল্প মেয়াদের গচ্ছিত টাকা তুলিবার ধুম পড়িয়া যায়। ১৯৩১ সনের বসন্তে ভিয়েনার এ্যাষ্টার-রাইখিশে ক্রেডিট-আন্ষ্টাল্ট্ ফেল মারে এবং তাহার অল্প দিন পরেই বার্লিনের ডার্ম্মাষ্টাট্টার উণ্ড্ নাট্সিওনাল বাঙ্কের দুয়ার বন্ধ হয়। ইহার ধাক্কায় বিলাত স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় (সেপ্টেম্বর ১৯৩১)। ১৯৩১ সনে এক আমেরিকাতেই ২৩০০টা ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইয়া ফেলে।

পুঁজির বাজারের এই দুর্য্যোগে লোকের মনে পুঁজি খাটাইবার আগ্রহ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া পড়ে। সুতরাং চল্তি কারবারগুলা যাহাতে লাভজনক ব্যাপারে পরিণত হয় বর্ত্তমানে তাহাই প্রধান সমস্যা।

## চাই ক্রয়-ক্ষমতার বাড়তি

দ্বিতীয় সমস্যাটা বেকার-দুর্য্যোগের সাময়িক রূপ বা চক্রাকার সম্পর্কে। এই দুর্য্যোগ দূর করিতে হইলে চাই বেকার লোকের সংখ্যা-হ্রাস অর্থাৎ নতুন মজুর ও কৃষকদের জন্য কাজের সংস্থান। বেকার-

সমস্যা দূর করার ধান্ধা গবর্ণমেণ্টের ততটা নয় যতটা জনসাধারণের ; অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের মালিকদিগকে ইহার পূরা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। যে-কোনো দিক্ হইতেই বিচার করা হউক শেষ পর্য্যন্ত সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি—লাভজনক ব্যবসার পত্তন করা আবশ্যক। সোজা কথায় এমন সব কারবার বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কায়েম বা পরিচালন করিতে হইবে যাহা হইতে দু'পয়সা রোজগার হইতে পারে। ব্যাপারটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল আর বেকার-ব্যাধিগ্রস্ত দেশ, দুইয়ের নিকট এ এক বিষম প্রহেলিকা। বোঝা শেষ পর্য্যন্ত পুঁজিওয়ালা-শ্রেণী বা বুর্জ্জোয়াদের উপরেই চাপে এবং তাহাদের ধনোৎপাদনের সামর্থ্যের উপরই সব-কিছু নির্ভর করে।

বর্ত্তমানে লাভজনক শিল্প-ব্যবসা পরিচালন করা বড়ই কষ্টসাধ্য। কেন এরূপ হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। ইহার উত্তর অত্যন্ত সহজ। বাজারের আয়তন খুব বেশী নয় অর্থাৎ ক্রেতার সংখ্যা বাস্তবিকই কম। লোকের ক্রয়-ক্ষমতা না বাড়িলে উৎপাদকদের শিল্প-ব্যবসা বাড়িতেই পারে না। সুতরাং কোনো কারবারে লাভের মুখ দেখিতে হইলে সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে, খাদনের মাপকাঠি, জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং মানুষের ক্রয়-ক্ষমতাও সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতেছে বা উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে পৌছিতেছে। জার্ম্মাণি, বিলাত বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও বেকার অবস্থা দূর করিতে অক্ষম। যতদিন পর্য্যন্ত স্বদেশ ও বিদেশের বাজার না বাড়িতেছে অর্থাৎ দেশ-বিদেশে বেশী-বেশী মাল বিক্রী না হইতেছে ততদিন এই দেশগুলি দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। এইসমস্ত দেশের অর্থনৈতিক ধুরন্ধরদিগকে নিম্নতর ও অবনত আর্থিক ধাপে অবস্থিত দেশগুলার,—যথা বলকান রাষ্ট্রনিচয়, রুশিয়া, চীন,

ভারতবর্ষ, লাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশের—আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে।

## অনগ্রসর দেশের স্বদেশী আন্দোলন

একমাত্র শিল্পোন্নতি এবং আধুনিক প্রথায় কৃষি-পরিচালন দ্বারাই এই অনগ্রসর দেশগুলার ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িতে পারে। এইসমস্ত দেশের শিল্পোন্নতির ফলে বিলাত, জার্ম্মাণি বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অল্প-বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা নতুন কতকগুলা প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া জুটিবে। কিন্তু প্রথম প্রথম কেবলমাত্র সাদাসিধে ও নিম্নশ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকিবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদেশী-বর্জ্জন বা শিল্প-সংরক্ষণ ইত্যাদির ফলে অনগ্রসর দেশগুলি বস্ত্র-শিল্পে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। কিন্তু এখনও বহুবর্ষ যাবৎ উৎকৃষ্ট পণ্য-সম্ভারের জন্য এই দেশগুলাকে বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। তাছাড়া কল-কারখানার রেওয়াজ-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে বহুল পরিমাণে যন্ত্রপাতি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির আমদানি করা আবশ্যক হইবে। তখন লোকের সম্পদ্‌ও বাড়িবে এবং এই সঙ্গে এমন কি কৃষককুলের মধ্যেও ভাল-ভাল জিনিষ এবং অন্যান্য নানা-প্রকার বিদেশী দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় নজরে পড়ে। এইসমস্ত অঞ্চলে মারকাট করিয়া যত-বেশী স্বদেশী ব্যাঙ্ক ও ইনশিওরেন্স কোম্পানী ইত্যাদি পুঁজি-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠুক না কেন, কলকারখানা গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহাদিগকে বিদেশে কিছু-কিছু পুঁজি ঢুঁড়িতেই হইবে। সুতরাং যেসমস্ত অনগ্রসর দেশ কলকারখানার রেওয়াজ-বৃদ্ধির জন্য মাথা ঘামাইতেছে সেইসকল দেশে পুঁজি রপ্তানি করিবার জন্য দুনিয়ার বেকার-প্রপীড়িত অথচ

পুঁজিশীল দেশগুলার উপর তলব পড়িতেছে। মহাযুদ্ধের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স বহুৎ ধন-দৌলত সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে। সুতরাং এই দুই দেশকে এ সম্বন্ধে অগ্রণী হইতে হইবে।

বেকারব্যাধিগ্রস্ত দেশ তিনটাকে বাধ্য হইয়া পুঁজি খাটাইবার নতুন-নতুন রাস্তা ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। প্রথমতঃ, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে অন্যান্য দেশগুলায় যেসমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উন্নত তিনটি দেশকে ঐসমস্ত শিল্পের কিছু-কিছু পরিত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উহাদিগকে নতুন-নতুন বিশেষ ধরণের শিল্পসমূহে পুঁজি ঢালিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ যন্ত্র-তৈরীর কারখানার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে; কারণ অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলায় শিল্পোন্নতি-বিধানের জন্য যন্ত্রের চাহিদা না বাড়িয়াই পারে না। তৃতীয়তঃ, উহাদিগকে কৃষিক্ষেত্রে নয়া পুঁজি ঢালিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার ফলে একদিকে কৃষির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ-স্থাপনও সাধিত হইবে। ফলতঃ, ক্ষেতখামার এবং কলকারখানার স্থানীয় অভাব-মাফিক লোকজনের বসবাসেরও সুবিধা হইবে। তাহাতে নয়া-নয়া কেন্দ্রে পল্লী-শহর ইত্যাদি গড়িয়া উঠিতে থাকিবে। জার্মাণি, বিলাত এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বনিয়াদ এইভাবেই এক বিরাট রূপান্তরের পথে যাত্রা সুরু করিবার উপক্রম করিয়াছে। এইসমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবে"র কয়েকটা লক্ষণরূপে ধরা হইতে পারে।

১৮৭০-৮৫ সনে একালের "সাবালক" শিল্পোন্নত দেশগুলা শিল্প-বিস্তারের ও যোগ্যতার উচ্চতর ধাপে উপনীত হয়। সেই ধাপে উঠিতে সুরু করিবে বর্ত্তমানের অনগ্রসর দেশগুলা,—তাহাদের স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে। সমসাময়িক অন্যান্য অনগ্রসর

দেশগুলার সাথে ভারতবর্ষও পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অপরিহার্য্য অংশ-রূপে খানিকটা উন্নততর কোঠায় নিশ্চয়ই পৌঁছিবে। ভারত ইত্যাদি দেশের পক্ষে ইহা প্রথম "শিল্প-বিপ্লবে"র যুগরূপে ধরা যাইতে পারে। এইখানে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। সাবালকদের দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের সহিত নাবালকদের প্রথম শিল্প-বিপ্লবের নাড়ীর যোগাযোগ রহিয়াছে। বিপ্লব দুইটা একই অর্থ-নৈতিক গড়নের অন্তর্গত। রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বিদেশী বর্জ্জন এবং সংরক্ষণ-শুল্কের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও আগামী আধ পুরুষ বা এক পুরুষকাল ধরিয়া দুনিয়ার ধনদৌলতের এই ধারাই বাস্তবে পরিণত হইতে থাকিবে।

সোজা কথায়, জার্ম্মাণি, বিলাত এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মজুরদের জীবনযাত্রা-প্রণালী উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামেই উঠিতে থাকিবে। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে সেই-পরিমাণে যে-পরিমাণে বলকান জনপদ, পূর্ব্ব-ইয়োরোপ, রুশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, ব্রাজিল, চীলি, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশের চাষীদের ক্রয়-ক্ষমতা, খাদনের বহর ও জীবনযাত্রার মাপকাঠি ইত্যাদি বাড়িয়া উঠিবে। সমাজ-বিজ্ঞান এবং বিশ্বশক্তির গবেষকেরা এই অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের প্রতি আশার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে।

## সংরক্ষণ-শুল্ক

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ভবন ( প্যারিস ) নামক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘ ( জেনীভা ) আজ "শুল্ক-সন্ধির" কথা চৌপর দিনরাত সর্ব্বত্র ছড়াইতেছে। আর এইসমস্ত জল্পনা-কল্পনা আন্তর্জ্জাতিক মনোভাব গঠনেও খুব সাহায্য করিতেছে। এই কারণবশতঃ ১৯২৯ সনের পরবর্ত্তী বিশ্ব-সঙ্কট-বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে অবাধ-বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণের সনাতন কোন্দল আবার মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইয়াছে। মন্দা এবং বেকার অবস্থার জন্য লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগের সংরক্ষণ-শুল্কের উপরেই সকলে দোষ চাপাইতেছে।

এইরূপ দোষ-চাপানো যুক্তিসঙ্গত কিনা সন্দেহ। চলতি ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাস ও আমদানি-রপ্তানির মাপজোকের মুখে এই মতবাদ দাঁড় করানো অত্যন্ত শক্ত। ফ্রান্স সংরক্ষণ-শুল্কের দেশ, কিন্তু এই দেশে আর্থিক মন্দা মারাত্মক আকার ধারণ করিতে পারে নাই। অপর পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যে "উদারনীতি" বেকার-ব্যাধির দাওয়াই,— এই মতবাদ অবাধ বাণিজ্য-নীতির লীলাভূমি বিলাতের বেলায় একদম খাটে না।

রীতিমত মাপজোক ও অঙ্ক কষিয়া দেখা যায় যে, সংরক্ষণ-শুল্ককে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকরূপে ধরা উচিত নয়। ইহা শুনিতে প্রহেলিকার মত লাগিলেও বাস্তবের রাজ্যে এসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১৯২৫ হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের হিসাব খতাইলে দেখা যায় যে, সংরক্ষণ বা অবাধ বাণিজ্য যে-কোনো প্রকারের বাণিজ্যনীতিই অবলম্বিত হউক না কেন, কতকগুলি দেশের আমদানি-বাণিজ্য ( শিল্পদ্রব্য-বিষয়ক ) বাড়িয়া গিয়াছে।

বিলাতী ও বিদেশী শিল্পবাণিজ্য-বিবরণীর ( ১৯২৪-৩০ ) প্রথম ভাগে ছয়টী দেশের মোট আমদানির মধ্যে শতকরা হিস্যারূপে কিরূপ "শিল্পদ্রব্য" আমদানি হইয়াছে তাহার নিম্নলিখিতরূপ হিসাব পাওয়া যায়:—

| সন | বিলাত | মার্কিণ | জার্ম্মাণি | ফ্রান্স | বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ | জাপান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯২৫ | ১৮·৫ | ২১·৮ | ১৬·২ | ১২·৮ | ২১·৮ | ২১·৩ |
| ১৯২৬ | ১৮·৫ | ২৩·০ | ১৩·৬ | ১৩·২ | ২১·৯ | ২২·০ |

| সন | বিলাত | মার্কিণ | জার্ম্মাণি | ফ্রান্স | বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ | জাপান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯২৭ | ১৯.৯ | ২৫.০ | ১৭.৮ | ১৩.৯ | ২২.৭ | ২২.৭ |
| ১৯২৮ | ২০.৯ | ২৫.৬ | ১৭.৫ | ১৮.৮ | ২৬.৩ | ২৪.৫ |
| ১৯২৯ | ২১.২ | ২৬.০ | ১৬.৯ | ২০.২ | ২৭.১ | ২৪.০ |

ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এইসমস্ত দেশের প্রত্যেকটি ১৯২৫ সনের তুলনায় ১৯২৯ সনে বেশী বিদেশী "শিল্পদ্রব্য" ক্রয় করিয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি কমিতে থাকিলেও শিল্পদ্রব্যের আমদানি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র সংরক্ষণ ও সংরক্ষণমূলক আইন-কানুনের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও এই সময়ের মধ্যে শিল্পদ্রব্য আমদানির বাড়তি পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং সংরক্ষণের জন্য আর্থিক মন্দা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ ধারণা চালানো ঠিক নয়। শিল্পবিপ্লবের গোড়া হইতেই সংরক্ষণ-শুল্কের রেওয়াজ যেন অর্থনীতির ইতিহাসের আটপৌরে বিষয়বস্তু। সুতরাং সংরক্ষণ-শুল্ক সমসাময়িক আর্থিক বনিয়াদের পহেলা খুঁটা বিশেষ। একশত বৎসরের মধ্যে যেরূপ সঙ্কট কখনও দেখা যায় নাই আজিকার দিনে সেই অত্যদ্ভুত সঙ্কট আবির্ভূত হইয়াছে। তাহার কারণ ঢুঁড়িবার জন্য সংরক্ষণ-নীতির দোহাই পাড়িতে বসিলে ইতিহাসেরও ইজ্জৎ যাইবে আর যুক্তি-তর্কেরও মাথা খাওয়া হইবে।

## মহালড়াইয়ের ক্ষতি-পূরণ

বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার আলোচনা সঙ্ক্ষেপে করিতে গেলেও, যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ নামক জটিল আর্থিক ব্যবস্থার সহিত উহার কি সম্বন্ধ তাহা খতাইয়া না দেখিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রারম্ভেই একটা কথা বলিয়া রাখি। মিত্রপক্ষকে জার্ম্মাণি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য যে টাকা দিতে বাধ্য তাহার সহিত মিত্রপক্ষের

নিজেদের মধ্যে যে যুদ্ধ-ঋণ আছে তাহার পরিশোধের সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে বেশী নয়। জার্ম্মাণির দেনা একপ্রকারের জিনিষ আর মিত্র-পক্ষের ভিতরকার পরস্পরের দেনা আর এক প্রকারের জিনিষ। হিসাব-নিকাশের বেলায় এই দুই বিভিন্ন দেনায় কাটা-কাটি কিছু-কিছু চলিতে পারে মাত্র। কিন্তু কি ইতিহাস, কি আইনের কেতাব কোনোখানেই যুদ্ধ-ঋণের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যুদ্ধের পরবর্ত্তী আর্থিক দুনিয়ায় এ দুটোই আলাদা চিজ্ এবং এ দুটোকেই স্বতন্ত্র ভাবিতে হইবে। অঙ্ক কষিয়াও দেখা যায়, ক্ষতিপূরণ দ্বারা যুদ্ধ-ঋণের কাটাকাটি করা অসম্ভব। ১৯৩০ সনে ক্ষতিপূরণ যুদ্ধ-ঋণের চেয়ে ১,২৯৫,০০০,০০০ রাইখ্স্ মার্ক বেশী হইয়াছিল, ১৯৪২ সনেও ক্ষতিপূরণ ৭৪৫,৪০০,০০০ রাইখ্স্ মার্ক বেশী থাকিবে।

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নাকচ করা মূলতঃ রাজনৈতিক সমস্যা। ভার্সাই সন্ধির থিয়োরি বা সিদ্ধান্ত (২৩১ অধ্যায়) অনুসারে যুদ্ধের ক্ষতির জন্য জার্ম্মাণিকে একমাত্র পাপী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ সাব্যস্ত করা অন্যায়। কাজেই যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাতিল না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ আত্মায় শান্তি নাই। শান্তি আসিতে পারে না। জার্ম্মাণির একমাত্র রাজনৈতিক সমস্যাই এইখানে। ১৯১৯ সনের পর গণ্ডায়-গণ্ডায় ভার্সাই-বিরোধী আন্দোলনে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে এবং ইহা চরম আকার ধারণ করিয়াছে "লৌহ শিরস্ত্রাণ", "জাতীয় সমাজ-তন্ত্রবাদী" (হিট্লার) ইত্যাদি দলের আবির্ভাবে ও আন্দোলনের বিক্ষোভে। ১৯৩২ সনের জুলাই মাসে ফোন্ পাপেনের ষড়যন্ত্র এই সর্ব্বশেষ পরিণতি। সম্প্রতি জার্ম্মাণ জাতীয়তানিষ্ঠ রাষ্ট্রিক দলসমূহের এই দাবী মিত্রপক্ষীয় দেশগুলার জনসাধারণও সহানুভূতির চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণের অর্থদ্বারা ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের রণবিধ্বস্ত অঞ্চলের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। উপরন্তু ঐগুলা চূড়ান্ত আধুনিক অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। জার্ম্মাণির কোক্‌, রং, কেমিক্যাল, কৃষিজাত দ্রব্য, কাঠ, চিনি ইত্যাদি দ্বারা গ্রীস, রুমানিয়া, জুগোস্লাভিয়া, পর্ত্তুগাল এবং এমন কি ইতালি পর্য্যন্ত শিল্পবিস্তার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলার আধুনিকতা সম্পাদনে সুবিধা করিয়া লইয়াছে। কাজেই মোটের উপর জার্ম্মাণি সম্বন্ধে মিত্রপক্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়া বর্ত্তমানে খানিকটা ভালই। অন্ততঃপক্ষে ১৯২৯ সনের জুন নাগাদ লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ-বিষয়ক টাকাকড়ি আদায়ের জন্য ইয়ং প্ল্যান সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত,—ডয়েস-ব্যবস্থার যুগ পর্য্যন্ত,—যেরূপ ছিল তাহার চেয়ে ভাল।

এই গেল রাষ্ট্রিক তরফের কথা। অপর পক্ষে অর্থনীতির দিক্‌ হইতে বিচার করিলে,—যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং যুদ্ধের ঋণ সমস্তই যদি "এই মুহূর্ত্তে" নাকচ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে জার্ম্মাণির বা মিত্রপক্ষের অথবা বাকী দুনিয়ার সুবিধা হইবে কিনা বাস্তবিকই সন্দেহের বিষয়। বিশেষতঃ, হঠাৎ কোনো-কিছু করিলে অবস্থা খারাপ হওয়ারই সম্ভাবনা। বিগত তের-চোদ্দ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণ জাতির শিল্প ও সাধারণ সামাজিক কাঠামো লড়াই ও ক্ষতি-পূরণের অর্থনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। পুঁজিপাট্টা খাটানো, মজুর ও বুদ্ধিজীবী নিয়োগ সমস্তই ক্ষতিপূরণ আমলের রপ্তানি-আমদানি ইত্যাদি ব্যবসার হালচালের উপর নির্ভরশীল রহিয়াছে। এই আমলের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে জার্ম্মাণির কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ সমস্তই বানচাল হইয়া যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-আদায় এবং যুদ্ধঋণ-পরিশোধ এই দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেকটা পাকা বনিয়াদের উপর অবস্থিত। তাহার সঙ্গে দেশ-বিদেশে টাকাকড়ি ও মালপত্র পাঠানো নিবিড়ভাবে

সংযুক্ত। আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন-বিষয়ক কতকগুলা অপরিহার্য্য কার্য্যক্রমের উদ্ভব হইয়াছে। তাহা অবলম্বন করিয়াই ইতালি, ফ্রান্স, বিলাত এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আমদানি-রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ এবং তদনুসারে আপন-আপন আর্থিক কাঠামোর পুনর্গঠন করিতে হইতেছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় "অসাধারণ" কোনো পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে এইসমস্ত দেশের কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা।

দুনিয়ার এই সেরা পাঁচটা দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বনিয়াদ স্থানচ্যুত হইলে দুনিয়ার ধনদৌলতের রাজ্যে আর এক দফা প্রলয়-কাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে। স্থানচ্যুতির ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় বাণিজ্যক্ষেত্রেই আমূল পবিবর্ত্তন দেখা দিবে, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান-গুলার উঠানামা, দেউলিয়া হওয়া, ব্যাঙ্ক-ফেলমারা, কারেন্সি-সঙ্কট ইত্যাদি নানাপ্রকার দুর্যোগ দেখা দিবে এবং নকৃরির বাজারেও তার ধাক্কা লাগিতে বাধ্য। ক্ষতিপূরণ-সমস্যার আশু অস্ত্রচিকিৎসা চালাইলে রোগ সারিবে কিনা সন্দেহ, বরং নিখিল দুনিয়ার অর্থনৈতিক দুর্য্যোগ আরও বেশী মারাত্মক আকার ধারণ করিতে পারে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিচিত্র ধরণের। রাষ্ট্রিক হিসাবে জার্ম্মাণির পক্ষে লড়াই-সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া বন্ধ করা অনেকদিন আগেই ন্যায়সঙ্গত ছিল। এখনো ন্যায়সঙ্গত বটে। কিন্তু আর্থিক হিসাবে তাহার দরুণ জার্ম্মাণিতে এবং দুনিয়ার অন্যত্র হ-য-ব-র-ল উপস্থিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান দুনিয়াব্যাপী অর্থসঙ্কট ক্ষতিপূরণ-যুদ্ধঋণ নামক আর্থিক সমস্যার দরুণ উদ্ভূত নয়। তবে সমস্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলার মধ্যে যখন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান তখন এই আর্থিক চক্রকে (কম্‌প্লেক্সকে) বিশ্বসঙ্কটের অন্যতম কারণরূপে ধরিয়া লওয়া অসম্ভব

নয়। কিন্তু ইহার উপর বেশী জোর না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বিশ্ব-মন্দার দৌরাত্ম্য ধ্বংস করিবার উপায়সমূহ পূর্ব্বে খানিকটা বাৎলানো গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত উপায়সমূহ অবলম্বন করিলে শেষ পর্য্যন্ত এই সঙ্কট কাটিয়া যাইবে বিশ্বাস করি। এজন্য ক্ষিপ্র শিল্পোন্নতির দ্বারা নিম্ন-লিখিত আর্থিক জনপদগুলার ক্রয়ক্ষমতা বাড়াইবার প্রয়োজন :—(১) বলকান জনপদ, (২) রুশিয়া, (৩) এশিয়া ( বিশেষতঃ চীন ও ভারত ), এবং (৪) লাটিন আমেরিকা। প্রথমতঃ, চাই বিদেশী পুঁজির আমদানি। দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মাণি, আমেরিকা এবং বিলাত হইতে বহুল পরিমাণে, এবং আংশিকভাবে বেলজিয়াম, স্বইট্সারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স হইতে যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল দ্রব্য এবং পহেলা নম্বরের পণ্যদ্রব্য আমদানি আবশ্যক। তাহা হইলে এইসমস্ত জনপদের শিল্পোন্নতি অতি সহজেই নিষ্পন্ন হইতে পারে।

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, দুনিয়াকে জার্ম্মাণির জাতীয় গৌরববোধ ও সম্মানের প্রতি সুবিচার প্রদর্শন করিতেই হইবে। এজন্য প্রথমতঃ, ক্ষতিপূরণের হার ক্রমশঃ কমানো আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, দশ বৎসরের মধ্যে ইহার অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১৯৪০ সনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ আর যুদ্ধ-ঋণ হইতে দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেওয়া চাই। তাহার সঙ্গে আবশ্যক দুনিয়াকে সাধারণ কৃষিশিল্প এবং বাণিজ্যের পথে ফিরাইয়া আনা এবং এই সঙ্গে ভারতবর্ষ, চীন, রুশিয়া, বলকান জনপদ, লাটিন আমেরিকা ইত্যাদির "প্রথম শিল্প-বিপ্লব"ও সার্থক করিবার প্রয়োজন। তাহা হইলে এই দেশগুলা অগ্রগামী দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের পর্য্যায়ে উপনীত দেশগুলার পূর্ণ সহযোগী বনিয়া যাইতে পারিবে। জার্ম্মাণি হইতে দুই পুরুষ ধরিয়া বৎসর-বৎসর ২,০০০,০০০,০০০ রাইখ্স মার্ক আদায় করিবার যে কু-ব্যবস্থা রহিয়াছে, মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহ যত শীঘ্র ইহা ত্যাগ করিতে পারে তত

শীঘ্রই দুনিয়ায় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শান্তি স্থাপিত হইবে। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট হুভার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান মোরেটোরিয়াম বা দেনা-শোধ স্থগিত রাখার ব্যবস্থায় যুদ্ধঋণ-ক্ষতিপূরণ নামক আজগুবি ব্যবস্থার অবসানেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

## পুঁজি-রপ্তানির ব্যবস্থা

ক্ষতিপূরণের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের সঙ্গে-সঙ্গে দুনিয়ায় নতুন আর্থিক ধারা সুরু হইবে। যে-সমস্ত জাতির ধার দেওয়ার মত যথেষ্ট পুঁজি আছে সেইসমস্ত দেশের বিদেশে পুঁজি-নিয়োগের আস্থা জাগ্রত হইবে। তাহার ফলে নতুনভাবে দেশবিদেশে পুঁজির চলাচল ঘটিতে থাকিবে। যে-সমস্ত দেশের অতিরিক্ত পুঁজি আছে সেইসমস্ত দেশ হইতে পুঁজিহীন দেশগুলায় পুঁজি-চালান হইলে বর্ত্তমান সঙ্কটের বেকার-সমস্যা, কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা-হ্রাস এবং দ্রব্যমূল্যের হ্রাস ইত্যাদি দোষগুলা কাটিয়া যাইবে। সমগ্র দুনিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজনৈতিক চিকিৎসা চালাইতে পারিলেই মানব-জাতির পুনরায় অর্থ-নৈতিক নবজীবন সুরু হইবে।

দুনিয়ার আটপৌরে ধনদৌলত সাধারণভাবে পুঁজি আমদানি-রপ্তানির উপরই নির্ভরশীল। কতকগুলি আর্থিক জনপদ আপন-আপন প্রয়োজনীয় পুঁজির কতকাংশ বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে এবং অন্যান্য দেশগুলা তাহা আমদানি করে।

১৯১৪ সন পর্য্যন্ত বিলাত, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণি এই তিনটি ছিল দুনিয়ার সেরা পুঁজি-রপ্তানিকারক দেশ। যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ছিল বিদেশী পুঁজির আমদানিকারক দেশ। সেই অবস্থা বিলকুল বদলাইয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সনে এই মার্কিণ মুল্লুক হইয়া গেল সেরা উত্তমর্ণ দেশ। আর যুদ্ধের পূর্ব্বকার উত্তমর্ণ জার্ম্মাণি অধমর্ণে

পরিণত হইল। পরবর্ত্তী যুগেও তিনটী দেশকেই শ্রেষ্ঠ উত্তমর্ণ দেশরূপে দেখা যাইতেছে; আন্তর্জ্জাতিক পুঁজির বাজারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জার্ম্মাণির স্থান দখল করিয়াছে।

নিম্নের তালিকায় চারটী দেশের ১৯১৪ ও ১৯২৮ সনে বিদেশে ঋ-দেওয়া ও কর্জ্জ-লওয়ার পরিচয় ( ডলারে ) দেওয়া গেল :—

| | দেশ | ১৯১৪ | ১৯২৮ |
|---|---|---|---|
| | | কর্জ্জ দেওয়া | কর্জ্জ দেওয়া |
| ১। | বিলাত | ১৮,০০০,০০০,০০০ | ২০,০০০,০০০,০০০ |
| ২। | ফ্রান্স | ৮,৭০০,০০০,০০০ | ৫,২০০,০০০,০০০ |
| | | | কর্জ্জ লওয়া |
| ৩। | জার্ম্মাণি | ৫,৬০০,০০০,০০০ | ৪,৫০০,০০০,০০০ |
| | | কর্জ্জ লওয়া | কর্জ্জ দেওয়া |
| ৪। | মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র | ৩,০০০,০০০,০০০ | ১০,০০০,০০০,০০০ |

এই তালিকায় ক্ষতি-পূরণের এবং যুদ্ধ-ঋণের হিসাব দেওয়া হয় নাই। তবে ইহা সত্য যে, ১৯১৪ সনের তুলনায় ১৯২৮ সনে রপ্তানি-পুঁজির পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে। লড়াইয়ের পরবর্ত্তী সময়ে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল। ১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বরে মর্কিণ দুর্য্যোগ ইহার গতি রুদ্ধ করিয়াছে। পৃথিবীব্যাপী মন্দার সূত্রপাত এই সময়ে।

পুঁজিপাট্টার লেনদেন বাড়ানো আবশ্যক। তাহাতে আর্থিক দুনিয়ায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে পারিবে। বর্ত্তমান সঙ্কটের অন্যতম মোদ্দা লক্ষণ এই যে, উত্তমর্ণ দেশগুলি সাধারণতঃ যেভাবে পুঁজিপাট্টা ধার দেয় সেভাবে দিতেছে না, আর অধমর্ণ দেশগুলা যেভাবে ধার পায় তাহা পাইতেছে না।

নিম্নের তালিকায় ১৯২৮ সনের পরবর্ত্তী পুঁজি-হ্রাসের পরিচয় দেওয়া হইল ( '০০০,০০০ ডলারে হিসাব ) ।:—

| | দেশ | ১৯২৮ | ১৯২৯ | ১৯৩০ |
|---|---|---|---|---|
| ১। | চেকোশ্লোভাকিয়া | ৫৩ | ৩১ | × |
| ২। | বিলাত | ৬৬৭ | ৬৭২ | ১৯০ |
| ৩। | মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র | ১০৩৬ | ২৩৩ | ২১৩ |

এই দেশত্রয়ের পুঁজি-রপ্তানির হ্রাস বাস্তবিকই অসম্ভব ধরণের। বিদেশের বাজার হইতে অধমর্ণ দেশগুলার পুঁজি-আমদানি অত্যধিক হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নের তালিকায় অধমর্ণ দেশগুলার পুঁজি-আমদানির পরিচয় দেওয়া হইল ( '০০০,০০০ ডলারে হিসাব ) :—

| | দেশ | ১৯২৮ | ১৯২৯ | ১৯৩০ |
|---|---|---|---|---|
| ১। | আর্জ্জেণ্টিনা | ১৩১ | ৩৮ | × |
| ২। | অষ্ট্রেলিয়া | ১৯৩ | ১৬৬ | ,, |
| ৩। | ফিনল্যাণ্ড | ৪০ | ১২ | ,, |
| ৪। | জার্ম্মাণি | ১০১৭ | ৫৬৭ | ১৭০ |
| ৫। | হাঙ্গারি | ৮৮ | ৩৭ | × |
| ৬। | ভারতবর্ষ | ৬৭ | ৩৬ | ,, |
| ৭। | নরওয়ে | ৩৪ | ৮ | ,, |
| ৮। | পোল্যাণ্ড | ১৪০ | ৫৮ | ,, |
| | মোট | ১,৭১০ | ৯৩২ | |

আমরা দেখিতে পাইতেছি, আর্জ্জেণ্টিনা ১৯২৮ সনে বিদেশ হইতে ১৩ কোটি ১০ লক্ষ ডলার ধার পাইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৯ সনে মাত্র ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ঋণ লইয়াই এই দেশকে খুসী থাকিতে হইয়াছে। ভারতের পুঁজি-আমদানি ৬ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার

হইতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই তালিকার বহির্ভূত আরও অনেক দেশ আছে। তালিকায় উক্ত আটটী দেশের পুঁজি আমদানি ১৭০ কোটি হইতে ৯৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলারে পরিণত হইয়াছে।

একটীমাত্র বৎসরে পুঁজি আমদানির শতকরা হ্রাস নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইয়াছে :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | নরওয়ে | ... | ৭৬% |
| ২। | আর্জ্জেণ্টিনা | ... | ৭১% |
| ৩। | ফিনল্যাণ্ড | ... | ৭০% |
| ৪। | পোল্যাণ্ড | ... | ৫৯% |
| ৫। | হাঙ্গারি | ... | ৫৮% |
| ৬। | ভারতবর্ষ | ... | ৪৬% |
| ৭। | আট দেশের মোট | ... | ৪৫·৭% |
| ৮। | জার্ম্মাণি | ... | ৪৪% |
| ৯। | অষ্ট্রেলিয়া | ... | ১৪°/ |

১৯২৯ সনে ইয়োরোপের এই আটটী দেশ, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, এবং ওশিয়ানিয়ার অর্থনৈতিক জীবন কমসে কম ৭৮৭,০০০,০০০ ডলারের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অবস্থা পরে আরও খারাপ দাঁড়াইয়াছে, তবে তাহার হিসাবপত্র পাওয়া কঠিন।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মনোজাগতিক যে-কোনো উপায়ে পুঁজির মহার্ঘতা দূর হইতে পারে, অর্থাৎ পুঁজির আমদানি-রপ্তানি বাড়িতে পারে। সকল তরফ হইতেই এই পুঁজি-চলাচল বাড়ানো আবশ্যক। বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার অবসান বা পরিমাণ-হ্রাসের পক্ষে তাহা মস্তবড় সহায় হইবে।

# মজুর-ভারত ও বিশ্বদৌলত*

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

এই প্রবন্ধের জন্য বিনয়বাবুর "বাড়্তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) গ্রন্থের ১৯০-২৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহার ভিতর নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবৃত আছেঃ—"মজুর" আর "গরীব লোক" একার্থক নয়, মজুরি করা অন্যতম পেশা-বিশেষ, মজুর-শ্রেণীর তিন সমস্যা, মজুর আমার "পূজাস্থান" কেন? চাষী-সমবায়, বণিক-ভবন ও মজুর-সঙ্ঘ, ভারতের মজুর-শক্তি, সঙ্ঘ-বদ্ধ মজুর-দুনিয়া, প্রতি দশ হাজারে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা, মজুর-ভারতের গুরু মজুর-জাপান, চাই বাবুর্চি-খান্সামা-সঙ্ঘ, মজুর-গবেষণা-পরিষৎ, মজুর-বীমা, ভারতে মজুরির হার, জার্ম্মাণ ও জাপানী হার, ঘরামীর মজুরির বিশ্বরূপ, মজুরির হার ও কর্ম্মদক্ষতার মাপজোক, মাথা-পিছু নানা জাতির বার্ষিক আয়, আয়ের অসাম্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রিক সাম্য, কাপড়ের কলে ভারতবর্ষের বাড়তি, ভারতবাসীর পুঁজি-বৃদ্ধি, যন্ত্রনিষ্ঠায় ভারতবাসীর উন্নতি, চাই বাংলায় ২৫,০০০ যন্ত্র-শিক্ষার্থী।

—সম্পাদক

* "আর্থিক উন্নতি" ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৮ (ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ, ১৯৩২)।

# বিদেশী বীমা-কোম্পানীর উপর স্বদেশী শাসন

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

ভারতবর্ষে অনেকগুলা বিদেশী বীমা-কোম্পানী ব্যবসা চালাইয়া বিস্তর টাকা রোজগার করিতেছে। এইসকল বিদেশী কোম্পানী দেখিয়া আমাদের স্বদেশী কোম্পানীগুলা বীমা-ব্যবসা-সম্পর্কিত কোনো-কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে বীমাবিষয়ক যে আইন-কানুন প্রচলিত আছে সেই আইন-কানুন অনুসারে বিদেশী কোম্পানীগুলাকে যথোচিত পরিমাণে শাসন করা সম্ভবপর নয়। স্বদেশী আন্দোলনকে পুষ্ট করিবার জন্য এইদিকে ভারতীয় বণিক্, ব্যবসায়ী এবং অর্থশাস্ত্রীদের মাথা খাটানো উচিত।

দুনিয়ার নানা দেশে বিদেশী বীমা-কোম্পানীগুলাকে আইনের দ্বারা শাসন করিবার ব্যবস্থা আছে। সেইসকল আইন-কানুনের কিছু-কিছু নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

## ১। জার্ম্মাণি

জার্ম্মাণ মুল্লুকে বারটা বিভিন্ন জাতের বিদেশী কোম্পানী বীমা-ব্যবসায় মোতায়েন আছে। ১৯৩০ সনে সব রকমের বিদেশী বীমা-কোম্পানীর সংখ্যা ৯৭ ; দেশ-হিসাবে এদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | বিলাত | ... | ৩৮ |
| ২। | সুইট্‌সারল্যাণ্ড | ... | ১৮ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩। | অষ্ট্রিয়া | ... | ৮ |
| ৪। | ডেন্মার্ক | ... | ৮ |
| ৫। | হল্যাণ্ড | ... | ৭ |
| ৬। | মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র | ... | ৫ |
| ৭। | সুইডেন | ... | ৪ |
| ৮। | ডান্‌ৎসিগ | ... | ৪ |
| ৯। | ইতালি | ... | ২ |
| ১০। | জুগোস্লাভিয়া | ... | ১ |
| ১১। | চেকোস্লোভাকিয়া | ... | ১ |
| ১২। | হাঙ্গারি | ... | ১ |
| | | | ৯৭ |

জার্ম্মাণিতে সকলপ্রকার বীমা-কোম্পানীর সংখ্যা ১৫০০; সুতরাং বিদেশী কোম্পানীগুলার সংখ্যা নগণ্য। মোটের উপর জার্ম্মাণ বীমা-মুল্লুকে দেশী কোম্পানীগুলারই জয়-জয়কার।

বিভিন্ন ধরণের বীমা-ব্যবসায় জার্ম্মাণির দেশী ও বিদেশী কোম্পানী-গুলা কিভাবে মোতায়েন আছে তাহা নিম্নের তালিকায় বেশ বুঝা যাইবে (১৯২৯, মে):—

| বীমার রকম | দেশী | বিদেশী | মোট |
|---|---|---|---|
| ১। জীবন ও রোগ | ৬৫৫ | ২০ | ৬৭৫ |
| ২। দুর্ঘটনা | ২২ | ৭ | ২৯ |
| ৩। শিলা ও গবাদি পশু | ৫০০ | ১ | ৫০১ |
| ৪। অগ্নি | ১০৬ | ৪৩ | ১৪৯ |
| ৫। বিবিধ | ১০০ | ২ | ১০২ |
| | ১৩৮৩ | ৭৩ | ১৪৫৬ |

উপরের তালিকায় "পুনর্বীমা"-কোম্পানীগুলাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৯ সনের মে মাসে জীবন, দুর্ঘটনা, শিলাবৃষ্টি, গবাদি পশু, অগ্নি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বীমা-ব্যবসায় মোট ১৪৫৬টী কোম্পানী কাজ করিয়াছে, ইহার মধ্যে বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা মাত্র ৭৩টী।

নিউ ইয়র্কের হোম ইনশিওর‍্যান্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৮৫৩ সনে; সুতরাং কোম্পানীটা একটা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বটে, ইহার আর্থিক অবস্থাও বেশ ভাল; কারণ পুঁজিপাটার পরিমাণ ২৪,০০০,০০০ ডলার। কোম্পানীটি ১৯২৩ সন হইতে জার্ম্মাণিতে কাজ করিয়া আসিতেছে এবং ইহার কার্য্যকলাপ মাল-চালান, অগ্নি ও বৃষ্টিবাদলের দরুণ ক্ষতিপূরণে সীমাবদ্ধ। ইহার জার্ম্মাণ কার্য্যালয় হাম্‌বুর্গে অবস্থিত এবং জার্ম্মাণিতে ব্যবসা পরিচালনের জন্য যিনি সমস্ত দায়িত্ব ও ঝুঁকি মাথায় করিয়া বসিয়া আছেন কোম্পানীর সেই বিজ্‌নেস্‌ ম্যানেজার বা কারবার-পরিচালক কোনো মার্কিণ নহেন, খোদ জার্ম্মাণিরই তিনি অধিবাসী।

দি গ্রেট আমেরিকান ইনশিওর‍্যান্স কোম্পানী অব্‌ নিউইয়র্ক (পুঁজি ১৫,০০০,০০০ ডলার; ১৮৭২ সনে স্থাপিত) আর একটী বাঘা মার্কিণ বীমা-প্রতিষ্ঠান। ইহার জার্ম্মাণ শাখার প্রধান দায়িত্বশীল কর্ম্মচারীও মার্কিণ নহেন, জার্ম্মাণ। জার্ম্মাণিতে কোম্পানীটী কেবলমাত্র মাল-চালান-সম্পর্কিত বীমা পরিচালনের লাইসেন্সভোগী বা অধিকার-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

ট্রিয়েষ্ট শহরের আসিকুরাৎসিয়নি জেনারালী একটী শক্তিশালী প্রাচীন কোম্পানী (১৮৩১ সনে স্থাপিত, পুঁজি ৬০,০০০,০০০ লিয়ার)। ১৯১৪-১৮ সনের মহাযুদ্ধের ফলে ট্রিয়েষ্ট ইতালি-কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই কোম্পানীটী জার্ম্মাণিতে ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছে। সবরকম বীমার কারবারই কোম্পানীটীর ধান্ধা, কিন্তু

জার্ম্মাণিতে আইন করিয়া ইহার কার্য্যকলাপ জীবন, অগ্নি, চুরি, কাচ এবং মালচালানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। ইহার জার্ম্মাণ অফিসগুলা হাম্বুর্গ, লাইপৎসিগ, ব্রেমেন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, হানোভার, ল্যিবেক এবং মানহাইম শহরে অবস্থিত এবং প্রত্যেক অফিসের দায়িত্বশীল প্রধান কর্ম্মসচিব ইতালীয় নহে, খোদ জার্ম্মাণ বাচ্চা।

১৮০৭ সনে স্থাপিত লণ্ডনের দি ইগল্, ষ্টার অ্যাণ্ড্ ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান্স্ ইনশিওর‍্যান্স কোম্পানী নামক বিলাতী অফিসটীর বর্ত্তমান পুঁজিপাট্টার পরিমাণ ৩,০০০,০০০ পাঃ (আদায়ী পুঁজি ১,০৯২,৮৯৮ পাঃ)। স্বদেশে কোম্পানীটী জীবন, অগ্নি, দুর্ঘটনা, চুরি, মাল-চালান ইত্যাদি বীমার কারবার চালায়। কিন্তু জার্ম্মাণিতে ইহার দৌড় মাল-চালান, অগ্নি এবং চুরিবিষয়ক বীমা পর্য্যন্ত। কোম্পানী জার্ম্মাণ বাজারে পদার্পণ করে ১৯২৫ সনে। ইহার জার্ম্মাণ অফিসগুলায়ও প্রধান কর্ম্মচারিরূপে একজনও ইংরেজ নাই; কোনো জার্ম্মাণ ভদ্রলোক বা কোম্পানীর উপর এইসমস্ত অফিসের পরিচালনভার ন্যস্ত আছে। ফির্ম্মা মড্, ফেষ্টার উণ্ড্ আরেণ্ট ( হাম্বুর্গ ), ফির্ম্মা বুসে উণ্ড শোয়ার্ট্সে ( ব্রেমেন ) প্রভৃতি জার্ম্মাণ কোম্পানীকে এই বিলাতী কোম্পানীর কারবার পরিচালন করিতে দেখা যায়।

দি নর্থ ব্রিটিশ অ্যাণ্ড মার্কেণ্টাইল্ ইন্‌শিওর‍্যান্স কোম্পানী অব্ লণ্ডন অ্যাণ্ড এডিন্‌বারাও একটী পুরাতন বীমা-কোম্পানী এবং ইহার পুঁজিপাট্টা ৬০ লাখ পাউণ্ডের কাছাকাছি ( আদায়-করা ২,৪৩৭,৫০০ পাঃ )। জার্ম্মাণিতে এর কারবার চলিতেছে ১৮৬৩ সন থেকে। স্বদেশের এবং বিদেশের নানাস্থানে কোম্পানীটা জীবনবীমা হইতে সামুদ্রিক বীমা পর্য্যন্ত নানাবিধ বীমার কারবার চালাইতে অভ্যস্ত। তথাপি জার্ম্মাণ মুল্লুকে এই বিলাতী কোম্পানী কেবলমাত্র অগ্নি-বীমা পরিচালনের লাইসেন্স পাইয়াছে। ইংরেজ নয়, জার্ম্মাণ দায়িত্বশীল

কর্ম্মচারীই কোম্পানীর জার্ম্মাণ মুল্লুকের কারবার পরিচালনা করিতেছে।

উপরে যে পাঁচটা বীমা-অফিসের নাম করা হইল সেই পাঁচটার পুঁজিপাট্টার জোর খুব বেশী এবং সব কয়টাই ব্যবসা-জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। এরা সবাই বাঘা-বাঘা। তাছাড়া এ কয়টী কোম্পানীই রাষ্ট্র-জগতে প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে পরিচিত ভিন্ন-ভিন্ন জাতির অন্তর্গত লোকজন কর্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যে-কোনো প্রকার বীমা-কারবারের জন্যই হউক না কেন, ইহাদের জার্ম্মাণ শাখা-গুলার দায়িত্বসম্পন্ন প্রধান কর্ম্মসচিবের পদে ইহাদের নিজের দেশবাসী একজনকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। জেনার‍্যাল ম্যানেজার বা ডিরেক্টরমাত্রই অপরিহার্য্যরূপে জার্ম্মাণ, অর্থাৎ যে-দেশে শাখা-অফিসের কাজ চলিতেছে সেই দেশের লোক। কেবলমাত্র পাঁচটী কোম্পানীর বেলাতেই যে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা নয়। জার্ম্মাণিতে যেসমস্ত বিদেশী অফিস কারবার চালাইতেছে তাহাদের প্রত্যেকটীকেই এই কার্য্যক্রম মানিয়া চলিতে হইতেছে। জার্ম্মাণ মুল্লুকে কারবার চালাইবার জন্য ইহাদিগকে জার্ম্মাণ ডিরেক্টর রাখিতে হইয়াছে।

জার্ম্মাণ বীমা-আইনে শুধু এই কথা বলে যে, "অ্যাটর্নির ক্ষমতা"-যুক্ত প্রধান ব্যক্তি ও দায়িত্বসম্পন্ন কর্ম্মচারীকে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের খোদ অধিবাসী হইতে হইবে। ১৯০১ ও ১৯১৩ (১০৬ ধারা) সনের আইনে উক্ত কর্ম্মচারীর "জাতীয়তা" অর্থাৎ রাষ্ট্রিকতা সম্পর্কে খুলিয়া লেখা হয় নাই বটে; কিন্তু "আউফ্‌জিখ্‌ট্‌স্‌-আম্‌ট্‌" (বীমা-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের সরকারী আফিস) ও অন্যান্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে খোঁজ লইলেই যে-কোনো ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে যে, কার্য্যতঃ কোনো বিদেশীকেই জার্ম্মাণির ত্রিসীমানার মধ্যে বীমা-ব্যবসা পরিচালনের জন্য অ্যাটর্নির ক্ষমতা দেওয়া হয় না। স্বদেশী কোম্পানীর ডিরেক্টর বা প্রতিনিধির

মতই এই অ্যাটর্নির ক্ষমতাযুক্ত পরিচালককে ব্যক্তিগতভাবে বীমা-নিয়ন্ত্রণের অফিসের কাছে সকল প্রকার চুক্তি, পুঁজিনিয়োগ, বন্ধকী কারবার, মজুত তহবিল রাখা, এজেন্ট ও কর্ম্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে দায়ী থাকিতে হয় (১০৭ ও ১০৮ ধারা)। উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, এই অ্যাটর্নির ক্ষমতা কোনো কোম্পানীও ভোগ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠান ভিন্ন-ভিন্ন দস্তুর মানিয়া চলে এবং নিয়ন্ত্রণ-আফিসের আইন-কানুনও রীতিমত অবস্থা-মাফিক ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত।

জার্ম্মাণিতে বীমা-ব্যবসায় মোতায়েন বিদেশী কোম্পানীগুলার আর একটা দস্তুরও লক্ষ্য করিবার মত। জার্ম্মাণ বীমা-ব্যবসা-বিষয়ক বার্ষিক বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই যে, হোম ইনশিওর্যান্স কোম্পানী অব্ নিউইয়র্ক, নামক মার্কিণ কোম্পানী বৎসরে দুইটি উদ্বর্ত্তপত্র প্রকাশ করে। একটাতে কোম্পানীর মোট কারবারের ডলারের হিসাব থাকে, আর একটাতে জার্ম্মাণিতে পরিচালিত কারবারের রাইখ্স্-মার্কের হিসাব প্রকাশ করা হয়। দিনেমার কোম্পানীগুলা দুই দুইটা বিবরণী ছাপায়, একটা দিনেমার ক্রাউনে প্রদত্ত মোট কারবারের হিসাব, আর একটা রাইখ্স্ মার্কে প্রদত্ত জার্ম্মাণ কারবারের পরিচয়। বিলাতী, ইতালীয় এবং অন্যান্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলাও দুইটা বিবরণী প্রকাশ করে, একটাতে থাকে নিজেদের জাতীয় কারেন্সিতে মোট ব্যবসার হিসাব, আর একটাতে জার্ম্মাণ সিক্কায় জার্ম্মাণ কারবারের পরিমাণ। বিদেশী কোম্পানীগুলার এই দুই-দুইটা বিবরণী বাহির করার সার্ব্বজনীন রীতি,—বিশেষতঃ জার্ম্মাণ কারেন্সিতে জার্ম্মাণ কারবার প্রকাশ করার রেওয়াজ,—কোম্পানীগুলা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই চালায় না। বে-সরকারী বীমা-নিয়ন্ত্রণের সরকারী ইম্পীরিয়াল কার্য্যালয় কর্ত্তৃক তাহারা এইরূপ আচরণে বাধ্য হয়। জার্ম্মাণিতে শাখা স্থাপনের

জন্য যে লাইসেন্স বা আদেশপত্র দেওয়া হয় তাহার একটা সর্ত্তই হইতেছে যে, জার্ম্মাণ কারবারের পৃথক বিবরণী প্রকাশ করিতে হইবে। আর মূল জার্ম্মাণ বাণিজ্য-বিষয়ক আইনেই জার্ম্মাণিতে পরিচালিত কারবারের জন্য পৃথক বিবরণী প্রকাশের নির্দ্দেশ সন্নিবেশিত আছে। এই বিবরণী যাহাতে জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। আর এক কথা। আপন-আপন দেশের আইন অনুসারে নিজেদের খোদ সরকারী নিয়ন্ত্রণ অফিসে যেসমস্ত মূল বিবরণী ও হিসাবপত্র দাখিল করিবার দস্তুর আছে, বিদেশী কোম্পানীগুলা ঐ-সমস্ত কাগজ-পত্রের হুবহু জার্ম্মাণ তর্জ্জমা জার্ম্মাণির আউফ্-জিথ্‌টস্-আম্‌ট বা বীমা-নিয়ন্ত্রণ আফিসে দাখিল করিতে বাধ্য থাকে। মূল কাগজপত্রের একটুও নড়-চড় বা অদল-বদল,—জার্ম্মাণ-আইন বরদাস্ত করে না।

১৯০১ সনের মে মাসের আইন দ্বারা জার্ম্মাণিতে বে-সরকারী বীমা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আইনটা কয়েকবার সংশোধন ও সম্প্রসারণ করিয়া ১৯৩১ সনের জুন মাসে উহাকে চরম আকারে পরিণত করা হইয়াছে ( বে-সরকারী বীমাও ইমারত সেভিংস ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ আইন )। স্বদেশী বীমা-কোম্পানীগুলাকে যেসমস্ত আইনকানুন মানিয়া চলিতে হয়, বিদেশী কোম্পানীগুলাও সেইসব আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য। যেসমস্ত সর্ত্তে বিদেশী কোম্পানী-গুলাকে ব্যবসা চালাইতে দেওয়া হয়, ১৯৩১ সনের আইনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১০৫—(৩) ধারায় তাহার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মাণির বীমা-নিয়ন্ত্রণ-আফিসের সহিত সব-কয়টা বিদেশী কোম্পানী সম্বন্ধ ঠিক একই ধরণের নহে। কয়েকটা কোম্পানীর অফিসে ঘুরা-ফিরার ফলে তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। এই আইনের সর্ত্তগুলা পালন করার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন কোম্পানী ভিন্ন-ভিন্ন ধরণের কার্য্যক্রম গ্রহণ

করিয়া থাকে। কোম্পানীগুলার উপর কিভাবে সর্ত্তাবলী প্রযুক্ত হইবে, প্রতি ক্ষেত্রে বীমানিয়ন্ত্রণ-আফিস তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অধিকারী।

নিম্নলিখিতরূপ অবস্থায় দেশী-বিদেশী সমস্ত বীমা-কোম্পানী অনুমতি বা লাইসেন্স হইতে বঞ্চিত হইতে পারে ( ১০৬ অধ্যায়) :—

১। কোম্পানীর ব্যবসার মোসাবিদায় সাধারণ আইন-সঙ্গত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইলে ;

২। (১) বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্তের অভাব হইলে অথবা (২) বীমার দায়িত্ব পূরণের জন্য সকল সময় যথাবিহিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইলে। মোটের উপর বীমাকারীর আইনগত এবং আর্থিক স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয় তৎপ্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হয়। এই দুই দফায় কোম্পানীর আর্থিক বনিয়াদ খুব শক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকন্তু কোম্পানীর স্থায়িত্ব রক্ষার বিধানও আছে। এই দুইটি ব্যবস্থার বলে "আউফ্-জিখ্ট্স্-আম্ট্" দেশী-বিদেশী সমস্ত বীমা-কোম্পানীরই খুঁটিনাটী ও আয়-ব্যয় তদারক করিবার অধিকারী।

৩। কোম্পানীর ব্যবসা-পরিচালনে দেশের আইনকানুন ও রীতিনীতি জখম হইতেছে এরূপ সন্দেহ জাগ্রত হইলে।

এইবার উল্লেখযোগ্য যে, দেশী-বিদেশী সকল প্রকার কোম্পানীই লাইসেন্স বা অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে যথোচিত জামিন দিতে বাধ্য ( ৮ অধ্যায় )। শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক বীমার বেলায় দুই দফা জামিন আদায় করা হয়, যথা :—(১) কমপক্ষে ৫০০,০০০ রাইখ্স্ মার্কের স্থায়ী আমানত এবং (২) চলতি আমানত। প্রত্যেক বীমা-কোম্পানী জার্ম্মাণ মুল্লুকের ভিতরকার ব্যবসায় প্রাপ্ত মোট প্রিমিয়াম আয়ের ৫০% ডিপজিট রাখিতে বাধ্য। জীবন-বীমা-কোম্পানীর বেলায় স্থায়ী আমানত প্রিমিয়াম-রিজার্ভ বা চাঁদা-গচ্ছিতের ১০%। তবে এইসমস্ত ডিপজিট বা আমানত সকল ক্ষেত্রে যে একই আকার ধারণ করে

তাহা নহে। বীমানিয়ন্ত্রণ-আফিস আপন ইচ্ছামত কোম্পানীর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে। আর এই আফিস যে কি পরিমাণ ডিপজিট আদায় করিতেছে তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবারও নিয়ম নাই।

আউফ্‌জিখ্‌ট্‌স্‌-আম্‌ট্‌ কর্ত্তৃক মনোনীত অডিটর হিসাবপত্র পরীক্ষা করে। এই আফিস ইচ্ছা করিলে বিদেশী কোম্পানীগুলারও এই-ভাবে হিসাবনিকাশ করিতে পারে।

বীমা-কোম্পানীসমূহের যত প্রকার তহবিল আছে তন্মধ্যে "প্রিমিয়াম রিজার্ভ ফাণ্ড"ই (চাঁদা-গচ্ছিত ভাণ্ডারই) বীমাকারীদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। রীতিমত সরকারী নির্দ্দেশ পালন করিয়া দেশী-বিদেশী সমস্ত কোম্পানীকে এই তহবিলের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই তহবিলের হিসাবপত্রগুলা পৃথক রাখিতে হয় এবং খোদ জার্ম্মাণিতেই ইহা জমা রাখিবার বিধান আছে। বীমানিয়ন্ত্রণ-আফিস এই তহবিলের হিসাবপত্র সব সময়ই তদারক করে, এবং সময় সময় এ সম্বন্ধে নির্দ্দেশও দিতে পারে। প্রিমিয়াম রিজার্ভের ভিন্ন-ভিন্ন দফার হিসাব একটা বিশেষ খাতায় রাখিবার দস্তুর আছে। পৃথক-পৃথকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হয়। এই তহবিলের সম্পূর্ণ বা উহার কোনো অংশ সাময়িকভাবে বিদেশে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ মিলিতে পারে। কিন্তু এই ব্যতিরেক যখন-তখন ঘটে না।

কোনো-কোনো দফার প্রিমিয়াম-গচ্ছিত ব্যাঙ্কে আমানত রাখা চলিতে পারে। সেই অবস্থায় বীমা-কোম্পানীকে উক্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সার্টিফিকেট আদায় করিয়া বীমা-নিয়ন্ত্রণ-আফিসের নিকট দাখিল করিয়া জানাইতে হইবে যে, উক্ত রিজার্ভের উপর ব্যাঙ্কের আইন-গত কোনো এক্তিয়ার নাই। অধিকন্তু গচ্ছিতটা চুক্তি, বন্ধকী ইত্যাদি দায়িত্বেরও বাহিরে। মোট কথা বীমানিয়ন্ত্রণ-আফিস জানিতে চায়,—ব্যাঙ্ক বা বীমা-কোম্পানী চুলোয় যাক, বীমাকারীর অর্থ যেন

নিরাপদ থাকে। তবে বীমাকারীর স্বার্থে ঐ তহবিল নাড়াচাড়া চলিতে পারে। প্রিমিয়াম-গচ্ছিত ভাণ্ডার সম্বন্ধে সরকারী শাসন খুব কঠোর। এমন কি কখন কিভাবে লাল কালি প্রয়োগ করিতে হইবে তাহারও বিধান আছে। বণ্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদি কোম্পানীর কাগজ ঢাকিবার খামগুলা পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হয়।

প্রিমিয়াম রিজার্ভের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। ভিন্ন-ভিন্ন যেসমস্ত বিদেশী কারেন্সিতে (মুদ্রায়) কোম্পানীর হাতে প্রিমিয়াম জমা হয়, কোম্পানী মূল তহবিলকে সেইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিতে বাধ্য। নিয়ম করা হইয়াছে যে, যে-কারেন্সিতে বা টাকাকড়িতে চাঁদা আদায় হয় সেই কারেন্সিতেই প্রিমিয়াম রিজার্ভ খাটাইতে হইবে। কারেন্সি বা টাকাকড়ির জাতি-হিসাবে যাহাতে বীমাকারীদের দাবীদাওয়া আদায়ের কোনোরূপ অসুবিধা না হয় এই উদ্দেশ্যে বিভাগ-গুলাকে এইভাবে পৃথক-পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক বিভাগের টাকাকড়ি হইতে অন্য বিভাগের বীমাকারীর দাবী মিটাইবার কোনো উপায় নাই। এই ব্যবস্থাকে "কংগ্রুয়েন্ট ডেকুং" অর্থাৎ চাঁদা-মাফিক ঢাকনা বা জামিন বলে।

উপরে চাঁদা-গচ্ছিত-ভাণ্ডার সম্বন্ধে যেসমস্ত আইন-কানুনের কথা উল্লেখ করা হইল, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের মতে বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার পক্ষে তাহা যথেষ্ট। বিদেশী কোম্পানীগুলি এসম্বন্ধে স্বদেশী কোম্পানীগুলার সমান গোত্রের প্রতিষ্ঠান। কোনো-কোনো দেশে বিদেশী কোম্পানীগুলাকে যেভাবে গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটীতে চাঁদা খাটাইতে বাধ্য করা হয়, জার্ম্মাণিতে তেমন কোনো আইন নাই।

জার্ম্মাণ বীমা-আইনের মোদ্দা কথা উক্ত আইনের ১১০ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। কেবলমাত্র চাঁদা-গচ্ছিত ভাণ্ডার নহে অন্যান্য তহবিল খাটানো সম্পর্কেও ঐ আইন বলবৎ। জীবন, দুর্ঘটনা ও অন্যান্য

দায়িত্ব পরিশোধের জন্য গচ্ছিত ভাণ্ডারের এক দাম্‌ড়িও বীমা-নিয়ন্ত্রণ আফিসের অনুমতি ব্যতিরেকে খাটাইবার উপায় নাই। যে-কোনো দেশে বা যে-কোনো উপায়েই রিজার্ভ খাটানো হউক না কেন, জার্ম্মাণিতে ব্যবসা-পরিচালনাকারী প্রত্যেক বিদেশী কোম্পানীকে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া চলিতে হয়। টাকা খাটাইবার সময় দেশী-বিদেশী সমস্ত কোম্পানীকেই নিয়ন্ত্রণ-আফিসের পরামর্শ লইতে হয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে খাটাইবার হুকুম মিলিতেও পারে আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নাও মিলিতে পারে। পুঁজি নিয়োগের পরও রেহাই নাই। খাটানো পুঁজি সম্পূর্ণরূপে এই আফিসের তত্ত্বাবধানে থাকে। অতঃপর এই নিযুক্ত পুঁজির যদি নড়চড় করিতে হয় তাহা এই আফিসের বিনা অনুমতিতে হইতে পারিবে না। এইখানে আর একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, বীমা-কোম্পানীসমূহের নিকট হইতে জামিন রাখার উপর কড়াক্কড়ি আছে। তাহাতেও জার্ম্মাণিতে বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ-আফিস বীমা-কোম্পানীর নামে এই আমানত রাইখস বাঙ্কে গচ্ছিত রাখে।

বিদেশী কোম্পানীগুলিকে জার্ম্মাণিতে সংগৃহীত অর্থ যে কেবলমাত্র জার্ম্মাণ ধন-সম্পদেই খাটাইতে হইবে এমন কোনো আইন নাই। তবে যে-যে সম্পত্তিতে ঐ অর্থ খাটাইতে পারা যাইবে তাহার তালিকা কিন্তু হুঁসিয়ারভাবে করা হইয়াছে। তালিকাটা নিম্নরূপ :—

১। (ক) জার্ম্মাণ দেওয়ানী আইন অনুসারে অভিভাবক যে ধরণের সম্পত্তিতে নাবালকের সম্পত্তি খাটাইতে অধিকারী ; (খ) যে-সমস্ত কোম্পানীর কাগজে এই ধরণের অর্থ খাটাইতে পারা যায় ; (গ) রাইখসবাঙ্ক জার্ম্মাণ বন্ধকী-ব্যাঙ্কসমূহের যেসমস্ত বন্ধক প্রথম শ্রেণীর বলিয়া মনে করে।

২। বন্ধক ও পূর্ব্বোক্তরূপ বণ্ডে বা কোম্পানীর কাগজে যেসমস্ত দাবী জন্মে এবং যাহা রাইখসবাঙ্কের অনুমোদিত।

৩। কোম্পানীর বীমা-পত্রের বলে যেসমস্ত সম্পত্তি হইতে অগ্রিম দাদন বা ঋণ পাওয়া যায়।

৪। যেসমস্ত দাবী, স্বদেশী কর্পোরেশ্যন, ইস্কুল বা চ্যর্চ্চ ( গির্জ্জা ) মিটাইতে পারে।

৫। দেশের এলাকার মধ্যস্থিত স্থাবর সম্পত্তির উপর ২৫% পর্য্যন্ত প্রিমিয়াম রিজার্ভ খাটানো চলে। নিয়ন্ত্রণ-আফিসের অনুমতি-ক্রমে বরাদ্দ বাড়ানো চলিতে পারে। এইসমস্ত জমিজমা বন্ধকহীন হওয়া চাই। এসবের উপর কোনো প্রকার দাবীদাওয়া থাকিলে চলিবে না। স্থাবর সম্পত্তিতে পুঁজি খাটাইবার পূর্ব্বে অনুমতি লওয়ার দরকার। বীমা-নিয়ন্ত্রণ আফিস সাধারণতঃ জমিজমায় টাকা খাটাইতে দিতে রাজি হয় না। কেন না তাহার ফলে বীমা-কোম্পানীর টাকা তারল্য হারাইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতে পারে।

৬। দেশী বা বিদেশী স্বর্ণ-প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তিতে।

৭। বিদেশী মুদ্রায় বীমাকারীদের জন্য,—বিদেশী মুদ্রায় স্থিরীকৃত সম্পত্তিতে। এইজন্য নিয়ন্ত্রণ-অফিসের অনুমতি লইয়া বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কর্জ্জ বা বিদেশী গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত কর্জ্জ এবং অন্যান্য প্রকার বিদেশী সিকিউরিটীর উপর পুঁজি খাটানোও চলিতে পারে। বিদেশী টাকাকড়িতে খাটাইতে হইলে প্রিমিয়াম রিজার্ভের অর্দ্ধেকের বেশী খাটানো আইনবিরুদ্ধ।

১৯২৩ সনে স্বদেশী কৃষি-শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের উপর ২৫% প্রিমিয়াম রিজার্ভ খাটাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯৩১ সনের আইনে উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কোম্পানী-ভেদে বীমা-নিয়ন্ত্রণ-আফিস ভিন্ন-

ভিন্নরূপ পুঁজি খাটাইবার অধিকার দিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সংসাধিত হয় গোপনে। বাহিরে কিছুই জানিবার উপায় নাই।

## ২। ফ্রান্স

ফ্রান্সে ৪৬৫টী বিদেশী বীমা-কোম্পানী বীমা-ব্যবসায় মোতায়েন আছে। জার্ম্মাণির মত ফ্রান্সেও এইসমস্ত কোম্পানী ফ্রান্সবাসী কোনো ব্যক্তিকে বিশিষ্ট এজেণ্ট বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে বাধ্য। এই ব্যক্তি যে খোদ ফরাসী নাগরিক হইবে এমনকোনো দস্তুর নাই। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীগুলার প্রধান কর্ত্তারা কে তাহা খোঁজ লইলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ কোম্পানীর কর্ত্তা ফরাসীই বটে। তবে অল্পসংখ্যক বিদেশীকেও কয়েকটী বিদেশী বীমা-কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করিতে দেখা যায়। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, জার্ম্মাণিতে বিদেশী কোম্পানীগুলার প্রতিনিধির পদে একমাত্র জার্ম্মাণদেরই দেখা যায়; যদিও আইনে ধরাবাঁধা এমন কোনো ব্যবস্থা দেখা যায় না।

ফরাসী বীমা-আইন জার্ম্মাণ বীমা-আইনের মত জামিন সম্বন্ধেও সেরূপ কঠোর নয়। বিদেশী কোম্পানীগুলাকে ডিপজিট বা জামিন রাখিতে বাধ্য করা হয় না। তবে যদি কোনো দেশ ফরাসী বীমা-কোম্পানীগুলাকে ডিপজিট রাখিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে ফরাসী মুল্লুকে বীমা-ব্যবসা পরিচালনের বেলায় সেইসমস্ত দেশের কোম্পানীকে অবশ্য ডিপজিট রাখিতে বাধ্য করা হয়।

বিশেষ কয়েক শ্রেণীর বীমাব্যবসার জন্য বিশেষ ধরণের সরকারী তদারক ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে, যথা—জীবন, এনডাউমেণ্ট বা নির্দ্দিষ্ট বয়স বিষয়ক বীমা, সেভিংস ও মজুর ক্ষতিপূরণ। এই তদারক দেশী-বিদেশী সমস্ত বীমা-কোম্পানীর উপরই খাটে। আইনের কড়াক্কড়ি

এত বেশী যে, খুব কম বিদেশী কোম্পানীই এ-পথে পা বাড়াইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ৪৬৫টি বিদেশী কোম্পানী এই চার দফা বাদ দিয়া অন্যান্য প্রকার বীমা-ব্যবসায়ই মোতায়েন আছে।

দেশী-বিদেশী সব কোম্পানীর পক্ষেই শেয়ার-পুঁজির পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে ১,০০০,০০০ ফ্রাঁ (১৲ টাকা = ৯ ফ্রাঁ) এবং আদায়ী (আদায়-করা) পুঁজির পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে ইহার ২৫% হওয়া চাই। এইরূপ পুঁজিপাট্টা লইয়া কোম্পানী যে-কোনো প্রকার বীমার কারবার ফাঁদিতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে নতুন কোনো ধরণের বীমার কারবার চালাইতে হইলে ফি-বারই নতুন লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হয়। তাছাড়া কোনো-কোনা প্রকার বীমার জন্য জামিনেরও দরকার হইতে পারে। নিট্ লাভের ২০% লইয়া আইন-সম্মত মৌজুদ তহবিল খুলিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত না এই তহবিল মোট শেয়ার-পুঁজির ২০% হয় ততদিন কোম্পানী এইভাবে মৌজুদ রাখিতে বাধ্য।

ফরাসী দেশে কারবারের জন্য বিদেশী কোম্পানীগুলাকে একখানি পৃথক উদ্বর্ত্ত-পত্র দাখিল করিতে হয়। দেশীবিদেশী সমস্ত বীমা-কোম্পানীরই তদারকভার মজুর-বিভাগের দপ্তরের উপর। বিদেশী জীবন-বীমা-কোম্পানীগুলার পক্ষে প্রিমিয়াম রিজার্ভ ইত্যাদির হিসাব দাখিল করার রেওয়াজ আছে বটে, কিন্তু বিদেশী অগ্নিবীমা কোম্পানী-গুলার এসব বালাই নাই।

ট্যাক্স, শুল্ক; ষ্ট্যাম্প খরচা, রেজিষ্টারি খরচা ইত্যাদি সম্পর্কে বিদেশী কোম্পানীগুলা কোনো ফরাসী ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য। এই ব্যাঙ্কের অন্ততঃপক্ষে ২০,০০০,০০০ ফ্রাঁ শেয়ার-ক্যাপিটাল থাকা চাই। রাজস্ববিভাগের কর্ত্তারা এইসমস্ত কোম্পানীর দেনা শোধের জন্য ব্যাঙ্ককেই দায়ী করিয়া থাকে।

আদায়ী বা আদায়-করা মূলধন এবং অন্যান্য তহবিল নির্দ্দিষ্ট

কোম্পানীর কাগজে খাটাইতে হয়। ধরাবাঁধা কতকগুলা কাগজ আছে যাহাতে কম-সে-কম কোম্পানীসমূহ তিন-চতুর্থাংশ তহবিল খাটাইতে বাধ্য। বাকী সিকি তহবিল কার্য্যকরী পুঁজির সামিল এবং কোম্পানী ইহা ইচ্ছামত খাটাইতে পারে। তবে অংশীদারদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়।

হিসাবপত্রে প্রিমিয়াম-রিজার্ভ এবং ক্ষতি-রিজার্ভ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে হয়। বৎসরের নিট্ প্রিমিয়াম-লাভের অন্ততঃপক্ষে ৩৩% প্রিমিয়াম-রিজার্ভের সামিল করিতে হয়।

যেসমস্ত সিকিউরিটির উপর এইসমস্ত ভাণ্ডার গচ্ছিত রাখা হয়, বার্ষিক বিবরণীতে তাহার বিশদ পরিচয় প্রকাশ করার হুকুম আছে। এই সমুদয়ের মূল্য-পরিবর্ত্তন ইত্যাদিও পরিষ্কারভাবে সমঝাইয়া দিতে হয়।

১৯২২ সনের আইন অনুসারেই বীমা-ব্যবসা চলিতেছে।

## ৩। ইতালি

ইতালি দেশে ১০৯টা দেশী কোম্পানীর সহিত ৫৭টা বিদেশী বীমা-কোম্পানীও বীমার কারবার চালাইতেছে। ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, বিলাত, অষ্ট্রিয়া, সুইট্সারল্যাণ্ড, আর্জ্জেণ্টিনা, ব্রেজিল, বুলগেরিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই কয়দেশের বীমা-কোম্পানীগুলা ইতালিতে আড্ডা গাড়িয়াছে। ফ্রান্সের হিস্সাই সব চেয়ে বেশী, ইতালিতে ফরাসী বীমা-কোম্পানীর সংখ্যা ২৬টা; তারপরই বিলাত, এবং বিলাতের পরে সুইট্সারল্যাণ্ডের স্থান; শেষোক্ত দেশ দুইটার ইতালিতে বীমা-কোম্পানীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯ ও ৮। দেশী এবং বিদেশী সব কোম্পানীই ১৯২১, ১৯২২, ১৯২৩ ও ১৯২৫ সনের কানুনের বলে শাসিত হয়। সমস্ত কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণের ভার মিনিস্তেরো প্যর

লেকনমিয়া নাৎসিঅনালের হাতে (অর্থনৈতিক সচিবের দপ্তরে) ন্যস্ত আছে।

(১) জীবন, (২) সম্পত্তি অর্থাৎ শিল্প-বাণিজ্য বা (৩) পুনর্বীমা, যে-কোনো খাতেই হউক প্রত্যেক কোম্পানীকে পূর্ব্বোক্ত শিল্প-বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রিসভার নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হয়। ইতালিতে বিদেশী কোম্পানীগুলার জেনার‍্যাল এজেন্ট ইতালিয়ান ছাড়া আর কেহ হইতে পারে না। কারবার চালাইবার অনুমতি-গ্রহণের জন্য বিদেশী কোম্পানীগুলাকে যে দরখাস্ত করিতে হয় তাহাতে প্রধান দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী যে ইতালিয়ান জাতির অন্তর্গত এমন প্রমাণ থাকা চাই। এবিষয়ে ইতালীয় বিধি জার্ম্মাণ বা ফরাসী বিধি অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট, সেইজন্য কঠোরতরও বটে। দেশী-বিদেশী সমস্ত কোম্পানীকে কারবার চালাইবার অনুমতি লইবার জন্য ট্যাক্স দিতে হয়।

জীবনবীমার জন্য প্রাথমিক ২,০০০,০০০ লিরা (১৲ টাকা=প্রায় ৭ লিরা) জামিন রাখিতে হয়। হয় নগদ, না হয় সরকারী কোম্পানীর কাগজে টাকা জমা দেওয়ার নিয়ম। ডিপজিট ও কর্জ্জের ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্ক এই জামিন গ্রহণের অধিকারী। মাত্র এক রকম বীমা পরিচালনের জন্য সম্পত্তি অর্থাৎ শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক বীমা-কোম্পানীর পক্ষে প্রাথমিক জামিনের বরাদ্দ ২০০,০০০ লিরা। একাধিক শিল্পবাণিজ্য খাতে বীমা পরিচালনের জন্য প্রাথমিক জামিনের বরাদ্দ ৫০০,০০০ লিরা।

অন্যান্য শ্রেণীর আমানতের নিয়মকানুনও স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। জীবনবীমা-কোম্পানীগুলাকে ম্যাথ্‌ম্যাটিক্যাল বা গাণিতিক রিজার্ভ অর্থাৎ গচ্ছিত ভাণ্ডার (১) ইতালীয় সরকারী বণ্ডে, (২) অ-বন্ধকী সম্পত্তিতে, (৩) অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটিতে বা (৪) নগদ অর্থে রাখিতে হয়। এই মৌজুদ তহবিল সেভিংস ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোথাও

রাখিবার উপায় নাই, এবং এই তহবিলের মাত্র ৫°/<sub>০</sub> খাটানো যাইতে পারে। বীমাকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রিজার্ভের পৃথক হিসাব দাখিল করিতে হয় এবং বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষা ছাড়া এই তহবিলের এক কপর্দ্দকও এদিক-ওদিক করার নিয়ম নাই। উদ্বর্ত্তপত্র দাখিল করার একমাস পরে এই রিজার্ভের হিসাব নিকাশ করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ২,০০০,০০০ লিরা প্রাথমিক জামিনরূপে জমা রাখিতে হয়। তাহার মধ্যে ১,৫০০,০০০ লিরা ম্যাথম্যাটিক্যাল বা গাণিতিক রিজার্ভরূপে ধরা যাইতে পারে।

শিল্প-ব্যবসা-ঘটিত বীমা-কোম্পানীগুলা প্রাথমিক জামিন ছাড়া ফি সন চলতি কারবারের উপর টাটকা ডিপজিট জমা রাখিতে বাধ্য। ইতালিতে যে প্রিমিয়াম আদায় হয় তাহার ৩৫% বর্ষ-শেষে ডিপজিট খাতে জমা দিতে হয়। এই শতকরা বরাদ্দ ক্ষেত্রবিশেষে কমাইবারও রেওয়াজ আছে। (১) মালপত্র একযাত্রা চালানের উপর সামুদ্রিক বীমা বিষয়ক এবং (২) ছয় মাসের অনধিক মেয়াদের সাধারণ বীমাবিষয়ক ( শিলাবৃষ্টি ও গবাদি পশু বীমা-সম্বন্ধীয় ছাড়া ) প্রিমিয়াম আয়ের মাত্র ১৫°/<sub>০</sub> বাৎসরিক ডিপজিটের পরিমাণ। (৩) শিলা ও গবাদি পশু-সম্বন্ধীয় বীমা প্রিমিয়ামের ২০°/<sub>০</sub> এবং (৪) বিশেষ কয়েকটা ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের ২৫°/<sub>০</sub> বাৎসরিক ডিপজিটরূপে দাখিল করার ব্যবস্থা আছে।

## ৪। সুইট্‌সারল্যাণ্ড

সুইট্‌সারল্যাণ্ডে ৩৪টা বিদেশী বীমা-কোম্পানী বীমা-ব্যবসায় মোতায়েন আছে। এর মধ্যে ফরাসী কোম্পানীর সংখ্যা ১৬টা, বিলাতী ৮টা, জার্ম্মাণ ৮টা এবং ইতালীয় ২টা। ১৮৮৫ সনের বে-সরকারী বীমা-কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন, ১৯১৯ সনের বীমা-কোম্পানী-

সমূহের জামিন বিষয়ক আইন, ১৯২১ সনের পূর্ব্বোক্ত দুই বিধির পরিপূরক আইন এবং ১৯৩০ সনের দাবীর নিরাপত্তা রক্ষার আইন—এই কয় দফা আইন দ্বারা বীমা-কোম্পানীগুলাকে শাসন করার ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে। শেষ আইনটী কিন্তু কেবলমাত্র স্বদেশী বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলার উপর খাটে।

বীমা-ব্যবসার শাসনভার বুণ্ডেসরাটের (ফেডার্যাল কাউন্সিলের) উপর ন্যস্ত। স্থইট্‌সারল্যাণ্ডের এলাকায় ব্যবসা চালাইবার জন্য বিদেশী কোম্পানীগুলাকে স্থইটসারল্যাণ্ড-নিবাসী খাঁটি স্থইস নাগরিককে অ্যাটর্নির ক্ষমতাযুক্ত প্রধান কর্ম্মসচিব নিয়োগ করিতে হয় (১৯২১ সনের আইন, ১৫ ধারা)। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার জাতীয়তা বা রাষ্ট্রিকতা সম্বন্ধে এই দেশ জার্ম্মাণির মত কোনো সন্দেহের অবকাশ না রাখিয়া ইতালির মত ধরাবাঁধা ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছে।

দেশী-বিদেশী সমস্ত বীমা-কোম্পানীকেই জামিন জমা দিতে হয়। কেবলমাত্র পুনর্বীমা পরিচালনের কোম্পানীগুলাকে রেহাই দেওয়া হইয়া থাকে।

বিদেশী কোম্পানীগুলার পক্ষে জামিন দেওয়ার হার নিম্নলিখিতরূপ (১৯২১ সনের আইনের ৩ ধারা):—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | জীবন | ... | ২০০,০০০ ফ্রাঁ |
| | | | (১৲ টাকা=প্রায় ১·৯ ফ্রাঁ) |
| ২। | দুর্ঘটনা ও দায়িত্ব | ... | ৬০০,০০০ ফ্রাঁ |
| ৩। | অগ্নি | ... | ১০০,০০০ ফ্রাঁ |
| ৪। | মাল-চালান | ... | ৫০,০০০ ফ্রাঁ |
| ৫। | বিভিন্ন, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য | ... | ২০,০০০ ফ্রাঁ |

একমাত্র স্থইস মুদ্রায় জামিন জমা দিবার বিধান।

প্রাথমিক ডিপজিট ছাড়া বিদেশী কোম্পানীগুলাকে বৎসর-বৎসরও টাকা জমা দিতে হয়। বীমার শ্রেণী-হিসাবে এইসমস্ত ডিপজিটের পার্থক্য আছে ( ১৯২১ সনের, ২ ধারা ) :—

১। জীবন-বীমার জন্য বিদেশী কোম্পানীগুলাকে ষোল আনা পুঁজি, এবং স্বইট্সার ল্যাণ্ডের আদায়ী বা আদায়-করা প্রিমিয়ামের গাণিতিক রিজার্ভ জমা রাখিতে হয় ; তাছাড়া সরকারী বীমা অফিসের নির্দ্দেশক্রমে আরও কিছু সম্ভবমত অর্থ জমা রাখিতে হয়।

২। দুর্ঘটনা ও দায়িত্ব শোধের বীমার জন্য বিদেশী কোম্পানী-গুলাকে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের স্বইটসারল্যাণ্ডে আদায়ী মোট প্রিমিয়ামের কম-সে-কম ৫০% জমা দিতে হয়। বুণ্ডেসরাট লম্বা মেয়াদের বীমার বেলায় এবং বিশেষ কয়টী খাতে স্বইট্সারল্যাণ্ডে আদায়ী বা আদায় করা প্রিমিয়ামের গোটা গাণিতিক রিজার্ভই দাবী করিয়া বসে।

৩। মাল-চালান-বিষয়ক বীমার খাতে স্বইট্সারল্যাণ্ডে আদায়ী প্রিমিয়ামের ২৫% বিদেশী কোম্পানীগুলা জমা দিতে বাধ্য। ১৯১৯ সনের আইনে মালচালান সম্পর্কে কোনো বিধান ছিল না।

৪। অন্যান্য বীমার জন্য জমা দেওয়ার হার কমপক্ষে ৫০%।

সতর্কতামূলক ডিপজিট বা জামিন রাখার বিধানাবলী স্বদেশী কোম্পানীগুলার বেলায়ও বলবৎ আছে ( ১৯২১ সনের আইনের ৬ ধারা )। তবে বীমার শ্রেণী-হিসাবে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমা দেওয়া সম্বন্ধে ইহাদের কিছু-কিছু স্বাধীনতা বা রেহাই আছে।

দেশী-বিদেশী সমস্ত বীমা-কোম্পানী বিদেশী কোম্পানীর কাগজও জমা রাখিতে পারে। তবে বিদেশী সিকিউরিটী ২৫%-এর বেশী রাখিবার উপায় নাই ( ১৯২১ সনের আইনের ৭ ধারা )। এই সীমানা অবস্থাভেদে সাময়িকভাবে বাড়ানোও যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায়

কোম্পানী সুইস কারেন্সির (সিক্কার) সমস্ত সম্পত্তি জামিন রাখিতে বাধ্য।

কোম্পানী যে-কোনো জাতীয় সিকিউরিটিই দাখিল করুক না কেন, সরকারী বীমা-অফিস হইতেই তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ডিপজিটসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। আফিসের অনুমতি ব্যতীত উহার বিনিময় করিবার বা উহা উঠাইবার উপায় নাই।

## ৫। পর্ত্তুগাল

১৯২৯ সনের আইনদ্বারা বিদেশী কোম্পানীগুলাকে দুইটি বিবৃতি প্রকাশ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। একটী বিবৃতিতে মোট কারবারের হিসাব থাকে। অপরটিতে পর্ত্তুগালের কারবারের পরিচয় থাকে। বিবৃতি দুইটীই পর্ত্তুগীজ ভাষায় প্রকাশ করিতে হয়।

সতর্কতার ডিপজিট বা জামিন দেশী-বিদেশী সমস্ত কোম্পানীর নিকট হইতেই নিম্নলিখিত হারে আদায় করা হয়ঃ—জীবন-বীমার জন্য, ৫০০,০০০ এস্কুদো; শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বীমায় ৩০০,০০০ এস্কুদো এবং অন্যান্য শ্রেণীর বীমায় ২৫০,০০০ এস্কুদো (১ এস্কুদো=৩৲ টাকা)।

এই জামিন ছাড়া বিদেশী কোম্পানীগুলাকে বিশেষ রিজার্ভও রাখিতে হয়ঃ—

১। জীবন ও শ্রমিক ক্ষতিপূরণের বেলায় গাণিতিক রিজার্ভের সমান রিজার্ভ।

২। অগ্নি, দুর্ঘটনা এবং এক বৎসরের অধিক মেয়াদযুক্ত অন্যান্য বীমায় রিজার্ভের পরিমাণ মোট বার্ষিক নিট প্রিমিয়াম-আয়ের এক-তৃতীয়াংশ হওয়ার দরকার।

৩। সামুদ্রিক ও অন্যান্য অল্পমেয়াদী বীমায় প্রিমিয়াম-আয়ের ১০% বিশেষ রিজার্ভ রাখিতে হয়।

## ৬। পোল্যাণ্ড

ইতালি ও সুইট্‌সারল্যাণ্ডের মত পোল্যাণ্ড দেশেও বিদেশী বীমা-কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারিরূপে পোলজাতীয় ব্যক্তিকেই দেখা যায়। অফিসের কাজ পোল ভাষাতেই চালাইতে হয়। অন্যান্য স্থানের মত এই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর নিয়োগ বীমা-সংক্রান্ত কারবারের সেরা কর্ত্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাজস্ব-বিভাগীয় মন্ত্রি-সভার বিবেচনা-সাপেক্ষ ও নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিদেশী কোম্পানীগুলার কাছ থেকে কমপক্ষে ২,০০০,০০০ স্লোতি জামিনস্বরূপ ডিপজিট আদায় করা হয়। তাহা ছাড়া অতিরিক্ত ডিপজিট রাখিতেও বিদেশী কোম্পানীগুলা বাধ্য। এই অতিরিক্ত ডিপজিট জীবন-বীমার পক্ষে ১,০০০,০০০ স্লোতি, অগ্নি-বীমায় ১,০০০,০০০ স্লোতি, শিলায় ৫০০,০০০ স্লোতি, মালচালানে ৫০০,০০০ স্লোতি এবং অন্যান্য শ্রেণীর বীমায় ২৫০,০০০ স্লোতি ( ১৲ টাকা=প্রায় ৩ স্লোতি)।

যেসমস্ত সম্পত্তিতে ডিপজিট ও অন্যান্য তহবিল রাখা হয় কোম্পানী একখানি পৃথক বহিতে তাহার হিসাব রাখিতে বাধ্য। জার্ম্মাণির মত পোল্যাণ্ড দেশেও নিয়ন্ত্রণকারী কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিদেশী কোম্পানীগুলা এইসব সম্পদ্ বিনিময় করিতে পারে না। কোম্পানীর বিরুদ্ধে দাবী চালাইয়া কেহ এইসব সম্পত্তির উপর দাবী করিতেও পারে না। কেবলমাত্র বীমাকারীদের স্বার্থের জন্যই ইহাকে স্পর্শ করা চলিতে পারে। পোল্যাণ্ডে কোম্পানীর ব্যবসা ফেল মারিলেই তবে ইহার ব্যবহার হইতে পারিবে। দেশী-বিদেশী সব কোম্পানীর উপরই এই বিধি প্রযোজ্য এবং জার্ম্মাণ আইনের সারমর্ম্মের সহিত এই বিধি হুবহু মিলিয়া যায়। জার্ম্মাণির মত পোল্যাণ্ডেও পুঁজি খাটাইবার বেলায় সিকা বা টাকাকড়ির জাতীয়তা অর্থাৎ রাষ্ট্রিকতা অনুসারে পুঁজির প্রয়োগক্ষেত্র ঢুঁড়িতে হয়।

পোল্যাণ্ডে বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ৭টী,—২টী অষ্ট্রিয়ান, ২টী জার্ম্মাণ, ২টী ইতালীয় এবং ১টী বিলাতী।

## ৭। বুলগেরিয়া

১৯২৬ সনের আইন অনুসারে মাত্র এক শ্রেণীর বীমা-ব্যবসার জন্য বিদেশী কোম্পানীগুলাকে অন্ততঃ পক্ষে আপন কার্য্যকরী পুঁজির ১,০০০,০০০ লেবা খাটাইতে হয়। একাধিক শ্রেণীর জন্য ইহাদিগের পক্ষে কম-সে-কম ২,০০০,০০০ লেবা পুঁজি ঢালিবার প্রয়োজন (১৲ টাকা=প্রায় ৫০ লেবা)।

দেশী-বিদেশী সব কোম্পানীর কাছ থেকে জামিনস্বরূপ প্রাথমিক ডিপজিট আদায় করা হয় এবং ইহার হার প্রত্যেক দফা কারবারের জন্য ১,৩০০,০০০ লেবা। এইসমস্ত ডিপজিটের টাকা বাঁক সাঁত্রাল কো-অপারাতিভ্ বুলগারের নিকট জমা রাখিতে হয়।

দেশী-বিদেশী সমস্ত কোম্পানীর পক্ষেই দেশের এলাকার ভিতর নিম্নলিখিত হারে পুঁজি খাটানো বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে:—(১) জীবনবীমার সমস্ত গাণিতিক রিজার্ভ, (২) দুর্ঘটনা-বীমাতেও তদনুরূপ ব্যবস্থা, (৩) অগ্নিবীমার বার্ষিক প্রিমিয়াম আয়ের ৪০%, (৪) সামুদ্রিক ও অন্যান্য বীমার প্রিমিয়ামের ২৫%।

## ৮। রুমাণিয়া

রুমাণিয়ায় বিদেশী কোম্পানীগুলাকে বাঁক্ ন্যাসিয়োনিল্ দ্য রুমাণীর নিকট নিম্নলিখিত বীমাগুলার প্রত্যেক দফার জন্য ৪,০০০,০০০ লেই সতর্কতার ডিপজিট রাখিতে হয়:—(১) জীবন বীমা (২) দুর্ঘটনা, (৩) অগ্নি, (৪) শিলা, (৫) মালচালানি (১৲ টাকা=৬০ লেই)। এই প্রাথমিক জামিন (১) নগদ টাকায়, (২) রাষ্ট্রের জামিনযুক্ত

বণ্ডে, বা (৩) রুমাণিয়ার বাড়ী-ঘরের উপর বন্ধকীতে রাখা যাইতে পারে।

এই জামিন ডিপজিট ছাড়া প্রত্যেক বিদেশী কোম্পানী রুমাণিয়ায় নিম্নলিখিত সর্ব্বনিম্ন হারে পুঁজি খাটাইতে বাধ্য :—

১। জীবন-বীমায়; মোট গাণিতিক রিজার্ভ, মায় পুনর্ব্বীমা-বিষয়ক গচ্ছিত ভাণ্ডার সমেত।

২। অন্যান্য বীমা; টেকনিক্যাল রিজার্ভ। এই রিজার্ভ অন্ততঃ পক্ষে (১) অগ্নি, সামুদ্রিক ইত্যাদির প্রিমিয়ামের ৪০% এবং (২) আভ্যন্তরীণ মালচালান বীমার প্রিমিয়ামের ২৫% হওয়া চাই। দেশী কোম্পানীগুলাকেও এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়।

বীমাঘটিত সর্ব্বশেষ আইন ১৯৩০ সনে কায়েম হইয়াছে।

## ৯। লাটভিয়া

লাটভিয়ায় বিদেশী বীমা-কোম্পানীকে কারবার ফাঁদিতে দেওয়া হয় না। ১৯২১ সনে আইন করিয়া এই ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে।

## ১০। লিথুয়ানিয়া

লিথুয়ানিয়ায় বিদেশী কোম্পানীগুলা বিদেশস্থ পুঁজিপাট্টা বা সম্পত্তির বিজ্ঞাপন দিতে অধিকারী নয়।

লিথুয়ানিয়ায় অনুষ্ঠিত ব্যবসার প্রিমিয়াম-রিজার্ভ এবং আবশ্যকীয় ডিপজিট ইত্যাদি টাকাকড়ি অর্থসচিবের অনুমোদিত লিথুয়ানিয়ান ব্যাঙ্ক-সমূহে জমা রাখিতে হয়। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ না লইয়া এইসমস্ত অর্থে কোম্পানীগুলার হাত দেওয়ার উপায় নাই।

বিদেশী অফিসগুলার প্রধান কর্ম্মচারীকে লিথুয়ানিয়ান জাতীয় ব্যক্তি হইতে হইবে।

১৯২৩ সনের আইনে এইসব ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে।

এই প্রবন্ধ ১৯৩১ সনে বার্লিনে থাকিবার সময় লেখা হয়। "আলিয়ান্‌ৎস উণ্ড ষ্টুটগার্টার" নামক বীমা-কোম্পানীর গ্রন্থাগারে বসিয়া তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রবন্ধটা ইংরেজিতে লেখা হয়। সেই বৎসরই এটা "ইন্‌শিওর‍্যান্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ" নামক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। পরে অন্যান্য কাগজেও প্রকাশিত হইয়াছে। "ইকনমিক ডেভেলপ-মেণ্ট" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৩২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৮) মূল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

# বাঙালীর ব্যাঙ্ক-দৌলত*

## অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

এই প্রবন্ধের জন্ম বিনয়বাবুর "বাড়তির পথে বাঙালী" গ্রন্থ (১৯৩৪) দ্রষ্টব্য। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের (পৃষ্ঠা ৯৩-১৮৯) আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ:—তুলাশিল্পে ভারত (১৯০৫-৩১), বাংলার ব্যাঙ্কে বিদেশী, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বাংলা ও বক্কান-চক্র, পোল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক, বাংলার সমবায় ও সেভিংস ব্যাঙ্কসমূহ, বাঙালী-পরিচালিত জয়েণ্ট-ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহ, ভারতীয় ব্যাঙ্ক বনাম ভারতের একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক, ফরাসী ব্যাঙ্ক-দৌলতের ধরণ-ধারণ (১৯২৩), একালের ইঙ্গ-মার্কিণ ব্যাঙ্ক-মাপকাঠি, ইতালির ব্যাঙ্ক-ব্যবসা (১৮৪৯-১৮৯৩), ইতালির বে-সরকারী ব্যাঙ্ক (১৯২৭), ১৮৭০ সনের কাছাকাছি বৃটিশ, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কিং, জাপানী ব্যাঙ্কিং (১৮৭২-১৯২৭), "শক্তি"শালী দেশসমূহের শ্রেণীবিভাগ, ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ ও ব্যাঙ্ক-পরিচালনা, কোম্যারৎস্‌-উণ্ড-প্রিফাট বাঙ্ক, ড্রেস্‌ড্‌নার বাঙ্ক, ডিস্কোণ্টো-গেজেল্‌শাফ্‌ট্‌, ব্যাঙ্কের বাড়তির তিন বিভিন্ন দিক্‌, ব্যাঙ্কিংয়ের অর্থনৈতিক "একক", বাঙালীর ব্যাঙ্কে "যুক্তিযোগ", বাঙালী ব্যাঙ্কের আগামী দশ বৎসর, সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়ার উদাহরণ, ব্যাঙ্ক-পরিচালনায় তুলনাসাধন, "মহাশক্তি" এবং বক্কান মাপে সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক ( সি, বি, আই ), পুঁজি ও রিজার্ভের সহিত আমানতের তুলনা, দেশে-দেশে ব্যাঙ্ক-সাম্য, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী ও ভারতের আধুনিক অর্থনীতি। —সম্পাদক

* "আর্থিক উন্নতি" আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ ( সেপ্টেম্বর-নবেম্বর ১৯৩২ )।

# "আর্থিক উন্নতি"র সাত বৎসর*

## অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

বিনয়বাবুর "বাড়্তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) গ্রন্থের ৫৮-৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধের বিবৃত বস্তু নিম্নরূপ :—বাঙালী জাতির বাড়্তি, ইতালি-রুশিয়ায় যুগান্তর, যৌবনাবতার হিট্লার, জাপান ও তুনিয়া, বিশ্বব্যাপী আর্থিক দুর্যোগ, যুবক বাংলার সাত সাল, বাঙালীর উন্নতি কাহাকে বলে? "হোআইট পেপারে"র যুগ, ব্যাঙ্ক-বীমায় বাঙালী, বাঙালীর জুট মিল ও বাণিজ্যনিষ্ঠা, চাষীদের খাওয়া-পরা, ভারতীয় মুদ্রানীতি ও বাঙালী চাষী, স্বর্ণ-রপ্তানি ও চাষী, অটাওয়ার ব্যবস্থায় চাষীর লাভ, অটাওয়া-চুক্তির ন্যায়-পরীক্ষা, আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যে জমিদার, ধনবিজ্ঞানে বাঙালী, গবেষকদের লেখাপড়ার নমুনা, অর্থশাস্ত্রের বিশ্ব-সাহিত্য, "আর্থিক উন্নতি"র আদর্শ, পরাধীন দেশের সম্পদ্‌বৃদ্ধি, আগামী সাত বৎসর, লণ্ডন-সম্মেলনে বিশ্বদৌলত, শুল্ক-সঙ্ঘ ও সিক্কা-সঙ্ঘ, মূল্য-সমস্যা, বেকার-সমস্যা, বিদেশী পুঁজি-আমদানির ব্যবস্থা।

—সম্পাদক

* "আর্থিক উন্নতি", বৈশাখ ১৩৪০ (এপ্রিল ১৯৩৩)।

# আঠার পেন্সের রূপেয়া*

## অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

বিগত ২৩শে অক্টোবর (১৯৩৩) তারিখে ভারতীয় লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেমব্লিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-বিষয়ক বিল পেশ করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে ঐ তারিখেই কলিকাতার "ইউনাইটেড প্রেস" নামক সাংবাদিক-দপ্তর "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে মোলাকাৎ চালাইয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করেন। প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় সিক্কার বর্ত্তমান দর সম্বন্ধে বিনয়বাবুর বক্তব্য "ইউনাইটেড প্রেস" কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের নানা দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইয়াছে। লাহোরের "ট্রিবিউন", দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌", মান্দ্রাজের "হিন্দু" ইত্যাদি দৈনিক পত্র এই সূত্রে উল্লেখযোগ্যের অন্তর্গত।

প্রায় সেই সময়েই,—অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে,—শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন রায়চৌধুরী তাঁহার প্রকাশ-ভবন হইতে বিনয়বাবুর "ইণ্ডিয়ান কারেন্সী অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্‌লেম্‌স্‌" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বইয়ে ১৯২৬ হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত টাকার মূল্য, ১৬ পেন্স বনাম ১৮ পেন্স সমস্যা, আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিনয়বাবু বিগত সাত-আট বৎসর ধরিয়া নানা মারফতে যে-সকল মত প্রচার করিয়াছেন তাহার একত্র সমাবেশ আছে।

* "ক্লাইভষ্ট্রীট" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত (ডিসেম্বর ১৯৩৩)।

১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়বাবু প্রথমবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বোম্বাইয়ে ও অন্যান্য কেন্দ্রে এইসকল সমস্যা লইয়া তুমুল আন্দোলন দেখিতে পান। বাংলা দেশেও এই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছিয়াছিল। সেই আন্দোলন ১৯২৭ সনের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত সজাগ ছিল। প্রথম হইতেই বিনয়বাবু আন্দোলনটাকে স্বাধীনভাবে যাচাই করিতে থাকেন। তাঁহার বিচারে সাধারণ্যে প্রচলিত মতগুলার স্বপক্ষে যুক্তি ছিল না। সেই বিচার অনুসারেই তিনি আজ পর্য্যন্ত কারেন্সী ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-বিষয়ক সকল আলোচনা চালাইয়া আসিতেছেন। ১৯২৫-২৭ সনে বিনয়বাবুর স্বপক্ষে ভারতবর্ষে বেশী লোক ছিল না। ১৯৩০ সনের আন্দোলনে অনেক বাঙালী সুধী এই মতের স্বপক্ষে রায় দিতেছেন।

"ইণ্ডিয়ান কারেন্সী অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্‌লেম্‌স্" ( ভারতীয় সিক্কা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমস্যা ) নামক বইয়ের সূচীপত্র নিম্নরূপ :—

১। হিল্টন ইয়ং কারেন্সী কমিশনের কার্য্যবিবরণী, আগষ্ট ১৯২৬।

২। টাকার বিনিময়-দর-বৃদ্ধি ও ভারতীয় কৃষি, জানুয়ারি ১৯২৭।

৩। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল, ১৯২৭।

৪। বিলাতী পাউণ্ড-ষ্টার্লিঙের সঙ্গে রূপেয়ার শৃঙ্খলীকরণ, নবেম্বর, ১৯৩১।

৫। সিক্কার দর ও "পক্ষপাত-মূলক" শুল্কব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় চাষীর যোগাযোগ, এপ্রিল-মে, ১৯৩৩।

৬। লণ্ডনের বিশ্বদৌলত-সম্মেলনে শুল্ক ও সিক্কা সমস্যার আলোচনা, মে, ১৯৩৩।

৭। ভারত হইতে সোনা রপ্তানি, মে ১৯৩৩।

৮। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কমিটির কার্য্যবিবরণী, আগষ্ট ১৯৩৩।

৯। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া বিল, ১৯৩৩।

এই অধ্যায়গুলা যথাসময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় মোলাকাৎ-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। কোনো-কোনোটা "আর্থিক উন্নতি"তেও বাহির হইয়াছে। মৎ-সম্পাদিত "ক্লাইভ ষ্ট্রীট" ও "ইন্সিওর‍্যান্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ" পত্রিকা দুইটায় কোনো-কোনোটা উদ্ধৃত হইয়াছে। কলিকাতার সাপ্তাহিক "কমার্শ্যাল গেজেট" এবং ঢাকার সাপ্তাহিক "সোনার বাংলা" ইত্যাদি পত্রিকায়ও এইসমুদয়ের বৃত্তান্ত আছে।

এই বৎসর ২৩এ অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল বিষয়ক বিনয়বাবুর মোলাকাৎ ছাপা হইবার পর বোধ হয় বোম্বাইয়ে কারেন্সী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লীগ টাকার দর ১৮ পেন্স হইতে নামাইয়া ১৬ অথবা অন্য কোনো স্তরে আনিতে প্রবৃত্ত। টাকার দর কমাইবার আন্দোলন বাংলা দেশেও পৌঁছিয়াছে। এই আন্দোলনে বিনয়বাবুর মতামত "ইউনাইটেড প্রেসের" মারফত কলিকাতার আর ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের বিভিন্ন পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যেসকল মোলাকাৎ বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতকগুলি একত্রে সংগৃহীত করা হইল। যে-যে পত্রিকা হইতে মোলাকাৎগুলা উদ্ধৃত করা হইতেছে সেইসকল পত্রিকার নামও উল্লেখ করা যাইতেছে। অন্যান্য পত্রিকায়ও এই সমুদায় মোলাকাৎ পূরাপূরি অথবা সংক্ষিপ্তরূপে বাহির হইয়াছে। তাহা ছাড়া কলিকাতার ফরওয়ার্ড, অ্যাড্‌ভান্স এবং অমৃতবাজার পত্রিকায়ও মতগুলি ইংরেজিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

## ১। টাকার মূল্য-হ্রাসের চেষ্টা

পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য কম করিয়া নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে "আনন্দ

বাজার পত্রিকার" প্রতিনিধি অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার অভিমত জানিতে চাহেন। এই সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার বলেন যে, বর্ত্তমানে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার যে মূল্য নির্দ্ধারিত আছে তদ্দ্বারা এদেশে বিদেশী জিনিষ আমদানির কতকটা সুবিধা হইতেছে বটে; কিন্তু আমাদের অবস্থা যে প্রকার তাহাতে বিদেশী জিনিষ আমদানি একটি নিছক অনিষ্টকর ব্যাপার নহে; কারণ বিদেশী কলকব্জা এবং অন্যান্য বহুবিধ জিনিষ ছাড়া আমরা চলিতে পারি না। আজ আমরা যে স্বদেশী আন্দোলন চালাইতেছি তাহাও বিদেশী কলকব্জার সাহায্য ব্যতিরেকে একদিনও চলিতে পারে না। কৃষি-কার্য্যের জন্যও অনেক বিদেশী রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হইতেছে। টাকার মূল্য অতিরিক্ত করিয়া ধার্য্য হওয়াতে আমরা কথঞ্চিৎ সস্তায় এইসকল বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে যদি টাকার মূল্য কমাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এইসব বিদেশী জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে আমাদের দেশের শিল্পোন্নতিতেও বাধা পড়িবে।

কেহ হয়ত বলিবেন যে, বিদেশী মাল সস্তায় আমদানি হওয়ার ফলে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের পক্ষে বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সেই হিসাবে টাকার মূল্য-হ্রাস দেশীয় শিল্পের সহায়ক হইতে পারে। এই কথার উত্তর এই যে, ভারতীয় সকল প্রকার শিল্পের "সংরক্ষণের" জন্য টারিফ বোর্ড রহিয়াছে এবং উহার নির্দ্দেশমত নানাপ্রকার ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য গবর্ণমেণ্ট বিদেশী শিল্পের উপর রক্ষণশুল্ক বসাইয়াছেন। ভবিষ্যতে আরও সংরক্ষণ শুল্ক বসানো সম্ভব। টাকার মূল্য হ্রাস দ্বারা দশ প্রকার অসুবিধা ডাকিয়া না আনিয়া ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের প্রতিযোগিতা-শক্তি বাড়াইবার জন্য রক্ষণশুল্কের সাহায্য নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

অনেকে আশা করেন যে, টাকার মূল্য হ্রাস করিলে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের মূল্য চড়িবে। এই বিষয়ে অধ্যাপক সরকার বলেন, ভারত হইতে রপ্তানি মালের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি সব সময়ে টাকার মূল্যের উপর নির্ভর করে না। এই অবস্থায় টাকার মূল্যের সাথে কৃষকের ভাগ্য জুড়িয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না। পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে, টাকার মূল্য শতকরা ১২॥০ কি ১৫॥০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে—অথচ কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বাড়ে নাই; বরং এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, টাকার মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ভারত হইতে রপ্তানি-করা কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, একমাত্র টাকার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির অন্য কারণ আছে। পৃথিবীতে যদি ভারতীয় পণ্যের চাহিদা না থাকে, তাহা হইলে টাকার মূল্য কমাইয়া ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে না। ভারতীয় পণ্যের ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা বর্দ্ধিত না হইলে ভারতীয় পণ্যের মূল্য চড়িবে না।

অধ্যাপক সরকার আরও বলেন যে, সম্প্রতি ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্স (সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত) অথবা সাম্রাজ্যজাত পণ্যের উদ্দেশ্যে সুবিধাদান নীতি অবলম্বিত হওয়াতে অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে টাকার মূল্য-হ্রাস করিবামাত্র আমদানি-শুল্কের হারেরও ওলটপালট করা আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহা আদৌ সম্ভবপর নয়। এজন্য তিনি বর্ত্তমানে টাকার মূল্যহ্রাসের জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন।

প্রসঙ্গতঃ অধ্যাপক সরকার একথাও বলেন যে, টাকাকে পাউণ্ডের সম্পর্কবর্জ্জিত করা বর্ত্তমানে কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইবে না। পাউণ্ডের হিসাবে যদি টাকাব একটা মূল্য নির্দ্ধারিত না থাকে তাহা হইলে

টাকার মূল্যে ক্রমাগত এমন উঠতি-পড়তি হইতে থাকিবে যে, এজন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিষম আঘাত পড়িবে। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভবিষ্যতে দেশের অবস্থা অনুযায়ী টাকার মূল্যের হার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে, তাহা অধ্যাপক সরকার স্বীকার করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে টাকার মূল্যহ্রাসের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে—অধ্যাপক সরকার দৃঢ়ভাবে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ নবেম্বর, ১৯৩৩)

## ২। টাকার মূল্য-হ্রাস বিধেয় কিনা

সম্প্রতি দৈনিক বসুমতীর স্পেশাল রিপোর্টার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারকে 'রূপি-ষ্টার্লিং' বিনিময় হার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। অধ্যাপক সরকার কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

প্রঃ—কেহ কেহ বলিতেছেন, টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্দিষ্ট হওয়ার ফলে এ দেশে বৈদেশিক পণ্যের আমদানি-বৃদ্ধি ঘটিতেছে। এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?

উঃ—টাকার বিনিময়-মূল্য উচ্চতর হওয়ায় ভারতবাসীরা বৈদেশিক পণ্য-ক্রয়ে নিশ্চয়ই কতকটা উৎসাহিত হইতেছে। কেন না টাকার হিসাবে ষ্টার্লিং সস্তা হওয়ায় যে বিদেশী পণ্য ষ্টার্লিংয়ের মূল্যে বিক্রী হয়, তাহাও টাকার হিসাবে সস্তা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়টাকে সর্ব্বপ্রকারে অশুভ বলা চলে না। বর্ত্তমানে আমাদের যেরূপ অবস্থা তাহা বিবেচনা করিলে বিদেশীয় পণ্য আমাদের পক্ষে আবশ্যক বলিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা এখনও অনেক জিনিষ স্বদেশে প্রস্তুত করিতে

পারি না। সুতরাং যে-সকল অত্যাবশ্যক শিল্পজাত দ্রব্য এ দেশে উৎপন্ন হয় না, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর স্বার্থের জন্যই সেগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিদেশ হইতে আমদানি করা বিধেয়। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি আবশ্যক; এইসকল দ্রব্য প্রধানতঃ বিদেশ হইতেই সরবরাহ হইতে পারে। এইসকল বস্তু অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে পাওয়া গেলে আমাদের স্বদেশী আন্দোলন অর্থাৎ দেশীয় শিল্পের উন্নতির চেষ্টা অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

প্রঃ—ভারতের বাজারে বিদেশী পণ্য সস্তা হইলে আমাদের স্বদেশী শিল্পের উৎকর্ষের পথে অথবা এ দেশে যেসকল শিল্প দেশী অথবা বিদেশী মূলধনে পরিচালিত হইতেছে, সেসকল শিল্পের পথে কি বাধা উপস্থিত হইবে না?

উঃ—কতকটা তাহাই বটে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আজ ভারতে 'টারিফ-বোর্ড' রহিয়াছে এবং যাহাতে ভারতের মূল শিল্পগুলির উন্নতি হয় তৎপ্রতি সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ভারতবাসীরা যখনই মনে করিবেন যে, বিদেশী পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কোনো কোনো শিল্পের প্রতিষ্ঠা ঘটিতেছে না, অথবা উন্নতি সাধিত হইতেছে না, তখনই আন্দোলন ও আইনের সহায়তায় ঐ বিষয়ে কতকটা প্রতীকারলাভের সম্ভাবনা থাকিবে। সুতরাং মুদ্রানীতিতে যে গলদ আছে, তাহা শুল্কনীতি দ্বারা কিয়ৎ-পরিমাণে সংশোধিত হইতে পারে।

প্রঃ—ষ্ট্যার্লিংয়ের অনুপাতে টাকার বিনিময়-মূল্য-বৃদ্ধি পাইলে উহার ফলে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি হ্রাস পায় না কি?

উঃ—প্রাচীন রিকার্ডীয় ধন-বিজ্ঞানের আনুমানিক যুক্তির উপর নির্ভর করিলে বলা চলে যে, যখনই ষ্ট্যার্লিংয়ের তুলনায় টাকার মূল্য

বাড়িয়া যাইবে, তখনই বিদেশী ক্রেতাদের কাছে ভারতীয় পণ্যের মূল্য বাড়িবে। কাজেই বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং ভারতীয় পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ইহার ফলে আমাদের কৃষককুলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে। কেবলমাত্র আনুমানিক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অন্ধকার ঘরে চক্ষু মুদিয়া এরূপ অভিমত সহজে প্রকাশ করা চলে। কিন্তু ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রকৃত অবস্থাটা কি? ১৯২৭ সনে টাকার মূল্য ১৮ পেনী নির্দ্ধারিত হয়। ইহার ফলে বিদেশে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। ১৯২৩-২৬ সনের রপ্তানির সহিত ১৯২৭-৩১ সনের রপ্তানির তুলনা করা হইলে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর আর্থিক দুর্গতি সত্ত্বেও বিদেশে ভারতীয় পাট, কার্পাস এবং চায়ের রপ্তানি বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি তৈল-বীজের রপ্তানিও কিছু বাড়িয়াছে। সুতরাং যাঁহারা ১ শিলিং ৬ পেনীর বিরুদ্ধে এবং ১ শিলিং ৪ পেনীর অনুকূলে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের যুক্তির অসারতা দেখা যাইতেছে।

প্রঃ—ষ্টার্লিংয়ের সহিত ভারতীয় মুদ্রাকে বাঁধিয়া দেওয়ার ফলে আমাদের ক্ষতি হইয়াছে কি?

উঃ—না, ক্ষতি হয় নাই। ১৯৩১ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ পাউণ্ডের মূল্য কমিয়া যায়। ঐ সময়ে বৃটিশ মুদ্রার সহিত ভারতীয় মুদ্রার সংযোগ-সাধন করা হয়। ইহার ফলে আমাদের টাকার মূল্যও হ্রাস পায়। ঐ সময় হইতে জার্ম্মাণি, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান প্রভৃতি স্বর্ণমান-সম্বলিত দেশের মুদ্রার অনুপাতে টাকার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। ষ্টার্লিং এবং টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে শিল্পজাত বৃটিশ পণ্য এবং ভারতীয় কৃষকদিগের উৎপন্ন পণ্য পৃথিবীর আর্থিক দুর্দ্দশার মধ্যেও বিদেশে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে। ষ্টার্লিংয়ের

সহিত ভারতীয় টাকার সংযোগ সাধন করা না হইলে আমাদের কৃষকদিগের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইত। আমাদের কৃষকদিগের স্বার্থের জন্যই ভবিষ্যতেও বৃটিশ মুদ্রার সহিত ভারতীয় মুদ্রার সংযোগ-রক্ষা আবশ্যক। অন্যান্য দেশের মুদ্রার তুলনায়,—ষ্টার্লিংয়ের সহিতই একসঙ্গে টাকার বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়া উচিত।

(দৈনিক বসুমতী, ১২ নবেম্বর, ১৯৩৩)

## ৩। টাকার দর কমাইলে দেশের ক্ষতি

প্রঃ—আজকাল ভারতবর্ষে আর বাঙ্গালা দেশেও টাকার মূল্য কমাইবার যে আন্দোলন চলিতেছে সে সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উঃ—টাকার মূল্য এখন কমাইতে গেলে দেশের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

প্রঃ—অনেকে বলিতেছেন, টাকার মূল্য কমিলে আমাদের লাভই হইবে। এই যুক্তি কি ভ্রমাত্মক?

### ভারতীয় মুদ্রানীতি ও বাঙালী চাষী

উঃ—১৯২৭ সনে ১৮ পেন্সের রূপেয়া কায়েম হয়। তাহার প্রভাবে বাঙালী চাষীর মাল বিদেশে অপেক্ষাকৃত কম বিক্রী হয় নাই। ১৯২৩-২৭ সন পর্য্যন্ত রপ্তানির অবস্থা যেরূপ ছিল তাহার সঙ্গে ১৯২৯-৩১ সনের রপ্তানির অবস্থা তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে, কি পাট, কি তুলা, কি চা, সকল ক্ষেত্রেই রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়াছে। অধিকন্তু যেসকল তৈল-বীজের কাটতি বিদেশে প্রচুর সেইসব বীজের রপ্তানিও বাড়িয়াছে। তখনকার দিনে যেসকল ভারতসন্তান ১৮ পেন্সের রূপেয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন তাঁহাদের যুক্তি ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হইয়াছে।

## পাউণ্ডের সঙ্গে টাকা গাঁথা থাকুক

প্রঃ—আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের রপ্তানি বাড়াইবার পক্ষে টাকার মূল্য কমানো কি লাভের উপায় নহে ?

উঃ—টাকার মূল্যহ্রাসে উপকার হইয়াছে। ১৯৩১ সনে বিলাতী পাউণ্ডের পতন ঘটে। তৎক্ষণাৎ ভারতীয় সিক্কাকে বিলাতী সিক্কার সঙ্গেই লেজুড়রূপে জুড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার ফলে পাউণ্ডের সঙ্গে-সঙ্গে টাকার পতনও ঘটিতে থাকে। তখন হইতে জার্ম্মাণ—মার্কিণ—ফরাসী—ইতালিয়ান ইত্যাদি মুদ্রার মাপে বিলাতী ও ভারতীয় মুদ্রার দাম কম হইয়া পড়িয়াছে। এই পতনের ফলে বিলাতী শিল্পীর আর বাঙালী চাষীর মাল বিদেশে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে রপ্তানি হইতে পারিয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে বাঙালী জাতিকে বিপদে পড়িতে হইত। ভবিষ্যতে ভারতীয় সিক্কাকে বৃটিশ সিক্কার সঙ্গে গাঁথিয়া রাখাই বাঙালী চাষীর স্বার্থমাফিক কাজ হইবে।

## বিশ্বব্যাপী দুর্য্যোগ ও ভারতীয় রপ্তানি

প্রঃ—আপনি কি এই বিশ্বব্যাপী আর্থিক দুর্গতির দিনেও ভারতীয় রপ্তানির সুদিন দেখিতেছেন ?

উঃ—সুদিনটা আপেক্ষিক মাত্র, অর্থাৎ মন্দের ভাল। টাকার মূল্য-হ্রাসের দরুণ ভারতবাসীর যতখানি লাভ হওয়া সম্ভব তাহা ইতিমধ্যে সাধিত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, এখনও দুনিয়ায় বিপুল মন্দা চলিতেছে। এই মন্দার যুগে ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বেকার মতন রপ্তানি আশা করা অসম্ভব। কিন্তু আজকাল বৎসর দুই ধরিয়া যতখানি রপ্তানি সাধিত হইয়াছে পাউণ্ডের সঙ্গে-সঙ্গে টাকার মূল্যহ্রাসই তাহার অন্যতম কারণ, এরূপ বুঝিলে বেশী ভুল করা হইবে না। আর্থিক জীবনে কারণ-বিশ্লেষণ সহজ-সরল কাণ্ড নয়। একথাও জানিয়া রাখা আবশ্যক।

প্রঃ—এখন যদি টাকার মূল্য আরও কমাইয়া দেওয়া যায় তাহাতে আরও কিছু লাভ হইতে পারে না কি ?

উঃ—দুই বৎসরে দেখা গেল যে, লাভ বড়-বেশী হয় নাই। অল্প মাত্র হইয়াছে। এখন আর রপ্তানির দিকে লাভ বাড়াইবার সম্ভাবনা কম।

### রপ্তানি ও কৃষিজাত দ্রব্যের দরবৃদ্ধি

প্রঃ—ভারতীয় মালের রপ্তানিবৃদ্ধি হইতে পারে কি উপায়ে ?

উঃ—ইয়োরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশগুলার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বাড়িতেছে। বিগত তিন মাস ধরিয়া শিল্পোন্নতির সাড়া পাওয়া যাইতেছে। ইহার ফলে এইসকল দেশের লোকেরা বাঙলা দেশের ও অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশের মাল ও খাদ্য বেশী পরিমাণে কিনিতে থাকিবে। এখনই তাহার কিছু-কিছু সংবাদ পাইতেছি। জার্ম্মাণির সর্ব্ববৃহৎ ব্যাঙ্কের আফিস হইতে খবর আসিয়াছে যে, জার্ম্মাণরা অল্প কিছুদিন হইল প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মাল কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা কিছুদিন চলিতে থাকিলেই ভারতের রপ্তানিও বাড়িবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের দরও হয়ত বাড়িবে।

### স্বর্ণ-রপ্তানি ও চাষী

প্রঃ—ভারতবর্ষ হইতে এত বেশী সোনা রপ্তানি হইতেছে, তাহাতে আমাদের ক্ষতি হইতেছে না কি ?

উঃ—আজকাল বিশ্বসঙ্কটের প্রভাবে পৃথিবীর সকল কৃষিপ্রধান দেশের মালই বিদেশে অল্প পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে। এই কারণে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের চাষীর মতন বাঙালী চাষীকেও কষ্ট সহিতে হইতেছে। কিন্তু কলকারখানার সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক আসবাব, ওষুধপত্র এবং অন্যান্য অতিমাত্রায় দরকারী জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানি না করিলে অন্যান্য চাষীজাতের মত বাঙ্গালীরও চলে না।

অথচ এইসকল দ্রব্যের দাম সমঝাইয়া দিতে হইলে যে পরিমাণ কৃষিজাত মাল বিদেশে পাঠানো আবশ্যক তাহা পাঠানো সম্ভবপর হয় নাই। এই কারণেই কাঁচা সোনা পাঠাইয়া বিদেশী মাল কিনিতে হইয়াছে। বিদেশে সোনা পাঠাইতে না পারিলে দরকারী জিনিষগুলি বাংলাদেশে আসিত না। তাহা হইলে বাঙালী জাতির অশেষ কষ্ট হইত। আর্জ্জেন্টিনা ইত্যাদি দুনিয়ার অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশও ঠিক এই কারণে বিদেশে সোনা পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছে।

### অটাওয়ার ব্যবস্থায় চাষীর লাভ

প্রঃ—অটাওয়ার সম্মেলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলাফল আপনি ভারতবর্ষে কিরূপ দেখিতেছেন?

উঃ—অটাওয়া-সম্মেলনের চুক্তিমাফিক ভারতেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে পারস্পরিক পক্ষপাতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার প্রভাবে ইংরেজরা তাহাদের বাজারে বিদেশী মালের উপর যে-হারে আমদানি-শুল্ক বসাইয়া থাকে তাহার চেয়ে কম হারে বাঙালীর পাঠানো মালের উপর আমদানি-শুল্ক বসাইতেছে। এই ব্যবস্থায় বিলাতে বাঙালীর মালের কাটৃতি বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। বিলাতের এইরূপ পক্ষপাত না পাইলে বাঙালী চাষীর ক্ষতি হইত। বিশ্বব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগ খানিকটা কাটিয়া গেলে বাঙালী চাষীর সম্পদবৃদ্ধির নতুন-নতুন লক্ষণ চোখে পড়িবে। ১৯৪০ সনের সমসমকালে এই কথাটার ইজ্জৎ মালুম হইবে।

### স্বদেশী শিল্পের উন্নতি

প্রঃ—বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন পুষ্ট করিবার জন্য ভারতীয় মুদ্রানীতি কিরূপ রাখা উচিত?

উঃ—স্বদেশী আন্দোলনের জন্য চাই টাকার কথঞ্চিৎ উঁচু দর। টাকার দর কমিলে স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

প্রঃ—স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি টাকার মূল্য-বৃদ্ধি চাহিতেছেন কেন ?

উঃ—আজকাল বিলাতী পাউণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় টাকার যে দর বাঁধা আছে সেই দরই স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক। এই দরের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নয়। দেশের ভিতর তেলের কল, চিনির কল, কাপড়ের কল, সুরকির কল ইত্যাদি নতুন-নতুন কল-কারখানা খাড়া করিবার জন্য আমাদিগকে বিলাতী ও অন্যান্য বিদেশী যন্ত্রপাতি কিনিতেই হইবে। এই ধরণের বিদেশী মাল আমদানি না করিলে জেলায়-জেলায় নতুন-নতুন কারখানা কায়েম করা অসম্ভব। কাজেই এইসকল বিদেশী যন্ত্রপাতি যত সস্তা হয় আমাদের পক্ষে ততই ভাল। পাউণ্ডের মাপে টাকার দর যদি খানিকটা উঁচু থাকে—যেমন বর্ত্তমানে আছে—তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত সস্তায় আমরা বিদেশী যন্ত্রপাতিগুলি কিনিতে পারিব। এইজন্যই আমি টাকার মূল্যহ্রাস দেশের পক্ষে অনিষ্টকর বিবেচনা করি।

(হিতবাদী, ১৭ নবেম্বর ১৯৩৩)।

## ৪। টাকার মূল্য অত্যধিক নহে

বোম্বাইয়ের কারেন্সী লিগের কর্ম্মকর্ত্তাগণ কলিকাতায় আসিয়া সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন, তৎসম্পর্কে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র একজন প্রতিনিধি অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন—

"বর্ত্তমানে পাউণ্ডের অনুপাতে টাকার মূল্য বেশী নহে। টাকার মূল্য-হ্রাসের আন্দোলনের কোনো যৌক্তিকতা নাই। বর্ত্তমানে ১৮ পেনী হিসাবে টাকার যে দর ধার্য্য আছে, তাহাই বলবৎ থাকা উচিত।"

তিনি কেন এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা

হইলে অধ্যাপক সরকার বলেন—১৯৩১ সনের পর হইতে ইংল্যাণ্ডে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যে পরিমাণে কমিয়াছে, ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য তাহা অপেক্ষা বেশী কমে নাই। বরং বর্ত্তমানে ভারতের পণ্যমূল্য ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা সম্ভবতঃ শতকরা ২।৩ ভাগ বেশী আছে। বিশেষতঃ সম্প্রতি পণ্যমূল্যের গতি ভারতবর্ষে উর্দ্ধদিকে চলিতেছে। এখানে-সেখানে মন্দা কাটিয়া যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে; যদিও উহা খুব মন্দ-গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

এই সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে পণ্যমূল্যের তুলনা করিতে হইলে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে অধিকাংশ স্থলে মাত্র কৃষিজাত পণ্য অবলম্বন করিয়াই মূল্যের "সূচী" স্থিরীকৃত হয়, পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে প্রধানতঃ শিল্পজাত দ্রব্যেরই দর দেওয়া হইয়া থাকে। কাজেই সাধারণভাবে দুই দেশের পণ্যমূল্যের তুলনা করিলে টাকা এবং পাউণ্ডের তুলনামূলক মূল্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দুই দেশের পণ্যমূল্যের দর স্থির করার পদ্ধতিতে যখন মূলতঃ পার্থক্য রহিয়াছে, তখন এই দুইটি দরের মধ্যে কোনো তুলনামূলক বিচার হইতে পারে না।

এই বিষয়ে আরও বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে অধ্যাপক সরকার বলেন যে, যেসব দেশ একমাত্র বা প্রধানতঃ কৃষিজীবী অথবা যেসব দেশের বাজার কৃষিজাত পণ্যে ভর্ত্তি থাকে, সেইসব দেশের পণ্যমূল্য শিল্পপ্রধান দেশের পণ্য-মূল্য অপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কোনো-কোনো দেশে বর্ত্তমান মন্দার সময়ে এই দুই শ্রেণীর পণ্যমূল্যের পার্থক্য শতকরা ২০ ভাগ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের পণ্য-মূল্যের মধ্যে মাত্র শতকরা ৫।৬

ভাগ পার্থক্য দেখা দিয়াছে বলিয়া এই ব্যাপারে বাট্টার হারকে টানিয়া আনা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

এই পার্থক্যের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে অধ্যাপক সরকার বলেন, ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে পণ্যমূল্যের তারতম্য বিচার করিতে হইলে কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের "সাধারণ" পণ্যমূল্যের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বোর্ড অব্ ট্রেড কর্তৃক প্রকাশিত "সাধারণ" মূল্যের হারের তুলনা করিলে চলিবে না। এই বিষয়ে উভয় দেশের মূল্যের হিসাব গভীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে এবং দুই দেশের একমাত্র কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ধরিয়া বিচার করিতে হইবে। ইংল্যাণ্ডের বোর্ড অব্ ট্রেডের প্রকাশিত "সাধারণ" মূল্যের হিসাব দেখিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডের পণ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫।৬ ভাগ বেশী। কিন্তু যদি ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের একমাত্র কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বরং ভারতবর্ষেরই পণ্যমূল্য ইংল্যাণ্ডের পণ্যমূল্য অপেক্ষা শতকরা ২।৩ ভাগ বেশী। অন্য কথায় বলিলে বলা যায় যে, একটা কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যতদূর কমা উচিত ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে মূল্য ততদূর কমে নাই। যে প্রকারেই হউক ভারতবর্ষ এবং ইংল্যাণ্ডের পণ্য দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের (নামতঃ মূল্য নহে) মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য থাকিয়া থাকে তবে তাহা ভারতের পক্ষেই বরং অধিকতর সুবিধাজনক। অনেকেই বলিতেছেন যে, পাউণ্ডের তুলনায় টাকার মূল্য বেশী। আমি বলি পাউণ্ডের মূল্যই টাকার তুলনায় কিছু বেশী। মোটামুটি টাকার বর্ত্তমান মূল্য হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা আছে—একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

ভারতে কি করিয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করা যায়, তৎসম্বন্ধে

অধ্যাপক সরকার বলেন—মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায়—এই অতি-সহজ কথাটা যথাতথা বলিলেই চলিবে না। এই বিষয়ে যেসব অঙ্ক আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি খোলা মন লইয়া তাহার বিচার করিতে হইবে। আমরা ব্যাপার এই দেখিতে পাই যে, টাকার মূল্য যখন এক শিলিং ছয় পেনীতে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, তখনও ভারত হইতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়াই গিয়াছিল। ১৯২৯ সনের পূর্ব্বে আমাদের দেশ হইতে রপ্তানির গতি তথাকথিত অর্থনীতিক তত্ত্ব বা নিয়ম অনুসারে যেভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত ছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে সেইভাবে হয় নাই। বর্ত্তমান সময়েও বুঝিতেছি যে, বাট্টার হারের সঙ্গে মূলের কোনো সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না। ১৯২৭ সনে টাকার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক সাব্যস্ত হইলেও ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়াছিল। এই বাট্টার অধীনেই আবার পণ্যমূল্য বাড়িবার লক্ষণ দেখিতেছি এবং উহা বাড়িতেও পারে। সুতরাং বর্ত্তমানে বাট্টার যে হার আছে, তাহার পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক।

বর্ত্তমানে ভারত হইতে রপ্তানির অবস্থা সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার বলেন—১৯৩৩ সনের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ১৯৩২ সনের এই ছয় মাস অপেক্ষা অনেক বেশী পণ্যদ্রব্য ভারত হইতে রপ্তানি হইয়াছে। এই ছয় মাসে তুলা এবং পাট অনেক বেশী রপ্তানি হইয়াছে এবং তুলার দাম চড়িয়াছে। খুব সামান্যভাবে হইলেও ভারতের অবস্থায় উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

ভবিষ্যতে ভারতে পণ্যমূল্য আরও চড়িবে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে অধ্যাপক সরকার বলেন, আমেরিকা, ইংল্যণ্ড এবং ফরাসী দেশ কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে এবং অন্যান্য যেসব দেশ টাকাকড়ি ধার করে তাহাতে মূলধন রপ্তানি করিবে—বর্ত্তমানে এরূপ সম্ভাবনা দেখা

যাইতেছে। ১৯২৯ সনের পর হইতে পুঁজি বা মূলধনের আমদানি-রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ আছে। বর্ত্তমানে যদি পুনরায় মূলধনের আমদানি-রপ্তানি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের মত ঋণী দেশগুলির কাঁচামালের মূল্য চড়িতে থাকিবে। বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মূলধনের স্বাভাবিক চলাচল থাকার সময়েও ভারতে পণ্যমূল্য চড়া ছিল।

অধ্যাপক সরকার ১৯২৬-২৭ সনেও বাট্টার হারের বিতর্কে এক শিলিং ছয় পেনীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৯৩১ সনে তিনি টাকাকে পাউণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখার প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, এই দুইটী বিষয়ই ভারতের কৃষকের পক্ষে হিতকর হইয়াছে।

( আনন্দবাজার, ২ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ )

## ৫। টাকার মূল্য কি বেশী ?

সম্প্রতি অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার "ইউনাইটেড প্রেসে" যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তৎসংস্রবে "বসুমতী"র বিশেষ প্রতিনিধি তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক সরকারকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। নিম্নে প্রশ্ন এবং অধ্যাপক সরকারের উত্তর আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রঃ—আপনার সহিত পূর্ব্বে যখন আলোচনা হয় তখন আপনি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, টাকার মূল্যহ্রাস সঙ্গত নহে। তবে কি আপনি টাকার বর্ত্তমান ১৮ পেনি মূল্যই সমর্থন করিতেছেন ?

উঃ—হাঁ। টাকার বর্ত্তমান ১৮ পেনি মূল্যই অব্যাহত রাখা উচিত। টাকার মূল্য-হ্রাসের কোনো সমীচীনতা নাই। ষ্টার্লিংয়ের সহিত তুলনায় টাকার মূল্য বর্দ্ধিত হয় নাই।

প্রঃ—আপনার উক্তির অনুকূলে কি যুক্তি আছে ?

উঃ—১৯৩১ সন হইতে ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের যে মূল্য-হ্রাস ঘটিয়াছে তাহা ইংল্যণ্ডের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রমাণ করা চলে না। ইংল্যণ্ডের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা ভারতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বরং কিছু কম হ্রাস পাইয়াছে। অধিকন্তু ভারতীয় পণ্যাদির মূল্যের আলোচনায় মূল-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাইতেছে। মূল্যবৃদ্ধি যৎসামান্য হইলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইতিপূর্ব্বে উহার সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

অতঃপর অধ্যাপক সরকার নিম্নলিখিত বিষয়টার প্রতি বিশেষ জোর দিয়া বলেন—

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং ভারতের মূল্য-সংক্রান্ত সাধারণ সূচী-সংখ্যা প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্যাদির সমবায়েই রচিত হয়। পক্ষান্তরে বৃটেন শিল্পপ্রধান দেশ, কাজেই ঐ দেশের "সাধারণ" সূচী-সংখ্যায় প্রধানতঃ শিল্পজাত দ্রব্যই স্থান পায়। এখন এই দুই দেশের সূচী-সংখ্যালব্ধ সাধারণ মূল্যের তুলনাকালে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বস্তুতঃ ঐ দুই দেশের মূল্যসূচীর গঠনে সাদৃশ্য না থাকায় উভয় দেশের সাধারণ মূল্যের মধ্যে তুলনা চলিতে পারে না। কাজেই উভয় দেশের সূচী-মূলক সাধারণ মূল্য দ্বারা রূপি-ষ্টার্লিংয়ের তুলনামূলক মূল্যের বিচার চলিতে পারে না।

প্রঃ—আপনার এই উক্তির সহিত রূপি-ষ্টার্লিং অনুপাতের কি সংস্রব আছে?

উঃ—আমি বলিতে চাই যে, ইংল্যণ্ড ও ভারতের মূল্যের তুলনায় রূপি-ষ্টার্লিং অনুপাতের প্রশ্নটা আসিতে পারে না। শিল্প-প্রধান দেশ অপেক্ষা কৃষি-প্রধান দেশের "সাধারণ" সূচীমূল্য অনেক বেশী হ্রাস পাইয়াছে। কোনো কোনো অঞ্চলে বর্ত্তমান আর্থিক অবনতির সময়ে উভয় মূল্যের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ পার্থক্য দেখা দিয়াছে।

কিন্তু বৃটিশ ও ভারতীয় সূচী-মূল্যের মধ্যে ৫ কি ৬ ভাগের বেশী পার্থক্য নাই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রূপি-ষ্টার্লিং অনুপাতের বিচার অনাবশ্যক।

প্রঃ—ভারত ও বৃটেনের সূচী-মূল্যের প্রকৃত পার্থক্যটা আপনি কিরূপ মনে করেন?

উঃ—কলিকাতা অথবা বোম্বাইয়ের সূচীর সহিত বৃটিশ বোর্ড অব্ ট্রেডের "মিশ্র" সূচীর তুলনা করিয়া ভারত ও বৃটেনের সাধারণ মূল্যের তুলনা করা হইলে উহা ভুল হইবে। এইরূপ তুলনায় উভয় দেশের একমাত্র কৃষি-সংক্রান্ত সূচীই গ্রহণীয়, ব্যাপক সূচীর আবশ্যকতা নাই। উভয় দেশের কৃষিসূচীর তুলনা করা হইলে দেখা যাইবে যে, বৃটিশ বোর্ড অব্ ট্রেডের সূচী অনুসারে ভারতের সহিত তুলনায় বৃটেনের "সাধারণ" মূল্য হ্রাস ৫ অথবা ৬ ভাগ কম হইলেও বৃটিশ কৃষি-সূচী অনুসারে বৃটেনের মূল্যহ্রাস ভারত অপেক্ষা ২ কি ৩ ভাগ বেশী হইয়াছে। অন্য কথায় বলা যায়, ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশের মূল্যহ্রাস যতটা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, ততটা ঘটে নাই। কৃত্রিম পার্থক্যের পরিবর্ত্তে উভয় দেশের মূল্যের প্রকৃত পার্থক্য ধরা হইলে উহা বৃটেনের পরিবর্ত্তে ভারতের অনুকূলেই দাঁড়ায়। টাকার মূল্য বর্দ্ধিত ত নহেই বরং ন্যায্য-মূল্যের কিঞ্চিৎ হ্রাসই দেখা যাইতেছে। টাকার মূল্য হ্রাস করিবার অনুকূল যুক্তি পাওয়া যায় না।

প্রঃ—তবে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য-বৃদ্ধির সংস্রবে টাকার মূল্য-হ্রাস-বিষয়ক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া লাভ নাই, নয় কি?

উঃ—হাঁ, তাই। যখন-তখন ভারতীয় রপ্তানিবৃদ্ধির জন্য অথবা ভারতীয় পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধির জন্য টাকার মূল্য-হ্রাস-বিষয়ক যুক্তির

উপর নির্ভর করিলেই যথেষ্ট হইবে না। কেবল আনুমানিক যুক্তিদ্বারা কাজ হয় না; চক্ষু মেলিয়া অর্থনীতিক আসল তথ্য ও সত্য ভালরূপে দেখিয়া ও বুঝিয়া সমস্যার সম্মুখীন হওয়া আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে টাকার ১৮ পেনি মূল্যের কালেও ভারতীয় রপ্তানির প্রসার ঘটিয়াছে। কাল্পনিক যুক্তি অনুসারে যতটা আশা করা যায় ১৯২৯ সনের পূর্ব্বে ভারতীয় রপ্তানির উপর টাকার বিনিময়-মূল্যের প্রভাব ততটা দাঁড়ায় নাই। অধিকন্তু, বর্ত্তমানে এই বিষয়ের প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক যে, পূর্ব্বের মত এখনও ভারতীয় পণ্যের মূল্যের উপর মুদ্রা-মূল্যের প্রভাব নাই। ১৯২৭ সনে যখন টাকার মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, তখনও ভারতীয় পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ঐরূপ মূল্যবৃদ্ধি আবার ঘটিতে পারে। বাস্তবিক উহার লক্ষণও দেখা দিয়াছে। সুতরাং টাকার বর্ত্তমান মূল্যের পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক।

প্রঃ—কোন্ কোন্ দিকে উন্নতির লক্ষণ সূচিত হইতেছে?

উঃ—১৯৩৩ সনের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতীয় বাণিজ্যের অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের একই সময়ের অবস্থা অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। পাট ও কার্পাসের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কার্পাসের মূল্যও বাড়িতেছে। অল্প-বিস্তর বাজারের অবস্থায় উন্নতি দেখা দিয়াছে।

প্রঃ—ভারতীয় পণ্যের আরও মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে আপনার আশা কিরূপ?

উঃ—খুব সম্ভবতঃ কৃষিপ্রধান এবং বিদেশীয় মূলধন পুঁজি বা গ্রহণে উৎসাহী দেশসমূহে মার্কিণ, বৃটিশ ও ফরাসী মূলধন আবার রপ্তানি হইবে। ১৯২৯ সন হইতে এই রপ্তানি একরূপ বন্ধ রহিয়াছে। মূলধন রপ্তানি পুনরায় আরম্ভ হইলেই ভারতের মত অধমর্ণ দেশসমূহের কৃষিজাত পণ্য ও অন্যান্য কাঁচা মালের মূল্য বৃদ্ধির পথে উপনীত হইবে।

বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিদেশী মূলধনের গতি যখন কতকটা অবাধ ছিল, সে সময়ের মূল্যের অবস্থা আবার আশা করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক সরকার রুপি-ষ্টার্লিং বন্ধনের এবং অটাওয়া-চুক্তির পক্ষপাতী। তাঁহার মতে, এতদ্দ্বারা ভারতীয় কৃষকদিগের এবং ভারতীয় রপ্তানির উপকার দর্শিবে।

( দৈনিক বসুমতী, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ )

## ৬। বর্ত্তমান টাকার দর অধিক নহে

টাকার মূল্যহ্রাস লইয়া দেশে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে "হিতবাদী"র প্রতিনিধির নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক, জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—

"পাউণ্ডের তুলনায় টাকার মূল্য অধিক নহে। কাজেই টাকার মূল্য কমাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এখন যেমন টাকার দর ১৮ পেন্স আছে, তেমন থাকাই ভাল। বিলাতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩১ সনের পর হইতে যে পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য তেমন কমে নাই। তুলনায় উহা এখনও বেশী আছে। তাহা ছাড়া সম্প্রতি কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কম পরিমাণে হইলেও মূল্যবৃদ্ধি সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছে। ভারতের অধিকাংশ জিনিষই কৃষিজাত, বিলাতের অধিকাংশ দ্রব্যই শিল্পজাত। কাজেই পাউণ্ডের দরের সহিত টাকার দরের তুলনা করিবার সময় ভারতীয় জিনিষের দরের সহিত বিলাতী জিনিষের দরের তুলনা করা চলে না।

"যেসকল দেশে শিল্পজাত জিনিষের পরিমাণ অধিক সেসকল দেশে যে হারে জিনিষের মূল্য কমিয়াছে, যেসকল দেশে কৃষিজাত দ্রব্য অধিক সেসকল দেশে জিনিষের মূল্য "সাধারণ"ভাবে তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে কমিয়াছে। কাজেই টাকার মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনার সময় উপরি উক্ত বিষয় লইয়া এক দেশের সহিত অপর দেশের তুলনা করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না।

"ভারতের ও বিলাতের জিনিষের মূল্যের পরিমাণ লইয়া তুলনামূলক সমালোচনা করিবার সময় কেহ যেন শুধু শিল্প ও কৃষি দুই প্রকার জিনিষের সমবেত "সাধারণ" হিসাব লইয়া তাহা না করেন। বিলাতের শুধু কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য পৃথক করিয়া লইয়া তাহার সহিত ভারতের কৃষিজাত পণ্যের মূল্যের তুলনা করা উচিত। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, বিলাতের কৃষিজাত পণ্যের মূল্য যে পরিমাণে কমিয়াছে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সে পরিমাণে কমে নাই—তাহা অপেক্ষা কিছু কম অনুপাতে কমিয়াছে। কাজেই বুঝা যায় যে, টাকার মূল্য এদেশে বেশী ত নয়-ই বরং কিছু কম আছে। কাজেই টাকার মূল্য-হ্রাসের কথা উঠিতে পারে না।

"টাকার মূল্য কমাইয়া দিয়া জিনিষের মূল্য বা রপ্তানি-পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া দেওয়া চলিতে পারে, একথা যখন-তখন বলিলে চলিবে না। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া হিসাবসমূহ পরীক্ষা করার প্রয়োজন। প্রকৃত কথা এই যে, টাকার দর বেশী ( অর্থাৎ ১৮ পেন্স ) থাকা সত্ত্বেও ভারত হইতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সনে টাকার এই চড়া দর স্থির হওয়ার পরও ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে। বাট্টার হারের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত পণ্যের মূল্যের যে বৃদ্ধি-হ্রাস হয় না, তাহা গত কয় বৎসরের হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। টাকার বর্ত্তমান দর থাকিলেও এখন যেমন রপ্তানির পরিমাণ বাড়িতেছে,

পরেও তেমনই উহা বাড়িতে পারে। কাজেই বর্ত্তমানে টাকার মূল্য পরিবর্ত্তনের কোনো প্রয়োজনই দেখা যায় না।

"১৯৩৩ সনের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর এই ছয় মাসের অবস্থা ১৯৩১ সনের ঐ সময়ের অবস্থা অপেক্ষা ভাল দেখা গিয়াছে। এই ছয় মাসে পাট ও তুলার রপ্তানি বেশী হইয়াছে এবং তুলার দাম বাড়িয়াছে। কম পরিমাণে হইলেও উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

"১৯২৯ সনের পর হইতে আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের ধনীরা ভারতের কাঁচা মাল অধিক ক্রয় করেন নাই। ঐসকল দেশের ধনীরা কাঁচা মাল ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেই এ দেশের কৃষিজাত পণ্য ও অন্যান্য কাঁচা মালের দাম বাড়িবে।"

১৯২৬-২৭ সনে যখন বাট্টার দর লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছিল, তখনও অধ্যাপক সরকার টাকার মূল্য ১৮ পেন্স রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৩১ সনে পাউণ্ডের সহিত টাকার দর বাঁধিয়া দিবার জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাও তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন। গত বৎসর তিনি অটাওয়া চুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, ঐসকল ব্যবস্থার ফলে ভারতের কৃষকদের সুবিধা হইয়াছে ও ভারত হইতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেও অধ্যাপক সরকার উক্ত বিলের ব্যবস্থাগুলি সমর্থন করিয়া তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন।

(হিতবাদী, ৮ ডিসেম্বর ১৯৩৩)

# সম্পাদকীয় মন্তব্য

অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, বি-এস-সি-এইচ্-ই ( ইলিনয়,
আমেরিকা), কলেজ অব এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড
টেক্‌নলজি, যাদবপুর ( কলিকাতা )

ইতিমধ্যে বিনয় বাবুর "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" ( ১৯৩৪ ) গ্রন্থ হইতে কয়েক অধ্যায়ের সূচীপত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৯৩১-১৯৩৩ সনের ভিতর,—এমন কি ১৯২৮-১৯৩৩ সনের ভিতর,—অর্থাৎ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইতে ১৯৩৩ সনের শেষ পর্য্যন্ত বিনয় বাবু নিজে এই পরিষদে কোনো রচনা পাঠ বা বক্তৃতা দান করেন নাই। গবেষকগণকে দিয়া নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখানো এবং প্রকাশ্য সভায় আলোচনায় যোগ দেওয়ানো তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার নিজের রচনাবলী বাংলায় অথবা ইংরেজিতে অথবা এক সঙ্গে দুই ভাষায় ( এবং কোনো-কোনোটা ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় ) প্রকাশিত হইত। বস্তুতঃ, তাঁহার রচনাসমূহ মুখ্যতঃ "আর্থিক-উন্নতি"র জন্য প্রণীত হয় নাই। তবে অনেকগুলাই কোনো-না-কোনো সময়ে "আর্থিক-উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৩১-১৯৩৩ সনের ভিতর ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়-সম্পর্কিত আলোচনায় পরিপূর্ণ বিনয় বাবুর নিম্নলিখিত বাংলা গ্রন্থগুলা প্রকাশিত হইয়াছিল :—

( ১ ) "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র", প্রথম ভাগ—"নয়া সম্পদের আকার-প্রকার" ( ১৯৩০ ), ৪৪০ পৃষ্ঠা।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ,—"ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা" ( ৭১০ পৃষ্ঠা ) ছাপা হইতেছিল। ১৯৩৫ সনে ইহা প্রকাশিত হয়।

( ২ ) "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন",—প্রথম ভাগ,—"তত্ত্বাংশ" ( ১৯৩২ ), ৫৩০ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় ভাগ,—"কর্ম্মকৌশল ( ১৯৩২ ), ৪৫০ পৃষ্ঠা।

এই দুই ভাগের কোনো-কোনো অধ্যায়,—যথা ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বীমা, জমিজমার আইন-কানুন,—১৯২৬ সনে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

( ৩ ) "বাড়তির পথে বাঙালী" ( ৬৩৬ পৃষ্ঠা ) ছাপা হইতেছিল। ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত হয়।

অধিকন্তু উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৯২৬ হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স ( বঙ্গীয় স্বদেশী বণিক-সঙ্ঘ ) ইংরেজিতে "জার্ণ্যাল" নামক একখানা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। বিনয়বাবু তাহার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩১-১৯৩৩ সনের ভিতর বিনয় বাবুর দুইখানা ইংরেজি বই প্রকাশিত হইয়াছিল, যথা :—

( ১ ) "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" দ্বিতীয় ভাগ ( ১৯৩২ )। প্রথম সংস্করণের সময় ইহা "অ্যাপ্লায়েড্‌ ইকনমিক্‌স্‌" নামে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৮ সনে বাহির হইয়াছে। ৩২০ পৃষ্ঠা।

( ২ ) "ইণ্ডিয়ান কারেন্সী অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্‌লেমস্‌" ( ১৯৩৩ )। ১৯৩৪ সনে ইহার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৯৪ পৃষ্ঠা।

এই সময়ে "ইম্পীরিয়াল প্রেফারেন্স ভিজ-আ-ভি ওয়ার্ল্‌ড্‌-ইকনমি" নামক অটাওয়া-চুক্তি-সম্বন্ধীয় এবং শুল্ক-নীতি ও আন্তর্জ্জাতিক

বাণিজ্য-বিষয়ক গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৯৩৪ সনে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৭০ পৃষ্ঠা।

মজুর-আন্দোলন ও সমাজ-বীমা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক ইংরেজি প্রবন্ধ ১৯৩১-৩৩ সনের ভিতর প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাগুলা "সোশ্যাল ইন্‌শিওর‍্যান্স" নামে ১৯৩৬ সনে গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে। তাহা ছাড়া ১৯৩৩ সন হইতে "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকায় বিনয়বাবুর বিশ্বদৌলৎ-সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধ নিয়মিতরূপে প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রথম পাঁচবৎসর (১৯২৮-১৯৩৩) এবং "আর্থিক উন্নতি"র প্রথম সাত-আট বৎসর (১৯২৬-১৯৩৩) আলোচনা-গবেষণার এবং প্রবন্ধাবলীর আবহাওয়া কিরূপ ছিল তাহা বুঝিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত তালিকাসমূহ প্রয়োজনীয়। ইহাও বলা আবশ্যক যে, "আর্থিক উন্নতি"র রচনাসমূহের ভিতর এবং পরিষদের আলোচনা-বলীতে প্রত্যেক লেখক ও বক্তা নিজ-নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিতে অধিকারী ছিলেন। বিনয়বাবুর মতামতের খাতিরে কাহাকেও স্বাধীন চিন্তা খর্ব্ব করিতে হয় নাই। সেই স্বাধীনচিন্তার আবহাওয়া আজও এই পরিষদে এবং পত্রিকায় বজায় আছে।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের গবেষকগণ, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত ও মণীন্দ্রমোহন মৌলিক ইত্যাদি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ এবং বিশ্ব-ভারতীয় লাইব্রেরীয়ান "রবীন্দ্র-জীবনী" ও "ভারত-পরিচয়" ইত্যাদি পুস্তকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিনয়বাবুর কোনো-কোনো ইংরেজি রচনার বাংলা তর্জ্জমা বা সারাংশ প্রকাশ করিয়াছেন। সেইসকল অনুবাদ বা ভাব-সংগ্রহ হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থের জন্য স্থানে-স্থানে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

# ব্যাঙ্ক-নির্ব্বাচনে সতর্কতা*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল

গবেষক বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ, "টাকা-কড়ি"-প্রণেতা

পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ব্যাপকতা লাভ করিলেও আমাদের দেশে কেবল ব্যবসায়ীদিগকেই বিশেষভাবে ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করিতে দেখা যায়। জনসাধারণের মধ্যে চেকের সাহায্যে দেনা-পাওনা চুকাইবার রেওয়াজ এদেশে একরূপ নাই বলিলেই চলে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটা বাঘা বাঘা ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে লোকে আর সহজে ব্যাঙ্কে, বিশেষতঃ স্বদেশী ব্যাঙ্কে, টাকা আমানত রাখিতে চায় না। এইসব ব্যাঙ্ক-ফেলই ব্যাঙ্কিং-প্রথার প্রসারের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে প্রধানতঃ আমানতকারীদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; সুতরাং টাকা জমা রাখিবার সময় ব্যাঙ্ক-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একটু সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া আশ্চর্য্য নহে এবং তাহা ব্যাঙ্ক-প্রসারেরও পরিপন্থী হইয়া থাকে।

মানুষের স্বভাবই এই যে, সে সাধারণতঃ নিজের কথা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না; যে ব্যাঙ্কে সে টাকা আমানত রাখিয়াছে, সেই ব্যাঙ্ক যদি চেক্ ভাঙ্গানোর সময় কোন গোলমাল না করিয়া টাকা দিয়া দেয়, তাহা হইলেই সে খুসী থাকে; অর্থাৎ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সে শুধু দেখে তার ব্যাঙ্কটী নিরাপদ কি না। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, যে-ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা হইয়াছে, সে-ব্যাঙ্কটী নিরাপদ কিনা জানা

*"আর্থিক উন্নতি", ভাদ্র, ১৩৩৮ (আগষ্ট ১৯৩১)।

যাইবে কিরূপে? অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ককে ফেল মারিতে দেখিয়া এরূপ প্রশ্ন ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার পূর্ব্বে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা চল্‌তি কথায় ব্যাঙ্ককে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শতসহস্র ব্যক্তি ব্যাঙ্ক-নির্ব্বাচনের সময়ে এই শ্রেণী-বিভাগের কথা মনে রাখেন না। বৃহৎ আফিস-ঘর, কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখিলেই সাধারণতঃ লোকে সেই ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়া বসে। ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণও লোককে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইতে শিক্ষা দেন না। ছয়মাসের বা বৎসরের শেষে সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যাঙ্ক একটী হিসাব প্রকাশ করে। আমানতকারিগণ সাধারণতঃ এইসব রিপোর্ট লক্ষ্যের মধ্যেই আনেন না। এই হিসাবের মধ্যে আমানতের হিস্যা যদি কিছু বাড়িয়া থাকে, তবে সে দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ইহার অধিক কিছু লোককে জানাইবার চেষ্টা করা হয় না। ব্যাঙ্ক-পরিচালনায় দুর্ব্বলতার চিহ্ন প্রকাশ পাইলেও সে দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। সুসময়ে লোকে যেমন নির্ব্বিচারে ব্যাঙ্ক নির্ব্বাচন করে, তেম্‌নি আর্থিক মন্দা উপস্থিত হইলে আবার সকল ব্যাঙ্ককেই সন্দেহের চোখে দেখে। অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা গুজবের জন্য অনেক ব্যাঙ্ককে দেউলিয়া হইতে হইয়াছে। এইসব নানা কারণে, ব্যাঙ্ক-পরিচালনার মধ্যে একটা "চুপ-চুপ" ভাব আসিয়াছে।

যদি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করা যায়, ব্যাঙ্কের শক্তি কতখানি বা দুর্ব্বলতা কতখানি বুঝিয়া লইবার মত করিয়া লোককে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক-ফেলের সংখ্যাও কমিয়া আসিবে। একথা এখন বলিবার হেতু আছে। স্বদেশীর হিড়িকে নিত্যই নূতন নূতন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার মধ্যে কয়টা টিঁকিয়া যাইবে বলা শক্ত। সুতরাং দেখিতে হইবে,

যে-ব্যাঙ্ক নিরাপদ নয় তাহাতে টাকা জমা রাখিয়া লোকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

ব্যাঙ্কের পক্ষে শক্তিশালী ও নিরাপদ হইতে হইলে কি কি নিয়ম পালন করা উচিত, তাহা বলা যতটা সহজ কিন্তু ব্যাঙ্ক সেই নিয়মগুলি মানিয়া চলিতেছে কিনা সে কথা বাহিরের লোকের পক্ষে জানা ততটা সহজ নহে। তবু সে কথা জানিয়া লইতে চেষ্টা করা উচিত। ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী সাধারণের কাছে নিতান্ত রহস্যময়। সুতরাং লোকে যদি একটুক্‌রা কাগজ লইয়া ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে প্রস্তুত থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে, লোকের মনে দেশের বাণিজ্যিক সভ্যতা সম্বন্ধে আস্থা বা বিশ্বাস আছে। এরূপ বলিবার হেতু এই যে, ব্যাঙ্ক আমানতি টাকা তহবিলে জমা করিয়া রাখে না। ব্যাঙ্ক সেই আমানতি টাকা নানাভাবে খাটায় বা কর্জ্জ দেয়; অতএব ব্যাঙ্ক যদি বিশেষ বিবেচনার সহিত গচ্ছিত টাকা না খাটায়, তাহা হইলে আমানতকারীর পক্ষে টাকা পাওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। সাধারণ লোকের মনে হয়ত এই ভুল ধারণাই আছে যে, ব্যাঙ্ক বুঝি নগদ টাকাকড়ি নিজের তহবিলেই জমা করিয়া রাখে।

ব্যাঙ্কিং এর গোড়ায় ব্যাঙ্কার আমানতকারীর প্রতিনিধি (এজেণ্ট)-রূপে গচ্ছিত টাকা রাখিত। ঐ গচ্ছিত টাকার মালিক সে হইতে পারিত না; কিন্তু এযুগে ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকার উপর মালিকানা স্বত্ব ভোগ করে; আজকাল ব্যাঙ্ক আমানতি টাকা ক্রয় করে ও তাহার বদলে ঐ পরিমাণ টাকা দাবী করিবার স্বত্ব বিক্রয় করে। যে টাকাগুলি আমানতকারী জমা রাখিয়াছে সেই টাকাগুলিই ব্যাঙ্ক ফিরাইয়া দেয় না, সেই পরিমাণ টাকা ফিরাইয়া দেয় মাত্র। তথাপি এখনো এমন্‌ লোক দেখা যায় যে, টাকা গচ্ছিত রাখিবার সময় উহাতে বিশেষ চিহ্ন দিয়া দেয় এবং আশা করে যে, ঐ চিহ্নিত

টাকাগুলিই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দাবী করিলে পাইবে। ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমানতকারীদের মধ্যে সকলেই একসাথে গচ্ছিত টাকা দাবী করিয়া বসে না, আমানতকারীদের দাবী মিটাইয়াও দৈনিক কিছু উদ্বৃত্ত তহবিলে থাকিয়া যায়। তাই ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণ সেই উদ্বর্ত্ত মজুদ টাকা স্বল্প মিয়াদে কর্জ্জ দিয়া কিছু মুনাফা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। ক্রমশঃ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যাঁহারা টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করেন, তাঁহারাও নগদ টাকা হাতে না লইয়া, সেই ঋণের পরিমাণ টাকা সেই ব্যাঙ্কেই জমা দিয়া চেক্ কাটিয়া টাকা উঠাইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ব্যাঙ্ক এখন হিসাব-রক্ষক ( বুক-কিপার ) বা চেক-খালাস-ভবন ( ক্লিয়ারিং হাউস্ ) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকাল পাশ্চাত্য দুনিয়ার প্রায় সকল দেশে এবং এদেশের বাণিজ্যিক মহলেও পণ্য-বিক্রয় করিয়া চেক্ গ্রহণ করা হয় এবং এই চেক্ আবার ব্যাঙ্ক জমা দিয়া অপরের পাওনা মিটাইবার সময় আবার চেক্ কাটা হয়। আজকাল চেকরূপী ব্যাঙ্ক-আমানত বিনিময়ের প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকে ব্যাঙ্কের নিকট নগদ টাকা দাবী করিতে পারিলেও তাহা দাবী না করিয়া চেক্ কাটিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। মনে কর একজন ১,০০,০০০ টাকার মাল বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কে সেই টাকা জমা রাখিয়াছে; মনে কর সে পরদিনই আসিয়া সেই টাকা দাবী করিল। যদি নগদ টাকা পাইয়াই ব্যাঙ্ক তাহা তহবিলে জমা করিয়া রাখে তবেই ব্যাঙ্কের পক্ষে সব আমানতকারীর পাওনা নগদ টাকায় এককালীন মিটানো সম্ভব হয়।

ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকা বিভিন্ন মিয়াদে কর্জ্জ দেয়। সুতরাং সব ঋণ একই সাথে শোধ করা চলে না। ধর যদি একজন চাষীকে ব্যাঙ্ক টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে, তবে ঐ চাষী যে শস্য বুনিয়াছে, যতদিন না

তাহার ফসল পায়, ততদিন তাহার নিকট হইতে টাকা পাওয়া যাইবে না। যদি দেনদার বণিক হয় তবে অন্ততঃ আংশিক পণ্য বিক্রয় না করিলে সে দেনা শোধ করিতে পারিবে না। তাই বলিতে হয়, যে, যদি সমস্ত ব্যাঙ্কের সমস্ত আমানতকারী একই সাথে টাকা দাবী করিয়া বসে, তবে সব ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক নিরাপদ কিনা জানিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ টাকা ব্যতীত যে সম্পত্তি (অ্যাসেট্) আছে তাহা লইয়া সে কি করে। যদিও একথা সত্য যে, সব আমানতকারীর টাকা ব্যাঙ্কের পক্ষে একসাথে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়; তথাপি যদি ব্যাঙ্ক ঠিকভাবে ঋণ দিয়া থাকে বা টাকা খাটাইয়া থাকে, তবে প্রয়োজন হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে অধিকাংশ আমানতকারীর দাবী মিটাইতে পারে। তা ছাড়া যদি আমানতকারীদের বিশ্বাস থাকে যে, ব্যাঙ্ক এরূপভাবে দাবী মিটাইতে পারিবে, তাহা হইলে তাহারা বেশী দাবীও করিবে না। পক্ষান্তরে যদি ব্যাঙ্ক এরূপভাবে টাকা খাটাইয়া থাকে বা কর্জ্জ দিয়া থাকে যে, প্রয়োজনমত সেগুলিকে টাকায় পরিণত করা যাইবে না, তাহা হইলে আমানতকারীদিগের দাবী মিটানো সে ব্যাঙ্কের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং আমানত-কারিগণও ইহার আভাষ পাইলে বেশী করিয়া দাবী করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্কের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র হইতেছে নগদ টাকা; তাহার পরই সহজে টাকায় পরিণত করা যায় এরূপ সম্পত্তি অর্থাৎ "লিকুইড্ অ্যাসেট্‌স্"। সুতরাং "লিকুইডিটি" হইল ব্যাঙ্ক নিরাপদ কিনা জানিবার প্রধান উপায়। "অ্যাসেট"কে নগদ টাকায় পরিণত করিবার উপায় তিনটী:—(১) ব্যাঙ্ক যদি টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে তাহা হইলে নগদ টাকা আবশ্যক হইলে দেনদারকে টাকা পরিশোধ করিতে বলিতে পারে, (২) ব্যাঙ্কের হাতে বণ্ড্ থাকিলে ব্যাঙ্ক তাহা বিক্রয়

করিতে পারে; অথবা (৩) ব্যাঙ্ক অপর কোন ব্যাঙ্কের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে সম্পত্তি বা অ্যাসেট্‌স্‌ বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যদি ব্যাঙ্ক তাহার অ্যাসেট্‌কে এরূপভাবে টাকায় পরিণত করিতে না পারে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ককে দেউলিয়া হইতে হয়। সুতরাং ব্যাঙ্ক-নির্ব্বাচন-কালে দেখিতে হয় যে, ব্যাঙ্কের অ্যাসেটস্‌ লিকুইড্‌ কিনা। কিন্তু কি করিয়া তাহা জানা যাইবে।

ব্যাঙ্ক কিরূপে পরিচালিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে অনেক কথাই লেখা চলে; কিন্তু ব্যাঙ্ক সেই উপায়গুলি অবলম্বন করিতেছে কিনা বাহির হইতে বুঝা শক্ত। সুতরাং বাহিরের লোকের পক্ষে ব্যাঙ্ক-পরিচালক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জানা থাকা আবশ্যক। ব্যাঙ্ক আয়ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশ করে তাহা দেখিয়া ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অল্পস্বল্প ধারণা জন্মে, কিন্তু তাহা খুবই অসম্পূর্ণ। তাই ব্যাঙ্ক-পরিচালকের বিষয়ে জানা কর্ত্তব্য। ব্যাঙ্কের কারবার প্রধানতঃ অপর ব্যক্তির টাকাকড়ি লইয়া; অতএব ব্যাঙ্ক-পরিচালকের প্রধান কর্ত্তব্য আমানতকারীর টাকা নিরাপদ রাখা; ব্যাঙ্কারের ভোলা উচিত নয় যে, সে পরের টাকা লইয়া কাজ করিতেছে। যখনি ব্যাঙ্কার মনে করে যে, সে নিজের টাকা লইয়া কারবার করিতেছে, তখনি বিপদের সূত্রপাত হয়। ব্যাঙ্ক-পরিচালকের বিষয়ে বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, তাহার উদ্দেশ্য কি—নিজের স্বার্থ কি আমানতকারীর স্বার্থ কোন্‌টার প্রতি তার লক্ষ্য? তাহার অপর লক্ষ্য হওয়া চাই অংশীদারদিগকে আমানতকারিগণের স্বার্থ বজায় রাখিয়া উপযুক্ত মুনাফা দেওয়া। দেখা গিয়াছে যে, যেসব ব্যাঙ্ক অংশীদারদের মুনাফা দিতে অসমর্থ হইয়াছিল, তাহারাই ফেল হইয়াছে। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, ব্যাঙ্কের প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক সমগ্র সমাজের সেবা। সমাজ-সেবা

বলিলে এই বুঝায় যে, ব্যাঙ্ক উদারভাবে টাকা ধার দিবে। কিন্তু এইরূপ করিলে ব্যাঙ্কের 'অ্যাসেট্' আর 'লিকুইড্' থাকে না। যদি ব্যাঙ্ক 'লিকুইডিটি' নষ্ট না করিয়া প্রচুর টাকা স্থানীয় লোকদের কর্জ্জ দিতে না পারে, তবে ব্যাঙ্ক উদার-নীতি অবলম্বন করিয়াছে বলা চলে না। ব্যাঙ্ক ফেল হইলে সমাজের যে ক্ষতি হয় অন্য কোন কারণে তাহা হয় না। টাকা বেপরোয়াভাবে কর্জ্জ দিতে দিতে হঠাৎ কর্জ্জ বন্ধ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা দীর্ঘকাল ধরিয়া সতর্কতার সহিত কর্জ্জ দিতে পারা সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর। বিভিন্ন মিয়াদে কর্জ্জ দেওয়ার উপর ব্যাঙ্কের নির্ব্বিঘ্নতা বা লিকুইডিটি নির্ভর করে। বিভিন্ন উপজীবিকার বিভিন্ন লোককে ব্যাঙ্কের টাকা কর্জ্জ দেওয়া উচিত। তাহা হইলে ঋণ-পরিশোধ বেশ একটানাভাবে পাওয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক যদি একটি মাত্র শিল্পে বা কৃষিজাত পণ্যে টাকা কর্জ্জ দেয়, তাহা হইলে ঋণের প্রকৃতির বিভিন্নতা না থাকার জন্য ব্যাঙ্ক নিরাপদ হইতে পারে না। স্থায়ী পুঁজিতে টাকা লাগান ব্যাঙ্কের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ নহে। যদি দেশে এইরূপভাবে বিভিন্ন মিয়াদে টাকা কর্জ্জ দিবার বা খাটাইবার সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক বিদেশে টাকা খাটাইতে পারে। ব্যাঙ্ক তাহা হইলে বণ্ড বা বিক্রয়যোগ্য দলীল (ওপেন্-মার্কেট পেপার) বা ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার-পত্র ( ব্যাঙ্ক অ্যাক্সেপ্টেন্‌সেস্ ) প্রভৃতি খরিদ করিতে পারে।

এত কথা বলিয়া বুঝানো হইতেছে এই যে, সুবিজ্ঞ ব্যাঙ্ক-পরিচালক একটু "কঠিন" লোক হইয়া থাকেন। অর্থাৎ "না"-ই হইতেছে তাঁহার মুখের, বুলি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে তিনি "হাঁ" বলেন। অনেকের মতে সমাজের উন্নতির জন্য ঋণ-গ্রহীতাদিগের অনুরোধ রাখাই ব্যাঙ্ক-পরিচালকের কর্ত্তব্য ; কিন্তু ঐ ব্যাঙ্ক যখন ফেল হয় তখন সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়। কেন না ব্যাঙ্ক ফেল হইলেই আমানত-

কারী, ষ্টক-হোল্ডার ও ঋণ-গ্রহীতা এই তিন শ্রেণীকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

ক্রেডিট অতিমাত্রায় করতলগত করার চেষ্টাই প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে স্বাভাবিক। প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাই ভাবেন যে, ঋণের টাকা তিনি লাভজনকভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। তাই প্রত্যেক ব্যাঙ্ক-পরিচালককেই খরিদ্দারের চাপ সহ্য করিতে হয়। ব্যাঙ্ক-কারবারেও যথেষ্ট প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া দূরদর্শী কোন ব্যাঙ্কার যদি ঋণ দিতে অস্বীকার করেন, তবে অপর কোন অবিবেচক ব্যাঙ্কার সেই টাকাটা দিয়া দেন এবং এইরূপ অবিবেচক ব্যাঙ্কার মনে করেন যে, তিনি বড় বেশী আধুনিক ও যিনি ঋণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন তিনি "বোকা প্রাচীন্" বা 'ওল্ডফুল' এবং তিনি এইরূপে টাকা কর্জ্জ দিয়া সমগ্র সমাজের কল্যাণসাধন করিতেছেন।

আর এক কথা, যেসব লোক শ্লথভাবে কারবার চালায়, তাহারা অসন্দিগ্ধ খরিদ্দারকে বাজে মাল চালাইবার জন্য সাধারণতঃ অত্যন্ত অধিক বিনয়ী হইয়া থাকে। অবিবেচক ব্যাঙ্ক-পরিচালকও সাধারণতঃ অত্যধিক বিনয়ী হইয়া থাকে এবং সেইজন্য ব্যাঙ্কের খরিদ্দারগণও মনে করেন যে, সেই ব্যাঙ্কারই তাঁহাদের পরম হিতৈষী বন্ধু, কেন না ব্যাঙ্কার তাঁহাদের মন যোগাইয়াই চলেন। তেমনি যেসব ব্যাঙ্ক-পরিচালক সহজে টাকা কর্জ্জ দিতে চাহেন না, তাঁহাদের ব্যবহারে খরিদ্দারের মনে একটু বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। খরিদ্দার তখন তাঁহাকে 'কঠিন', 'কুসীদজীবী' 'হৃদয়হীন' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকেন। এই-সব খরিদ্দার অভিযোগ তোলেন যে, ব্যাঙ্ক এরূপ উৎকৃষ্ট সিকিউরিটি চাহে যে, সেরূপ সিকিউরিটী থাকিলে তিনি ব্যাঙ্কের দ্বারস্থই হইতেন না।

যখন ঝঞ্ঝা আসে ও ব্যাঙ্ক ফেল হইতে সুরু করে, তখন

খরিদ্দারগণ বুঝিতে পারেন যে, যেসব ব্যাঙ্কারের মুখের বুলি ছিল "স্বাগতম্" তাঁহারা নিজেদের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্যই অত অধিক পরিমাণে বিনয়ী হইয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, তথাকথিত হৃদয়হীন ব্যাঙ্ক-পরিচালকই ঋণ-গ্রহীতার প্রকৃত বন্ধু। অর্থাৎ যে ব্যাঙ্ক-পরিচালক ঋণ-গ্রহীতাকে পুনঃ পুনঃ ঋণ করিতে সাহায্য না করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করেন, তিনিই ঋণগ্রহীতার হিতাকাঙ্ক্ষী।

অনেকে বলিবেন, এ কথা কারবারী লোকের পক্ষে জানা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ আমানতকারীর এসব জানিয়া কি লাভ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, তুমি ঋণগ্রহীতাই হও আর আমানতকারীই হও, তোমার জানা আবশ্যক ব্যাঙ্কার সাবধানী লোক কি না। ইহা জানিবার একটা উপায় হইতেছে আমানতকারীর প্রতি ব্যাঙ্কের ব্যবহার দেখা। ব্যাঙ্ক যদি তোমার আমানতি টাকা লইবার জন্য ব্যগ্রতা দেখায়, তাহা হইলে নমস্কার করিয়া বিদায় লইবে। কিন্তু এই ব্যগ্রতার লক্ষণ কি? ইহার একটা লক্ষণ এই যে, ছোটখাট ব্যাঙ্ক বা নূতন ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে সামান্য টাকা কোনরূপ 'চার্জ' না করিয়া জমা রাখিয়া চেক-হিসাব খুলিতে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, সুদের হার চড়া দিয়া থাকে—বাজার-চল্‌তি সুদের হার অপেক্ষা অধিক সুদ দিয়া থাকে। সাধারণ ব্যাঙ্ককে আমানতকারীর জন্য অনেক কাজ অমনিই করিয়া দিতে হয় বলিয়া ও একসাথে নানা কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয় বলিয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে নামমাত্র সুদ ছাড়া বেশী দেওয়া সম্ভব হয় না। ব্যাঙ্ককে হিসাবপত্র রাখিবার জন্য সাধারণতঃ ১% হইতে ১½% খরচা করিতে হয়; ব্যাঙ্ক যদি উৎকৃষ্ট বণ্ডে বা উৎকৃষ্ট সিকিউরিটি রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেয় তবে বেশী সুদ পাইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে যদি একটু চড়া সুদ আমানতকারীকে দিতে হয় তাহা হইলে আর ষ্টক্-

হোল্ডারদের মুনাফা দিতে পারে না। আমানতি টাকার উপর কত সুদ ব্যাঙ্ক দিবে তাহা নির্ভর করে ব্যাঙ্ক কত সুদে টাকা ধার দিয়াছে তাহার উপর। আসল কথা এই যে, স্থানীয় অবস্থার দরুণ যে সুদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত তাহার বেশী দেওয়া ব্যাঙ্কের উচিত নয়।

এখানে প্রতিযোগিতার কথা উঠিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক বাণিজ্যিক কেন্দ্রেই বাঙ্কসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া 'ক্লিয়ারিং হাউস' কায়েম করে; এই ক্লিয়ারিং হাউস স্থির করিয়া দেয় যে, সদস্য ব্যাঙ্কগুলি কত পর্য্যন্ত সুদ নিঃশঙ্কচিত্তে দিতে পারে; সুতরাং সদস্যদিগের মধ্যে প্রতি-যোগিতার কথাই উঠে না। তবে কথা এই যে, সব সময়ে সব ব্যাঙ্ক 'ক্লিয়ারিং হাউসের' সদস্য হয় না। সেরূপ ব্যাঙ্কে টাকা জমা না রাখাই ভাল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে আমানতকারীর প্রতি, দ্বিতীয়তঃ ষ্টক্-হোল্ডারের প্রতি এবং তৃতীয়তঃ ঋণ-গ্রহীতার প্রতি। ব্যাঙ্কের চতুর্থ ও শেষ কর্ত্তব্য হইতেছে ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারিগণের প্রতি। ব্যাঙ্ক-ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারিগণ যদি মনে করেন যে, তাঁহারা রাতারাতি বড়লোক হইয়া উঠিবেন ত সে বড় ভয়ানক কথা। নিজেদের স্বার্থকে বড় করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। ব্যাঙ্ক প্রেসিডেণ্ট যদি ফটকা খেলায় মাতিয়া অল্প সময়েই মোটা মুনাফা মারিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বিপদের কথা। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা সমগ্র সমাজের "ট্রাষ্টি"-বিশেষ। ব্যাঙ্ক-প্রেসিডেণ্ট স্থানীয় সকল লোককেই জানেন। তিনি লোকের সুখ-দুঃখের সন্ধান রাখেন। সুতরাং অনন্যকর্ম্মা প্রকৃত ব্যাঙ্ক-প্রেসিডেণ্টের স্থান সমাজের শীর্ষদেশে। তাই যে ব্যাঙ্ক-প্রেসিডেণ্ট বেশী ঝুঁকি গ্রহণ করেন, ফট্‌কা খেলিতে চান, সেরূপ ব্যাঙ্ক-প্রেসিডেণ্টের হাতে টাকা জমা দেওয়া সুবিবেচনার কাজ নহে।

# রাষ্ট্রের ব্যয়*

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি ; বি, এ ; এফ, ইকন্, এস্ (লণ্ডন) ;
গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ; "টাকার কথা"-প্রণেতা

গৃহস্থালী থাকিলেই খরচ আছে - সে গভর্ণমেণ্টের গৃহস্থালীই হউক, আর ব্যক্তিগত গৃহস্থালীই হউক। আর এই খরচ মিটাইবার জন্ম সকল দেশে সকল সময়ে অর্থেরও প্রয়োজন হয়। তবে ব্যক্তির ও সরকারের খরচ যে একই রকম তাহা নয়। ব্যক্তির গৃহস্থালীতে খরচ যে-যে খাতে হয় সরকারের খরচও যে ঠিক সেই-সেই বাবদ হয় তাহা নয়। এই দুই রকম খরচের মধ্যে মিলও আছে, আবার গরমিলও ঢের। আর এই দুইয়ের ধরণ-ধারণেও প্রভেদ কম নহে। প্রথমতঃ, ব্যক্তি তার নিজের আয় বুঝিয়া খরচ করে। কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ঠিক উল্টা। রাষ্ট্র আগে ঠিক করে খরচ কি কি খাতে করিতে হইবে, তাই বুঝিয়া আয়ের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়তঃ, গৃহস্থের লক্ষ্য থাকে নিজের আয় হইতে সংসার-খরচ মিটাইয়া যাহাতে দুই পয়সা বাঁচাইতে পারে। ঋণের ধার সে ধারিতে চাহে না। কিন্তু রাষ্ট্রের আয়ব্যয়ে মিল হওয়া চাই—সঞ্চয় যেন না হয়, ঋণও যেন না হয়। রাষ্ট্রের খরচের টাকা জোগায় করদাতা জনসাধারণ। রাষ্ট্রের খরচ মিটাইয়া যদি টাকা বাঁচে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই ফাল্‌তো টাকা করদাতাদের নিকট হইতে আদায় না করিলেও চলিত। তাহাদের করভার আরও কমানো যাইত। আবার বে-হিসাবী খরচ করিয়া রাষ্ট্র যদি দুই হাতে অতিরিক্ত ঋণ করিতে থাকে, তাহা হইলেও উহা নিন্দনীয় ; কারণ সে

---

* "আর্থিক উন্নতি", ভাদ্র ১৩৩৮ ( আগষ্ট ১৯৩৯ )।

ঋণ শোধ করিতে হইবে দেশবাসীকেই। তৃতীয়তঃ, গৃহস্থ খরচ করিবার সময় নজরে রাখে তাহার নিজের সংসারের লাভালাভ, আর রাষ্ট্রের খরচের উদ্দেশ্য থাকে সমাজের কল্যাণ। কাজেই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের খরচের ক্ষেত্রেও পার্থক্য যথেষ্ট।

## রাষ্ট্রের খরচ কি কি ?

রাষ্ট্রের খরচ যে সকল দেশে সকল সময়ে একই ছিল বা আছে তাহা নহে। যুগে যুগে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লোকের ধারণা যেমন বদলাইয়াছে, তেমনি উহার খরচের দফাগুলির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনুপাতও ঠিক থাকে নাই। একই রাষ্ট্রের প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের খরচের মধ্যেই যে কেবল প্রভেদ তাহা নহে ; বর্ত্তমান যুগেও মানুষের শিক্ষা ও চিন্তার গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণাও যেমন বদলাইতেছে, সরকারী খরচের খাতে এবং অনুপাতেও তেমনি পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোনো কোনো রাষ্ট্রে বাহিরের শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষা, দেশের ভিতরে শান্তিরক্ষা, কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও শিক্ষার বিস্তার এই সকল কাজই সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র মনে করে প্রজাদিগের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য কিছু করা তাহার কাজ নহে, শুধু দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষা করিলেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল। কোনো রাষ্ট্রে হয়তো দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার খাতে যথেষ্ট টাকা ব্যয় হইতেছে, অথচ শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য খরচ নমো নমো করিয়া সারা হইতেছে। আবার হয়তো আর কোনো রাষ্ট্রে শেষের দফাগুলিতে টাকা ব্যয় হইতেছে জলের মত, দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার প্রতি ততটা নজর নাই। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, সকল রাষ্ট্রে সরকারী

খরচের তালিকায় অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও উহা আগাগোড়া ঠিক একই রকম নহে। যে রাষ্ট্রের চেষ্টা যত ব্যাপক, তাহার খরচও তত বেশী। আবার এই খরচ মিটাইবার জন্য তাহাকে টাকাও সংগ্রহ করিতে হয় অনেক। কোন্ কাজের জন্য কত খরচ হয়, এবং খরচের টাকা প্রজাদিগের নিকট হইতে কি কি বাবদ কত হারে আদায় হয় ইহার উপরই সমাজের কল্যাণ অনেকটা নির্ভর করে। তাহা হইলেই মনে প্রশ্ন জাগে—তবে কি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ঠিক করিবার কোনো মাপকাঠি নাই? এমন একটা মাপকাঠি নাই যাহা দিয়া বিচার করিয়া এক দুই তিন করিয়া বলা যায় যে, এইগুলি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য কাজ। আজ যাহা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা হইতেছে ৫০ বৎসর আগে হয়তো তাহা রাষ্ট্রের কাজ বলিয়া গণ্য হইত না। ব্যক্তি নিজের গরজেই উহা করিত। বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রের কাজ কি কি তাহা জানিতে হইলে কোন্ কোন্ যুগে রাষ্ট্রের কি কি কাজ ছিল, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তখনকার লোকের কিরকম ধারণা ছিল তাহা বুঝা দরকার। আজকাল কি পূবের, কি পশ্চিমের সকল দেশের রাষ্ট্রেরই গড়ন, ধরণধারণ, কম-বেশী য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাজেই আপাততঃ য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের অভিব্যক্তি বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। আদিম যুগে য়ুরোপে রাষ্ট্রই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বলিয়া কিছু ছিল না। সমস্ত সমাজের গড়ন ও চলন নির্ভর করিত সমাজের আইন-প্রণেতার মর্জ্জির উপর। তাহার পরের যুগে ব্যক্তির মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একটু একটু করিয়া জাগিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার বাহ্য প্রকাশ বা সুফল তেমন-কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। মধ্যযুগের পরে যখন কেন্দ্রীকৃত সম্রাটগণের উদ্ভব হইল, তখন তাঁহারাও চাহিলেন আগের মতই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আর্থিক জীবনের সবদিকটাই শাসন করিতে।

শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যেও আজকালকার মত তখন স্বাধীনতা ছিল না। শ্রীযুক্ত জি, আরমিটেজ্ স্মিথ তাঁহার "প্রিন্সিপ্যালস্ অ্যাণ্ড মেথাডস্ অব্ ট্যাক্সেশান" নামক বহিতে লিখিয়াছেন "যুগে-যুগে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রশক্তি প্রথানুসারে ব্যক্তির উপরে যে শাসন চালাইয়া আসিয়াছে তাহাতে সামাজিক ও আর্থিক অধীনতার চেহারাই ফুটিয়া উঠিয়াছে বেশী করিয়া। শ্রম ও করের উপরে দেখিতে পাওয়া যায় জুলুমের প্রভাব; হরেক রকম বাঁধনে বাঁধা ছিল শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য ও শ্রম। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বেশীর ভাগ লোকের কাছে ছিল স্বপ্নের জিনিষ।" একদিকে ব্যক্তির জীবনের উপরে রাষ্ট্রশক্তির এই শাসন ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছিল, অপরদিকে ব্যক্তির মনে এই বাঁধন হইতে মুক্তি পাইয়া নিজের জীবনকে নিজের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চালাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে ষোড়শ শতাব্দী হইতে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়া আসিতে লাগিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে লাভ হইল ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এমন করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং সঙ্গে-সঙ্গে উহার কর্ত্তব্য কিছু কিছু করিয়া কমিতে লাগিল। কিন্তু তখনও সমাজের আর্থিক জীবন ছিল রাষ্ট্রের মুঠার মধ্যে। আর্থিক কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করিত রাষ্ট্রশক্তির উপর। সপ্তদশ শতাব্দীতেও আর্থিক জীবনে, ব্যবসাবাণিজ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা কিছু ছিল না, রাষ্ট্রের হুকুম ছিল বড় কথা। এই আর্থিক স্বাধীনতা লাভ হইল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তখনকার মানুষ ভাবিতে শিখিল যে, শিল্প-বাণিজ্যের উপর সরকারের কর্ত্তামি অনেকটা কমানো দরকার। মানুষ যদি তাহার স্বাভাবিক স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ বেশী হয়। ব্যক্তির জীবনের উপর রাষ্ট্রের কর্ত্তামি কমাইয়া দিয়া

প্রতি ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেও, সে তাহার স্বার্থের টানে স্বাধীনভাবে দশের সঙ্গে টক্কর দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করুক, দেখিবে সমাজের আর্থিক জীবন আরও উন্নত হইয়া উঠিবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আওতায় মানুষ স্বার্থের প্রেরণায় প্রতিযোগিতা করিয়া চলিলে তাহার শক্তির বিকাশ হয়, কাজের ক্ষমতা বাড়ে এবং সে নূতন নূতন বিষয়ে মাথা খেলাইয়া নানারকম আবিষ্কার করিয়া দেশের সম্পদ্ বাড়াইতে পারে। তাহাতে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিলেও সমাজে শান্তি ও জ্ঞানের বিস্তার না থাকিলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। কাজেই এই দুইটী কাজ আসিয়া পড়ে রাষ্ট্রের ঘাড়ে। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ইংল্যণ্ডের অর্থশাস্ত্রী অ্যাডাম্ স্মিথ তাঁহার "ওয়েল্থ্ অব্ নেশান্স্" (জাতীয় সম্পদ্) নামক বহিতে লিখিয়াছেন—"স্বাভাবিক স্বাধীনতার নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের কেবলমাত্র তিনটি কাজ করা দরকার—(১) বাহিরের অন্যান্য স্বাধীন সমাজের অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করা (২) সমাজের ভিতরেই একজন যেন আর একজনের উপরে অত্যাচার বা অবিচার না করে তাহা দেখা এবং (৩) ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণায় যেসকল কাজ কোনও ব্যক্তি করিতে চাহে না, সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য সেইসকল কাজ করা অথবা তজ্জন্য প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা। যেমন পথ-ঘাট যান-বাহন, খাল, বন্দর, স্কুল, মন্দির, মস্‌জিদ ইত্যাদি।" এক কথায় বলিতে গেলে তখনকার লোকের মত ছিল যে, মানুষের জীবনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে তাহার সুপ্ত শক্তির বিকাশ ও চর্চ্চার জন্য তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হইবে। সমাজের উন্নতির জন্য ব্যক্তির জীবনের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই মতবাদের প্রভাবেই রাষ্ট্রের কাজ কমিয়া আসিল, এবং ব্যক্তির কর্ত্তব্য বাড়িয়া চলিল। ইহার পর আর এক ধরণের চিন্তা মানুষের মাথায়

খেলিল। সমাজ-তান্ত্রিকেরা বলিলেন "মানুষের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য সমাজের অপরাপর লোকের সাহায্য পাওয়া একান্ত দরকার। এই সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে রাষ্ট্রের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে।" এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাজ ঠিক করিতে গেলে আর্থিক জীবনের সকল কাজকর্ম্মই রাষ্ট্রের হাতের মুঠায় আসিয়া পড়ে, ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়। স্নেহপ্রবণ পিতা যেমন পুত্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণ-কামনায় তাহার স্বাধীনতায় বাধা দেয়, তেমনি সমাজতন্ত্রপ্রবণ রাষ্ট্রগুলিও ব্যক্তির কল্যাণের জন্য তাহার স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটায়। কোনো কোনো রাষ্ট্র এই মতবাদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে।

এখনকার সকল রাষ্ট্রই এই সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিতন্ত্রবাদের মাঝামাঝি থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইতেছে। তবে সকলেরই মূল নীতি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে মানিয়া চলা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যও বদলায়। কখনো উহার দুই একটা কাজ বাড়ে আবার কোনো সময়ে বা ব্যক্তিই নিজে গরজ করিয়া কোনো কোনো কাজ করে, রাষ্ট্র রেহাই পায়। আজকাল রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতায় তখনই হস্তক্ষেপ করে যখন সে ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির সুযোগ নষ্ট না করিয়া তাহার কল্যাণ করিতে পারে। কিন্তু গত য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্রের পর হইতে বড় বড় দেশের রাষ্ট্রের ঝোঁক দেখিতেছি সমাজতন্ত্রবাদের দিকে।

## রাষ্ট্রের খরচের বিভাগ

বর্ত্তমান সময়ের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রের খরচের দফাগুলিকে মোটা-মুটি নিম্নলিখিত দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে:—(১) মুখ্য ও

(২) গৌণ*। রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্যের জন্য খরচগুলিকেই উহার মুখ্য খরচ বলা যাইতে পারে, যথা (ক) দেশরক্ষা, অর্থাৎ সৈন্য-সামন্ত, নৌবাহিনী ও আকাশযানের জন্য ব্যয়। (খ) দেশের ভিতরে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য ব্যয়। এইখাতে পড়ে পুলিশ, বিচার ও জেল প্রভৃতির খরচ। (গ) শাসনবিভাগের দেওয়ানী খাতে ব্যয়। ইহার মধ্যে পড়ে গভর্ণমেণ্ট বা শাসন যাঁহারা চালাইবেন তাঁহাদের বেতন ও ভাতা, সিভিল সার্ভিসের ও দপ্তরখানার (সেক্রেটারীয়েট) ব্যয়, ব্যবস্থাপক সভার খরচ এবং কিছু কিছু রাজনৈতিক দায়, যেমন অপর দেশে গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের বেতন ও সরঞ্জামি খরচ। কর-সংগ্রহের খরচও এই খাতেই পড়ে। (ঘ) রাষ্ট্রের ঋণ। ঋণের কতক অংশ দেশের ধনসম্পদ্‌বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হয়, আর কতক তাহা হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রের ঋণের মোট পরিমাণই মুখ্য খরচের খাতে পড়ে। কারণ রাষ্ট্রের আয়ের উপর ইহার দাবীই সর্ব্বপ্রধান।

রাষ্ট্রের গৌণ খরচের দফাগুলির মধ্যে পড়ে (১) সামাজিক ব্যয়, যথা—শিক্ষা, সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্য, গরীবের দুঃখমোচন, বেকার-বীমা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয়। (২) ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণায় যেসকল কাজ কোনও ব্যক্তি করিতে চাহে না, অথবা করিলেও ভাল হয় না সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য সেইসকল কাজ করা অথবা তজ্জন্য প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা, যেমন :—পথঘাট, রেল, খাল, বন্দর, জলসেচ এবং অন্যান্য সার্ব্বজনীন কাজ, ডাক ও টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, কৃষি ও শিল্প গবেষণার জন্য ব্যয়, খনি ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য তথ্যানুসন্ধান (সার্ভে), ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য যানবাহন ও আকাশ-

* জি, ফিণ্ড্‌লে সিরাজ প্রণীত "দি সায়েন্স অব্‌ পাব্লিক ফিনান্স"। পৃঃ ৫০। রাষ্ট্রের খরচগুলিকে নানা পণ্ডিত নানাভাবে ভাগ করিয়াছেন। কিন্তু কোনটাই দোষমুক্ত নহে।

যান। (৩) রাষ্ট্রের গৌণব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ ব্যয়ের খাতে পড়িবে পেন্সন ও ওয়াপস।

## দেশরক্ষা

প্রত্যেক রাষ্ট্রের মুখ্য খরচের প্রধান দফা—সামরিক ব্যয়। এই বাবদ খরচ প্রতি দেশেই কিরকম ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা নীচের হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

### ইংলণ্ড

| সন | | ব্যয় |
|---|---|---|
| ১৭৭৫ | ... | ৩,৮১০,০০০ পাউণ্ড |
| ১৮২৩ | ... | ১৪,৩৫০,০০০ ,, |
| ১৮৪৭ | ... | ১৮,৫০০,০০০ ,, |
| ১৮৫৭-৫৮ | ... | ২৩,৫০০,০০০ ,, |
| ১৮৬৮-৬৯ | ... | ২৬,৮৯১,০০০ ,, |
| ১৮৭৮-৭৯ | ... | ৩০,২৫২,০০০ ,, |
| ১৮৮৯-৯০ | ... | ৩২,৭৮১,০০০ ,, |
| ১৮৯৩-৯৪ | ... | ৩৩,৫৬৬,০০০ ,, |
| ১৮৯৫-৯৬ | ... | ৩৭,৪০৭,০০০ ,, |
| ১৯০০-১ ( যুদ্ধ ) | ... | ১২১,২৩০,০০০ ,, |
| ১৯২৮-২৯ | ... | ১১৪,৬০০,০০০ ,, |
| ১৯২৯-৩০ | ... | ১১২,৬১০,০০০ ,, |

### জার্মাণি

| সন | | ব্যয় |
|---|---|---|
| ১৮৭৩ | ... | ১৯,২০০,০০০ পাউণ্ড |
| ১৮৭৬ | ... | ২১৯,০০০,০০০ ,, |
| ১৮৮৩-৮৪ | ... | ২২,৭৫০,০০০ ,, |

| সন | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| ১৮৮৮-৮৯ | ... | ৪১,৯০০,৭০০ | ,, |
| ১৯০০-১ | ... | ৩৯,০৯০,০০০ | ,, |
| ১৯০২-৩ | ... | ৩৯,৯৪৬,০০০ | ,, |
| ১৯২৭-২৮ | ... | ৩৪,৩৭৩,৪৭০ | ,, |
| ১৯২৮-২৯ | .. | ৩৬,৪২৮,৫৭৫ | ,, |

## ইটালী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৬২ | ... | ৮,৫০০,০০০ | পাঃ |
| ১৮৬৯ | ... | ৬,৮০০,০০০ | ,, |
| ১৮৭৫ | ... | ৮,৭৬০,০০০ | ,, |
| ১৮৮০ | ... | ১০,১২০,০০০ | ,, |
| ১৮৮৬ | ... | ১৫,১২০,০০০ | ,, |
| ১৮৯০ | ... | ১৪,৫০০,০০০ | ,, |
| ১৯০০-১ | ... | ১৫,৩৭৭,০০০ | ,, |

## ফ্রান্স

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৭৭৪ | ... | ৪,৮৮০,০০০ | ,, |
| ১৮৩০ | ... | ১২,৯৬০,০০০ | ,, |
| ১৮৪৭ | ... | ১৯,৩২০,০০০ | ,, |
| ১৮৫৮ | ... | ১৯,৯৬০,০০০ | ,, |
| ১৮৬৮ | ... | ২৬,৩২০,০০০ | ,, |
| ১৮৭৮ | ... | ২৯,২৪০,০০০ | ,, |
| ১৮৯০ | ... | ৩৭,৬৪০,০০০ | ,, |
| ১৯০০ | ... | ৩৮,৮৮০,০০০ | ,, |
| ১৯০২ | ... | ৪১,১৫১,০০০ | ,, |

## ভারতবর্ষ

| সন | | ব্যয় |
|---|---|---|
| ১৮৬১-৬২ | ... | ১৬,৯৪,৯৬,০০০ টাকা |
| ১৮৭১-৭২ | ... | ১৬,২৫,২২,০০০ ,, |
| ১৮৮১-৮২ | ... | ২০,৩৫,২৭,০০০ ,, |
| ১৮৯১-৯২ | ... | ২৩,৫১,৩৪,০০০ ,, |
| ১৯০১-০২ | ... | ২৫,৮৩,৩৭,০০০ ,, |
| ১৯১১-১২ | ... | ৩১,৩৫,২৫,০০০ ,, |
| ১৯১৩-১৪ | ... | ৩১.৮৯,৮৬,০০০ ,, |
| ১৯১৪-১৫ | ... | ৩২,৭১,৪৪,০০০ ,, |
| ১৯১৫-১৬ | ... | ৩৫,২৫,৪৬,০০০ ,, |
| ১৯১৬-১৭ | ... | ৩৯,৮৫,০১,০০০ ,, |
| ১৯১৭-১৮ | ... | ৪৬,১৪,৫৫,০০০ ,, |
| ১৯১৮-১৯ | ... | ৭০,২৪,৫৩,০০০ ,, |
| ১৯১৯-২০ | ... | ৯১,০৩,০০,০০০ ,' |
| ১৯২০-২১ | ... | ৮৮,২৩,২৪,০০০ ,, |
| ১৯২১-২২ | ... | ৭৭,৮৭,৯৮,০০০ ,, |

দেশরক্ষার খাতে খরচ একেবারে তুলিয়া দেওয়া যায় না। শক্রর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা না রাখিতে পারিলে শিল্পবাণিজ্য কেন, কোনোপ্রকার উন্নতিই সম্ভবপর নয়।

### ব্যয় বাড়িয়াছে কেন ?

সকল দেশেই যে খরচ একই ভাবে বাড়িয়াছে তাহা নহে, তবে গতিটা বৃদ্ধির দিকেই। অ্যাডাম্ স্মিথ তাঁহার "ওয়েল্থ্ অব নেশানস্" বহিতে প্রায় ১৫০ বৎসর আগে লিখিয়াছিলেন, "প্রতি

সমাজই সভ্যতায় যত অগ্রসর হয় দেশ-রক্ষার খাতে উহার খরচ ততই বাড়িয়া চলে"। হইয়াছেও তাহাই। এখনো পৃথিবীর নানাদেশে মানুষের চরিত্র যে স্তরে রহিয়াছে তাহাতে জাতিতে-জাতিতে রেষারেষি, কলহ ও যুদ্ধাদি অসম্ভব হয় নাই। কাজেই দেশরক্ষার ব্যয় তুলিয়া দেওয়া এখনও সম্ভবপর নহে। শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষা করিয়া সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা না রাখিতে পারিলে শিল্প-বাণিজ্য কেন, সকল প্রকার উন্নতিই বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

বিভিন্নদেশে এই খাতে খরচ বাড়িবার একটি কারণ জিনিষপত্রের মূল্য-বৃদ্ধি। কিন্তু ভারতবর্ষ, গ্রেটবৃটেন, ক্যানাডা, জাপান, বেলজিয়াম যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে জিনিষ-পত্রাদির দাম যে হারে বাড়িয়াছে তাহার চেয়েও বেশী হারে বাড়িয়াছে দেশরক্ষার ব্যয়। দ্বিতীয় কারণ, শ্রমবিভাগ। সভ্য সমাজে শ্রমবিভাগ প্রচলিত হওয়াতে এখন আর সমাজের সকল মানুষই দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধাদি শিখিয়া তৈরী থাকে না। কতকগুলি লোককে ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষা দিয়া তৈরী করিয়া রাখা হয়। তাহারা দেশের ধনসম্পদ্ উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে না। সামরিক কাজের জন্য যাহাদিগকে রাখা হয় তাহাদিগকে চল্‌তি মজুরির চেয়ে কিছু বেশী দেওয়াই রেওয়াজ। সামরিক কাজের জন্য বিশেষ করিয়া কতকগুলি লোককে না পুষিয়া যদি সমাজে সমর্থ ব্যক্তিমাত্রকেই সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা হইলে দেশরক্ষার খাতে ব্যয় অনেক কমিয়া যাইত। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য সমাজেই এখনো তাহা সম্ভব নহে। তৃতীয় কারণ, নূতন-নূতন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার। বৈজ্ঞানিক-দিগের কৃপায় ক্রমশই নূতন-নূতন অস্ত্রশস্ত্র ও মানুষ মারিবার কল-কৌশলাদি আবিষ্কৃত হইতেছে। সভ্য সমাজ এই সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্য লওয়াতে শান্তির সময়কার সামরিক খরচ এবং লড়াইয়ের খরচ দুই-ই বাড়িয়া চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর

শেষদিকে বুয়ার লড়াইয়ের সমসমকালে বিলাতের শান্তির সময়কার সামরিক খরচ ছিল বৎসরে ৪ কোটি পাউণ্ড। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই খরচ ছিল গড়ে প্রায় ৫৷৷-৬ কোটি পাউণ্ড। দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্দ্ধে (১৯১০-১৪) দেখি ৬৷৷০-৭৷৷০ কোটি পাউণ্ড।

## ইংরেজ ও ভারতবাসী

"বিলাতের সামরিক খরচ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এ খরচ 'অসামরিক' খরচের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে, এমন কি অপেক্ষাকৃত শান্তির সময়েও সামরিক খরচ অসামরিক খরচকে ডিঙাইয়া চলিত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৭ কোটি ৭২ লক্ষ পাউণ্ড ছিল সামরিক খরচ। তখন অসামরিক খরচ প্রায় ৭৷৷০ কোটি ছিল।

"১৯০৯ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের বিলাতী সামরিক খরচ নিম্নরূপ :—

| বৎসর | | সামরিক খরচ (পাউণ্ড) |
|---|---|---|
| ১৯০৯ | ... | ৫ কোটি ৯০ লাখ |
| ১৯১০ | ... | ৬ ,, ৩০ ,, |
| ১৯১১ | ... | ৬ ,, ৭৮ |
| ১৯১২ | ... | ৭ ,, ৫ |
| ১৯১৩ | ... | ৭ ,, ২৪ |
| ১৯১৪ | ... | ৭ ,, ৭২ ,, |

বিনা লড়াইয়েই ফী ইংরেজকে সামরিক মতলবে খরচ করিতে হয় বৎসরে প্রায় ২৫৲। এই হিসাবটা মনে রাখিলে স্বাধীনতার মাপকাঠি কথঞ্চিৎ মালুম হইবে। যুদ্ধের সময়কার সামরিক মতলবে খরচ তো এলাহি কারখানা!

"ভারত-সন্তান সামরিক মতলবে খরচ করিতেছে কত ? ৩০ কোটি নরনারীর জন্য ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের 'ভারতীয়' বাজেটে আছে প্রায় ৫৫ কোটি টাকা। এই অঙ্ক সকল প্রকার খরচের তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু ১৯২০-২১ এই কয় বৎসর ধরিয়া 'ভারতীয়' বাজেটের প্রায় আধাআধি ছিল সামরিক খরচ। সহজে অঙ্কটাকে ৬০।৬৫ কোটি ধরিয়া লইলাম। তাহা হইলে প্রত্যেক ভারত-সন্তান ( বাঙ্গালী আর অ-বাঙ্গালী ) গড়পড়তা ২৲ বা ২।০ আনা মাত্র খরচ করিতে অভ্যস্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শান্তির সময়কার সামরিক খরচের মাপেও প্রায় দশ-দশটা ভারতবাসীর সমান হইতেছে এক একজন ইংরেজ।"*

## আসল লড়াইয়ের খরচা

"বর্ত্তমান জগৎ লড়াইয়ের জগৎ। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা একালের নরনারীর স্বধর্ম্ম। যেসকল নরনারী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে না, আর লড়াইয়ের জন্য দিনের পর দিন কিছু কিছু টাকা ঢালে না তাহারা মানুষ নামের উপযুক্ত নয়।"*

লড়াইয়ের হিসাবেও খরচের বাড়্তি নজরে পড়িবে।

| সন | লড়াই | মোট খরচ |
|---|---|---|
| ১৮৫৪-৫৭ | ক্রিমিয়ায় রুশ লড়াই | ৭ কোটি ৩০ লাখ পাঃ (৩ বৎসরে) |
| ১৮৯৯-১৯০৩ | বুয়ার লড়াই | ২৮ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ড (৪ বৎসরে) |
| ১৯১৪-১৯১৮ | বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র | ৯৫৭ কোটি পাউণ্ড (৫ বৎসর) |

---

* "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র"—প্রথম ভাগ।

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে ইংরেজ জাতির এত বেশী খরচ হইয়াছে যে, সাধারণ এবং অসাধারণ কোনো লোকই তাহা বিশ্বাস করিবে চাহিবে না। অথচ ইহার ভিতর একদম কিছুই "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন।" হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২২৬ বৎসরে বৃটিশ সরকার সকল প্রকার সামরিক, অসামরিক এবং লড়াই কার্য্যে যতকিছু খরচ করিয়াছে ১৯১৪ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে তাহার চেয়ে বেশী খরচ করিতে হইয়াছে। ফর্দ্দটা নিম্নরূপ :—

| সময় | সকল প্রকার সরকারী খরচ |
|---|---|
| ১৬৮৮-১৯১৪ (২২৬ বৎসর) | ১,০৯৪ কোটি পাউণ্ড |
| ১৯১৪-১৯২০ ( ৬ বৎসর) | ১,১২৬ ,, ,, |

ইহাকেই বলে বর্ত্তমান জগতের আধুনিকতম যুগ,—নবীনের নবীন, কট্টর নয়া দুনিয়ার আর্থিক খরচ বার্ষিক ১৮৭ কোটি পাউণ্ড।

"১৯১৪-২০ খৃষ্টাব্দে লড়াইয়ের দিনে সকল প্রকার মতলবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে খরচ করিতে হয় ১,১২৬ কোটি পাউণ্ড। গড়ে ফী বৎসর পড়িয়াছে ১৮৭ কোটি পাউণ্ড।" ইহার আগে ইংরেজের গড়পড়তা খরচ ছিল অনেক কম, যথা :—

| সন | সরকারী খরচ (সকল প্রকার) |
|---|---|
| ১৮১৭ | ৭ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ড |
| ১৯১৪ | ২১ কোটি ২০ লাখ পাউণ্ড |

তাহার পরেই ধাঁ করিয়া ১৯১৪-২০ খৃষ্টাব্দে ফী বৎসরে গড়ে ১৮৭ কোটি পাউণ্ড ( অর্থাৎ ৯ গুণ )।"

ইহা সম্ভবপর হইল কি করিয়া ? "এই ১,১২৬ কোটি পাউণ্ডের ⅓ আসিয়াছে ট্যাক্স্ ও অন্যান্য খাজনা হইতে। ইংরেজেরা কর দিতে ডরায় না। খাঁটি নিক্তির ওজনে হিসাব চাপাইলে দেখা যায় যে,

এইরূপ খাজনা হইতে আদায়ের পরিমাণ শতকরা ৩৬ অংশ। অবশিষ্ট ৬৪ অংশ আসিয়াছে কর্জ্জ হইতে। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—নীতি অনুসারে জীবন চালাইলে লোকেরা নিন্দনীয় হয় কিনা জানি না। কিন্তু "ঋণং কৃত্বা লড়াই চালাও" হইতেছে দুনিয়ার সনাতন দস্তুর। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই ছয় বৎসরে ৭৩৬॥০ কোটি পাউণ্ড কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিল।"*

সামরিক ব্যয় সোজাসুজিভাবে দেশের ধনসম্পদ্ বাড়ায় না, কিন্তু দেশকে নিরাপদ রাখিয়া গৌণভাবে ধনোৎপাদনে সহায়তা করে। এই গৌণ ফললাভের জন্য অপরিমিত ব্যয় যুক্তিসঙ্গত কি? দেশের সম্পদের অধিকাংশই যদি যায় সামরিক ব্যয়ে তাহা হইলে ধনবৃদ্ধি হইবে কম। শান্তির সময়েও দেশে-দেশে সমর-সজ্জার জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, এবং যে জনবল উহাতে আবদ্ধ থাকে তাহার কতক অংশও যদি মুক্ত করিয়া ধনবল ও জনশক্তি-বৃদ্ধির জন্য লাগানো যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধি আরও অনেক বাড়িতে পারে। জাতিসঙ্ঘের (লীগ অব্ নেশান্স্) যুদ্ধবিরতির চেষ্টা যদি কখনও সফল হয়, তাহা হইলে প্রতি দেশের সামরিক ব্যয় কমিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধবিরতি তখনই সম্ভব, যখন বিশ্বসভ্যতা বিশ্বপ্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে।

## শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যয়

সমাজে প্রতিনিয়তই যদি একজন আর একজনের ধনসম্পত্তি লুট করে, সুনাম ও সম্ভ্রমের হানি করে, ব্যক্তিগত অধিকারে বাধা দেয়, এবং রুচি ও আদর্শ অনুযায়ী চলার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটায়, তাহা হইলে

* "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র"—প্রথমভাগ (১৯৩০), শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত।

সকলেরই জীবনে বিকাশলাভে অন্তরায় ঘটে। দেশের ভিতরে লোকে যদি নিজ-নিজ আদর্শ অনুযায়ী চলিয়া জীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিবার অধিকার না পায়, তাহা হইলে সমাজের ভিতরে বিশৃঙ্খলা আসে, এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি অসম্ভব হয়। সেইজন্য বাহিরের শত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা যেমন রাষ্ট্রের প্রধান কাজ, তেমনি সমাজের ভিতরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাও উহার একটি মুখ্য কর্ত্তব্য। সকল সভ্য দেশেই রাষ্ট্র এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মানুষ এখনো সভ্যতার যে স্তরে রহিয়াছে, তাহাতে পরস্পরের পক্ষে পরস্পরের অধিকারকে আক্রমণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় নাই। তাই প্রতি দেশে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার খরচ মোট ব্যয়ের তুলনায় নিতান্ত কম নয়, এবং উহা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই কর্ত্তব্য করিবার জন্য প্রতি দেশেই রাষ্ট্রকে তিনটী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লইতে হয়, যথা (১) পুলিশ, (২) বিচার ও (৩) কারাগার। দেশের ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তির অধিকার নির্দ্দেশ করে, অথবা সীমারেখা টানিয়া সংযত করিয়া দেয়। সমাজে পরস্পরের অধিকারে যদি হস্তক্ষেপ না হইত, তাহা হইলে মানুষের জীবন আরও সুখের হইত, সামাজিক উন্নতি আরও দ্রুতগতিতে চলিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায়, প্রতি দেশেই এমন কতকগুলি নরনারী থাকে—যাহারা হয় ক্ষমতাগর্ব্বে, নয়তো লোভ বা হিংসার বশে, অথবা সামাজিক অনৈক্য সহ্য করিতে না পারিয়া কিংবা অন্য কোন কারণে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজেদের এবং অপরের জীবনের প্রগতিতে বাধা দেয় ও সমাজে বিশৃঙ্খলা আনে। পুলিশের কাজ হইল এইসব বে-আইনী কাজ যাহাতে সমাজে না হইতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা, এবং এরূপ কাজ হইলে তদন্ত করিয়া আইন-ভঙ্গকারীকে বিচারার্থ আনয়ন

করা। বিচারবিভাগের কর্ত্তব্য, আইনভঙ্গ হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দোষীকে শাস্তি প্রদান করা। শাস্তির বিধান করিয়া দোষীর উপর প্রতিশোধ লওয়া সমাজের লক্ষ্য নহে। শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য আইন-ভঙ্গকারীকে ভবিষ্যতে বে-আইনী কাজ হইতে নিবৃত্ত করা, এবং আইন অমান্য করিতে উন্মুখ ব্যক্তিকে নিশ্চেষ্ট করিয়া দেওয়া।

শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারাগারে আবদ্ধ রাখাই নিয়ম। প্রাচীন ইয়োরোপে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইত, নয়তো ক্রতদাস করিয়া রাখা হইত। কাজেই কারাগারের ব্যয় লইয়া তখনকার রাষ্ট্রের মাথা ঘামাইতে হয় নাই। বর্ত্তমান যুগের ব্যবস্থার তুলনায় মধ্যযুগের কারাগার-ব্যবস্থাও অত্যন্ত নিম্ন স্তরের মনে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে ইয়োরোপীয় কারাগারের সংস্কার আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে। বর্ত্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্র ইয়োরোপীয় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এখন কারাগারের ব্যবস্থা যেমন-তেমন করিলে চলে না। কয়েদীর স্বাস্থ্য ও কর্ম্মক্ষমতা অটুট রাখিয়া তাহার সদ্‌বুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলিতে হয়। সে মুক্ত হইলে যাহাতে সমাজের অনুমোদিত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে সেরূপ শিক্ষাও তাহাকে দিতে হয়।

যে-কোনো দেশে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা'র খাতে খরচের পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানতঃ সমাজের জনবল, নরনারীর নৈতিক জীবন, পৌর আদর্শ, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, অধিবাসীর সংস্থান ও সমাজের গড়নের উপর। যে দেশ শিল্প-প্রধান, যে স্থানের অধিকাংশ নরনারী অসৎ, নৈতিক জীবনে অনুন্নত, পৌর কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিমুখ, সেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার খাতে ব্যয় স্বভাবতই বেশী হইবে। আর যে সমাজের অধিকাংশ লোক এইসকল দোষ হইতে মুক্ত সেই সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা কম। সুতরাং ব্যয়ও অল্প। এইসব

কারণ ব্যতীতও কোনো বিশেষ কারণে কোনো দেশে এই খাতে ব্যয় বাড়িতে বা কমিতে পারে। কাজেই বিভিন্ন দেশের 'শান্তি ও শৃঙ্খলা, রক্ষার ব্যয়ের তুলনামূলক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ঐসব দেশের পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে খাঁটি তথ্য জানা আবশ্যক। শুধু মাথাপিছু ও প্রতি বর্গ মাইল হিসাবে খরচের তুলনা করিয়া দেখিলে অসম্পূর্ণ জ্ঞানই লাভ হইবে।

## ভারতের ব্যয়

ভারতবর্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয় কোন্ বৎসরে কত হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয়

ভারতবর্ষ

| | আইন ও বিচার ব্যয় | পুলিশ | মোট ব্যয় |
|---|---|---|---|
| ১৮৬১-৬২ | ১,৮৯,৯৯,০০০৲ | ২,১৪,৯১,০০০৲ | ৪,০৪,৯০,০০০৲ |
| ১৮৭১-৭২ | ২,৯১,৪৮,০০০৲ | ২,২২,০৯,০০০৲ | ৫,১৩,৫৭,০০০৲ |
| ১৮৮১-৮২ | ৩,২৩,২৮,০০০৲ | ২,৫৫,৩৯,০০০৲ | ৫,৭৮,৬৭,০০০৲ |
| ১৮৯১-৯২ | ৩,৭৩,৯৭,০০০৲ | ৩,৮৬,৮৬,০০০৲ | ৭,৬০,৮৩,০০০৲ |
| ১৯০১-২ | ৪,৩৯,৩৯,০০০৲ | ৪,০৩,৭০,০০০৲ | ৮,৪৩,০৯,০০০৲ |
| ১৯১১-১২ | ৫,৭৩,৭১০০০৲ | ৬,৯০,৪৫,০০০৲ | ১২,৬৪,১৬,০০০৲ |
| ১৯১৩-১৪ | ৬,১০,৬৬,০০০৲ | ৭,২৯,৭৫,০০০৲ | ১৩,৪০,৪১,০০০৲ |
| ১৯১৪-১৫ | ৬,৪৬,৬২,০০০৲ | ৭,৮৫,৫৫,০০০৲ | ১৪,৩২,১৭,০০০৲ |
| ১৯১৫-১৬ | ৬,৫৯,৪৭,০০০৲ | ৮,০৩,০৪,০০০৲ | ১৪,৬২,৫১,০০০৲ |
| ১৯১৬-১৭ | ৬,৫৯,০২,০০০৲ | ৮,১৩,৬৩,০০০৲ | ১৪,৭২,৬৫,০০০৲ |
| ১৯১৭-১৮ | ৬,৭০,৫২,০০০৲ | ৮,৪২,৫৬,০০০৲ | ১৫,১৩,০৮,০০০৲ |
| ১৯১৮-১৯ | ৭,২৮,৮৪,০০০৲ | ৯,১৬,৪৬,০০০৲ | ১৬,৪৫,৩০,০০০৲ |
| ১৯১৯-২০ | ৭,৯২,৭৬০০০৲ | ১০,২৭,৫২,০০০৲ | ১৮,২০,২৮,০০০৲ |
| ১৯২০-২১ | ৯,২২,২৮,০০০৲ | ১২,০২,৩৯,০০০৲ | ২১,২৪,৬৭,০০০৲ |
| ১৯২১-২২ | ৭,৭৯,৮৯,০০০৲ | ১২,৮৪,০৩,০০০৲ | ২০,৬৩,৯২,০০০৲ |

সব দেশেই সামরিক ব্যয়ের তুলনায় আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার খরচ কম। ভারতবর্ষের মোট ব্যয়ের শতকরা কত অংশ সামরিক খাতে এবং কতটা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার খাতে ব্যয় হইয়াছে তাহা নীচের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে—

| | ১৮৭১-৭২ | ১৮৯১-৯২ | ১৯০১-২ |
|---|---|---|---|
| সামরিক ব্যয় ... | ৩৩.৪% | ২৬.৫% | ২৮.৯% |
| শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয় | ১০.৬% | ৮.৬% | ৯.৪% |
| | ১৯১১-১২ | ১৯১৩-১৪ | ১৯২১-২২ |
| সামরিক ব্যয় ... | ২৬.৫% | ২৫.৬% | ৩০.৬% |
| শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয় | ১০.৭% | ১০.৮% | ৮.৬% |

এই দুই খাতে ব্যয় কি হারে বাড়িয়াছে তাহার আঁচ পাওয়া যাইবে ১৮৭১-৭২ সনের খরচের সহিত ১৯২১-২২ সনের খরচের তুলনা করিলে। ১৮৭১-৭২ সনের ব্যয়কে যদি ১০০ ধরা যায় তাহা হইলে ১৯২১-২২ সনের সামরিক ব্যয় হয় ৪৭৯ এবং ঐ বৎসর শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতের খরচ হয় ৪০২।*

## শাসন বিভাগের ব্যয়

শাসন বিভাগের ব্যয়কে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—

(১) সাধারণ শাসন। ইহার মধ্যে পড়ে শাসনকর্ত্তাদের বেতন ও ভাতা, দপ্তরখানার (সেক্রেটারিয়েটের) ও সিভিল সার্ভিসের (শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের) ব্যয়, ব্যবস্থাপক ও কর্ম্মসভার খরচ।

(২) রাজনৈতিক, যেমন অপর দেশে গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের

* জি ফিণ্ডলে সিরাজ প্রণীত "দি সায়েন্স অব্ পাব্লিক ফিনান্স" গ্রন্থ হইতে গৃহীত। পৃঃ ৬২০-৬২১।

বেতন ও সরঞ্জাম খরচ, করদ ও মিত্র রাজ্যে রেসিডেণ্ট ও পোলিটিক্যাল এজেণ্টদের ব্যয়।

(৩) কর-সংগ্রহ।

এইসব দফায় ভারতবর্ষে কিরকম ব্যয় হয় তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

| | ১৮৬১-৬২ | ১৮৯১-৯২ |
|---|---|---|
| সাধারণ শাসন ব্যয় | ১,৪৮,৪২,০০০৲ | ১,৭৯,১৩,০০০৲ |
| রাজনৈতিক ব্যয় | ২৪,২০,০০০৲ | ৭৬,৭৭,০০০৲ |
| কর-সংগ্রহের ব্যয় | ৪,২৬,২৬,০০০৲ | ৬,৯১,৭০,০০০৲ |
| | ৫,৯৮,৮৮,০০০৲ | ৯,৪৭,৬০,০০০৲ |
| | ১৯১৩-১৪ | ১৯২১-২২ |
| সাধারণ শাসন ব্যয় | ২,৯৭,৫৫,০০০৲ | ১১,০৩,৭০,০০০৲ |
| রাজনৈতিক ব্যয় | ১,৭৩,৮৮,০০০৲ | ২,২৫,৬২,০০০৲ |
| কর-সংগ্রহের ব্যয় | ৯,৭৮,৪৩,০০০৲ | ১২,৭৪,৩৪,০০০৲ |
| | ১৪,৪৯,৮৬,০০০৲ | ২৬,০৩,৬৬,০০০৲ |

ভারতবর্ষে ৬০ বৎসরে শাসন-বিভাগের ব্যয় প্রায় পাঁচগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই জন্য বৃদ্ধি যে কেবল এই ভারতবর্ষে হইয়াছে তাহা নহে, সকল দেশেই শাসন-বিভাগের ব্যয় বাড়িয়াছে। ইহার প্রধান কারণ রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য-বৃদ্ধি। গত ১৫০ বৎসরে সকল দেশেই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া শাসন-ব্যয়ও বাড়িতেছে। শাসনব্যয় শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার চেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়িয়াছে।

## রাষ্ট্রের ঋণ

আয়ের দ্বারা ব্যয় মিটাইতে না পারিলেই ব্যক্তির মত রাষ্ট্রকেও ঋণ করিতে হয়। রাষ্ট্রের ঋণের দরকার হয় অস্থায়ী কোন প্রয়োজনে,

যুদ্ধে, অথবা জনহিতকর কোনো কাজের খরচ বাৎসরিক রাজস্ব হইতে মিটানো না গেলে। ঋণের কতক অংশ দেশের ধন-সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হয়। "সকলজাতিই বর্ত্তমানকালে দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া রেললাইন, খাল, জলসরবরাহের ব্যবস্থা, বন্দর-নির্ম্মাণ, স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে। এই কাজের জন্য যত অর্থ প্রয়োজন হয়, তাহা কোন জাতিই বার্ষিক রাজস্ব হইতে দিতে পারে না। এইজাতীয় ঋণ করাতে জাতির আর্থিক উন্নতি হয় এবং তাহাতে রাজস্ব বৃদ্ধি হয়। সুতরাং এইরূপ ঋণের সুদের ব্যবস্থা করিতে কোনো জাতিরই বেগ পাইতে হয় না। ইহাকে অর্থপ্রসূ (প্রোডাকৃটিভ্) ঋণ বলা যাইতে পারে।" আর যে অংশ সেজন্য ব্যয় হয় না অর্থাৎ বিলাসিতা, যুদ্ধ ইত্যাদিতে ব্যয় হয় তাহাকে অফলপ্রসূ (আন-প্রোডাকৃটিভ) ঋণ বলা হয়।

"হঠাৎ কোনোপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহ, নৈসর্গিক দুর্ঘটনা অথবা দুর্ভিক্ষ ঘটিলে বাৎসরিক রাজস্বের সাহায্যে তাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তখন রাজসরকার হইতে ঋণ গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় থাকেনা। এইজাতীয় ঋণ নিছক খরচ (অর্থাৎ অর্থপ্রসূ নহে)। ইহার সুদ গুনিতে জাতিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে জগতের বহু জাতিকে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এই ব্যয় যে-ভাবে করা হইয়াছে তাহাতে কোনো জাতির কোনো প্রকার আর্থিক উন্নতি হয় নাই। বরং বহু কামান দাগিয়া পরস্পরের বহু ধনসম্পত্তি ধ্বংস করা হয় এবং তজ্জন্য সকল যুদ্ধলিপ্ত জাতিরই ভবিষ্যতে আয় বাড়া দূরের কথা, কমিয়া যায়। জাপানের মহাভূমিকম্পে যা লোকসান হয়, তাহার জন্য জাপানকে যা ঋণ করিতে হয় তাহাও এইরূপ অফলপ্রসূ (আন্‌প্রোডাকৃটিভ)।"*

* প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৮ "বিবিধ প্রসঙ্গ"

অর্থপ্রসূ কার্য্যে যেসব টাকা সরকার ধার করিয়া খরচ করেন তাহার আয় হইতে অফলপ্রসূ দেনা শোধ হয়। ভারতে অর্থপ্রসূ ও অফল-প্রসূ দেনার হিসাব পাওয়া যাইবে নীচের তালিকায়—

| | ১৮৬১-৬২ | ১৮৯১-৯২ |
|---|---|---|
| অর্থপ্রসূ ঋণ ... | ১,৪২,৫১,০০০৲ | ৫,৭৮,৩৬,০০০৲ |
| অফলপ্রসূ ঋণ ... | ৫,১৯,১০,০০০৲ | ৪,৩১,৫২,০০০৲ |
| মোট | ৬,৬১,৬১,০০০৲ | ১০,০৯,৮৮,০০০৲ |
| | ১৯১৩-১৪ | ১৯২১-২২ |
| অর্থপ্রসূ ... | ১২,৯১,২০,০০০৲ | ১৮,৯৫,০৯,০০০৲ |
| অফলপ্রসূ ... | ২,২৭,৩৫,০০০৲ | ১৭,০১,৯৬,০০০৲ |
| | ১৫,১৮,৫৫,০০০৲ | ৩৫,৯৭,০৫,০০০৲ |

গত যুদ্ধের পর হইতে প্রায় সকল দেশেই এই খাতে খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। ইয়োরোপের দেশগুলিতে অফলপ্রসূ ঋণের দায় যে শীঘ্র মিটিবে তাহা মনে হয় না। ভারতেও যুদ্ধের ঠিক আগে মোট ব্যয়ের শতকরা ১·৮ অংশ ছিল অফলপ্রসূ ঋণ আর যুদ্ধের পর উহা বাড়িয়া হইয়াছে ৭·১%। ভারতের অর্থপ্রসূ ঋণের পরিমাণ যুদ্ধের ঠিক আগে ছিল ১০·৪%, পরে হইয়াছে ৭·৯%।

## সমাজ-সেবা

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল দেশেই রাষ্ট্রের গৌণব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। সমাজসেবা অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবীমা, বেকারবীমা, বৃদ্ধদের ভাতা ইত্যাদি বহু দফার ব্যয় আগে ছিল ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের অন্তর্গত, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এইসকলে দাঁড়াইয়াছে গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব। "দেশ-সেবা যে গভর্ণমেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য এই জ্ঞানটা

য়ুরোপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ছিল না। তখনকার দিনে গভর্ণমেণ্টের আর জনসাধারণের এমন কি পাকা মাথাওয়ালা লোকেরাও ভাবিত যে, দেশসেবা হইতেছে নরনারীর ব্যক্তিগত দায়িত্বের আর কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। এমন কি শিক্ষাবিস্তারের জন্য খরচ করাটাও গভর্ণমেণ্ট স্বধর্ম্মের সামিল বলিয়া সমঝিত না।"*

যে বিলাতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার জন্য সরকারী বাজেটে এক পয়সাও ধরা হয় নাই, সেই দেশে আজ দেশ-শাসনে যত খরচ হয় তাহার ডবলেরও বেশী খরচ হয় সমাজ-সেবার জন্য অর্থাৎ দেশের নরনারীর আর্থিক ও আত্মিক পুষ্টিসাধনের জন্য। ভারতের সরকারী গৌণব্যয় ১৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে ছিল শতকরা ২৩৮, যুদ্ধের আগে ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে হয় ৩৯.৭, ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে হয় ২৯.৪। বাংলাদেশেও গভর্ণমেণ্টের গৌণব্যয় ছিল ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৪৬.৬, ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে হয় ৫১.০, ১৯১৯-২০তে হয় শতকরা ৫৩.৫।

প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রের ব্যয়ের হিসাব খতিয়ান করিয়া দেখিলে দেখা যায়, সকল দেশেই রাষ্ট্রের গৌণব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ক্রমশঃ রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপিতেছে। ইহাই বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রীয় যুগধর্ম্ম।

## শিক্ষার খরচ

শিক্ষিত মানে কেবলমাত্র বিদ্বান্ নহে। বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে চরিত্র ও মনের উৎকর্ষকেই শিক্ষা বলে। কাজেই প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি সংযমী, বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান হয়। তাহার কর্ম্মক্ষমতা বাড়ে। সমাজে শিক্ষিত কর্ম্মীর সংখ্যা বেশী থাকিলে জাতীয় সম্পদ্‌ও বৃদ্ধি পায়।

---

* "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" প্রথম ভাগ (১৯৩০)—শ্রীবিনয়কুমার সরকার পৃঃ ২৫১।

শিক্ষার ফলে নরনারী হুজুগ ও কুসংস্কারের হাত হইতে মুক্ত হইয়া জীবনে উন্নত হইতে পারে। শিক্ষাই সমাজে মানসিক বৈষম্য কমাইয়া দেয়। কাজেই শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা-বৃদ্ধি মানব-সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। তাই শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের যে ব্যয় হয় তাহা অপব্যয় নহে, উহা সুফলপ্রসূ।

প্রাচীন য়ুরোপে শিক্ষা ছিল ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান-গুলিতেই শিক্ষাদানের কাজও চলিত। ধর্ম্মশাসকই ছিলেন তখনকার দিনে শিক্ষা-ব্যবস্থারও মালিক। তাহার পরের যুগে ধর্ম্মশাসকদিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া গিয়া সম্রাটগণের প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিল। য়ুরোপের প্রায় সকলদিকেই সম্রাটগণ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের অনেক অংশ নিজেদের হাতের মুঠায় আনিলেন। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্বও ক্রমশঃ সম্রাটদিগের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। বর্ত্তমান জগতে শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব পূর্ব্বতন সম্রাটদিগের দায়িত্বের চেয়েও বেশী। বর্ত্তমান জগতে সকল দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত কয়েকভাগে ভাগ করা যাইতে পারে:—(১) প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, (২) মধ্য বা উচ্চ বিদ্যালয়, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়, এবং (৪) অর্থকরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। সকল নরনারী শিক্ষিত হইলে দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক দুই রকম লাভই হয়। শিক্ষালাভে দেশবাসীর কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়াতে জাতীয় সম্পদ্ বাড়ে স্বরাজের সাফল্যের জন্য জন-সাধারণের থাকা চাই সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং তাহাদের বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি হওয়া চাই তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত। শিক্ষাদ্বারা এই-সব ফললাভ করিতে পারা যায় বলিয়া সকল দেশেই জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, মধ্য শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত হওয়া উচিত নহে। কিন্তু

বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমান জগতে সকল দেশেই এই দুই প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব স্বীকৃত হইতেছে; কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দানের প্রভাব এখনো কমে নাই। 'টেক্‌নিক্যাল্' বিদ্যা শিখিলে দক্ষতা বাড়ে, এবং তাহাতে জাতির আর্থিক সুবিধা হয়। কিন্তু টেক্‌নিক্যাল শিক্ষালয় সহজলভ্য করা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক চেষ্টায় সম্ভবপর নহে বলিয়া, সকল দেশেই এই বিদ্যার জন্য ব্যবস্থা করাও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, ছবিঘর ইত্যাদি জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির সাহায্য করে এবং উহারা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহায়ক বলিয়া ঐগুলির খরচও গভর্ণমেণ্ট বহন করেন। বর্ত্তমান যুগে সকল দেশেই শিক্ষাব্যয় যে কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট বহন করেন তাহা নহে, ধনীর দান গভর্ণমেণ্টের ভার অনেকটা লাঘব করে। দেশরক্ষা, যুদ্ধ ইত্যাদির জন্য প্রত্যেক গভর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ ব্যয় করেন তাহার তুলনায় শিক্ষাব্যয় অত্যন্ত কম। অথচ শিক্ষাব্যয় সুফলপ্রসূ।

বর্ত্তমান দুনিয়ার প্রত্যেক দেশেই যে শিক্ষার ব্যবস্থা একই প্রকার তাহা নহে। বর্ত্তমান য়ুরোপ ও আমেরিকার ঝোঁক হইতেছে সমাজের প্রত্যেকটী নরনারীকে শিক্ষিত করিয়া তোলার দিকে। তজ্জন্য-য়ুরোপ আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক দেশেই বালকবালিকাদিগের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও কোথাও কোথাও অবৈতনিক করা হইয়াছে। নানা কারণে স্কুল কলেজে যাইয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে পারে নাই এমন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্যও বর্ত্তমান পশ্চিমা রাষ্ট্রের চেষ্টার অভাব নাই। বর্ত্তমান এশিয়াও য়ুরোপ-আমেরিকার কাছে এ বিষয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশেও নরনারীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য নব-নব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইতেছে।

সমগ্র বৃটিশ ভারতবর্ষে ও বঙ্গদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| বৃটিশ ভারত | সর্ব্বপ্রকার নিম্ন ও উচ্চবিদ্যালয় | |
|---|---|---|
| বৎসর | বিদ্যালয় | ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা |
| ১৯২১-২২ | ২০০,৮৬৪ | ৮,১৮৯,০৪৯ |
| ১৯২৪-২৫ | ১৮৫,৬৪৫ | ৮,৮৫১,৪২০ |
| ১৯২৬-২৭ | ১৯৪,০০১ | ৯,৫২০,০০০ |
| বৃটিশ শসিত বঙ্গদেশ | | |
| ১৯২১-২২ | ৫২,৩০১ | ১,৮১৯,৫০৯ |
| ১৯২৬-২৭ | ৫৩,৮২৬ | ২,০৯৩,০৮৭ |

১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইত—

| | | |
|---|---|---|
| বৃটিশ ভারতে | মোট জনসংখ্যার | ৩·৮% |
| বৃটিশ বঙ্গদেশ | ,, | ৮·৪% |
| ফ্রান্সে | ,, | ৯·৬% |
| জাপানে | ,, | ১৬·৭% |
| ইতালিতে | ,, | ৯·৬৭% |
| জার্ম্মাণিতে | ,, | ১৪·১% |
| সোভিয়েট রুশিয়ায় | ,, | ৫·৩% |
| আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে | ,, | ১৯·৩% |
| গ্রেট বৃটেনে | ,, | ১৪·৩% |

## কলেজ

| বৃটিশ ভারত | | |
|---|---|---|
| বৎসর | কলেজের সংখ্যা | ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা |
| ১৯২১-২২ | ১৬৭ | ৪৫,৯৩৩ |
| ১৯২৪-২৫ | ১৮৫ | ৬৩,৫৪৩ |

| বৎসর | কলেজের সংখ্যা | ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১৯২৬-২৭ | ৩০০ | ৭০,০০০ |
| বৃটিশ বঙ্গদেশ | | |
| ১৯২১-২২ | ৩৬ | ১৬,৯৪২ |
| ১৯২৬-২৭ | ৪২ | ২৪,৪২৩ |

১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে কলেজে শিক্ষা পাইয়াছে—

| | | |
|---|---|---|
| বৃটিশ ভারতে | মোট জনসংখ্যার | ·০২৮% |
| ,, বঙ্গদেশে | ,, | ·০৫% |
| ফ্রান্সে | ,, | ·৪% |
| জাপানে | ,, | ·৭% |
| ইতালিতে | ,, | ·৩৫% |
| জার্ম্মাণিতে | ,, | ১·১% |
| সোভিয়েট রুশিয়াতে | ,, | ·৫% |
| আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে | ,, | ৩·২% |
| গ্রেটবটেনে | .. | ১·৩% |

১৯২১-২২ হইতে ১৯২৬-২৭ এই সময়ের দুনিয়ায় কোন্ কোন্ দেশে প্রতি ১০,০০০ হাজার লোকের মধ্যে কতজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বৃত্তি-শিক্ষা পাইত তাহার হিসাব নিম্নরূপ—

| | বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রতি দশ হাজারে | বৃত্তিশিক্ষায় প্রতি দশ হাজারে |
|---|---|---|
| বৃটিশ ভারত | ·২৯ | ২·৭ |
| ,, বঙ্গদেশ | ·৩৫ | ৩ |
| ফ্রান্স | ১৩ | × |
| জাপান | ৫·৮ | ১৬০ |

| | বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রতি দশ হাজারে | বৃত্তিশিক্ষায় প্রতি দশ হাজারে |
|---|---|---|
| ইতালি | ৭·৫ | × |
| জার্ম্মাণি | ১১ | ১২০ |
| সোভিয়েট রুশিয়া | ৫ | ৩৮ |
| আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র | ৫৭ | ৬১ |
| গ্রেটবৃটেন | ১২ | ২০০ |

উপরের হিসাবগুলি হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে শিক্ষায় ভারত ও বঙ্গদেশের স্থান বর্ত্তমান জগতে কোথায়।

শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ব্যয় কোন্ দেশে কিরূপ তাহা নিম্নে দেখান হইল।

| | প্রতিবৎসর রাষ্ট্রের মোট ব্যয়ের কত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় | মাথাপিছু শিক্ষার জন্য বাৎসরিক ব্যয় |
|---|---|---|
| বৃটিশ ভারত | × | ॥০ |
| ,, বঙ্গদেশ | ৪·৭% | ।/৬ |
| ফ্রান্স | ৫% | ৫।/৩ |
| জাপান | ৯·৬% | ২।৩ |
| ইতালী | ৭·৬% | ৪৲ |
| জার্ম্মাণি | × | ১৭॥/০ |
| সোভিয়েট রুশিয়া | ৩·৮% | ৬৯ |
| আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র | × | ২৯।৵৪ |
| গ্রেটবৃটেন | ৫·৪% | ১৭।/৪ |

জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষার্থীর অনুপাত অথবা শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ব্যয়, যে মাপকাঠি দিয়াই বিচার করা যাক না কেন, বর্ত্তমান দুনিয়ার

আসরে ভারত বা বঙ্গদেশের স্থান অনেক পশ্চাতে। ভারতে ও বঙ্গদেশে শিক্ষার খাতে রাষ্ট্রের ব্যয় আরও বেশী হওয়া দরকার।*

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিবার চেষ্টাও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকার তুলনায় আমরা এখনো পিছনে পড়িয়া আছি। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা ৩·৩ জন এবং বাংলাদেশের ৩·৭ জন বালকবালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িত; কিন্তু দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ঐ সময়কার শতকরা হার নিম্নরূপ :—

| | | |
|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | ... | ১৯·৮৭% |
| ইংল্যণ্ড | ... | ১৬·৫২% |
| জার্ম্মাণি | ... | ১৬·৩০% |
| ফ্রান্স | ... | ১৩·৯০% |
| জাপান | ... | ১৩·০৭% |
| রুশিয়া | ... | ৩·৭৭% |

১৯১৭-১৮ সন হইতে ১৯২৬-২৭ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে বৃটিশ ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, যথা :—

| | | |
|---|---|---|
| ১৯১৭-১৮ | ... | ৩,১০,৪২,৫১৪৲ |
| ১৯১৮-১৯ | ... | ৩,৫৩,২৭,২৯৪৲ |
| ১৯১৯-২০ | ... | ৪,০৬,২৬,৯৮৫৲ |
| ১৯২০-২১ | ... | ৪,৫৩,৫৩,৬২৭৲ |
| ১৯২১-২২ | ... | ৫,০৯,০৮,১০৭৲ |
| ১৯২২-২৩ | ... | ৫,৩৭,৯২,৭২৫৲ |
| ১৯২৩-২৪ | ... | ৫,৬৫,৪৪,৮৩০৲ |
| ১৯২৪-২৫ | ... | ৫,৯৬,৬৫,২১১৲ |
| ১০২৫-২৬ | ... | ৬,৩৫,৫৮,২৯৮৲ |
| ১৯২৬-২৭ | ... | ৬,৯৫,২১,৬৯৬৲ |

* "কম্পারেটিভ পেডাগজিক্‌স্‌ ইন রেলেশন টু পাব্‌লিক ফিনান্স অ্যাণ্ড ন্যাশন্যাল ওয়েল্‌থ" ( কলিকাতা ১৯২৯ ),—শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মোট জনসংখ্যার উপরে যদি এই খরচটা ভাগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, ভারতবর্ষে ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষার জন্ম মাথাপিছু ব্যয় হইয়াছে ৪, ৫ আনা, অর্থাৎ প্রায় ৬ পেন্স; এবং বাংলাদেশে ঐ সনে মাথাপিছু ব্যয় হইয়াছে ২·৩ আনা অর্থাৎ প্রায় ৩ পেন্স। কিন্তু অন্যত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্ম মাথাপিছু ব্যয় হয় নিম্নরূপ:

| | | |
|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্রে | ... | ১৬ শিলিং |
| অষ্ট্রেলিয়ায় | ... | ১১ শিলিং ৩ পেন্স |
| ইংল্যণ্ড ও ওয়েল্‌সে | ... | ১০ শিলিং |
| স্কট্‌ল্যাণ্ডে | ... | ৯ শিলিং |
| জার্ম্মাণিতে | ... | ৬ শিলিং ১০ পেন্স |
| ফ্রান্সে | ... | ৪ শিলিং ১০ পেন্স |

স্বর্গীয় গোখেল্ মহোদয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তুলনামূলক তথ্যতালিকা মন্থন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কোনো দেশে মোট জনসংখ্যার তুলনায় অন্ততঃ শতকরা ১৫ জন বালকবালিকার (৭ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক) বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করা উচিত। এই মাপকাঠি দ্বারা বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে শিক্ষায় ভারতবর্ষ কত পশ্চাতে।

## ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান পোষণের খরচ

শুধু পার্থিব ভোগবাসনা পূরণ করিয়াই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। মানুষের আধ্যাত্মিক অভাবও আছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি বেশী নির্ভর করে নর বা নারীর ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর, কিন্তু তাই বলিয়া পারিপার্শিক অবস্থা প্রতিকূল হইলে চলে না। আত্মিক পুষ্টিরও আর্থিক ভিত্ হইতেছে শ্রম ও অর্থ। এখন প্রশ্ন এই যে, এই শ্রম ও অর্থব্যয় গভর্ণমেণ্ট্ করিবে অথবা ব্যক্তি নিজে করিবে। বর্ত্তমান জগতে সকল দেশেই যে এক নীতি অনুযায়ী কাজ হইতেছে তাহা

নহে। প্রত্যেক দেশের অতীত অবস্থা এই বিষয়ে উহার বর্ত্তমান নীতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। ইংরেজদিগের উপনিবেশগুলি এবং আয়ার্ল্যাণ্ড আমেরিকার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। কিন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান পুষিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে কিছু-না-কিছু ব্যয় করিতে হয়। কোনোও রাষ্ট্র যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশের ধর্ম্মচর্চ্চা তদারক করে, তাহা হইলে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সাহায্য করাই যুক্তিসঙ্গত। বস্তুতঃ, দুনিয়ায় বেশীর ভাগ রাষ্ট্রই রাজনৈতিক মতলবে জনগণের ধর্ম্মচর্চ্চায় হস্তক্ষেপ করে এবং তজ্জন্য ঐ খাতে কিছু না কিছু ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার খরচটা রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যয়ের সহিত জুড়িয়া দেওয়ারই রেওয়াজ আছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই লোকের মাথায় এই ভাব খেলিতেছে যে, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান পোষণের জন্য রাষ্ট্রের ব্যয় অনাবশ্যক।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান-পোষণের খাতে ব্যয় ইংরেজ রাজত্বের প্রথম হইতেই হইতেছে। এই খরচটা হয় ভারতবর্ষে যে-সকল ইয়োরোপীয় নরনারী, সৈন্য ও কর্ম্মচারী থাকেন তাঁহাদের আত্মিক পুষ্টির জন্য।

এই ব্যয়টা হয় ভারত গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে কোন দায়িত্ব নাই। এই খরচের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদন দরকার হয় না। এই খাতে ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়াছে।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৬১-৬২ | খৃষ্টাব্দে | ব্যয় হইয়াছে | ১৪,৮৯,০০০ | টাকা |
| ১৮৭১-৭২ | ,, | ,, | ১৫,৮০,০০০ | ,, |
| ১৮৮১-৮২ | ,, | ,, | ১৬,২২,০০০ | ,, |
| ১৮৯১ ৯২ | ,, | ,, | ১৬,১৬,০০০ | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৯০১-২ | খৃষ্টাব্দে | ব্যয় হইয়াছে | ১৬,৯১,০০০ | টাকা |
| [illegible] | ,, | ,, | [illegible] | ,, |
| ১৯১৩-১৪ | ,, | ,, | ১৯,১৫,৬৭৭ | ,, |
| ১৯১৪-১৫ | ,, | ,, | ১৯,০৮,২৮৩ | ,, |
| ১৯১৫-১৬ | ,, | ,, | ১৯,৬৫,৬৮৬ | ,, |
| ১৯১৬-১৭ | ,, | ,, | ১৯,২৮,০৫৯ | ,, |
| ১৯১৭-১৮ | ,, | ,, | ১৯,৯০,০৪৩ | ,, |

পরবর্ত্তী দশ বৎসরেও এই খাতে ব্যয় বাড়িয়াছে।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৯১৮-১৯ | খৃষ্টাব্দে | ব্যয় হইয়াছে | ২০,৫১,৮৭৮ | টাকা |
| ১৯১৯-২০ | ,, | ,, | ১৯,১৬,৭০৩ | ,, |
| ১৯২০-২১ | ,, | ,, | ২৫,৩৯,৪৪৮ | ,, |
| ১৯২১-২২ | ,, | ,, | ৩০,৫০,৪৬৭ | ,, |
| ১৯২২-২৩ | ,, | ,, | ২৯,৭২,২৭৫ | ,, |
| ১৯২৩-২৪ | ,, | ,, | ২৯,২৭,৩৪৩ | ,, |
| ১৯২৪-২৫ | ,, | ,, | ৩১,২৯,৫৩০ | ,, |
| ১৯২৫-২৬ | ,, | ,, | ৩১,৭৫,৮৪৯ | ,, |
| ১৯২৬-২৭ | ,, | ,, | ৩২,৪৯,৭৩৬ | ,, |

১৯২১ খৃষ্টাব্দের স্থমারীর হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটিশ ভারতে মোট ২,৪৯২,২৮৪ জন খৃষ্টান নরনারী আছে। মোট ব্যয়টা যদি ইহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে এই বাবদ মাথাপিছু ব্যয় হইয়াছে ১।১০ পাই।

ধর্ম্ম-বিষয়ে উদাসীনতার নীতি অবলম্বিত হইবে বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট যখন ঘোষণা করিয়াছেন এবং দেশের অধিকাংশ নরনারীও যখন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নহে, তখন সম্প্রদায়-বিশেষের আত্মিক পুষ্টির জন্য গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে ব্যয় করা অর্থশাস্ত্রিগণ যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না।

# মানবের স্থূল অভাব*

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল, গবেষক, বঙ্গীয়
ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, রিকার্ডোর অনুবাদক

## শ্রমের প্রসার

একবার ভাবিয়া দেখা যাক্ মানুষের জীবনধারণের জন্য কোন্ কোন্ জিনিষের দরকার হয়। এই সব জিনিষকে গোড়াতেই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি মানুষের পরিশ্রম, যত্ন, আয়াস ও কষ্ট-সাপেক্ষ। কতকগুলি মানুষ বিনা শ্রমে ও বিনা চেষ্টায় পাইয়া থাকে। যেমন বাতাস, সূর্য্যের উত্তাপ, ইত্যাদি। বাতাস বা সূর্য্যের উত্তাপ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এমন কি, এদের অভাবে মানুষের প্রাণবিনাশ পর্য্যন্ত ঘটে। কিন্তু এগুলি প্রকৃতি আমাদিগকে না চাহিতেই দিয়াছে। এদের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা বা পরিশ্রম করিতে হয় না।

সাধারণতঃ যে জিনিষ আমরা বিনা শ্রমে লাভ করি, তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুভূতি আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা সচেতনভাবে বর্ত্তমান থাকে না। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাতাস গ্রহণ করিতে না পারিলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হয় না। অথচ আমরা বাতাস পাইবার জন্য সিকি পয়সার পরিশ্রম বা কষ্টও করি না, এবং মনে হয় যেন তা করিতে প্রস্তুতও নই। অথচ দেশকালপাত্রভেদে যদি বাতাস, সূর্য্যের উত্তাপ, ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, তবে আমরা তাদের জন্য বহু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না।

* "আর্থিক উন্নতি", কার্ত্তিক ১৩৩৮ ( অক্টোবর ১৯৩১ )।

বর্ত্তমান সভ্য সমাজের দিকে তাকাইলে এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে বহু প্রমাণ মিলিবে সন্দেহ নাই। বাতাস আমরা বিনা আয়াসে পাই। কিন্তু কোন কারণে যদি বাতাস কোন স্থানে কমিয়া যায় এবং যদি সেখানে কৃত্রিম উপায়ে বাতাস পাইবার বা সৃষ্টি করিবার পথ থাকে, তবে সেজন্য কোন পরিশ্রমকেই আমরা পরিশ্রম বলিয়া মনে করিব না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। হাতপাখা হইতে বিজলীপাখা পর্য্যন্ত তার সাক্ষ্য দিতেছে। নদীর বা পুষ্করিণীর জল আমরা বিনা আয়াসে অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিতে পারি, ব্যবহার করিতে পারি ও তাতে স্নান করিতে পারি। কিন্তু যেখানে নদী, খাল বা পুষ্করিণী নাই, সেখানে মানুষ কি জল না খাইয়া থাকে? জলের ব্যবহার কম পরিমাণে হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া জল ছাড়া চলে না। সুতরাং মাটিতে নলকূপ বসাইয়াই হোক্ বা কল তৈরী করিয়াই হোক্, জল চাই। এই জল পাইবার জন্য সমস্ত বাধাকে জয় করিতে হয়। কলিকাতায় কুয়া, পুষ্করিণী অত্যন্ত বিরল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক জলের অভাব বোধ করিতেছে না। কারণ কলের জলে অভাব মিটিতেছে।

[ অবান্তর হইলেও একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা দরকার। পরিশ্রম দ্বারা সাধারণতঃ জিনিষের দাম নির্ণীত হয়। অর্থাৎ যে জিনিষ পাইতে বা উৎপাদন করিতে যত বেশী কষ্ট, শ্রম, আয়াস ও যত্ন করিতে হয়, সেই জিনিষের দামও তত বেশী। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, জিনিষের দাম শ্রমের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কথাটা আংশিক সত্য। পূরা সত্য কথাটা এই যে, দাম বাস্তবিক পক্ষে নির্ভর করে পরিশ্রম করিবার ইচ্ছার উপর। কোন্ জিনিষ পাইবার জন্য আমরা কতখানি পরিশ্রম বা কষ্ট স্বীকার করিতে রাজী আছি?—এই প্রশ্নের উত্তরের উপর সেই জিনিষের দাম নির্ভর করে।

হীরক বা বহুমূল্য ধাতু ইত্যাদি আমাদের পক্ষে এমন অপরিহার্য্য নয় যে, সেগুলি না থাকিলে আমাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। বরং অবস্থার বিপাকে পড়িলে আমরা একমুষ্টি অন্নের জন্য বহুমূল্য হীরকখণ্ড বিলাইয়া দিতেও প্রস্তুত থাকিতে পারি। হীরক যোগাড় করিতে খুব যে অসীম পরিশ্রম করিতে হয় তাহাও নয়। বরং বর্ত্তমান জগতে দু'বেলা দু'মুঠা ভাত যোগাড় করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছে। তথাপি হীরক মূল্যবান্ এবং খাদ্যদ্রব্য সকলের চেয়ে শস্তা। এই দাম বা মূল্যের হেতু খুঁজিতে হইবে আমাদের মানসিক দৃষ্টিতে। আমরা মনে মনে কোন কোন জিনিষকে অত্যধিক মর্য্যাদা দিই। সেগুলিকে পাইবার জন্য আমাদের বাসনা এমন প্রবল ও তীক্ষ্ণ যে, তজ্জন্য আমরা অপরিসীম শ্রম করিতে রাজী থাকি। এই জিনিষগুলিই মূল্যবান্ হইয়া দাঁড়ায়।]

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের দরকারী ও ব্যবহৃত জিনিষকে আমরা যে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম, তাদের সীমারেখা এমন কিছু দৃঢ় ও অপরিবর্ত্তনীয় নয়। আজ যা বিনা শ্রমে পাওয়া যাইতেছে, কাল তার জন্য শ্রম করিতে হইতে পারে। সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সীমারেখার অদলবদল হওয়া বিচিত্র নয়। কোন কালেই নিশ্চিতরূপে এমন কথা বলা চলে না যে, অমুক অমুক জিনিষ বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায় ও যাইবে, আর অমুক অমুক জিনিষ পাইতে হইলে পরিশ্রম করিতে হইবে। মোটামুটিভাবে শুধু এই কথা বলা চলে যে, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাব বাড়িতেছে ও অভাবের নানা বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে; এইসব অভাব পূরণের জন্য মানুষের শ্রমের পরিমাণ ও প্রকার বাড়িয়াছে। আদিম মানব সমাজের চেয়ে এখনকার মানব সমাজ অনেক বেশী পরিশ্রম-

লব্ধ জিনিষের উপর নির্ভর করে, তাতে সন্দেহ আছে কি? বস্তুতঃ, বিনা আয়াসে ও পরিশ্রমে লব্ধ জিনিষের পরিমাণ হাজার হাজার বছরে যতখানি বাড়িয়াছে, পরিশ্রম-লব্ধ জিনিষের পরিমাণ তার বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

## জীবনধারণের ত্রিধারা

মানুষের যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম তিনটি ধারায় বা স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। জীবন-ধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষ যে তিনটি উপাদানকে অত্যাবশ্যক ও অপরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করে, তা সংক্ষেপে এই: (১) খাদ্য, (২) বস্ত্র, (৩) আশ্রয়-স্থান।

এই ত্রিধারার ভিতর দিয়া মানুষের সহিত পৃথিবীর অন্য সকল প্রাণীর বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে। তিন প্রকার অভাবই অত্যন্ত স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং পার্থিব। অথচ এই স্থূলতা অবলম্বন করিয়াই মনুষ্য-সমাজের বিশিষ্ট রূপ ও মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রয়োজনীয়তার দিক্ হইতে পশুর ও মানুষের পক্ষে খাদ্য সমান মূল্যবান্, অন্বেষণের দিক্ হইতে নহে। প্রত্যেক পশু ও পাখীর খাদ্য চাই, মানুষেরও চাই। ক্ষুৎপ্রবৃত্তি মানুষের ও পশুর মধ্যে সমান প্রবল ও সমানভাবে বর্ত্তমান আছে। মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনের অধিকাংশ সময় খাদ্য-অন্বেষণে যায়, কিন্তু সভ্য মানুষের তা যায় না। প্রতিদিন প্রত্যেক ইতর প্রাণীকে তার খাদ্যের জন্য পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। হয়ত অসভ্য মানুষ এ বিষয়ে ইতর প্রাণীর মত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রত্যেক সভ্য মানুষের ক্ষুৎপিপাসায় সমান কাতর বা চঞ্চল হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানা স্থানে এমন ঢের মানুষ ছড়াইয়া আছে, যাদের ক্ষুৎপিপাসা দূর করিবার

উপকরণ সর্ব্বদা হাতের কাছে রহিয়াছে। এরা নিজেদের অথবা পূর্ব্ব-পুরুষদের সঞ্চয়ের ফলে এমন ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে যে ক্ষুৎ-পিপাসা-নিবৃত্তির কথা এদের একদিনও ভাবিতে হয় না। বলা বাহুল্য, এরূপ লোকের সংখ্যা বেশী নয়। ক্ষুৎপিপাসায় অস্থির মানবের সংখ্যাই অনেক অধিক।

কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর মানুষও বর্ত্তমান কালে তার সমস্ত শক্তি, সময় ও পরিশ্রম আহার-অন্বেষণে ব্যয় করে না। অনেক লোক দিনের অধিকাংশ সময় উপজীবিকার সন্ধানে কাটায় বটে, তবু এমন সুস্থ, সবল, সভ্য মানুষ নাই, যার অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় নাই। মনুষ্য ভিন্ন ইতর প্রাণীর দৃষ্টি খাদ্যকে ছাড়াইয়া যায় না। মানুষের দৃষ্টি একদিকে যেমন অতীতের মধ্যে নিহিত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত, অন্যদিকে তেমনি বর্ত্তমানকে সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয় করিয়া তুলিবার আগ্রহে পূর্ণ। এইজন্য হাজার হাজার বছর ধরিয়া পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের আহার্য্য দ্রব্য ও আহার-প্রণালী প্রায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, কিন্তু যুগে যুগে মানুষ নব-নব খাদ্যদ্রব্য উদ্ভাবন করিয়াছে, তা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছে, খাইবার প্রণালীকেও বহুভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে।

মানবের বৃত্তিসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, সর্ব্বাপেক্ষা পার্থিব হইল ক্ষুৎপিপাসা। এখানে মানুষ অন্য সব ইতর প্রাণীর সহিত একাসনে অধিষ্ঠিত, কিন্তু এখানেও তার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা আকার পাইয়াছে।

আশ্রয়স্থান মানুষ ও পশুর পক্ষে সমান দরকার। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। রৌদ্র-বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যেমন দরকার, শত্রুর হাত হইতে নিরাপদে আপনার উপজীবিকা ভোগ করিবার উপায় করাও তেমনি দরকার। সেইজন্য সকল প্রাণীর পক্ষেই আশ্রয় আবশ্যক।

কিন্তু এখানেও মানুষে পশুতে মিল যতটা অমিল তার চেয়ে ঢের বেশী। সিংহের বিবর হাজার হাজার বৎসরে কতখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? পাখীর নীড় বাঁধিবার প্রণালী কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে? ইতর প্রাণীর আশ্রয়স্থান রচনার নৈপুণ্যে চমৎকৃত হইবার অনেক-কিছু আছে, তা যথাযথভাবে আয়ত্ত করিবার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করিতেছি না। তথাপি মানুষের কুটির-নির্ম্মাণে যে মনন-শক্তির, যে বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায়, ইতর প্রাণীর রচনা-নৈপুণ্যে তার সম্ভাবনা কোথায়? মানুষের ঊর্দ্ধদৃষ্টি অন্য কোন প্রাণীতে দেখা যাইবে না।

খাদ্য ও আশ্রয়স্থান সংগ্রহের ব্যাপারে মানুষ পশু থাকিয়াও পশুকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, আপনার পশুত্বকে জয় করিয়া মনুষ্যত্বের পতাকা উড়াইয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের ব্যাপারে মানুষের সহিত অন্য কোন প্রাণীর মিল নাই। অন্যান্য প্রাণীর শরীর আচ্ছাদনের প্রয়োজন আছে কি নাই, সে কথা এখানে বিবেচ্য নয়। এখানে এই কথা বিবেচ্য যে, খাদ্য ও আশ্রয় ব্যতীত বস্ত্রও মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ একদিনে কাপড় পরিতে শিখে নাই নিশ্চয়। কতকালে মানুষ কাপড় পরিতে শিখিয়াছে এবং ধাপে-ধাপে গাছের বাকল হইতে সূতা বা রেশমের কাপড়ে অগ্রসর হইয়াছে, তা এখানে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যুগের পর যুগ মানুষ যে মনন-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে তা স্মরণ-যোগ্য।

## স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্ম

মানুষের জীবন-ধারণের জন্য সর্ব্বাগ্রে দরকার খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়। এই তিনটি অভাব মানুষের আদিম অভাব ও অত্যন্ত স্থূল। মানুষ

যদি তার জাগ্রত অবস্থার সমস্ত সময়টা, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, এই তিনের পশ্চাতে অতিবাহিত করিত, তবু তার সহিত সৃষ্টির অন্য সমস্ত প্রাণীর যথেষ্ট পার্থক্য থাকিয়া যাইত। কারণ মানুষ বস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা।

পশুপাখী সারাটা দিন কেমন করিয়া কাটায়, তা আমরা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? মানুষের মধ্যে বহু পরিমাণে আলস্যপরায়ণতা দেখা যাইবে, কিন্তু তাবৎ ইতর প্রাণী প্রায় অনলস জীবন যাপন করে বলা যাইতে পারে। তারা যতক্ষণ সুস্থ থাকে ততক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় অনবরত খাটে। তাদের এই কাজের প্রেরণা আপনা হইতে আসে, কারও শিক্ষা বা পরিচালনা দরকার হয় না। অধিকাংশ মানুষ আপনা হইতে কাজে প্রবৃত্ত হইতে চায় না, অথবা প্রবৃত্ত হইলেও প্রত্যেক মুহূর্ত্তের জন্য এরূপভাবে খাটে না। সোজা কথায় মানুষের চেয়ে ইতর প্রাণীরা অনেক বেশী খাটে।

তবু একথা সহজেই বুঝা যাইবে যে, মানুষের পরিশ্রমের ফলের সহিত ইতর প্রাণীর পরিশ্রমের ফলের আকাশ-পাতাল তফাৎ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ইতর প্রাণী মাত্রেই তার সকল পরিশ্রম খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য ব্যয় করে। মানুষ তদুপরি বস্ত্রের জন্য সময় ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট অবসর ভোগ করে। নিজ অন্নবস্ত্রের ধান্দায় মানুষকে যত না কেন অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিতে হোক্, দারিদ্র্যের পীড়নে মানুষ যত না নিষ্পেষিত হোক্, এমন সুস্থ ও সবল মানুষ কম, যাদের হাতে অল্প-বিস্তর সময় না থাকে। দ্বিতীয়তঃ, পশুপাখী যে অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য শ্রম করে, সে অন্ন ও আশ্রয়ের পরিবর্ত্তন লক্ষ লক্ষ বৎসরেও সামান্য মাত্র হইয়াছে। আর মানুষের বেলায় সে দিক্ দিয়া কত না পরিবর্ত্তন, রুচির উত্থান-পতন লক্ষিত হইবে।

যদি পশুপাখী মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারিত, তবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে এইরূপে নালিশ করিত, "প্রকৃতি, :তুমি বড় কৃপণ। নিষ্ঠুরও

বট। আমরা প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যা পাই, অনেক মানুষ অলস জীবন যাপন করিয়া তার চেয়ে ঢের বেশী পায়। আমরা দিনরাত খাটিতে পারি, তাই আমাদের শাস্তি দিয়াছ। ওরা অলস, তাই ওরা জিতিয়া গিয়াছে। আমরা স্থাবরত্ব লাভ করিয়াছি, আর ওরা দিনে দিনে উন্নত হইয়াছে।"

আমি এমন কথা বলিতেছি না, পশুপাখীর জীবনে কোন সরসতা বা কোন চাঞ্চল্য নাই। আহার-অন্বেষণে ও আশ্রয়-নির্ম্মাণে ইতর জীবকেও তার বুদ্ধি খাটাইতে হয়। উভয় ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। এদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অসংখ্য সম্ভাবনা। পদে পদে নিজেদের ও বংশধরদের রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করিয়া চলিতে হয়, কখনো বা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয়। এই শত্রুর সংখ্যা স্বজাতীয়ের মধ্যেও কম নয়, অন্য জাতীয়ের মধ্যে ত কথাই নাই। গোটা জীবনের সকল কথা স্মরণ করিয়া বলা চলে কি যে, পশুপাখীর জীবন একঘেয়ে, তাতে কোন বৈচিত্র্য নাই, তা কলের মত রসহীন ও প্রাণহীন? বোধ হয় বলা চলে না।

পশুপাখীর জীবন-যাত্রা-প্রণালীর মধ্যেও বুঝিবার মত অনেক বস্তু আছে। তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে সকল কথা আজও ধরা পড়ে নাই। তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন লইয়া মাথা ঘামাইবার জন্য এখনও অনেক বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তথাপি একথা সত্য, পশুপাখীর মনন-শক্তি সমস্তটাই খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে, অন্য দিকে চালিত হইবার জন্য তার কিছু অবশিষ্ট থাকে নাই। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ঐ দুই স্থূল অভাবের চারিদিকেই প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তার ঊর্দ্ধে উঠিবার অবকাশ পায় নাই। এই স্থূলের ভিতর দিয়া তারা কোন

সূক্ষ্মতর ও উচ্চতর লোকের সন্ধান পায় নাই। কিন্তু মানুষ তা পাইয়াছে। মানব সমাজ এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থূল অভাবগুলিকে অস্বীকার করিতে পারে না। অন্ততঃ ইহলোকে পারে না। এগুলিকে স্বীকার ও ভিত্তি করিয়া তাকে সভ্যতা গড়িতে হইয়াছে। তথাপি তার সমগ্র মনন-শক্তি এদের জন্য ব্যয়িত হয় নাই। এই স্থূলতার ভিতর দিয়া সে একটা সূক্ষ্মতার সন্ধান পাইয়াছে।

তার কারণ খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় মানুষের কাম্য হইলেও উদ্দেশ্য নহে। মানুষ গোড়া হইতে এগুলিকে উপায় মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। পশুপাখীর পক্ষে এগুলি উদ্দেশ্যও বটে। মনে হয় যেন সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত তাদের এই উদ্দেশ্য স্থির হইয়া রহিয়াছে। সেজন্য তাদের অতিরিক্ত বুদ্ধি-খরচের দরকার হয় নাই। কিন্তু মানুষের বেলায় এগুলি উপায়মাত্রে পরিণত হইয়াছে। কিসের উপায়? মানুষ জানে এগুলি উপায় মাত্র, কিন্তু কিসের উপায় তা আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে কি? বোধ হয় পারে নাই। কখনও এটাকে উপায় মনে করিয়াছে, কখনও ওটাকে উপায় মানিয়া লইয়া প্রতিনিয়ত কত না পরীক্ষা করিয়াছে। আর উপায় নির্দ্ধারণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা দ্বারা খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় স্থানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সম্ভব হইয়াছে। এই স্থূল অভাবগুলি মানুষের উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে নিশ্চয়; কিন্তু সর্ব্বোপরি যুগে-যুগে উদ্দেশ্যের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন খাদ্যে, বস্ত্রে ও আশ্রয়-স্থানে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, সে কথাও মনে রাখা দরকার।

## বিপ্লবের ইতিহাস সন্ধান

সকল পশু বা পাখীর খাদ্য বা বাসস্থান একপ্রকার নহে। কেহ আমিষাশী, কেহ নিরামিষাশী। প্রত্যেকের আবার নানা প্রকার

স্তরভেদ রহিয়াছে। গরু ঘোড়ার আশ্রয়স্থান যে প্রকার, সিংহ বাঘের তদ্রূপ নয়, পক্ষীকুলের আবার সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তথাপি এ কথা বলা চলে যে, একজাতীয় পশুপাখীর ভিতর আহার ও বাসস্থান নির্ব্বাচন বা নির্ম্মাণে প্রায় পার্থক্য থাকে না এবং বিভিন্ন জাতীয় পশুপাখীও স্ব স্ব পথ পরিত্যাগ করে না।

কিন্তু মানুষের বেলা একথা সত্য নয়। আদিম মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান বিষয়ে যত্নসহকারে পার্থক্য-রেখা মানিয়া চলা হইত কি না তার ইতিহাস কেহ লেখে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সভ্য মানবসমাজে বিভিন্ন জাতির ইচ্ছাগত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় নির্ব্বাচন ও নির্ম্মাণে প্রত্যেকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। প্রতি ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তার নিজের খুসীমত এইসব স্থূল অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিতে পারে। যদি সুযোগ বা সুবিধা সত্ত্বেও সে তা না করে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট আইনকানুন মানিয়া চলে ত তা পরাধীনতার জন্য নয়, ইচ্ছা করিয়াই। এই পরাধীনতা ও স্বাধীনতার দ্বারাই আদিম সমাজের সহিত বর্ত্তমান সমাজের পার্থক্য বুঝা যাইবে। অসভ্য মানুষের খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, থাকা-চলা সমস্তই উপর হইতে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন বিষয়ে কোন শাসন না মানার অর্থ হয় কর্ত্তার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা। কেহ তা করিলে, তার সহজে নিষ্কৃতি নাই, তাকে দণ্ড বহন করিতে হইবে। অর্থাৎ সেখানে ব্যক্তি বড় নয়, ব্যক্তির চেয়ে আচার বা প্রথা বড়।

কিন্তু মানব সমাজ যুগে যুগে এ কঠিন নাগপাশ ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। পুরাতন নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে বলিয়াই নূতন নিয়ম গড়িতে ও দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়-স্থানের যথোচিত ইতিহাস আজও রচিত হয়

নাই, ভাল করিয়া তার সন্ধান পর্য্যন্ত হয় নাই। এই অভাব অত্যন্ত স্থূল ও পার্থিব বলিয়া ঐতিহাসিকের পক্ষেও যেন এদের লইয়া কোন প্রকার গবেষণা করা লজ্জার বিষয়!

বস্তুতঃ মনুষ্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়-স্থান—প্রত্যেকটির বিস্তৃত ইতিহাস বৈজ্ঞানিকভাবে বিবৃত করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করা হয়। কেন করা হয়? কোন জাতি আজ যে খাদ্য ব্যবহার করিতেছে, কেন করিতেছে? এই খাদ্য কিরূপভাবে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে? কোন্ কোন্ কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? পরিবর্ত্তনের ফল কোন্ সময়ে কিরূপ হইয়াছে? খাদ্যের সহিত জাতীয় স্বাস্থ্যের সম্পর্ক কি? জলবায়ু, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন, দেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংস্থান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ কতখানি হইয়াছে? খাদ্যই বা ঐগুলিকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে? কোন্ জাতির মধ্যে খাদ্যবিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কতখানি পার্থক্য এবং সেই পার্থক্যের কারণ কি? জাতির বা ব্যক্তির কতখানি সময় খাদ্য-সংগ্রহে যায় ও সময়-সংক্ষেপের কোন্ প্রণালী কোন্ জাতি অবলম্বন করিয়াছে? কারা খাদ্য উৎপাদন করে? বণ্টন-প্রণালী কি?

কোন্ জাতির মধ্যে কিরূপ বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে? ভিন্ন-ভিন্ন জাতির মধ্যে বস্ত্র-ব্যবহারের বিকাশ কিরূপ ভাবে ঘটিয়াছে? বিভিন্ন জাতির ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বস্ত্র ব্যবহারে কিরূপ পার্থক্য রহিয়াছে এবং কেন এই পার্থক্য? বস্ত্র-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন কেন ঘটিয়াছে? বস্ত্রনির্ম্মাণ জলবায়ু, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন, দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার

উপর কখন কতখানি নির্ভর করিয়াছে বা করে নাই? বস্ত্রের ব্যবহার দ্বারাই বা সেগুলি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে? জাতির বা ব্যক্তির কতখানি সময় ও পরিশ্রম বস্ত্রনির্ম্মাণে বা বস্ত্রসংগ্রহে ব্যয়িত হয়? বস্ত্রের ব্যাপারে কোন্ দেশকে পরদেশের উপর কতখানি নির্ভর করিতে হয়? কারা কি প্রকারে বস্ত্র উৎপাদন করে? উৎপাদকগণ পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় কি না? বস্ত্র-বণ্টন কিরূপে হয়?

কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে আশ্রয়স্থান নির্ম্মিত হয়? বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণে কোন্ নির্দ্দিষ্ট রীতি কোন্ কোন্ জাতি অবলম্বন করিতেছে বা করিতেছে না? কেন করিতেছে বা করিতেছে না? কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান প্রণালীতে আসিয়া পৌছিয়াছে? আশ্রয়-নির্ম্মাণে কোন্ কোন্ লোকের কিরূপ সাহায্য দরকার হয়? দেশে দেশে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বা এক দেশের মধ্যেই যে পার্থক্য রহিয়াছে, তা কতদিনে হইয়াছে? কেন হইয়াছে? আশ্রয় নির্ম্মাণের মাল-মশলায় যুগে যুগে ও দেশে দেশে কিরূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে? কেন দিয়াছে? জলবায়ু, প্রাকৃতিক আবেষ্টন, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে বা বিভিন্ন সময়ে আশ্রয়-রচনার পার্থক্য কতখানি দায়ী? আশ্রয়-রচনাই বা ঐ সবকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে? কারা আশ্রয় রচনা করে? ইত্যাদি। ইত্যাদি।

উপরে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন এলোমেলোভাবে করা হইল। কিন্তু যে কোনটার উত্তর দিতে গেলেই দেখা যাইবে, খাদ্যে, বস্ত্রে ও আশ্রয়স্থানে মনুষ্যসমাজে কিরূপ বিপ্লবের পর বিপ্লব দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষ এই স্থূল অভাবগুলিকে চিরদিন উপায় বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত। সেইজন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক চিন্তাপূর্ব্বক তাকে এই উপায় সর্ব্বদা বদ্‌লাইতে

হইয়াছে, আবার না ভাবিয়াও বদ্‌লাইতে হইয়াছে। এই বিপ্লবের ইতিহাস মানব-সমাজের এক গৌরবময় ইতিহাস। পুনঃ পুনঃ এই বিপ্লব দ্বারা মানুষ প্রমাণ করিয়াছে যে, সে পশুদের অন্তর্গত হইয়াও পশুলোক ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও তাদের চিন্তা অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষ। তথাপি এগুলি তুচ্ছ নয়। এদের সব চেয়ে ভাল করিয়া পাইবার জন্য অথবা আমাদের সব চেয়ে স্থূল অভাব-গুলি মিটাইবার দিকে আমাদের কম মনোযোগ দিলে অর্থাৎ সেগুলির উন্নতি-সাধনের চেষ্টা না করিলে আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বাধা পায়। এই স্থূল অভাবগুলি যত সহজে ও যত ভাল করিয়া মিটিবে ততই আমাদের আত্মিক উন্নতির অবকাশ বাড়িবে।

## আত্মিক বনাম শারীরিক উন্নতি

শরীরের রক্ষা ও পোষণের জন্য খাদ্য চাই। বস্ত্র সেই শরীরকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করে। আশ্রয়স্থান গড়িয়া মানুষ পরিবার পরিজনকে লইয়া প্রকৃতির সকল প্রকার অত্যাচার হইতে নিজেকে অনেকটা রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় মানুষের ভৌতিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা অথবা বৃদ্ধি করে। এগুলি শারীরিক উন্নতির সহায়ক।

কিন্তু এই স্থূল অভাবগুলি মিটাইবার জন্য কতখানি মনোযোগ বা সময় ও পরিশ্রম দেওয়া যাইতে পারে? শারীরিক উন্নতি দরকার। কিন্তু সেই শারীরিক উন্নতির জন্যই কি আমাদের সমস্ত যত্ন, চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করিতে হইবে? পশুপাখী হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া তা করিয়া আসিয়াছে। ফলে হাজার হাজার বৎসরে তাদের সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু মানুষ তা করে নাই। ফলে মানুষের আত্মিক উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই দুই প্রকার উন্নতির জন্য নিযুক্ত সময়কে কিভাবে ভাগ করা চলিবে? অধিকাংশ সময় এই তিনটি স্থূল অভাব মিটাইবার জন্য ব্যয় করা হইবে, না আত্মিক উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে?

আত্মিক উন্নতির মোহ মানবজাতির অধিকাংশের মধ্যে এত প্রবল যে, ধর্ম্মব্যবস্থার মধ্যে শারীরিক উন্নতির কোন স্থান নাই, কিন্তু আত্মিক উন্নতি সবখানি অথবা অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে। আত্মবাদী বলেন, শরীর নশ্বর, অতএব আমাদের স্থূল ও পার্থিব অভাবগুলির দিকে বেশী দৃষ্টি দিলে, সেগুলি কোন কালে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে ত পারা যাইবেই না, অধিকন্তু আত্মার শক্তি খর্ব্বীকৃত হইবে। শরীর যেন জঞ্জাল-বিশেষ, আত্মার অবাধ বিকাশের পথে বাধা-স্বরূপ। শরীরকে ও শরীরের স্থূল অভাবগুলিকে যত শাসনে রাখা যায়, আত্মার শক্তি তত বৃদ্ধি পায়। আত্মার শক্তিই প্রকৃত শক্তি, আত্মার ঐশ্বর্য্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য্য।

সংসারে অতিমাত্র দুঃখ-কষ্ট অতিমাত্র শরীর-সেবার ফল। শরীর-ধারণের পক্ষে সাদাসিধা পুষ্টিকর খাদ্য অল্প পরিমাণে পাইলেই যথেষ্ট। সেখানে খাদ্য-বিলাসিতার প্রয়োজন কি? সেইরূপ বস্ত্র বা আশ্রয়-বিলাসিতাও নিরর্থক। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সন্ন্যাসের আদর্শ, শারীরিক সকল অভাব মিটাইবার জন্য সংযমের প্রয়োজন সম্বন্ধে উপদেশ দেখা দিয়াছে। এই আদর্শের ও উপদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে একদিকে আত্মিক উন্নতির চেষ্টা, অন্য দিকে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের অভাব-জনিত দুঃখ ইত্যাদিকে দূর করিবার মন্ত্র।

প্রথম ভাবিবার কথা এই যে, আত্মিক আদর্শ দ্বারা দুঃখ ও জরাকে জয় করা সম্ভব হয় নাই। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় সমস্যা মানুষের পক্ষে হাজার হাজার বৎসরেও সহজ অথবা সরল হইয়া দাঁড়ায় নাই। আজও

কোটি কোটি নরনারীকে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতে হয়।

দ্বিতীয় ভাবিবার কথা এই যে, শারীরিক উন্নতি ভিন্ন আত্মিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। মানুষের স্থূল অভাবগুলি ভাল করিয়া না মিটিলে অন্য কোনদিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ থাকে না। আমি এমন বলিতেছি না যে, স্থূল অভাবগুলি মিটিলেই আপনা হইতে আত্মিক উন্নতি ঘটিবে। কিন্তু একথা সত্য, দারিদ্র্যের যতই গুণ কীর্ত্তন করা হোক্ না, দারিদ্র্যের ফলে মানুষের সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হইয়া যাইতে বাধ্য। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের চিন্তায় মানুষ তার সমস্ত শক্তি, শ্রম নিযুক্ত করিয়াও যদি যথোচিত পরিমাণে সেগুলি না পায়, তবে তার জীবন দুঃখময় হইয়া দাঁড়ায়।

দারিদ্র্য পৃথিবী হইতে দূর করা যায় কি না, অথবা মানুষকে খাওয়া-পরার চিন্তা হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায় কি না, সে কথার মীমাংসা আজও হয় নাই, শীঘ্র হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু বহুবার বহুক্ষেত্রে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবের আত্মিক উন্নতি তার শারীরিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। এই কথা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও পুনঃ পুনঃ প্রচার করিবার সার্থকতা আছে। কতকগুলি লোক অন্ধভাবে ঠিক উল্টা কথাটা বিশ্বাস করে। আর কতকগুলি লোক অবস্থার পীড়নে হতাশ্বাসের আশ্বাসরূপে উল্টা কথাটা বিশ্বাস করে। কিন্তু তা কারো পক্ষেই কল্যাণকর নহে। প্রথমে ভাল করিয়া বোঝা চাই যে, স্থূল অভাবগুলি মিটাইতে না পারিলেই স্বর্গের পথ প্রশস্ত হয় না। আমরা যদি অন্ন, বস্ত্র বা আশ্রয়ের অভাবে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ পাই, তবে এমন মনে করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই যে, আমরা পরম ধাম্মিক বনিয়া যাইতেছি এবং পরলোকে আমাদের জন্য অশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করা

হইতেছে। দ্বিতীয় কথা এই বোঝা চাই যে, যদি আমরা নিজ নিজ ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে নিজেদের স্থূল অভাবগুলি যথোচিতভাবে মিটাইতে পারি, ভাল খাইয়া, ভাল পরিয়া, ভাল ঘরে থাকিয়া সময় কাটাইতে পারি, তবে তা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে যেমন কল্যাণকর, সমাজের ও জাতির পক্ষেও তেমনই কল্যাণকর। ভাল খাইলে, ভাল পরিলে ও ভাল ঘর বাড়ীতে থাকিলে আমাদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা বাড়ে, নিজ নিজ কার্য্যের দ্বারা আমরা সমাজের যথার্থ সেবা করিবার অবকাশ পাই,—তাহাই আত্মিক উন্নতির পথ।

বস্তুতঃ, আত্মিক উন্নতি ভূঁইফোড় জিনিষ নয়। শারীরিক উন্নতি ব্যতীত আত্মিক উন্নতির কল্পনামাত্র করা সম্ভবপর নয়। শারীরিক উন্নতির ভিত্তির উপরেই মাত্র আত্মিক উন্নতি দাঁড়াইতে পারে। এই কথা অস্বীকার করিলে জাতীয় জীবনে মহা অনর্থ ও অকল্যাণ দেখা দেয়। এই কথা সকলের আগে বুঝা চাই।

# যশোহর ও বাংলার মফঃস্বল*

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক,
"ধনবিজ্ঞানে সাক্‌রেতি"-প্রণেতা

## আর্থিক যশোহর

যশোহর সহরে মাসকয়েক কাটাইলাম। সহরটা নিতান্ত ছোট নয়। এখানে একটা জিনিষ দেখিয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। আরামবাগ ও গোপালগঞ্জে থাকিতে রাস্তার এরকম অবস্থা দেখিয়াছিলাম যে তাহাতে বাঙালী জাতিটার উপর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কিন্তু এখানে লম্বা-চওড়া রাস্তা চারিদিকেই দেখিতেছি। এইসব রাস্তা থাকার একটা ফল হইয়াছে—বাস চলিতেছে খুব। এখান হইতে ঝিনাইদহ, নড়াইল, বনগাঁও বাসে করিয়া যাওয়া যায়।

যশোহর-ঝিনাইদহ রেল দেখিলাম। ট্রেনগুলার অবস্থা অতি কদর্য্য। শুনিতেছি বাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যশোহর-ঝিনাইদহ রেল মোটেই পারিয়া উঠিতেছে না। এই রেলে একপ্রকার নূতন গাড়ী দেখিয়াছি—বাসের মত দেখিতে, পেট্রলে চলে, কিন্তু চাকা রেলগাড়ীর মত। এই গাড়ীগুলা রেল লাইনের উপর দিয়া চলে।

এখানকার জিনিষপত্রের দাম কলিকাতারই মত, অথবা তাহার চেয়েও কিছু বেশী। কেবল দুধ, সন্দেশ, ডিম, গুড় ইত্যাদি কিছু সস্তা।

সহরের এক পাশ দিয়া ভৈরব নদী প্রবাহিত। বেশ চওড়া নদী,

---

*আর্থিক উন্নতি, মাঘ ১৩৩৮ (জানুয়ারি ১৯৩২)

কিন্তু কচুরিপানায় একেবারে ঢাকা। জল আছে কিনা তাহা খুঁজিয়া দেখিবার দরকার হয়। কচুরিপানার পাতার আড়ালে খুব মশা জন্মায়। এইজন্য যশোহরের স্বাস্থ্য খারাপ। নদীটী শুনিতেছি ৪০।৫০ বছর ধরিয়া এই অবস্থায় আছে। ইহাকে কাটাইলে সহরের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, সহরের শ্রীও শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছি। নিতান্ত রুগ্ন ও একেবারে রাস্তার ভিখারীদের ছাড়িয়া দিলে, সাধারণের স্বাস্থ্য নিতান্ত খারাপ বলিয়া মনে হয় না। লোকগুলা একেবারে না খাইয়া আছে এমন একটা-কিছু ধারণা হয় না।

যশোহর হইতে বাসে চড়িয়া একদিন বনগাঁও গিয়াছিলাম। চারিদিকেই দেখিলাম বনজঙ্গল, মাঝে-মাঝে ধানের ক্ষেত। বাংলাদেশ কি সভ্য জাতির দেশ? মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়।

গরু-ছাগলের স্বাস্থ্য দেখিতেছি নিতান্ত শোচনীয়। গরুগুলা চরিয়া বেড়াইবার উপযুক্ত মাঠ পায় না, এইজন্যই ইহাদের স্বাস্থ্য এত খারাপ।

## বনগ্রামের অবস্থা

যশোহর ছাড়িয়া বনগ্রাম বা বনগাঁও আসিলাম। ট্রেনে আসিতে পথে পাঁচটী নদী পড়িল। সব কয়টীর নাম জানি না। ইহার মধ্যে একটী, যাহার নাম ইছামতী, তাহারই কেবল একটু স্রোত আছে। বাকী চারিটীর মধ্যে দুইটী কচুরিপানায় একেবারে ঢাকা। আর দুইটীতে জল মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশটাই কচুরিপানায় ঢাকা। এইসব নদীতে স্রোত থাকিলে এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ও স্বাস্থ্যের দিক্ হইতে অনেক সুবিধা হইত। কচুরিপানা বাংলার কত বড় আর্থিক সমস্যা তাহা পদে-পদে দেখিতেছি ও বুঝিতেছি।

ষ্টেশন হইতে বাসা ক্রোশখানেক দূরে। পথটা মোটরে আসা গেল। রাস্তা মন্দ নয়। দু'ধারে সমান্তরালে অবস্থিত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বৃক্ষের সারি। রাস্তা-নির্ম্মাণে বাঙালীর মাথা যে বেশ খেলে তাহা এইসব রাস্তা দেখিয়া বোঝা যায়। কিন্তু একটা বড় গলদ আছে। রাস্তার ধূলা বড় বিষম। মোটরে চলিলে চারিদিক্ ধূলায় একেবারে অন্ধকার হইয়া যায়। যশোহর সহরেও এই শ্রেণীর রাস্তা, কিন্তু সেখানে এত ধূলা নাই। মনে হয় রাস্তা-নির্ম্মাণের সময় চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার ভাল যত্ন লওয়া হয় না। এইসব রাস্তায় পিচ্ দেওয়া হইলে এই সহরে থাকা সত্যই আরামের হইবে। তা ছাড়া, মোটরের যাতায়াত বাড়িবে। তাহাতে যাত্রী ও মাল বেশী করিয়া যাওয়া-আসা করিবে। বর্ত্তমানে রাস্তা খারাপ বলিয়া মোটর-গুলা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় এবং ইহারা ধূলায় এতটা আচ্ছন্ন হয় যে, খুব সহিষ্ণুতা থাকিলেও নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া থাকা অসম্ভব।

যশোহর হইতে বনগ্রাম মাত্র ৩০ মাইলের ব্যবধান। অথচ প্রথম দিনেই বাজার-দরের পার্থক্যটা বেশ দেখিয়াছি। যশোহরে ধোপারা কাপড় কাচে ৪৲ টাকায় ১০০, এখানে ৫৲ টাকায় ১০০। জেলার প্রধান সহর যশোহর। অথচ সেখানে এখানকার চেয়েও সস্তায় কাপড় কাচানো যায়। হইতে পারে যে, যশোহরে কাপড় কাচার চাহিদার তুলনায় ধোপার যোগান বেশী। আর একটা কারণও হইতে পারে। এখানকার ধোপারা শুনিতেছি শীঘ্র কাপড় দেয়। সেই জন্যই ইহাদের দাবী বেশী হওয়া সম্ভব। আর একটা জিনিষের দরের কথা বলি। যশোহরে সন্দেশের দর প্রতি সের ১।০। এখানে ১৲ টাকায় এক সের সন্দেশ পাওয়া যায়। যশোহরে ধূলা কম, অথচ সেখানকার সন্দেশ মাঝে মাঝে অপরিষ্কার দেখিয়াছি। এখানে টাট্‌কা সন্দেশ আনাইয়া খাইলাম। ইহা এত শুভ্র যে, দেখিলে সত্যই মনে তৃপ্তি জন্মে।

বাসা হইতে কর্ম্মস্থল ১০ মিনিটের পথ। যেখান দিয়া যাইতে হয় তাহার ডান পাশে গোটা দুই পুকুর আছে ও একটানা নীচু জমি আছে। এইরূপ একটানা নীচু জমির মানে কি, একজনকে জিজ্ঞাসা করা গেল। তিনি বলিলেন যে, আগে খুব সম্ভব এখানে একটী নদী ছিল। আমারও তাহাই মনে হয়। নদীগুলার ধ্বংসাবশেষ সর্ব্বত্রই দেখিতেছি।

## মফঃস্বলের আর্থিক অবস্থা

অর্থাভাবের কথা চারিদিকেই শুনিতেছি। শুনিতেছি অনেক বড়-বড় জমিদারও (ছোটদের ত কথাই নাই) রাজস্বের টাকা সংগ্রহের জন্য বিশেষ বেগ পাইতেছেন। তার কারণ, প্রজাদের কাছে খাজানা সংগ্রহ হইতেছে না। উকীলদের অবস্থা ত দেখিতেছি বিশেষ শোচনীয়। জনকয়েককে বাদ দিলে, ইঁহাদেও দিন যে অতি কষ্টে কাটিতেছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। সাধারণ প্রজাদের আয় ধান বা পাট বেচিয়া। ধান ও পাটের দর কমাতে তাহাদের অবস্থা যে খারাপ হইবেই, তা সহজেই বোঝা যায়। যতদূর জানিতেছি শুনিতেছি তাহা হইতেও ধারণা হয় যে, অধিকাংশ প্রজারই আর্থিক অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়।

চারিদিকে নৈরাশ্যের চিহ্ন। কিন্তু ভবিষ্যৎ কি একেবারে তমসাচ্ছন্ন? তাহা ত মনে হয় না। কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের যতটা উন্নতি হইতে পারে তার কিছুই হয় নাই। আমরা প্রধানতঃ চাকুরী, বা ওকালতী, ডাক্তারী বা জমিদারীর আয়ের উপর নির্ভর করি। দেশের আর্থিক উন্নতিতে সচেষ্ট থাকিলে এবং তাহা করিলে আমাদের অবস্থা বোধ হয় এত শোচনীয় হইত না।

অনেকের ধারণা দেশের আর্থিক অবস্থা এক সময় খুবই ভাল

ছিল এবং তাহা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে। সুদূর অতীতের কথা জানি না। কিন্তু ৫।১০।২০ বৎসর আগেকার কথা ধরিলে, বাংলার মফঃস্বলের নানা কেন্দ্রের যে অবস্থা ছিল এখন তাহার চেয়ে অবস্থা ঢের ভাল। চোর-ডাকাতের হাত হইতে মুক্তি, খাওয়া পরা থাকার সুবিধা, চলা-ফেরার সুবিধা সকল দিক্ হইতেই এই কথা বলা চলে।

ইহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই বছর ও গত বছরের কথা বাদ দিলে, বাংলার অনেক স্থানেই জমির দর বেশ বাড়িয়াছে। যেসব জমির দর বিঘা প্রতি ৫।১০।১৫৲ টাকা ছিল তাহা ৫০৲। ৬০৲। ১০০৲। ১৫০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। যেসব স্থানে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হয় নাই, সেসব স্থানেও জমির দর বাড়িয়াছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, আমাদের সামাজিক উন্নতি হইতেছে, নূতন নূতন জনকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে, অথবা পুরাতন জনকেন্দ্রেই আগের চেয়ে ভালভাবে থাকিবার সুযোগ ঘটিতেছে। ইহা যদি না হইত তাহা হইলে নানাস্থানে জমির দর বাড়িত না।

যাহা হউক, মোটের উপর আমরা উন্নতির দিকেই চলিয়াছি। এখন দরকার, বর্ত্তমানের দুর্দ্দশায় মুইয়া না পড়িয়া কি করিয়া আরও উন্নতি করা যায় তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

# প্রাদেশিক স্বার্থের সংরক্ষণ*

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি
পরিচালক, "আর্থিক উন্নতি"

## বাঙ্গালী বনাম অবাঙ্গালী ভারতবাসী

স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয়। এই স্বার্থ আন্তর্প্রাদেশিক হইতে পারে আবার বাহিরের স্বার্থও হইতে পারে। ভারতীয় স্বার্থের সহিত বৃটিশ বণিক্‌দের তথা বিদেশী বণিক্‌দের স্বার্থের সংঘর্ষ হইতে পারে। এই সংঘর্ষ যাহাতে না হয় অথবা হইলে কি করা সমীচীন হইবে, তদ্বিষয়ে রাউণ্ড টেব্‌লের বৈঠকে যে আলাপ আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তাহার কিছু আভাষ গত চৈত্র মাসের আর্থিক উন্নতিতে দেওয়া হইয়াছে। বিদেশী স্বার্থের কথা বলিবার সময় গোটা ভারতকে এক অখণ্ড দেশ ও জাতি বলিয়া ধরিয়া লইলেও ভারতের প্রত্যেক স্থানের স্বার্থ একপ্রকার নহে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আর্থিক বিকাশ বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে এবং এক এক স্থানের প্রয়োজন এক এক প্রকার। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় আর্থিক সম্বন্ধটা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ রহিয়াছে। আরও একটা কথা। ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো ফেডারেশন বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাতে ভারতীয় প্রদেশগুলি এক একটি আত্মকর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন রাষ্ট্রের সামিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আত্মকর্ত্তৃত্ব-

* লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সে প্রদত্ত মন্তব্য অবলম্বনে লিখিত। "আর্থিক উন্নতি", মাঘ ১৩৩৮ ( জানুয়ারি ১৯৩২ )।

সম্পন্ন এইপ্রকার বিভিন্ন প্রাদেশিক স্বার্থের কথাই আলোচনা করা হইবে।

কিছুদিন ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের কাগজপত্রে ও সভাদিতে এক দল লোক এই কথা বলিতেছেন যে, "সম্প্রতি লবণ শুল্ক, তুলা শুল্ক, গম আইন ইত্যাদি যে পাশ করা হইল তাহাতে বোম্বাই প্রভৃতি দেশ উপকৃত হইবে, কিন্তু বাঙ্গালার ক্ষতি হইবে। লবণ বোম্বাইয়ের সমুদ্রোপকূলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই লবণ পরিষ্কার করিয়া ব্যবহার করিতে বোম্বাইয়ের কোন বাধা হইবে না; অথচ শুল্ক বসানোর দরুণ প্রত্যেক বাঙ্গালী বেশী দাম দিয়া লবণ কিনিতে বাধ্য হইবে। তুলা-শুল্ক বসানোর দরুণ বিদেশী প্রতিযোগিতা কমিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালা ও অন্যান্য দেশকে বেশী দাম দিয়া কাপড় কিনিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশে যেসব আটা-ময়দার কলকারখানা আছে সেগুলি বেশী দরে গম কিনিতে বাধ্য হইবে, ইত্যাদি। অর্থাৎ এই আইনের ফলে বাঙ্গালীর ক্ষতি করিয়া অন্য এক বা অধিক প্রদেশ লাভবান্ হইবার সুযোগ পাইবে। ইহার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ইহাই হইল প্রথম সমস্যা। লেজিস্‌লেটিব্ এসেমব্লিতে যে আইন পাশ হয়, তাহাতে কোন প্রদেশের নামোল্লেখ থাকে না। তাহা ভারতীয় আইন এবং ভারতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য পাশ করা হয়। অথচ পাশ করিবার পর (যে কোন কারণেই হোক) প্রদেশ-বিশেষেরই মঙ্গল হইল এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইতে পারে। প্রদেশ-বিশেষের মঙ্গল হইলেও তত আপত্তির কারণ থাকিত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক বা অধিক প্রদেশের আর্থিক স্বার্থ ব্যাহত হইল। এরূপ অবস্থার প্রতীকার আছে কি? ইহাই হইল প্রশ্ন।

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালা দেশে এককালে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বেশ

উন্নত ছিল। অন্যায় প্রতিযোগিতা ও অন্য বহুবিধ কারণে ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙ্গালা আজ অনেক হীন হইয়া রহিয়াছে। পরন্তু মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি জাতিরা ও বিদেশী বণিকেরা আজ কলিকাতার ও বাঙ্গালার বাজার প্রায় করতলগত রাখিয়া বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। যেখানে তাঁহারা লাখে লাখে টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন সেখানে বাঙ্গালীরা তাঁহাদের কেরাণী ও অন্য সামান্য কর্ম্মচারিরূপে সামান্য কিছু-কিছু উপার্জ্জন করিতেছেন। তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি কোন কাজে আসিতেছে না। সুতরাং বাঙ্গালীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে; যেহেতু বিভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তিদের সহিত প্রতিযোগিতায় আমরা স্বার্থ-রক্ষা করিতে পারিতেছি না, সেই জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিতেছেন যে, এমন আইন প্রণীত হউক যাহাতে বাঙ্গালীরা বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করিতে পারিবে, কিন্তু অবাঙ্গালীরা পারিবে না। এই প্রকার মনোভাব ও অনুরূপ কার্য্যাবলী অন্যান্য প্রদেশে আগেই দেখা গিয়াছে। "বেহারীদের জন্য বেহার", "আসামীদের জন্য আসাম" ইত্যাদি বুলি ও তদনুযায়ী কার্য্য এই ভাবের পরিচায়ক। বাঙ্গালা দেশে সে প্রকার কোন নীতি আজ পর্য্যন্ত অনুসৃত না হইলেও কেহ কেহ বলিতেছেন এখন তাহা প্রচলিত না করিলে বাঙ্গালীর আরও আর্থিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

২০।৩০ বৎসর আগে প্রাদেশিক স্বার্থবোধ এতটা স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, বোম্বাই ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে আর্থিক প্রচেষ্টাও তেমনভাবে সুরু হয় নাই। তখনকার নালিশ ছিল বৃটিশ স্বার্থের বিরুদ্ধে। ইয়োরোপীয় বণিকেরা কোটি কোটি টাকা ভারতে চা, পাট, কাফি, কয়লা, তেল ইত্যাদি বাবদ খাটাইতেছে, প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকার মুনাফা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। এই কথা ভাবিয়াই কেহ কেহ এতকাল দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ, একদল

অর্থনীতি-বিশারদ একথা বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই যে, কয়লা ও তেল যদি মাটির নীচেই থাকিয়া যাইত, পাটের চাষ যদি একদম না, হইত, কাফি এবং চা এক ছটাকও যদি উৎপাদন না করা হইত, তবেই দেশের পক্ষে মঙ্গল হইত। দেশের লোক উপযুক্ত হইয়া এই সব শিল্প নিজেদের হাতে পরিচালনা করিতে সমর্থ হইত। বলা বাহুল্য অতীতে যাঁহারা এইরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারাও উপরিউক্ত বহিষ্কার নীতির কবলে আসিয়া পড়েন। "বাঙ্গালীদের জন্য বাঙ্গালা দেশ" বলিলে তাঁহাদেরও আর কোন দাবী থাকে না, একথা সম্ভবতঃ অনেক সময় ইয়োরোপীয় বণিক্‌দের মনে থাকে না।

## প্রাদেশিক সমস্যাসমূহ

উপরে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমাদের আর্থিক সংরক্ষণ সমস্যার প্রাদেশিক দিক্‌টা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল। প্রশ্নের আকারে সমস্যাটিকে নিম্নলিখিতভাবে বলা চলে :—

১। প্রত্যেক প্রদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িবার অবাধ অধিকার অন্য কোন প্রদেশের থাকা উচিত কি না?

২। যখন কোন আইন বা নীতি অনুসরণ করার ফলে এক প্রদেশের উপকার হয় কিন্তু অন্য এক বা অধিক প্রদেশের ক্ষতি হয় তখন কিরূপ ব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে?

ইয়োরোপীয় বণিকের কথাই ভাবি আর মাড়োয়ারী প্রভৃতি অবাঙ্গালী ভারতীয় বণিকের কথাই ভাবি, তাহাদের দোষ দিলে চলে না। তাহারা শিল্প-প্রতিষ্ঠায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উদাসীন ছিল না। দোষটা তাহাদের তত নহে আমাদের যত। সুতরাং প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই নহে যে, অবাঙ্গালী বণিক্‌কুলকে তাড়াইলেই আমাদের কর্ত্তব্য

সম্পন্ন হইবে। বাঙ্গালা দেশেও জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্য বড় লোক অনেক আছেন। অথচ ইঁহাদের অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আজ পর্য্যন্ত উদাসীন রহিয়াছেন। দেশের বণিক্‌দের যদি ব্যবসা করিতে ইচ্ছা না জন্মে আর বাইরের লোকেরা আমাদের শৈথিল্যের সুযোগ লইয়া ক্রমাগত শিল্প-ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে থাকে, তবে সংরক্ষণমূলক আইনের পর আইন পাশ করিয়াই বা আমাদের কি লাভ হইবে? আইন করিয়া শুধু আমাদের অক্ষমতা, অপারগতা ও ব্যবসা-হীনতাটাকে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। সংরক্ষণের অর্থ যদি হয় আমাদের অকর্ম্মণ্যতাকে জীবিত রাখা তবে তাহা কোন-ক্রমেই সমর্থনীয় নহে।

দেশের ধনিককুলের এখনও চোখ ফুটে নাই। এখানে ওখানে দু'এক জন ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশের ব্যবসা ও শিল্পের দিকে আজও ঝোঁক জন্মে নাই। তাঁহারা তাঁহাদের টাকা শিল্প-বাণিজ্যে খাটাইতে পরাঙ্মুখ, কোম্পানীর কাগজ, বাড়ীভাড়া, লগ্নী কারবার প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিরাপদ উপায়ে টাকা খাটাইয়া থাকেন। এই প্রকার মনোভাবের জন্য জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কতকটা দায়ী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ, বাঙ্গালা দেশে জমিদার, তালুকদার, বড় ব্যারিষ্টার, ডাক্তার ও অন্যান্য শ্রেণীর ধনী ব্যক্তির সংখ্যা কম নয়, ইঁহারা সেপ্রকার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে অল্পকালের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের চেহারা বদ্‌লাইয়া দিতে পারিতেন। শিল্প-বাণিজ্যের উদ্ভব ও সমুন্নতিতে তাঁহারা দেশকে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন। যতকাল বাঙ্গালার বণিক্‌কুলের শিল্প-বাণিজ্যের দিকে মতিগতি না ফিরিবে ততকাল সংরক্ষণ কথার কথা মাত্র হইবে। জগতে শুধু বাঁচিয়া থাকাই যথেষ্ট নয়, ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকা উচিত। এবং তাহা করিতে হইলে অন্য দশজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের

জয়লাভ করিতে হইবে। সত্য বটে, বিভিন্ন প্রদেশের লোক বাঙ্গালা দেশে আসিয়া শিল্প-বাণিজ্য ও চাকুরির জগতে একটা সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু "বাঙ্গালা দেশ বাঙ্গালীদের জন্য" নীতি অনুসরণ করিয়া চাকুরি, ওকালতি ইত্যাদিতে আমাদের কিছু সুবিধা করা সম্ভবপর হইলেও আমরা ব্যবসা-ক্ষেত্রে শুধু সংরক্ষণের ফলে তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারিব না, আর আমাদের বণিক্‌কুলের মনোভাব না বদলাইলে বাঙ্গালা দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন সুদূরপরাহত।

দ্বিতীয়তঃ, কোন আইন বা নীতি অনুসরণ করার ফলে যদি একটি প্রদেশ উপকৃত হয়, কিন্তু এক বা অধিক প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এ প্রসঙ্গে দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে।

(১) যেখানে ফেডারেশনকে আমাদের লক্ষ্য বা গন্তব্য স্থল বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে সেখানে এই বৃহৎ স্বার্থকে বজায় রাখিবার জন্য বহু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্বার্থকে খর্ব্ব না করিয়া উপায় নাই। যেসকল দেশে ফেডারেশন কায়েম করা হইয়াছে সেসব দেশেও কেন্দ্রীয় শাসনের বিচার মানিয়া লইতে হয় ও উহার কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত থাকে। সমগ্র ভারতকে এক জাতি ও এক দেশ বলিয়া ধরিলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত আইন-কানুনে যদি এক প্রদেশের যতটা লাভ হয়, অন্য প্রদেশের ততটা লাভ না হয়, এমন কি ক্ষতি হয়, তবু তাহা মানিয়া লইতে হইবে।

(২) ভৌগোলিক সংস্থান বা অন্য নৈসর্গিক কারণে প্রদেশে-প্রদেশে তারতম্য আছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সকল প্রদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যে সমান উন্নত নয় বলিয়াও লবণশুল্ক, তুলাশুল্ক, গম আইন ইত্যাদি কারণে কোন-কোন প্রদেশের বাস্তবিক ক্ষতি হইবার

সম্ভাবনা। এই অবস্থার প্রতীকারের একটা উপায় হইতেছে, দেশের ধনিকদের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেরও এ বিষয়ে অনেক কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যসমূহ পালন করিয়া ধনিকদের নানাপ্রকারে অনুপ্রেরণা দেওয়া ও বিধিমত উপায়ে সাহায্য করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

আমাদের বিবেচনায় প্রদেশে-প্রদেশে রাজনৈতিক ও আর্থিক সংঘর্ষ নিবারণের জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে একটা আন্তররাষ্ট্রিক সমিতির ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই সমিতি ব্যবস্থার বা আইনের গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিবে। বলা বাহুল্য, ইহা অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া হইবে এবং ইহার পূর্ণ সম্মতি ব্যতিরেকে বিভিন্ন প্রদেশের স্বার্থ-সম্পর্কিত আইন পাশ করা হইবে না। যেসকল আইনকানুন সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ অভিযোগ উপস্থিত করিবে যে ঐসকল আইন কানুনের ফলে তাহাদের ক্ষতি হইতেছে, কমিশন সেইসকল আইন কানুন বিচার করিয়া দেখিবে সত্যই ক্ষতি হইতেছে কি না, হইলে ক্ষতির পরিমাণ সামান্য কি না, সামান্য না হইলে তাহার প্রতীকারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যায় কি না অথবা আইনের খস্ড়া বদ্‌লাইয়া ক্ষতির পরিমাণ নিবারণ করা যায় কি না, ইত্যাদি বিষয় কমিশনের আলোচ্য হইবে।

## রক্ষাকবচ

ভারতের ভাবী যৌথ রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কে প্রদেশসমূহের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কতকগুলি রক্ষাকবচ নির্দ্ধারণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালার জনসাধারণও এই ধরণের রক্ষাকবচের পক্ষপাতী। বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, প্রথম হইতে এই ধরণের

সতর্কতা অবলম্বন না করিলে যৌথ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালার স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে না। কারণ শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত এবং অবনত নানা ধরণের প্রদেশ হইতে নানা ধরণের প্রতিনিধিগণ যৌথ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় সমবেত হইবেন। এরূপ বিরাট রাষ্ট্রীয় বারোয়ারিতলায় বাঙ্গালার স্বার্থের কথা যথোচিতভাবে বিবেচিত হইবে না। ভারতের বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাতেও ইহার যথেষ্ট নজীর রহিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ লবণের উপর আমদানি শুল্কের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার বিশিষ্ট লোকদিগের ধারণা এই যে, বিধিবদ্ধ আইনটি বাঙ্গালার স্বার্থের প্রতিকূল। সুতরাং পূর্ব্বাহ্ণে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে বাঙ্গালার ঠকিবার সম্ভাবনা আছে। ব্যবস্থাপক সভার নজীর ছাড়া অন্য নজীরও আছে। প্রথমতঃ, কোন কোন প্রদেশে প্রাদেশিক স্বার্থান্ধতা বিশেষ প্রবল, দ্বিতীয়তঃ, নিজের প্রদেশেও শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে অবাঙ্গালী ক্রমে বাঙ্গালীকে স্থানচ্যুত করিতেছে। এজন্য বাঙ্গালীরা নিজেরাই প্রধানতঃ দোষী। বহু যুগ ধরিয়া বাঙ্গালীরা বুদ্ধিজীবী হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে—শিল্প-ব্যবসার দিকে আদৌ মনোনিবেশ করে নাই। এইজন্যই এখন হইতে বাঙ্গালীর মন ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ফিরাইতে হইবে এবং কার্য্যকরী সরকারী নীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার-সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করায় অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যবিত্তের অন্ন-সমস্যা বাঙ্গালা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ এবং এইজন্য সমগ্র বাঙ্গালা আজ চিন্তাসঙ্কুল। বাঙ্গালার জনসাধারণের মধ্যে অনেকের ধারণা এই যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশঃ অবাঙ্গালীর হাতে নিপতিত হওয়ার দরুণই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এমন কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। ১৯২১ সনের আদমসুমারিতে সংগৃহীত তথ্য হইতে জানিতে পারি যে, পাট, কয়লা, ধাতু ও যন্ত্র

শিল্পের মজুরদের মধ্যে মাত্র ১,০০,০০০ নর এবং নারী বাঙ্গালী, পক্ষান্তরে ঐ তিন শিল্পের অবাঙ্গালী মেয়ে এবং পুরুষ কারখানা-মজুরের সংখ্যা অন্ততঃ ২,৫০,০০০ ; অর্থাৎ যেখানে দশজন বাঙ্গালী আছে সেখানে ২৫ জন অবাঙ্গালী বর্ত্তমান। পরবর্ত্তী দশ বৎসরে অবস্থা নিশ্চয়ই আরো খারাপ হইয়াছে। ছোট-ছোট শিল্পক্ষেত্রেও অবাঙ্গালীরা ক্রমশঃ বাঙ্গালীদিগকে স্থানচ্যুত করিতেছে।

বাঙ্গালী নিজের প্রদেশেই পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। এজন্য বাঙ্গালী নিজেই দায়ী। বাঙ্গালীর এই অক্ষমতা এবং অযোগ্যতা ঢাকিতে চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় নহে। বাঙ্গালার যুবকগণ এইরূপে নিজেদের অক্ষমতা বুঝিয়া লইয়া প্রাণপণে শিল্প-বাণিজ্যের পশ্চাতে ধাবমান হউক। কারণ ভদ্রলোকের পেশায় আর পেট চলিবার উপায় নাই—ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে বেজায় ভিড়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রয়োজনীয় তথ্য হজম করিয়া রাখা ভাল। বাঙ্গালার সন্তানগণ শিল্প-বাণিজ্য-ধুরন্ধর হইয়া উঠিলেও বাঙ্গালার বাহির হইতে আগমনকারী মূলধন এবং নানাপ্রকার বাণিজ্যিক স্বার্থের গতিরোধ করিতে পারা যাইবে না। বাঙ্গালী জাতের অস্থিমজ্জার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে আজ যে একটা উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান দেখা যাইতেছে, তাহার কারণও হয়তো এই হইতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অবাঙ্গালীর স্বার্থ এবং পুঁজি এমন শিকড় গাড়িয়া রহিয়াছে যে, বাঙ্গালীর সেখানে দন্তস্ফুট করিবার উপায় নাই।

বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালার জন্য অগ্রসর কার্য্য নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রাদেশিক স্বদেশপ্রেম খারাপ জিনিষ নয়, তবে তাহা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হইলেই ভাল। সুস্থ এবং সন্তুষ্টচিত্ত প্রাদেশিক জীবনই উন্নতিশীল যৌথরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষণ। এইসমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার অসন্তোষের বীজ

চিরতরে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে বাঙ্গালার জন্য অগ্রসর কার্য্য-নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

## মেষ্টন ব্যবস্থা

মেষ্টন সেট্‌ল্‌মেণ্ট এবং তদনুযায়ী কার্য্যনীতি অবলম্বনের ফলে রাজস্বনীতির তরফ হইতে বাঙ্গালা শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালার প্রতি কিরূপ অবিচার করা হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে স্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে :—

১৯২৯-৩০ সনের বাজেট এষ্টিমেট অনুসারে বৎসরে মাথাপিছু খরচের পরিমাণ নিম্নরূপ :

| | | |
|---|---|---|
| বোম্বাই | ... | ৮·২৯১ টাকা |
| পাঞ্জাব | ... | ৫·৫৪৯ ,, |
| মান্দ্রাজ | ... | ৪·১৮৮ ,, |
| আসাম | ... | ৩·৯২০ ,, |
| মধ্য প্রদেশ | ... | ৩·৭৯২ ,, |
| যুক্ত প্রদেশ | ... | ২·৭২৯ ,, |
| বাঙ্গালা | ... | ২·৫৫৪ ,, |
| বিহার-উড়িষ্যা | ... | ১·৮০০ ,, |

গঠনমূলক কাজে মাথাপিছু সরকারী খরচের পরিমাণ দেখিলে আমাদের আরও চোখ ফুটিবে। ১৯২৮-২৯ সনের বাজেট হিসাবে দেখা যায়, এই সনে বাঙ্গালার মাথাপিছু খরচা হইয়াছে ০·৫৮ টাকা। কিন্তু বোম্বাইয়ে ১·৫৯ টাকা, মান্দ্রাজে ১ টাকা, পাঞ্জাবে ১·৪০ টাকা, মধ্যপ্রদেশে ০·৭৭ টাকা, আসামে ০·৭৬ টাকা, যুক্তপ্রদেশে ০·৬৫ টাকা এবং বিহার-উড়িষ্যায় ০·৪২ টাকা খরচ হইয়াছে। সুতরাং ভারতের

বড় বড় প্রদেশগুলির তুলনায় বাঙ্গালায় গঠনমূলক কার্য্য কিছুই করা হইতেছে না। এ সম্বন্ধে এক বিহার-উড়িষ্যা ছাড়া বাঙ্গালা সকল প্রদেশেরই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ভাবী সেট্‌ল্‌মেণ্টে বাঙ্গালার এই অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; গঠনমূলক কার্য্যের জন্য যাহাতে বাঙ্গালার সরকারী খাজাঞ্চিখানায় অর্থাভাব না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমগ্র ভারতীয় রাজস্বে বাঙ্গালা হইতে যে পরিমাণে রাজস্ব প্রেরিত হয়, সেই তুলনায় বাঙ্গালার জন্য খরচ করা হয় না। বাঙ্গালার প্রতি এই অবিচারের প্রতীকার দরকার।

## আন্তঃপ্রাদেশিক কমিশন

অন্যান্য প্রদেশ যাহাতে অন্যায়ভাবে বাঙ্গালার স্বার্থকে পদদলিত না করে সে জন্য কিছু না কিছু শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কিত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা আমি রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইনের বলে সম্পন্ন করা সমীচীন মনে করি না। আমি চাই যে, এমন ব্যবস্থা হোক্ যাহাতে এক প্রদেশ অন্যায়ভাবে অন্য প্রদেশের স্বার্থকে বিনষ্ট করিতে বা শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতে না পারে। এই জন্য আমি একটি স্থায়ী আন্তঃপ্রাদেশিক কমিশন বসাইবার পক্ষপাতী। প্রদেশসমূহের মধ্যে সকল প্রকার বিবাদের কারণ অনুসন্ধান করা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা এই কমিশনের কর্ত্তব্য হইবে। এইরূপ কমিশন থাকিলে কোন দুর্ব্বল প্রদেশ যদি কোন প্রবল প্রদেশের সহিত সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে অন্যান্য প্রদেশ একত্রে ভোটাধিক্যবশতঃ যৌথরাষ্ট্রকে তাহাদের মতানুসারে কার্য্য করাইতে ও দুর্ব্বল প্রদেশের দিকে উদাসীন রাখিতে সমর্থ হইবে না। যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা কার্য্যতঃ দুই তিনটি বড় প্রদেশের সদস্য দ্বারাই চালিত হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ ধরণের প্রদেশের সহিত

অন্যান্য প্রদেশের স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইলে অসুবিধাগ্রস্ত প্রদেশের সকল প্রকার অভাব অভিযোগই যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা না শুনিতে পারে। এমন কি সময়ে সময়ে যৌথরাষ্ট্র সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান চালাইতেও অস্বীকার করিতে পারে। অন্য পক্ষে, ট্যারিফ বোর্ড বা রেলওয়ে রেট্‌স্ ট্রাইবুন্যালের মত বিশদভাবে অনুসন্ধান করিবার এবং উপদেশ প্রদানের ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি স্থায়ী আন্তঃপ্রাদেশিক কমিশন বসান হইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। অভিযোগ যদি প্রকৃত এবং ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা হইলে কমিশন অনুসন্ধান এবং প্রচারকার্য্যের দ্বারা ক্রমে অভিযোগ দূর করিবার স্বপক্ষে জনমতের সৃজন এবং উক্ত জনমতের সহায়তায় অভাব অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইহাতে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন ব্যবস্থা পরিষদেরই কর্ত্তৃত্ব বা অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না। কারণ কমিশন কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে মাত্র সুপারিশই করিবে এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার রহিবে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের উপর। এই আন্তঃ-প্রাদেশিক কমিশনের সদস্য-সংখ্যা ৩।৪ জনের অতিরিক্ত হইবে না। কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ-মর্য্যাদা হাইকোর্টের জজের সমান হইবে। প্রয়োজন হইলে চেয়ারম্যানের সহায়তা করিবার জন্য এক বা ততোহধিক এসেসার নিযুক্ত করিতে হইবে। কমিশন আপন সুপারিশ-সহ প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট রিপোর্ট করিবে; এবং প্রধান মন্ত্রী ব্যবস্থা পরিষদের নিকট ঐ সমস্ত সুপারিশ উত্থাপন করিয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিবেন।

ছোটখাট এবং খেয়ালসম্ভূত অভাব অভিযোগ যাহাতে কমিশনের দরবারে উপস্থাপিত না করা হয় তার জন্য রীতিমত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ব্যবস্থা-পরিষদের সমস্ত সদস্যের অতিজন (মেজরিটী) বা আরও বেশী সদস্যের অনুমোদিত অভাব-অভিযোগই কমিশনের নিকট

উপস্থাপিত করা হইবে। এই ব্যবস্থাদ্বারা প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা প্রকাশের দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।

এতক্ষণ ধরিয়া আমি যে উপায়ের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম তাহাই যে একমাত্র পন্থা তাহা নয়; আরও অনেক পন্থা থাকিতে পারে। সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালত ছাড়া যৌথরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা চলে না। এসেসারদিগের সহায়তায় পরিচালিত সুপ্রিম্ কোর্টের কমিটির দ্বারাও কাজ চলিতে পারে, আর পৃথক কমিশনের প্রয়োজন থাকে না। শক্তিমান এবং সুষ্ঠু জনমত গঠনই প্রকৃত এবং শ্রেষ্ঠ প্রাদেশিক রক্ষাকবচ। এই জনমতই একটি বিরাট মানবপ্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত করিবে। বাঙ্গালার জনসাধারণ যে কিরূপ অর্থনৈতিক দুর্দ্দশায় উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্যদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যেসমস্ত অর্থনৈতিক কারণে বাঙ্গালার এই শোচনীয় অবস্থা তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্য এবং আমার আশা এই যে, এ সম্পর্কে গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যদিগের সহযোগিতায় বঞ্চিত হইব না।

# বেকার-বীমা*

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বিল, এল,
গবেষক "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ

বেকার নিবারণের জন্য নানাদেশে অনেক রকমের চেষ্টা চলেছে, অনেক মতবাদও প্রকাশ হয়েছে। তার মধ্যে একটী উপায় সম্বন্ধে কিছু বলব। বেকার সমস্যা দেখা দেবার আগে বেকার নিবারণের উপায় করা দরকার—কাজেই যদি এমন কোন সঞ্চিত অর্থ থাকে যা মানুষের আকস্মিক বেকার অবস্থায় সাহায্য করতে পারে তা' হ'লে কতকটা দুঃখের লাঘব হবে আশা করা যায়। যেমন জীবনবীমা অসম্ভব নয়, যেমন মোটর গাড়ীর আকস্মিক বিপদের জন্য বীমা করা সম্ভব, ঠিক সেই রকম বেকারের বীমা হওয়াও সম্ভব। ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় বেকার বীমা প্রচলিত হয়েছে, কোথাও বা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে, কোথাও বা সাধারণের সাহায্যে; আবার কোথাও গভর্ণমেণ্ট, সাধারণ ও শ্রমিক সকলে মিলিতভাবে বীমা চালায়।

বেকার বীমার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক। প্রথমে প্রায় সকল দেশেই বেকারের জন্য বীমা করা শ্রমিকদলের ইচ্ছাধীন ছিল; কিন্তু অবশেষে তাতে বিশেষ কোন উন্নতি না হওয়ায় শাসনকর্ত্তারা বাধ্যতামূলক আইন করেন।

১৮৯৩ সনে বার্ণএ, ১৮৯৬ সনে কলোন ও বলোনায় ইচ্ছামূলক বেকার বীমার সৃষ্টি হয়। ১৮৯৪ সনে সেণ্ট গলের মিউনিসিপ্যালিটিতে শ্রমিকগণের বেকার বীমা বাধ্যতামূলকরূপে প্রচলিত হয়। পাঁচ ফ্রাঁর

*"আর্থিক উন্নতি", ফাল্গুন, ১৩৩৮ (ফেব্রুয়ারি ১৯৩২)।

চেয়ে যাদের অধিক আয় নয় তারা বেকার বীমা করতে বাধ্য ছিল। বেকার বীমার বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। ১৯০১ সনে বেলজিয়ামে সিটি অব্ ঘেণ্ট নামক স্থানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেকার বীমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ সনে গ্রেটবৃটেন প্রথম বাধ্যতামূলক আইন পাশ ক'রে বেকার বীমা প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯১৯ সনে ইটালীতে বাধ্যতামূলকরূপে বেকার বীমা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়। ১৯২০ সনে অষ্ট্রীয়াতে, ১৯২১ সনে বুলগেরিয়াতে ১৯২৫ সনে সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের নয়টী ক্যাণ্টনে এবং কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটিতে বেকার বীমা প্রচলিত হয়। ১৯২৭ সনে জার্ম্মাণিতে বাধ্যতামূলক বেকার বীমা আইন পাশ করা হয়েছে, তৎপূর্ব্বে ইচ্ছামূলক বেকার বীমা ছিল। আমেরিকায় আজ বেকার বীমা শ্রমিকবর্গের ইচ্ছামূলক অবস্থায় রয়েছে।

ভারতে কা কথা, সারা এশিয়ায় এখনও বেকার বীমার প্রতিষ্ঠান-সম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায় না।

এইবার দেখা যাক কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক ইচ্ছাধীন অবস্থায় বেকার বীমা গ্রহণ করেছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্ত্তৃক প্রথমে বেকার বীমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই জন্য যে মজুরদল এই ইউনিয়ন-ভুক্ত ছিল তারাই প্রথমে এই বীমার আশ্রয় পেয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, বাড়ীর মিস্ত্রী আর ছাপাখানার লোকেরাই ইহার অধিক শরাণাপন্ন হয়।

গ্রেটবৃটেনে ১৯১১ সনের আইন অনুযায়ী বেকার বীমা সকল শ্রেণীর মজুরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে নাই। কেবল কলকারখানার এঞ্জিনিয়ার, লোহার কারখানার লোক, জাহাজের কারখানার লোক, বাড়ীর মিস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণীর শ্রমিকগণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে। ১৯১৬ সনের আইন অনুসারে বেকার বীমা আরও অধিক

প্রচলিত হয় এবং ১৯২০ সনের আইনে "মজুর" ব'লতে যাদের বোঝায় সেই শ্রেণীভুক্ত সব লোকের মধ্যেই বাধ্যতামূলক হ'য়ে পড়ে।

অষ্ট্রীয়াতে চাষীর দল ছাড়া আর সব শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে বাধ্যতামূলক বীমার ব্যবস্থা করা হয়।

বুলগেরিয়া, ইতালী, পোল্যাণ্ড ও কুইন্সল্যাণ্ডে চাষী ও সিজন্যাল (সাময়িক) মজুর বাদে আর সব শ্রেণীর মজুর বেকার বীমা করতে বাধ্য হয়েছে।

সুইট্জারল্যাণ্ডে ইচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক উভয়প্রকার বেকার বীমার ব্যবস্থা আছে। কাগজে কলমে সকল শ্রেণীর মজুরই বেকার বীমার সভ্য হ'তে পারে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চাষী আর চাকর শ্রেণীর মজুর এই সুযোগ থেকে আইনতঃ বঞ্চিত রয়েছে।

জার্ম্মাণির ১৯২৭ সনের আইন অনুযায়ী সকল শ্রেণীর মজুরকেই বেকার বীমার আশ্রয় দেওয়া হয়, চাষীরাও সেখানে বাদ পড়ে নাই।

বেকার বীমাকে ভালমন্দের দিক্ থেকে এইবার বিচার ক'রে দেখা যাউক। জগতে সব জিনিষেরই ভাল আর মন্দ এই দুইটা দিক্ থাকে। কোন অনুষ্ঠানই একেবারে নিছক্ ভাল বা নিছক্ মন্দ এ রকম হ'তে পারে না। এখন যা'তে বেশী ভাল পাওয়া যায় তাকেই আমরা ভাল ব'লে গ্রহণ করি। বেকার বীমা সম্বন্ধে যখন বিচার করবো তখন দেখবো যে, এর ভালও আছে আবার মন্দও আছে। ভালর দিক্ থেকে আমরা গোড়া থেকেই দেখে আস্‌ছি যে, বেকার বীমার সাহায্যে বেকার অবস্থায় অনাহারে যা'তে না মারা যেতে হয় তারই ব্যবস্থা করা যায়। মন্দের দিক্ থেকে বলা যায় টাকা কোথা হ'তে পাওয়া যাবে—এই একটা প্রশ্ন। যতদিন বেকার থাকবে ততদিন কোন মজুর যদি সাহায্য পায় তা' হলে তার বেকার অবস্থায় থাকায় ক্ষতি কি, এই হ'ল দ্বিতীয় প্রশ্ন; এবং তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মজুরদের বিনা

ভাবনায় টাকা যোগালে তারা নিজের বাসস্থানটী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইবে না বা অন্য কোন কাজও করবে না।

প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ টাকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে ইহার উত্তর কি দেখা যাক। বিভিন্ন দেশে কি রকম করে টাকার যোগাড় হ'য়েছে তা দেখলেই বোঝা যাবে। সুইটস্যারল্যাণ্ডে ১৯২৪ সনের আইন অনুযায়ী ঘেণ্ট সিস্‌টেম প্রচলিত হয়। তাহাতে যদিও গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থ দিয়ে থাকেন, তবুও মজুরদের নিযোক্তাদের সাহায্য করতে হয়। মাহিনার শতকরা ২৲ তারা দেয়।

ইংল্যণ্ডে ১৯১১ সন হ'তে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত প্রচলিত আইনে মজুর তাহাদের মনিব এবং গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বেকার বীমার ফাণ্ড তৈয়ারী হত। বুলগেরিয়া ও অষ্ট্রিয়াতে ইংলণ্ডের মতই ব্যবস্থা আছে। ইটালীতে বীমার যা খরচা তা মজুর আর তাদের প্রভুর মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। আমেরিকায় বীমার খরচা নিযোক্তাদের উপরেই চাপান হয়।

জার্ম্মাণিতে মজুর ও নিযোক্তাদের বীমা চালাইবার ভার গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ কোন টাকার দরকারে গভর্ণমেণ্ট $\frac{৪}{৫}$ ভাগ সাহায্য করে এবং দেশের যে অংশে ঐ রকম টাকার দরকার সেই অংশের লোকদের $\frac{১}{৫}$ ভাগ সাহায্য করতে হয়।

রাশিয়াতে বীমার সমস্ত ভারই শিল্পের উপরে দেওয়া আছে। কাজেই দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই নিযোক্তা এবং মজুর উভয়কেই কিছু-কিছু দিতে হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর বীমা সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। তবে কেহ বলতে পারেন যে, নিযোক্তারা টাকা দিয়ে সাহায্য করে বটে, সেইজন্য ততটা জিনিষ তৈয়ারী করবার খরচাও বেড়ে যায়, এবং ফলে জিনিষের দামের হার বেশী হয়। দাম দিতে হয় ক্রেতাদের। কাজেই শেষ অবধি অধিকমূল্যে জিনিষ কিনে তাঁদেরই কষ্টভোগ করতে হয় বেশী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—বেকার অবস্থায় থেকে যদি ভরণপোষণের ভাবনা না থাকে তবে কে আর কাজের জন্য ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়? এর উত্তরে বলতে পারি একটা সম্ভবপর সময় ঠিক ক'রে দেওয়া হবে, সেই সময়ের মধ্যে কোন লোক যদি কাজ না পায়, তবে তার ব্যবস্থা সে নিজে করে নেবে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের মধ্যেই দেওয়া হয়েছে। যদি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন লোক কাজ না জুটিয়ে নিতে পারে তা'হলে সে-ই কষ্টভোগ করবে। কাজেই স্থানান্তরে যেতে বা ভিন্ন কর্ম্ম নিতে মজুরদের কোন আপত্তি থাকা সম্ভবপর নয়।

আমাদের দেশে বেকার বীমা আরম্ভ করতে গেলে মিউনি-সিপ্যালিটির মধ্য দিয়ে আরম্ভ করা মন্দ হবে না। কারণ সেন্টপলের মিউনিসিপ্যালিটিতে বেকার বীমা বেশ ভাল ভাবেই সফল হ'য়েছিল। টাকার দিক্ থেকে বল্‌তে গেলে মজুর ও নিযোক্তা উভয়কেই কিছু কিছু সাহায্য করতে হ'বে। কারণ একেবারে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে কোথাও বেকার বীমা গড়ে উঠে নি। এ ছাড়া গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ যে বেকার বীমার উন্নতিসাধক নয়, তাহা ইংলণ্ডের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। ইংলণ্ডে গভর্ণমেণ্ট বেকার বীমার সাহায্যে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও বেকার সমস্যার বিশেষ লাঘব করতে পারে নি। জার্ম্মাণিতে গভর্ণমেণ্টের হস্ত থেকে বীমার অস্তিত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে একটী স্বাধীন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে—সেই সম্প্রদায়ের নাম হ'ল "ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ ফর আনএমপ্লয়মেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স।"

# রাঢ়-পল্লীর অর্থকথা

শ্রীহরিদাস পালিত, বিদ্যাবিনোদ, গবেষক,

"আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ, "আদ্যের গম্ভীরা"-প্রণেতা

রাঢ় পর্য্যটনের জন্য আমি ২৮শে মার্চ্চ ( ১৯৩২ ) সোমবার কালী-পাহাড়ী গিয়েছিলাম। ষ্টেশন হতে মিনিট দশেকের পথ দক্ষিণে মৃষিক গ্রামে আমার আড্ডা। এবার বিহারীনাথ পাহাড় দেখবার কল্পনা পূর্ব্ব হতেই ছিল।

মৃষিক হতে বিহারীনাথ প্রায় আট মাইল দক্ষিণে। মধ্যে দামোদর পার হতে হয়। সড়ক বল্‌তে কিছু নাই। ঢেউ খেলান মাঠের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হল। গমন পথের পার্শ্বে দু-তিনটা সাঁওতাল পাড়া দেখা গেল, মাঠের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠ পাষাণ আস্তরণে সাজান রয়েছে। এ সব পাথর বেলে। মাঝে মাঝে মহুয়া গাছের তলা দিয়ে যেতে হল। এখন মহুয়া ফুলের সময়, প্রাতে গাছ তলায় যেন পাকা আঙ্গুর বিছান, ফুলগুলা রসে ভরা, রস বেজায় মিষ্টি এবং এক রকম গন্ধযুক্ত। সাঁওতাল নারীরা ফুল কুড়িয়ে বেড়ায় রাখছে। তাদের বাড়ীর উঠানে মহুয়া ফুল শুকাচ্ছে। এ জিনিষটা তাদের উপাদেয় খাদ্য।

দামোদর প্রায় শুষ্ক হয়ে গিয়েছে, বালির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটা বীরত্বের ব্যাপার। দুই তিন মাইল পথ হাঁটতে কষ্ট হয়নি, কিন্তু এক মাইল বালি পার হতে ঘাম ছুটে গেল। দামোদরে ফুট্ খানেক

*"আর্থিক উন্নতি", ফাল্গুন ১৩৩৮ (ফেব্রুয়ারি ১৯৩২)।

জল। দামোদরগর্ভ পার হয়েই একটা 'ডাইক', সেটা পার হয়ে, আবার ঢেউখেলান, পাথুরে মাঠ, পার হয়ে আনন্দপুর গাঁ পেলাম। সেখানে বাউড়ীদের পাড়ার মধ্য দিয়ে যাবার সময় দেখা গেল তাদের দীনতার চিত্র। দারিদ্র্যের চরম অবস্থায় তারা পড়ে রয়েছে, ঘরের চালে প্রায় খড় নাই, জলাভাবে তাদের শাকের ও বেগুনের ক্ষেত শুকিয়ে গিয়েছে, উঠানে মহুয়া শুকাচ্ছে।

সে গ্রামখানা পার হলাম, একটা শুষ্ক ড্রেনের মধ্য দিয়ে। এইটাই পথ। বর্ষার জল এই পথে বয়ে যায়, পাষাণ বেড়িয়ে পড়েছে। ফুট দুই তিন নীচেই এদেশ পাষাণ স্তরে ছাওয়া। বিহারীনাথ খুব নিকটেই দেখা গেল।

এর পরের গ্রামটার নাম কুজকুড়িয়া, আমার পথ-প্রদর্শকের বাড়ী সেই গ্রামে। তাঁর বাড়ীতে গেলাম, তখন নয়টা বেজে গিয়েছে। সেদিনটা মেঘলা ছিল। সেখান থেকে দক্ষিণে রওনা হলাম, প্রায় দুই মাইল গিয়ে একটা গ্রাম পেলাম, গ্রামটা পার হয়ে পূর্ব্বমুখে আধঘণ্টা চলে বিহারীনাথের পাদদেশে উপস্থিত হলাম। পোড়ামাটির মত মাটি এবং কাঁকরের গাদা, মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরগুলা যেন মোষের মত শুয়ে রয়েছে, নানান্ আকারের পাথর গড়াগড়ি যাচ্ছে। এসব পাথরগুলা প্রায় লোহা-পাথর। পাথর দিয়ে পাথর ভেঙ্গে দেখলাম, ভিতরে রক্তাভ বর্ণ লুকান রয়েছে। লোহা পাথরের দেশ।

সকলের আগে বিহারীনাথ অনাদি লিঙ্গ দেখলাম; পাহাড়ের খানিকটা ভেঙ্গে পড়েছে। সে পাথরগুলার অর্দ্ধেক লোহা-পাথর। পাহাড়টা বাঁকুড়া জেলার দ্বিতীয় পাহাড়, সবচেয়ে বড় পাহাড় শুষণীয়া পাহাড়। সেটার খাড়াই ১৪৪২ ফুট, এটা তার চেয়ে কিছু ছোট, প্রায় ১৪০০ ফুটের কম হবে না। পাহাড়ে নানা রকমের গাছ আছে, কিন্তু একটাও বড় গাছ দেখা গেল না। বৎসর বৎসর জ্বালানি কাঠের জন্য

কেটে নেওয়ায় বড় গাছ ফুরিয়ে আসছে। কতক বড় গাছ, চুড়ার কাছাকাছি আছে, সেগুলা কেটে, নীচে আনা সহজ কথা নয়। পাহাড়ে বেড়ান বসন্তকালেই ভাল, বন-জঙ্গল কম, এবং পাহাড়ের রাজবেশ দেখা যায়। পাহাড়ে ঝরণা আছে।

কেঁদ গাছ বিস্তর। নবীন পাতায় গাছ ভরে রয়েছে, এই পাতায় তামাকের বিড়ী পাকান হয়। কল্‌কাতায় বলে "বিড়ীর পাতা"। এই পাতা সংগ্রহের সময় উপস্থিত হয়েছে। সিংভূম, চাঁইবাসা অঞ্চলের পাহাড়গুলোতে এ পাতা বিস্তর পাওয়া যায়। এক পয়সা হিসাবে তাড়া কেনা যেতে পারে, প্রত্যেক তাড়ায় হাজারখানেক পাতা থাকে। ৪০।৫০৲ টাকা পুঁজি হলে পাতার ব্যবসা চলতে পারে। সাঁওতাল মেয়েরা পাতা তুলে দেয় যদি নগদ পয়সা পায়।

পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে 'বেউর বাঁশের' বন। বাঁশের 'কোঁড়' বাহির হবার সময় হয়েছে। নতুন বাঁশগুলার কঞ্চি বেরুবার পূর্ব্বেই সংগ্রহ করে, টুকরা টুকরা করে চিরে আটি বেঁধে কাগজ-কলে বিক্রয় করবার ব্যবস্থা করলে, অল্প পুঁজিতে একটা ব্যবসা চল্‌তে পারে। পাহাড়ে এক রকম ঘাস জন্মায়—সেগুলাও কাগজের উপকরণ হতে পারে।

বেলগাছে প্রকাণ্ড বন—নানা রকমের বেলগাছ। গাছগুলি বেলে ভরা। কত পাকা বেল গাছ তলায় পড়ে রয়েছে। যখন বেল কচি থাকে, তখন অনেক বেল গাছতলায় পড়ে, সেই বেল কুড়িয়ে, চাকা চাকা করে কেটে, শুকিয়ে 'বেলশুঁঠ করা যেতে পারে,—বেলশুঁঠ ডাক্তারি ও কবিরাজি ঔষধে লাগে। কাঁচা ও পাকা বেল থেকে— "একষ্ট্রাক্ট বেলি লিকুইড্" প্রস্তুত করতে পারলে, বাজারে বিলক্ষণ কাটতি হতে পারে। অবশ্য এজন্য কিছু যন্ত্রপাতি কিন্‌তে হয়।

এ দেশে কুচ্‌লে বীজ সংগ্রহ করা যেতে পারে। 'নক্সভমিকা'

'ষ্ট্রিকনিয়া' প্রভৃতি ঔষধ কুচলে বীজ থেকেই হয়। ভেলার বীজ যথেষ্ট পাওয়া যায়, যাকে মার্কিংনট্ বলে। এনাকার্ডিয়মের গাছ আছে, সে ফলের সময় গত-প্রায়, পাকা ফলের শাঁস খায়, বীজমধ্যস্থ আটা বিষাক্ত। ভেলার বীজ ইচ্ছামত সংগ্রহ করা চল্‌তে পারে।

অনন্তমূল প্রচুর পাওয়া যায়, এ জিনিষটার চাহিদা নিতান্ত কম নয়। কলকাতায় আট-দশ আনা সের বিক্রয় হয়, সাঁওতালরা এসব জিনিষ যোগাতে ওস্তাদ। দুই তিন আনায় ভাল অনন্তমূল এক সের মিলে।

কাঁচা 'কেঁদ-ফল' (বন-গাব) ট্যানিক্ এসিডে ভরা। চেষ্টা করলে এ থেকে ট্যানিন্ বার করা যেতে পারে, জাল রং করতে গাবের আবশ্যক হয়, নৌকায় ছোব্ লাগাতে গাবের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ দেশে পাকা কেঁদ লোকে খায়।

হরীতকী কিছু সংগ্রহ হতে পারে। তবে হরীতকী গাছ এখানে প্রচুর নাই।

এ সব ব্যবসা দরিদ্রভাবে চলতে পারে। শ'খানেক টাকা মূলধন হইলেই এক রকম চলতে পারে।

বড় পুঁজির ব্যবসা করতে হলে বিহারীনাথের লোহার পাথক ভেঙ্গে লোহা বের করতে হয়। পাথুরে কয়লার জন্য, দূরে যেতে হবে না, পার্শ্বস্থ ভূভাগের অনতিগভীর স্তরে যথেষ্ট কয়লা আছে। কূপ খুড়তে কয়লা বাহির হয়। নিকটে চূণো-পাথর, আর ম্যাঙ্গানিজের ওর। লোহা গলাই করতে ওগুলার বড় একটা আবশ্যক হয় না, ইস্‌পাত বানাতে হলে দরকার হয়।

বিহারীনাথ ও ইহার সংলগ্ন পাহাড়-মালায় যেসকল কৃষ্ণপ্রস্তর আছে, অল্প চেষ্টায় সেগুলার স্তরগুলাকে ছাড়ান যায়, আর সেই পাথরে টালি বা গৃহের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম তৈরী হতে পারে।

বর্ত্তমান কালে কলিকাতা বেলেঘাটা নিবাসী প্রসিদ্ধ টিম্‌বার মার্চ্চেণ্ট মৃত নফরচন্দ্র পাল মহাশয়ের পুত্রেরা বাঁকুড়ার শুষণীয়া পাহাড়ের মালিক। তাঁহারা পাথরের নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করাইতেছেন, ইমারতের জন্য—মেজে ও দেওয়ালে দিবার জন্য বড় ছোট নানা রকমের টালি তৈরি হচ্ছে। এই টালি নানা স্থানে রপ্তানিও হচ্ছে। বিহারীনাথ ও তৎপারিপার্শ্বিক পাহাড়গুলা হতে ঐ রকমের টালি তৈরি হতে পারে। পূর্ব্বে শুষণীয়া পাহাড়ের মালিক ছিলেন বেঙ্গল ষ্টোন কোম্পানী।

বিহারীনাথ শালতোড়া থানার অন্তর্গত। শালতোড়ায় গ্রাণাইট জাতীয় পাথর আছে, এদেশের লোকে সে পাথরকে 'মিছরি পাথর' বলে। এ পাথরের টালি তৈরি হলে মূল্যবান জিনিষ হবে। উড়িষ্যার খুরদা জংসন ষ্টেশনের অনতিদূরে খুরদা রোডের ধারে, পুলিশ ষ্টেশনের পশ্চাতে একটা মিছরি পাহাড় ( গ্রাণাইট ) কেটে সুন্দর টালি করতে দেখেছিলাম। শালতোড়া পাহাড়ের পাথর থেকে টালি হতে পারে। বিহারীনাথের দক্ষিণ অংশে তিলুড়ী গ্রাম হতে পাকা রাস্তা আছে, সে রাস্তায় মোটরবাস চলে। বিহারীনাথ থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে বা আরও কাছে, বি, এন, আর রেল লাইন গিয়েছে।

দেশে ভীষণ জলকষ্ট, তবে পাহাড়ে ক্ষুদ্র নদীগুলাতে বাঁধ দিলে জল থাকা অসম্ভব।

অদ্য আপনাকে পত্রযোগে যা লিখলাম, তা ছাড়া অনেক-কিছু বলবার আছে। আমাদের স্বাধীন কর্ম্ম-প্রবৃত্তির অভাব হয়েছে, অর্থ চতুর্দ্দিকে ছড়ান রয়েছে, কুড়াবার প্রবৃত্তি নাই। ইতি ৬ই এপ্রিল, ৩২ সন।

পুঃ—বুনো লোকেরা খুব পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। মজুরীর হার কম। এরা সত্যবাদী।

# যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও ঋণ-সমস্যা*

শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, এম-এ

গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ

এক একটা বড় যুদ্ধের দরুণ পৃথিবীর যে ক্ষতি হয়, সেই যুদ্ধে কতগুলি লোক মারা গেল, তাহা দিয়া যে সে ক্ষতির পরিমাপ করা যায় না, গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের দিকে তাকাইলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আজ প্রায় ১৪ বৎসর হইল এই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত আমাদিগকে তাহার জের টানিয়া চলিতে হইতেছে। বর্ত্তমান পৃথিবীজোড়া বিরাট অর্থসঙ্কটের দায়িত্ব যে বহুল পরিমাণে এই মহাযুদ্ধের ঘাড়ে চাপান যায় তাহা সকলেই জানেন। বিভিন্ন দেশ কর্ত্তৃক স্বর্ণমান পরিত্যাগ ও তাহার আনুষঙ্গিক সিক্কা ( কারেন্সী ) নীতির ফলে জিনিষপত্রের দাম-বৃদ্ধি, মধ্য-য়ুরোপের অনেক দেশেরই আর্থিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি অনেকগুলি ঘটনাকে এক হিসাবে বর্ত্তমান সঙ্কটের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। জার্ম্মাণ ক্ষতি-পূরণ ও যুদ্ধঋণও গত মহাযুদ্ধের আর একটী অভিশাপ। এই ব্যাপারটীকে বর্ত্তমান সঙ্কটের একটী প্রধান কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না; এবং এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে—এ সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একমত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভিন্ন জাতির পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থের সংঘাতে আজ পর্য্যন্ত এই সমস্যার

---

* ১৯৩২ সনের ৯ এপ্রিল বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত ( "আর্থিক উন্নতি" জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, মে ১৯৩২ )।

কোনও মীমাংসা হইল না। একাধিক কমিটীর নির্দ্দেশানুসারে বিভিন্ন সময়ে এই সমস্যা বিভিন্নরূপ ধারণ করিলেও ঘটনাসমাবেশে ইহার গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে নাই, এবং কোনও সন্তোষজনক স্থায়ী মীমাংসা না হওয়াতে পৃথিবীর বিভিন্নদেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইতে আরও খারাপ হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি একটু ক্ষীণ আশার আলোক দেখা যাইতেছে; আগামী জুনমাসে লুসেন সহরে যে সর্ব্বজাতি সম্মেলন হইবে, তাহাতে এই গুরুতর সমস্যার আলোচনা হইবে। এই সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করিয়া নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ করিতে পারিবেন—নানা কারণে অনেকেই এইরূপ আশা করিতেছেন।

## রেপারেশন কমিশন

রেপারেশন ও যুদ্ধঋণ ব্যাপারটা বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের জন্য কতখানি দায়ী, এবং এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়ার পক্ষে এই বিষয়ে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়ার কতখানি দরকার, তাহা বুঝিতে হইলে ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতগুলি কথা জানা দরকার।

১৯১৯ সনে ভার্সাই সহরে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, সেই সন্ধিপত্রের ২৩২ নং ধারাতে সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মাণি স্বীকার করে যে, তদানীন্তন বিবিধ মিত্রপক্ষের সহিত যুদ্ধের ফলে তাহাদের অসামরিক অধিবাসিগণের এবং বিবিধ সম্পত্তির যে ক্ষতি ঘটিয়াছিল তাহা পূরণ করিয়া দিবে। এই ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণিকে কত টাকা দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এবং এই টাকা আদায়ের সুব্যবস্থা করিবার জন্য ভার্সাইয়ের সন্ধিসভায় "রেপারেশন কমিশন" নামে একটা সমিতি নিযুক্ত করা হয়; কমিশন ১৯২১ সনের এপ্রিল

মাসে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে এই ক্ষতিপূরণের মোট টাকার পরিমাণ, ১৩,২০০ কোটি সোনার মার্ক নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরে বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় দেশের প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে একটী সম্মেলনে সমবেত হইয়া জার্ম্মাণিকে প্রতি বছর কত টাকা করিয়া এই দেনা শোধ করিতে হইবে, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিলেন; স্থির হইল, জার্ম্মাণি প্রতিবছর ২০০ কোটি মার্ক এবং তাহা ছাড়া নানাদেশে প্রেরিত তাহার রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের মূল্যের শতকরা ২৬ ভাগ করিয়া অতিরিক্ত টাকা মিত্রপক্ষকে দিয়া তাহার "পাপের" প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহা ছাড়া সেই বছরই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তাহাকে ১০০ কোটি মার্ক দেওয়ার জন্য হুকুম করা হইল।

দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা খুবই শোচনীয় থাকা সত্ত্বেও বিজয়ী মিত্রপক্ষের দাবী জার্ম্মাণিকে অবনত মস্তকে মানিয়া নিতে হইল; কিন্তু বছর ঘুরিয়া আসিতে না আসিতেই আর্থিক দুরবস্থার জন্য তাহার পক্ষে কিস্তির সমস্ত টাকা দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ১০০ কোটি মার্ক দেওয়ার সময় মার্কের দাম কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল; পরে অবস্থা আরও শোচনীয় হওয়াতে মিত্রপক্ষ প্রথমে জার্ম্মাণিকে একটু খাতির করিলেন বটে, কিন্তু ১৯২৩ সনের জানুয়ারী মাসে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় ফরাসী প্রভাবান্বিত রিপারেশন কমিশন জার্ম্মাণিকে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং এই অজুহাতে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রূঢ়দেশ আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিল। এদিকে জার্ম্মাণির বজেটেও আয়ব্যয়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে ঘাটতি পড়িয়া গেল, এবং মার্কেরও আন্তর্জ্জাতিক মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গেল। অবস্থা ক্রমশই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া

সেই বৎসর নবেম্বর মাসে রিপারেশন কমিশন প্রধানতঃ জার্ম্মাণির আয়ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার জন্য এবং মার্কের স্থিরতা রক্ষা করিবার জন্য জেনারেল ডয়েস্এর নেতৃত্বে একটী কমিটী নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে খুসী করিবার জন্য কমিশন রেপারেশন সম্বন্ধে কমিটীকে কোনও স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেন নাই ; কিন্তু জার্ম্মাণির বজেটের সঙ্গে এই সমস্যার এত নিকট সম্পর্ক ছিল ( এবং এখনও আছে ) যে, "ডয়েস্ কমিটী" এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিবেন—ইহা ধরিয়াই নেওয়া হইয়াছিল।

## ডয়েস্ কমিটির রিপোর্ট

১৯২৪ সনের ১১ই এপ্রিল ডয়েস্ কমিটীর রিপোর্ট বাহির হইল। কমিটী নিম্নলিখিতরূপে জার্ম্মাণি কর্ত্তৃক তাহার দেয় টাকা শোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন ঃ ১৯২৪-২৫ সনে তাহাকে ১০০ কোটী মার্ক দিতে হইবে ; ক্রমে এই সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ১৯২৮-২৯ সনে ইহার পরিমাণ হইবে ২৫০ কোটি মার্ক ; এই শেষোক্ত সংখ্যাকে মূল ভিত্তি করিয়া ইহার পরবর্ত্তী বৎসরসমূহে সোনার ক্রয়শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে প্রতি বছর জার্ম্মাণির দেয় টাকা কমানো কিংবা বাড়ানো হইবে ; এই পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে জার্ম্মাণিকে তাহার আর্থিক সম্পদ্-বৃদ্ধির অনুপাতে আরও কিছু টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে। এইভাবে যতদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির সমস্ত দেনা শোধ না হয়, ততদিন তাহাকে টাকা দিয়া যাইতে হইবে ডয়েস্ কমিটী এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেন।

প্রথম কয়েক বৎসর জার্ম্মাণির আর্থিক দুরবস্থা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে রেপারেশনের গুরুভারে তাহার বজেটের উপর অত্যধিক

চাপ না পড়ে, সেইজন্য ডয়েস্ কমিটির নির্দ্দেশানুসারে মিত্রপক্ষীয়েরা চাঁদা করিয়া তাহাকে ৮০ কোটি মার্ক ধার দিলেন; (এই টাকার অধিকাংশ ইংলণ্ড ও আমেরিকার মহাজনেরা দিয়াছিলেন)। অপর-পক্ষে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ে যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য জার্ম্মাণির আভ্যন্তরিক শাসন ও রাজস্বপদ্ধতির উপর কিয়ৎ-পরিমাণে মিত্রপক্ষের কর্ত্তৃত্ব রাখিবার জন্য কমিটী কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছিলেন; তাঁহাদের এই প্রস্তাবানুসারে জার্ম্মাণ রেলওয়ে কোম্পানীর আয়ের টাকা, কয়েকটী বিশেষ বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ এবং পাঁচটী রাজস্ব দফা হইতে সংগৃহীত সমস্ত টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। এবং ইহা তদারক করিবার জন্য মিত্র পক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন বিদেশী কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। শেষোক্ত পাঁচটী রাজস্ব দফার মধ্যে চারিটি দফার হার কমাইবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টকে উক্ত কমিশনারের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাও হইল। দ্বিতীয়তঃ, রেলওয়ে কোম্পানী পরিচালনার জন্য ১৮ জন সভ্য নিয়া একটী বোর্ড গঠিত হইল এবং তাঁহাদের মধ্যে ৯ জন মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিকে নেওয়া হইল; অবশ্য এই ৯ জনের মধ্যে ৫ জন জার্ম্মাণ-দেশবাসী ছিলেন। তৃতীয়তঃ, জার্ম্মাণির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। রাইখ্‌সবাঙ্কের পরিচালক সভার ১৪ জন সভ্যের মধ্যে অর্দ্ধেক মিত্রপক্ষের প্রতিনিধি থাকিবেন, এবং কাগজী মুদ্রা পরিচালনের জন্য দায়ী একজন কমিশনার নিযুক্ত হইবেন—এইরূপ ব্যবস্থাও হইল। ইহা ছাড়া সমস্ত পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য আর একজন কর্ম্মচারী "এজেণ্ট জেনারেল ফর রিপারেশনস্" নিযুক্ত করা হইল। যাহাতে প্রতি বছর এত টাকা জার্ম্মাণি হইতে অন্যান্য দেশে চালান দেওয়ার ফলে মার্কের বাজার-দরের কোনও হ্রাসবৃদ্ধি না হয়, সেই বিষয়ে সুব্যবস্থা করিবার জন্য

বাট্টা-বিশারদ কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়া একটি "ট্র্যান্সফার" কমিটিও নিযুক্ত হইল।

পূর্ব্ব ব্যবস্থা হইতে এই ব্যবস্থার পার্থক্য সম্বন্ধে এ স্থানে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যুদ্ধ-জয়ের অব্যবহিত পরে বিজয়ী মদোন্মত্ত মিত্রপক্ষীয়েরা ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা জার্ম্মাণিকে যা হুকুম করিবেন সে তাহাই মানিয়া লইবে; যখন রিপারেশন কমিশন মিত্রপক্ষের দাবীর পরিমাণ ১৩,২০০ কোটি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাও জার্ম্মাণির কতটাকা দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাহা বিবেচনা করেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন পরাজিত জার্ম্মাণির নিকট হইতে তাঁহারা কত টাকা আদায় করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মাণির প্রতি বিশেষভাবে বিদ্বেষপরায়ণ ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হওয়াতে এবং কোন বিষয়ে সভ্যগণের সমান সংখ্যা বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিলে তাঁহার একটী অতিরিক্ত ভোট থাকাতে অধিকাংশ সময়ে রিপারেশন কমিশনের সিদ্ধান্তে ফরাসী প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইত; ইহাতেও খুব বেশী ক্ষতি হইত না, যদি মঁসিয়ে ব্রিঁয়া—অতি অল্পদিন হইল যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—এই সময় ফরাসী রাজনীতির কর্ণধার থাকিতেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ফরাসীরা সেই সময় জার্ম্মাণির প্রতি এত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন যে, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত শান্তিকামী ব্রিঁয়ার স্থলে জার্ম্মাণির পরম শত্রু মঁসিয়ে পঁয়কারেকে তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রীর পদে নির্ব্বাচিত করিয়া রিপারেশন সমস্যাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৯২৩ সনের জানুয়ারী মাসে নিতান্ত অবিবেচকের ন্যায় জার্ম্মাণিকে দেউলিয়া ঘোষণা করিয়া রিপারেশন কমিশন তাঁহাদের কার্য্যনীতির উপর ফরাসী প্রভাবের এই আতিশয্যের প্রমাণ দিয়াছিলেন। এই একই কারণে রিপারেশনের টাকা জার্ম্মাণির

তৎকালীন আর্থিক অবস্থায় দেওয়া কতখানি কষ্টসাধ্য তাহা বিবেচনা করা তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন নাই, এবং দূরদৃষ্টির অভাবে তাঁহাদের অনুসৃত নীতির ফলে সাক্ষাৎভাবে জার্ম্মাণির এবং পরোক্ষ-ভাবে সমস্ত পৃথিবীর আর্থিক অবস্থার কি গতি হইবে, সেদিকেও তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন নাই। তৃতীয়তঃ, রিপারেশন কমিশনের অধিকাংশ সভ্য ছিলেন বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক প্রতিনিধি —অর্থনীতির সহিত প্রায় কোনও সদস্যেরই কোনও সম্পর্ক ছিল না। কাজেই জার্ম্মাণিকে তাঁহারা যে টাকা দেওয়ার হুকুম করিয়াছিলেন, সেই টাকা জার্ম্মাণি হইতে বিদেশে বিভিন্ন মিত্রপক্ষদের নিকট পৌঁছানোতে মার্কের দাম যে কিরূপ কমিয়া যাইতে পারে তাহা তাঁহারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

১৯২৪ সনে ডয়েস কমিটীর নির্দ্দেশানুযায়ী গৃহীত নূতন ব্যবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থার এই দোষগুলি ছিল না। প্রথমতঃ, যদিও কমিটীর সদস্যগণ রাজনৈতিক প্রভাববিশিষ্ট রিপারেশন কমিশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা সকলেই অর্থনীতিবিশারদ ছিলেন, এবং অনেক পরিমাণে স্ব স্ব দেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রভাব হইতে নিজদিগকে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া কমিটীর সভাপতি এবং আর একজন সদস্য নিরপেক্ষ আমেরিকাবাসী ছিলেন বলিয়া কমিটী তাঁহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় জার্ম্মাণি কিংবা মিত্রপক্ষ কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিবেন না, সকলেই এই আশা করিয়াছিলেন, এবং ইহা একরূপ জোর করিয়াই বলা যায় যে, তাঁহাদের সব সিদ্ধান্তগুলিই অভ্রান্ত না হইলেও তাঁহারা রিপারেশন সমস্যার মীমাংসা করিবার সময় কেবল-মাত্র ইহার অর্থনৈতিক দিক্‌টাই দেখিয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক মতামত দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ,

তাঁহারা জার্ম্মাণির মোট দেনা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া প্রথম পাঁচ বৎসর জার্ম্মাণিকে কি দিতে হইবে, জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেবল তাহাই আলোচনা করিয়াছিলেন ; এই পাঁচ বৎসরে জার্ম্মাণির দেয় টাকার তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় জার্ম্মাণির আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে আংশিক কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া টাকা আদায় করিতে যাহাতে বিশেষ কোনও বেগ পাইতে না হয় সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, প্রথম বৎসর যুগপৎ একটী আন্তর্জ্জাতিক ঋণের ব্যবস্থা এবং জার্ম্মাণিকে সেই বৎসরে কিস্তির টাকা দিতে হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অনেকের মতে জার্ম্মাণিকে সেই বৎসরের জন্য রেহাই দেওয়াই উচিত ছিল, এবং তাহা হইলে আবার উল্টা ঋণের ব্যবস্থার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ডয়েস্ কমিটী চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, জার্ম্মাণির তৎকালীন আর্থিক অবস্থায় যদি একটী আন্তর্জ্জাতিক ঋণের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে বাজার-সম্ভ্রম খুবই বাড়িয়া যাইবে এবং যদি এই ঋণ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে দেয় টাকা দিতে বেশী কষ্ট হইবে না। চতুর্থতঃ, জার্ম্মাণির পক্ষে প্রতি বছর কিস্তির টাকা সংগ্রহ করা এবং তাহা মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে পাঠান, এই দুইটি ব্যাপার যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং শেষোক্ত ব্যাপারের সঙ্গে যে আন্তর্জ্জাতিক বাট্টার বিশেষ সম্পর্ক আছে কমিটি তাহাও ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; এবং এই জন্য তাঁহারা একদিকে যেমন টাকা আদায়ের সুব্যবস্থা করিলেন, অপর পক্ষে সেই টাকা বিদেশে চালান করা যাহাতে সহজ হয়, সেই জন্য তাহার দায়িত্ব মিত্রপক্ষীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা সংগঠিত একটী ট্র্যানস্‌ফার কমিটী নিয়োগ করিয়া তাহার উপর দিলেন। যাহাতে এই কমিটীর কাজে কোনও পক্ষপাতিত্ব সন্দেহ করার অবকাশ না

থাকে, সেই জন্য কমিটির সদস্যগণের মধ্যে অন্ততঃ একজন আমেরিকান থাকেন এইরূপ নির্দ্দেশও তাঁহারা করিলেন। সর্ব্বোপরি এই একই উদ্দেশ্যে "এজেণ্ট জেনারেল ফর রিপারেশন"—যাঁহার উপর সমস্ত ব্যাপার তদারক করিবার ভার ন্যস্ত হয় তিনিও—যেন আমেরিকান্ হন ডয়েস্ কমিটী এইরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে, কমিটী স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণির আভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে সারা য়ুরোপে এবং পৃথিবীতেও কোনও কালে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না এবং তাঁহারা এই মূলনীতি স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট ডয়েস্ কমিটীর সকল সিদ্ধান্তেই যে খুব খুসী হইয়াছিলেন তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া কমিটীর নির্দ্দেশ মানিয়া লইলেন; এবং ১৯২৮-২৯ সন পর্য্যন্ত—অর্থাৎ যে বৎসরকে ডয়েস্ কমিটী প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই বৎসর পর্য্যন্ত সময় মত তাঁহাদের সকল দেনা শোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও কমিটীর নির্দ্দেশানুযায়ী ব্যবস্থা হওয়ার দরুণ জার্ম্মাণির আভ্যন্তরিক আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছিল, তথাপি কতকগুলি কারণে জার্ম্মাণিতে এই ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল। রাইখসবাঙ্ক, রেলওয়ে কোম্পানী প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজস্ব ব্যবস্থার উপর বৈদেশিক প্রভুত্ব যে জার্ম্মাণির অধিবাসিগণ অপমানজনক বলিয়া মনে করিবেন তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। অপর পক্ষে মিত্রপক্ষীয়েরা তাঁহাদের উপর সংগৃহীত টাকা বিদেশে চালান দেওয়ার যে ভার ছিল, তাহা আর বহন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন। তৃতীয়তঃ, ডয়েস্ কমিটী যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে রেপারেশন সম্বন্ধে জার্ম্মাণির মোট দেনার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না

হওয়াতে একটা অনিশ্চয়তার ভাব থাকার দরুণ জার্ম্মাণি অনেক-কিছু কর্ম্মপদ্ধতি স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সব নানা কারণে ১৯২৮ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর জেনেভায় বেলজিয়াম, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান এবং জার্ম্মাণি—এই ছয়টী দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া একটী কমিটী নিয়োগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। উপরোক্ত প্রত্যেক দেশ এবং আমেরিকা হইতে তুইজন করিয়া ১৪ জন বিশেষজ্ঞ নিয়া এই কমিটী নিযুক্ত হইল। অন্যতর আমেরিকান প্রতিনিধি মিঃ আওয়েন ডি ইয়ং ইহার সভাপতি ছিলেন বলিয়া ইহাকে ইয়ং কমিটী বলা হয়। ইয়ং কমিটী ১৯১৯ সনের ৭ই জুন তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন।

## ইয়ং কমিটীর ব্যবস্থা

রেপারেশন বাবদ জার্ম্মাণিকে কত টাকা দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে এই টাকা বিদেশে চালান দেওয়া সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে—ইয়ং কমিটী সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে মনোযোগ দিলেন। এক দেশ হইতে অন্য দেশে এই বৃহৎ পরিমাণ টাকা লেনদেন করা যে সম্পূর্ণরূপে একটী অর্থনৈতিক সমস্যা সে কথা তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। ডয়েস্ কমিটীও যে ইহা না বুঝিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহাদের প্রস্তাবিত ট্রান্সফ্যার কমিটী সম্পূর্ণভাবে একটী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানই ছিল; কিন্তু ডয়েস কমিটীর সিদ্ধান্তের সহিত ইয়ং কমিটীর সিদ্ধান্তের অন্যতম প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, ইয়ং কমিটী এই বৃহৎ পরিমাণ টাকার লেনদেন একটা সামান্য কমিটীর হাতে (সেই কমিটীর সদস্যগণ যতই অর্থনীতিবিশারদ হউন না কেন) ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে একটী নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিলেন।

এইরূপ একটী আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইয়ং কমিটী যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার অন্য আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল। অনেকদিন হইতেই বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের প্রয়োজন সকল দেশেরই চিন্তাশীল অর্থনীতিবিদ্‌গণ অনুভব করিতেছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি যে কোনও সময়েই পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করে নাই তাহা নহে; কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা যাইত যে, তাঁহাদের একের কার্য্যনীতির সহিত অন্যের কার্য্যনীতির সামঞ্জস্য ছিল না; অথচ বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সব সময়েই এত বেশী টাকার আদান-প্রদান হয় যে, অনেক সময়ই সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একযোগে কাজ করার দরকার হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির পরস্পরের মধ্যে একটী যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্যই যদি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে যে তাহার জন্য আরও অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হইত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। রেপারেশন সমস্যা ১৯২৯ সনে এত গুরুতর না হইলে ইয়ং কমিটিও হয়ত ডয়েস্ কমিটী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ট্র্যান্সফ্যার কমিটীর অনুরূপ অন্য কোনও কমিটীর নিয়োগের ব্যবস্থা করিতেন; কিন্তু তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তৎকালীন সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম এরূপ একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহার ফলে এক দেশ হইতে অন্য দেশে বৃহৎ পরিমাণ টাকা সহজে চালান দেওয়া যাইতে পারে। একই দেশের মধ্যে যখন টাকাপয়সার লেনদেন ব্যাঙ্ক ছাড়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, তখন আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনও একটী ব্যাঙ্কের সাহায্য ছাড়া সন্তোষজনকরূপে হইতে পারে না—কমিটীর এই সিদ্ধান্তে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই।

সকল প্রকার রাজনীতির বন্ধন হইতে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কটীকে মুক্ত করিবার জন্য এবং যাহাতে ইহার কার্য্যাবলীতে কোনও দেশের প্রতি পক্ষপাত না করা হয়, সেই উদ্দেশ্যে কমিটী কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কের মূলধন কোনও এক বিশেষ দেশ হইতে গ্রহণ না করিয়া পৃথিবীর সকল দেশ—বিশেষতঃ রেপারেশন সমস্যার সঙ্গে যে সব দেশের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, সেই সব দেশ—হইতে যোগাড় করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের পরিচালনার ব্যাপারে সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতা স্থাপনের জন্য কমিটী প্রস্তাব করিলেন যে, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড, ইতালী, জাপান ও আমেরিকা—এই সাতটী দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাতজন গবর্ণর (বা প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ) ও এই গবর্ণরগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত স্ব স্ব দেশীয় অতিরিক্ত আরও সাতজন এবং ইহা ছাড়া অন্য যে সব দেশ হইতে ব্যাঙ্কের মূলধন যোগাড় করা হইবে সেই সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গবর্ণরগণ কিংবা গবর্ণরগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে উপরি লিখিত ১৪ জন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আরও ৯ জন—সর্ব্বসুদ্ধ এই ২৩ জন সদস্য নিয়া ব্যাঙ্কের পরিচালক সভা গঠন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া রেপারেশন সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গবর্ণরগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত আরও দুইজন—এই সভার সদস্য থাকিবেন—কমিটী এইরূপ প্রস্তাবও করিলেন। তৃতীয়তঃ, কোনও বিশেষ দেশের আইন দ্বারা ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী যাহাতে চালিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে যাহাতে সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট পরস্পরের সহিত একটী চুক্তি করেন কমিটী এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেন।*

---

* এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের "আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (আর্থিক উন্নতি"—১৩৩৬, মাঘ)।

প্রথমেই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে এত কথা বলিয়া ইয়ং কমিটী রেপারেশন বাবদ জার্ম্মাণিকে কত টাকা দিতে হইবে তাহার আলোচনা করিলেন। এই বিষয়ে ডয়েস্ কমিটীর নির্দ্দেশের মধ্যে যেটুকু অনিশ্চয়তা ছিল—তাঁহারা তাহা দূর করিয়া দিলেন। ১৯২৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে তাঁহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হউক, তাঁহারা এই মত প্রকাশ করিলেন; এবং এই সময় হইতে ১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাত মাসের, এবং তাহার পরে প্রতি বছর ১লা এপ্রিল হইতে পর বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত হিসাবে পরবর্ত্তী ৫৮ বৎসরের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথম পূর্ণ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩০-৩১ সনে জার্ম্মাণিকে ১৭০ কোটি রাইখ্‌স্ মার্ক দিতে হইবে, পরে এই সংখ্যা মাঝে মাঝে কমিয়া, মাঝে মাঝে বাড়িয়া ১৯৬৫-৬৬ সনে ২৪৩ কোটি হইবে, এবং তাহার পরে আবার কমিতে কমিতে ১৯৮৭-৮৮ সনে ৮৯ কোটি হইবে—কমিটী এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেন। এই হিসাবে ১৯২৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৬৫ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই ৩৬½ বৎসরে জার্ম্মাণির বাৎসরিক দেনার পরিমাণ গড়পড়তা ১৯৮ কোটি ৮৮ লক্ষ রাইখ্‌স্ মার্ক হয়।

এই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিটি নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাব করিলেন। (১) ডয়েস কমিটীর নির্দ্দেশানুসারে জার্ম্মাণ রেলওয়ে কোম্পানী মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধির নিকট ১১০০ কোটি মার্কের একটী খত লিখিয়া দিয়াছিলেন—এবং এই খতে সুদ বাবদ প্রতি বৎসর ৬৬ কোটি মার্ক তাঁহার নিকট জমা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যাহাতে এই টাকা নিয়মিতভাবে আদায় হয় সেইজন্য রেলওয়ে কোম্পানীর পরিচালকসভার ১৮ জন সভ্যের মধ্যে যাহাতে ৯ জন মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধি থাকেন সে ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। ইয়ং কমিটি রেলওয়ে কোম্পানীর দেয় টাকার পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিলেন

না বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, খত হইতে কোম্পানীকে রেহাই দিতে হইবে এবং কোম্পানীর পরিচালনার ব্যাপারে বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব একেবারেই তুলিয়া দিতে হইবে। তৎপরিবর্ত্তে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট নিজেদের দায়িত্বে রেলওয়ে কোম্পানীর উপর এমন একটী কর ধার্য্য করিবেন যাহার ফলে প্রতি বৎসর রেলওয়ে কোম্পানী হইতে ৬৬ কোটি টাকা আদায় হইবে।

(২) এই ৬৬ কোটি টাকা ছাড়া বাকী টাকা জার্ম্মাণির প্রতি বছরের বজেটের নিয়মিত খরচের অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হইল। ডয়েস কমিটি এই উদ্দেশ্যে পাঁচটী রাজস্ব দফা সম্বন্ধে যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—ইয়ং কমিটি তাহা তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। এই টাকা দেওয়া সম্বন্ধে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি ভিন্ন অন্য কোনওরূপ ব্যবস্থা করার বিরুদ্ধে তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন।

(৩) কয়েকটী বিশেষ বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ হইতে রেপারেশনের টাকা আদায়ের যে ব্যবস্থা ডয়েস্ কমিটি করিয়াছিলেন—ইয়ং কমিটি তাহার কোনও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন না।

(৪) ডয়েস্ কমিটির নির্দ্দেশানুসারে গৃহীত ব্যবস্থায় ইহা ছাড়া জার্ম্মাণির আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে অন্য যেসব বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব ছিল—ইয়ং কমিটি সে সমস্তও তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন।

(৫) এক দিকে যেমন এই সমস্ত বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব তুলিয়া দেওয়া হইল, অপর পক্ষে এত টাকা বিদেশে চালান দেওয়ার জন্য এতদিন যে দায়িত্ব ট্র্যান্সফার কমিটির ঘাড়ে ছিল—কমিটি তাহা জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপাইলেন। অর্থাৎ জার্ম্মাণি হইতে রিপারেশন বাবদ সমস্ত টাকা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট চালান দেওয়ার ভার এবং মার্কের আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের সমতা রক্ষার দায়িত্ব এখন হইতে

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টকেই গ্রহণ করিতে হইবে ইয়ং কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করিলেন।

কিন্তু এই বিষয়েও যাহাতে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে কমিটি আর একটি অভিনব প্রস্তাব করিলেন।

জার্ম্মাণির মোট বাৎসরিক দেনাকে কমিটি দুইটী ভাগে ভাগ করিলেন—কন্‌ডিশনাল্ ও আন্‌কন্‌ডিশনাল্ অর্থাৎ "সর্ত্তে দেয়" ও "অবশ্য-দেয়"। জার্ম্মাণির আভ্যন্তরিক অবস্থা যে চিরকালই খুব ভাল থাকিবে না, গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে কমিটী ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই সময় এত টাকা তাহার পক্ষে মিত্রশক্তিবর্গকে দেওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতে পারে, নিদেন পক্ষে এত টাকা বিদেশে চালান দেওয়ার ফলে মার্কের আন্তর্জ্জাতিক মূল্য বজায় রাখা দায় হইতে পারে, তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিলেন। সেইজন্য তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, অবস্থা-বিশেষে জার্ম্মাণি যখন তাহার বাৎসরিক দেনা শোধ করিতে কিংবা বিদেশে চালান দিতে অপারগ হইয়া পড়িবে তখন দুই বৎসরের জন্য তাহাকে প্রতি বৎসর ৬৬ কোটি মার্ক ছাড়া বাকী টাকা হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট যখন বুঝিতে পারিবেন যে, এত টাকা বিদেশে চালান দিতে গেলে তাঁহাদের পক্ষে মার্কের মূল্য স্থিরভাবে রাখা কষ্টকর হইবে। তখন তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া দুই বৎসরের ৬৬ কোটি টাকা ব্যতীত বাকী টাকা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট চালান দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং তখন এই টাকা তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের নামে রাইখ্‌স্ বাঙ্কে জমা রাখিবেন— ইয়ং কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করিলেন। জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত আরও খারাপ হইলে এই টাকা রাইখ্‌স্ বাঙ্কে জমা

রাখার দায় হইতেও জার্ম্মাণিকে রেহাই দেওয়া হইবে—কমিটি এইরূপ প্রস্তাবও করিলেন।

এইরূপ অবস্থার উদয় হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক একটী বিশেষ পরামর্শ-সভা গঠন করিবেন। সাতটী দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গবর্ণরগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত সাত জন প্রতিনিধিকে লইয়া এই কমিটি গঠন করা হইবে। বাস্তবিক পক্ষে জার্ম্মাণির আভ্যন্তরিক অবস্থায় "কন্‌ডিশ্যনাল" টাকা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট চালান দেওয়া কিংবা আদৌ এই টাকা রাইখ্‌সবাঙ্কে জমা রাখা অসাধ্য কিনা এবং যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থায় কি করা উচিত এই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া এই কমিটির কর্ত্তব্য হইবে, ইয়ং কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করিলেন।

ইয়ং কমিটির প্রস্তাবগুলি মোটামুটিভাবে উপরে বর্ণনা করা হইল। ১৯২৯ সনের জুন মাসে তাঁহাদের রিপোর্ট বাহির হয়; সেই বৎসর আগষ্ট মাসে ও পর বৎসর জানুয়ারীতে হেগ্‌ সহরে সকল দেশের প্রতিনিধিগণের দুইটী সম্মেলন হয়; এই দুইটী সম্মেলনে সামান্য কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ইয়ং কমিটির রিপোর্ট সকলে গ্রহণ করেন।

ডয়েস্‌ কমিটির ব্যবস্থা হইতে ইয়ং কমিটির ব্যবস্থার তফাৎ সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ইয়ং কমিটির প্রস্তাবের প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, রিপারেশন বাবদ জার্ম্মাণিকে কতদিনের জন্য কত টাকা দিতে হইবে কমিটি যে কেবল তাহাই স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের প্রস্তাবিত গড়পড়তা বাৎসরিক দেনা ডয়েস্‌ কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত পঞ্চম বৎসরের দেনা—যাহাকে মূলভিত্তি করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষাও অনেক কম ছিল; এমন কি ইয়ং কমিটির ব্যবস্থায় যে বৎসর সব চেয়ে বেশী দিতে হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেই বৎসরও ডয়েস্‌ কমিটির প্রস্তাবিত এই টাকা হইতে

কম দিতে হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ তাঁহারা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, সকল প্রকার বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব তুলিয়া দিয়া একটি সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ ব্যাঙ্কের উপর সমস্ত বিষয়ের তদারক করার ভার দেওয়া হইল; এবং রিপারেশন সমস্যা হইতে রাজনীতির প্রভাব একেবারেই তুলিয়া দেওয়া হইল। তৃতীয়তঃ, মিত্রশক্তিবর্গও এই ভাবিয়া খুসী হইলেন যে, এখন হইতে প্রতি বৎসর কত টাকা পাওয়া যাইবে তাহার একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া গেল, এবং ইহার ফলে তাঁহাদের স্ব স্ব দেশের বজেটের মধ্যে যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব ছিল তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল।

সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, এইবার বোধ হয় রিপারেশন সমস্যার সমাধান হইল; কিন্তু গত দুই বৎসরের মধ্যে এই সমস্যা কিরূপ তীব্রভাব ধারণ করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করার পূর্ব্বে যুদ্ধ-ঋণ সমস্যা সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা দরকার; কারণ গত দুই বৎসরের ঘটনাবলীর সহিত এই দুইটী সমস্যা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আমরা এতক্ষণ রিপারেশন বাবদ জার্ম্মাণি মিত্রশক্তিবর্গকে কত টাকা দিবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় দেশগুলি এই মোট টাকার কত অংশ পাইবে তাহার আলোচনা করি নাই। এই বিষয়ে বিশেষ কিছু না বলিয়া কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রথমে ১৯২০ সনে স্পা সহরে জার্ম্মাণির পাওনাদারদের একটি সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের অংশ নির্দ্ধারিত হয়; পরে ১৯২৫ সনে প্যারী সহরে আর একটী সম্মেলনে এই অংশবিভাগের কিছু পরিবর্ত্তন হয়, এবং তাহার ফলে বিভিন্ন দেশের পাওনা নিম্নলিখিতরূপ স্থিরীকৃত হয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফ্রান্স | মোট টাকার | শতকরা | ৫৪·৪৫ ভাগ |
| বৃটীশ সাম্রাজ্য | ঐ | ঐ | ২৩·০৫ |
| ইটালী | ঐ | ঐ | ১০·০০ |
| বেলজিয়াম | ঐ | ঐ | ৪·৫০ |
| জাপান | ঐ | ঐ | ০·৭৫ |
| জুগোশ্লাভিয়া | ঐ | ঐ | ৫·০০ |
| পর্ত্তুগাল | ঐ | ঐ | ০·৭৫ |
| রুমাণিয়া | ঐ | ঐ | ১·১০ |
| গ্রীস | ঐ | ঐ | ০·৪০ |
| মোট | | | ১০০ |

## যুদ্ধ-ঋণ

যুদ্ধ-ঋণের সমস্যাটা ক্ষতিপূরণ সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৯২২ সনের আগষ্ট মাসের বালফুর নোট মিত্র শক্তিবর্গের নিকট আদৃত হইলে সুফল ফলিত। আমেরিকা একমাত্র উত্তমর্ণ দেশ। কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধ-ঋণ সমস্যাকে ক্ষতিপূরণ সমস্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। সেজন্য অনেক গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। আমেরিকার এই রক্ষণশীল নীতির প্রথম অন্যথা করেন হুভার। তিনি সাহসের সঙ্গে এক বৎসরের জন্য যুদ্ধ-ঋণ ও ক্ষতিপূরণ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। একদিকে জিনিষপত্রের দরের অতিশয় গুরুতর পতন হইয়াছে; অন্যদিকে জনগণের ক্রয়-ক্ষমতাও কমিয়াছে। মধ্য ইয়োরোপে আর্থিক সঙ্কট চলিতেছে, সুতরাং জার্ম্মাণির পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়া দুঃসাধ্য।

সকল দেশ হুভার প্ল্যান গ্রহণ করিলেও জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থার

উন্নতি হয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের কাছে জার্ম্মাণিকে এজন্য নিবেদন করিতে হইয়াছে। গত ১৮ই জানুয়ারী এ বিষয়ে এক সম্মেলন ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই উহা জুন মাসে বসিবার জন্য মুলতুবী থাকে। আগামী সম্মেলনে বিভিন্ন শক্তিবর্গ স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত না থাকিলে দুনিয়ার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

## আলোচনা

বক্তার বক্তৃতার পর বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ও "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের সদস্যগণ আলোচনায় যোগ দেন। এই আলোচনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় সাঁওতালদের সরল জীবন যাপন প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যতদিন আমরা আমাদের অভাব কমাইতে না পারিব ও ঐরূপ সরল জীবনধারা অবলম্বন না করিব, ততদিন দুনিয়ার দৈন্য ও হাহাকার কিছুতেই কমিবে না। অ্যাড্‌ভোকেট পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় বলেন, জগতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, অতএব আমরাও যে দুনিয়ার দুর্য্যোগে ভুগিব তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বলেন, বর্ত্তমান সভ্যতার দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত না হইলে ও সভ্য দেশসমূহ পরস্পরের প্রতি হিংসা-দ্বেষ বিস্মৃত না হইলে কোন প্রকার মীমাংসার আশা করা যায় না।

## আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রশঙ্কর রায় প্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার উপর জোর দেন। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি এই সময়ে যেসকল সমস্যার সমাধান করিতে শিক্ষা পাইতেছে, তন্মধ্যে ক্ষতিপূরণ ও যুদ্ধঋণ অন্যতম সমস্যা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, মীমাংসার পথ যে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, তাহা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার মতে যুদ্ধ ও ক্ষতিপূরণ যতই অনিষ্টকর হোক না, এই দুটী বস্তু লোকের দৃষ্টি পরস্পরের সহযোগিতার দিকে ফিরাইয়া মহদুপকার সাধন করিতেছে।

তৃতীয় প্রকার আলোচনায় সমস্যা দুটিকে বিশেষ একটা দিক্ হইতে দেখিবার চেষ্টা করা হয়। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেন, বক্তার সমুদায় আলোচনা হইতে শ্রোতারা মনে এই ধারণা করিতে বাধ্য যে ক্ষতিপূরণ ও যুদ্ধঋণ সমস্যা বস্তুতঃ টাকা আনা পাইয়ের সমস্যা ছাড়া আর কিছু নয়। দেনা পাওনা, বিশেষভাবে আন্তর্জ্জাতিক দেনা পাওনা, সকল প্রকার আর্থিক প্রচেষ্টা, শিল্প, বাণিজ্য, সিক্কা, বিনিময় প্রভৃতির উপর সকল দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা তিনি প্রদর্শন করেন। তাঁহার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, যদিও কথাটা শুনিতে পরার্থপরতার মত তথাপি জগতের মঙ্গল ও স্বার্থ-রক্ষার জন্য দরকার যুদ্ধঋণ প্রভৃতিকে একেবারে মুছিয়া ফেলা; তাহা না হইলে শুধু যে অধমর্ণ দেশসমূহের সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা নহে, উত্তমর্ণ দেশসমূহও ক্রমে ক্রমে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে প্রথমতঃ এবিষয়ে গত ছয় সাত বৎসরে "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকার মারফৎ যে আলোচনা হইয়াছিল তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলা ভাষায় ডয়েস্ কমিটির চুম্বক প্রকাশ একমাত্র এই পত্রিকাই করিয়াছে। তিনি বলেন, যুদ্ধঋণ ও ক্ষতি পূরণকে একটা খাপছাড়া সমস্যারূপে বিবেচনা করিলে চলিবে না, ইহা অন্য পাঁচটা সমস্যার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত আছে। একথা ভুলিয়া গেলে কিছুতেই চলিবে না যে, যুদ্ধের পূর্ব্বের দুনিয়ার সহিত যুদ্ধের পরের দুনিয়ার আকাশ-পাতাল তফাৎ। পূর্ব্বেও অনেক যুদ্ধ হইয়াছে

এবং যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ লইয়াও অনেক লোককে মাথা ঘামাইতে হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রত্যেক সমস্যার নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী সকল যুদ্ধের সমস্যাসমূহ ছেলে খেলা মাত্র। সেইজন্য সভ্য দেশসমূহ তাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা-দ্বারা হালে পানি পাইতেছে না। এক দিক্ হইতে যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণকে যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এক নূতন সমস্যারূপে গ্রহণ করা চলে, তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য পূর্ব্বে যে পথে চলিতেছিল, যুদ্ধ আসিয়া তাহা ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে তিনি বলেন শুধু সহযোগিতা দ্বারা দুনিয়ার মানদণ্ড ঠিক জায়গায় ফিরিয়া আসিবে না; এসিয়া আফ্রিকায় আজও কোটি কোটী নরনারী আর্থিক ও রাজনৈতিক দাসত্বভোগ করিতেছে, শান্তির অর্থ ইহাদের চির দাসত্ব; তাহা কখনও ন্যায়সঙ্গত নহে। সুতরাং এই ব্যবস্থার প্রতীকারের জন্য ভবিষ্যতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

## বিনয় সরকারের মতামত

উপসংহারে অধ্যাপক সরকার যাহা বলেন তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নরূপ:—

জার্ম্মাণি মিত্রশক্তিবর্গকে যে ক্ষতিপূরণ শোধ করিতেছে তার সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পরের ঋণটার কোন মিল নাই। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণই করি, আর আইনতই পরীক্ষা করি, যুদ্ধঋণের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। তারপর শুধু পাটিগণিতের অঙ্ক দিয়া পরিমাপ করিলেও দেখা যাইবে ক্ষতিপূরণ ও যুদ্ধঋণ পরস্পর কাটাকাটি যায় না। ১৯৩০ সনে যুদ্ধঋণের চেয়ে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বেশী ছিল ১২৯½ কোটি রাইখ্স মার্ক।

আর ১৯৪২ সনেও উহা ৭৪ কোটী ৫৪ লক্ষ রাইখ্‌স মার্ক বেশী থাকিবে।

তারপর ক্ষতিপূরণ ছাড়িয়া দেওয়া হইল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা। ভার্সাই সন্ধির তত্ত্ব এই যে যুদ্ধের দরুণ ক্ষতির জন্য একমাত্র জার্ম্মাণিই দায়ী ( ২৩১ ধারা ) ; কিন্তু ইহা সত্য নহে। যে পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ না ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে পর্য্যন্ত কোন জার্ম্মাণ সুস্থির থাকিতে পারে না। এই রাজনৈতিক গরজ হইতেই ১৯১৯ সন থেকে জার্ম্মাণিতে যত-কিছু ভার্সাই-বিরুদ্ধতা ( নাৎসিদের হিটলা —বর্ত্তমান আন্দোলন স্মর্ত্তব্য ) দেখা দিয়াছে। জার্ম্মাণরা জাতীয়তাবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

## জার্ম্মাণির সর্ব্বনাশ, কিন্তু কার পৌষ মাস ?

একটা কারণ এই যে, আর একথা কারও অজ্ঞাত নয় যে, জার্ম্মাণি হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের দৌলতে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ শুধু যে সংস্কৃত হইয়াছে তাহা নয়, সে সব স্থলে যাও দেখিবে সেগুলি একেবারে সম্পূর্ণ আধুনিক হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের সে দীন চেহারা একদম বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তারপর জার্ম্মাণির কোক্‌, রং, রাসায়নিক দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য, কাঠ, চিনি ইত্যাদি গ্রীস্‌, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পর্ত্তুগালের ন্যায় পশ্চাৎপদ দেশসমূহ ক্ষতিপূরণরূপে পাইয়া একেবারে আধুনিক ও শিল্পপ্রধান দেশে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি ইতালিরও কম উন্নতি হয় নাই। সুতরাং মিত্র শক্তিবর্গ যে এক্ষণে জার্ম্মাণিকে কিঞ্চিৎ সুনজরে দেখিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্ততঃ, ১৯২৯ সনের জুন মাসে ইয়ং প্লান খাড়া করার কালে যেভাবে দেখিত তার চেয়ে ভাল চোখে দেখিতেছে।

কিন্তু আর্থিক দিক্ হইতে বিবেচনা বরিলে ক্ষতিপূরণ ও যুদ্ধঋণ যদি আজই বন্ধ হইয়া যায়, তবে ধরাতলে স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিবে না। তাতে না জার্মাণির না মিত্র শক্তিবর্গের, না বাকী দুনিয়ার কোন উপকার হইবে। বিশেষতঃ, এই বন্ধ হওয়াটা যদি হঠাৎ হয়। আজ বিশ বৎসর জার্মাণি যে শিল্প, সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার ভিত্তি যুদ্ধের অর্থনীতি ও যুদ্ধঋণের অর্থনীতি। আজ জার্মাণিতে পুঁজিপাটা খাটিতেছে, হাতের ও মাথার কাজে যে লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে, সবই ক্ষতিপূরণের আবহাওয়ায় সৃষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদির উপর দাঁড়াইয়া আছে। আজ হঠাৎ এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে, জার্মাণির শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষিতে ঘোরতর বিপ্লব ও দুর্য্যোগ দেখা দিবে।

অন্য দিকে ইতালি, ফ্রান্স, গ্রেট্‌বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র যে জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থা গড়িয়াছে, যে আমদানি রপ্তানি করিতেছে তাহা যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ পরিবর্ত্তনে এই সব দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আর এই পাঁচটা বড় দেশের বিশৃঙ্খলার অর্থ বিশ্বদৌলতে দ্বিতীয়বার ওলটপালট। আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্বাণিজ্য কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন, বিভিন্ন কারবারের উত্থান-পতন, ব্যাঙ্ক দেউলিয়া ও পতন, সিক্কা-সঙ্কট ইত্যাদি দেখা দিয়া বেকার সমস্যাকে আরো ঘোরালো করিয়া তুলিবে। সুতরাং ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি ছুরি চালাইলে দুনিয়ার আর্থিক অবস্থা আরও মন্দ ছাড়া ভাল হইবে না।

## দুনিয়ার সঙ্কটের জন্য যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ দায়ী নহে

বর্ত্তমানে দুনিয়ায় যে দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে তার জন্য যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণকে দায়ী করিলে অন্যায় হইবে। পাঁচ কারণের মধ্যে ইহা একটী

মাত্র কারণ। এই দুর্য্যোগ দূর হইতে পারে যদি নিম্নলিখিত জনপদ-সমূহকে তাড়াতাড়ি শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা যায়। (১) বল্কান মণ্ডল, (২) রুশিয়া, (৩) এশিয়া ( বিশেষতঃ চীন ও ভারতবর্ষ ) এবং (৪) লাটিন আমেরিকা। প্রথমতঃ, পুঁজিপাটা আমদানি করিয়া, দ্বিতীয়তঃ, কলকব্জা, রাসায়নিক দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য আমদানি করিয়া এইসব জনপদের উন্নতি করা যাইতে পারে। প্রধানতঃ, জার্ম্মাণি, আমেরিকা গ্রেট্‌বৃটেন এবং কতক পরিমাণে বেলজিয়াম সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এবিষয়ে সাহায্য করিতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধঋণ সম্পর্কে একদিন না একদিন জার্ম্মানির প্রতি সুবিচার করিতেই হইবে। জার্ম্মাণির জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য দরকার (১) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস ও ক্রমাগত কম শোধের ব্যবস্থা; (২) হ্রাসপ্রাপ্ত ক্ষতিপূরণকে একবারে না লইয়া কয়েক বৎসরে আদায় করা। ১৯৪০ সনের মধ্যে (১) যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ হইতে দুনিয়ার সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া উচিত। (২) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসা আবশ্যক, (৩) চরম অগ্রগামী দেশগুলিতে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ, চীন, রুষিয়া, বল্কান ও লাটীন আমেরিকার শিল্পবিপ্লব সমাপ্ত হওয়া আবশ্যক। বিশ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণির নিকট হইতে বৎসরে ২০০ কোটি মার্ক আদায় করা হইবে, এই ধারণা হইতে জগৎ যত শীঘ্র মুক্তি পায়, ততই মানব জাতির আর্থিক ও রাজনৈতিক মঙ্গল।

# ভারতের মজুর ও মজুরি*

শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু, এম, এ, বি, এল

গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

ভারতের মজুরদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য গত ১৯২৪ সনের ৪ঠা জুলাই একটী রয়্যাল কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ জন হেন্‌রী হুইট্‌লি। অন্যান্য সভ্য যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল,—শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যর ভিক্টর সেস্থন, স্যর ইব্রাহিম রহমতুল্লা, স্যর আলেকজাণ্ডার মারে, মিঃ ক্লাউ, মিঃ কবিরুদ্দিন আমেদ, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা, মিঃ জন ক্লিফ, শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশী, দেওয়ান চমনলাল, এবং একজন মহিলা সভ্যও ছিলেন, তাঁহার নাম মিসেস পাওয়ার। গত ১৯৩১ সনের ১৪ই মার্চ্চ ইঁহারা এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন। সেই রিপোর্টে কারখানা, খনি, চা-বাগান, যানবাহনাদির মজুরদিগের আয়ব্যয়, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, ট্রেড্ ইউনিয়ন, ধর্ম্মঘট, মজুরি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রিপোর্টের সঙ্গে ইঁহারা মজুরদিগের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নিজেদের মতামত দিয়াছেন, তাহাতে অনেক নূতন ও মূল্যবান তথ্য জানিতে পারা যায়।

* ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত ("আর্থিক উন্নতি" জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ এবং পৌষ ১৩৪০)।

## কারখানার মজুর

রিপোর্টের প্রথমেই কারখানার মজুরদের কথা আছে। ইহার মধ্যে যেসকল কারখানায় সারা বৎসর কাজ চলে প্রথমে তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে। যথা, কাপড়ের কল, পাটের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ইত্যাদি। ১৯২৯ সনে এরূপ কারখানার সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৫০০ এবং ইহাতে নিযুক্ত মজুরদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ লক্ষ।

কাপড় ও তূলার কল বোম্বাই প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভারতবর্ষে মোট ২৯৫টী এরূপ মিল আছে। তাহার মধ্যে কেবল বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেই আছে ২০৩টী। ইহাতে কাজ করে প্রায়, ২,৩২,০০০ মজুর। বাকী ৯২টী মিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আছে এবং তাহাতে কাজ করে প্রায় ১,০৬,০০০ মজুর। তবে আজকাল বোম্বাইয়ের বাহিরে অনেক ছোটখাট মিল খোলা হইতেছে এবং কাঁচামাল পাওয়া বা কাপড় বিক্রয় করা প্রভৃতি বিষয়ে বোম্বাই অপেক্ষা ইহাদের যথেষ্ট সুবিধা আছে বলিয়া কমিশন মনে করেন।

কাপড়ের কল অপেক্ষা পাটের কলের সংখ্যা অনেক কম, কিন্তু উভয়ের-মজুর-সংখ্যা প্রায় সমান। ১৯২৯ সনে পাটের কলের সংখ্যা ছিল ৯৫, মজুরের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩,৪৭,০০০। প্রত্যেক পাটের কলে কাপড়ের কল অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বেশী লোক কাজ করে। পাটের কলগুলি প্রধানতঃ বাঙ্গালা দেশে, কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণে গঙ্গার উভয় তীরে, প্রায় ৬০ মাইল দীর্ঘ ও ২ মাইল প্রস্থ স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। অন্য প্রদেশে পাটের কল নাই বলিলেও চলে।

এরূপ কারখানার মধ্যে রেলের কারখানাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মোট ১৪৫ রেলের কারখানায় ১,৩৬,০০০ লোক কাজ করে। ইহা ছাড়া ইলেকট্রিক, ট্রামওয়ে, টেলিগ্রাফ, মোটরকার ও জাহাজের

কারখানা আছে। ধাতু দ্রব্যের কারখানার মধ্যে জামসেদপুরে টাটার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহাতে মোট ২৮,০০০ লোক কাজ করে।

অন্যান্য কারখানার মধ্যে বাঙ্গালা ও বোম্বাইয়ের কাগজের কল, বিহার ও বাঙ্গালোরের সিগারেট কারখানা, ব্রহ্মদেশের পেট্রোলিয়াম শোধনের কারখানা ও বিভিন্ন প্রদেশের পশমের কল, ছাপাখানা, দেশলাই কারখানা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এইসমস্ত কারখানায় নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

কেন্দ্র হিসাবে মজুরের সংখ্যা ধরিলে দেখা যায় যে, কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার যেসকল কারখানায় সারা বৎসর কাজ চলে তাহাতে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা প্রায় ৪,৫০,০০০ এবং বোম্বাই অঞ্চলের মজুর-সংখ্যা ১,৯০,০০০। অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষে যেসকল কারখানায় সম্বৎসর কাজ হয় তাহাতে যত মজুর কাজ করে কলিকাতা ও বোম্বাই কেন্দ্রে তাহার অর্দ্ধেকের বেশী লোক কাজ করে। এই দুইটী কেন্দ্র ছাড়া আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, কানপুর, জামসেদপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি কেন্দ্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে আমেদাবাদ ছাড়া আর কোনও কেন্দ্রে ৩০,০০০ এর বেশী স্থায়ী মজুর নাই।

## মজুর-সংগ্রহ

এইসকল কেন্দ্রের মধ্যে জামসেদপুর, বোম্বাই ও কলিকাতা (হুগলী) কেন্দ্রের মজুর দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। রেঙ্গুনের কারখানা প্রভৃতির জন্য প্রধানতঃ মাদ্রাজ হইতে, জামসেদ-পুরের জন্য বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ হইতে এবং বোম্বাইয়ের জন্য রত্নগিরি, আমেদনগর, পুনা ও সোলাপুর হইতে

মজুর সংগ্রহ করা হয়। হুগলী কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে যদিও যথেষ্ট লোক আছে তবুও ইহার জন্য মজুর সুদূর বিহার-উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও মাদ্রাজ হইতে আসে। ইহার কারণ অন্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা বাঙ্গালীরা কারখানায় মজুরি করিতে স্বভাবতই নারাজ।

এদেশে কলকারখার মজুর সাধারণতঃ পল্লীগ্রাম হইতেই সংগ্রহ করা হয়। পল্লীগ্রামকেই তাহারা 'ঘর' বলিয়া মনে করে এবং সহরে মজুরি করিতে আসা যে একটী স্থায়ী ব্যাপার নয় সে ধারণা তাহাদের বরাবরই থাকে। এইখানেই পাশ্চাত্য দেশের মজুরদের সঙ্গে ইহাদের দারুণ পার্থক্য। পাশ্চাত্য দেশের মজুর সাধারণতঃ আপনাদিগকে গ্রাম হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্থায়িভাবেই সহরে বাস করে।

কিন্তু তাই বলিয়া এদেশের কারখানার মজুরদিগকে ঠিক চাষী বলা চলে না। সমস্ত মজুর গ্রামের চাষীদিগের মধ্য হইতে সংগ্রহ করা হয় না। অবশ্য সকলেরই মনে গ্রাম্য সংস্কার অল্পবিস্তর আছে। এবং অনেকেরই আত্মীয়-স্বজন গ্রামে থাকে ও চাষবাস করে। যেসকল মজুরের স্ত্রী সহরে থাকে তাহারা স্ত্রীকে প্রসবের সময় সামর্থ্য থাকিলে গ্রামেই পাঠাইয়া দেয় এবং অনেকের শৈশব গ্রামেই কাটে। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক মজুর ছুটী লইয়া গ্রামে চলিয়া যায় এবং যতদিন না অর্থের অনটন হয় ততদিন গ্রামেই থাকে। যদিও অনেক মজুর স্ত্রীপুত্র লইয়া কারখানার সীমানার মধ্যে বাস করে, তবুও গ্রামকেই তাহারা ঘর বলিয়া জানে এবং কারখানার কাজ শেষ হইলে স্থায়িভাবে গ্রামে গিয়া আরামে বাস করিবার ইচ্ছা প্রায় প্রত্যেকেরই আছে।

এই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতের কারখানার মজুর পাশ্চাত্য দেশের মজুরের মত জমি হইতে বিচ্ছিন্ন নয় অথবা অস্থায়িভাবে কারখানায় নিযুক্ত চাষীও নয়।

## গ্রাম ছাড়িবার কারণ

নিজের গ্রামে যথেষ্ট রোজগারের অভাবই মজুরদের গ্রাম ছাড়িয়া সহরে যাইবার প্রধান কারণ। ভারতের বেশীর ভাগ স্থানেই যে পরিমাণ লোক জমি চাষের জন্য দরকার তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এবং সেই জমি যতগুলি লোকের খোরাক জোগাইতে পারে তদপেক্ষা অনেক বেশী লোক সেই জমির উপর নির্ভর করিয়া আছে। লোকের ব্যয় বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও জমির উপর এই জুলুম ক্রমাগতই বাড়িতেছে। দেনার দায়ে জমি হস্তান্তরিত হওয়া, জমিদার কর্ত্তৃক জমি খাস করিয়া লওয়া ও বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি নানা কারণে অনেককেই চাষ ছাড়িয়া সহরের কারখানায় মজুরি করিতে হয়। তাহা ছাড়া যাহাদের একেবারেই জমি নাই এইরূপ লোকও ভারতে যথেষ্ট আছে। ইহাদিগকেও দুঃসময়ে কারখানায় মজুরি করিতে হয়।

বহির্জ্জগতের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁতী, ছুতার, কামার প্রভৃতিকে কাপড়ের কল ও কারখানা প্রভৃতিতে মজুরি করিতে হইতেছে।

দারিদ্র্য ছাড়া সামাজিক অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেকে সহরের কারখানায় মজুরি করিতে যায়। অনেকে আবার কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া আইনের ও সমাজের শাস্তিবিধানের হাত এড়াইবার জন্যও সহরে পলাইয়া যায় এবং কারখানায় মজুরি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে।

তবুও কলের মজুরের গ্রামের প্রতি টান বরাবরই থাকিয়া যায় এবং একটু অবস্থার উন্নতি হইলে সে গ্রামে ফিরিবার আশা রাখে।

সহরের প্রতি তাহার কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই, তাহাকে যেন জোর করিয়া সহরের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং সহরে বাসের অসুবিধা এই ঘরমুখো হইবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। কলকারখানার মজুর সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের চাষীদের ভিতর হইতে সংগ্রহ করা হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু সব সময়ে কারখানায় স্ত্রীলোক ও বালকের মজুরি মেলে না। সেই জন্য গ্রামেই তাহাদিগকে রাখিয়া আসিতে হয়। তা ছাড়া সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে থাকিবার খরচও কম। ভারতের লোক এখনও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, সহরের ব্যক্তিমূলক জীবন-যাপনে গ্রামের লোক মোটেই আকৃষ্ট হয় না। সেই জন্য গ্রামে যেসকল আত্মীয়স্বজন রাখিয়া আসে তাহাদের জন্য আকর্ষণ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কারখানার আবহাওয়ায় বাস করার সুবিধা অসুবিধা পরে আরও বলা হইবে, কিন্তু বংশপরম্পরায় গ্রামে বাস করিতে অভ্যস্ত কলের মজুর স্থায়িভাবে সহরে বাস করিতে চায় না এবং সুবিধা পাইলেই সহর ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিবার ইচ্ছা তাহার মনে বরাবরই থাকে।

গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত মজুর সহরে এমন একটী পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়ে যেখানকার লোকজন আচার, ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক এবং যেখানে সামাজিক বন্ধন বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। কাজেই তাহার জীবন আপনাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায় অনেকেরই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। যুক্তপ্রদেশের লোক বাঙ্গালার জলবায়ুতে কখনই স্বাস্থ্য পূর্ব্বের ন্যায় অটুট রাখিতে পারে না। পল্লীর উন্মুক্ত বাতাসে যাহারা মানুষ হইয়া আসিয়াছে সহরের সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে আসিয়া তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে। যে সকল মজুর বিবাহিত এবং স্ত্রীকে গ্রামে রাখিয়া আসে

তাহারা সহরের নানারূপ প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া যায়। মদ্যপান ও জুয়াখেলা যে ক্লান্ত শরীর ও মনকে স্ফূর্ত্তি দেয় তাহা তাহাদের অজানা থাকে না এবং অন্য কোন বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদের অভাবে ইহাতেই তাহারা শীঘ্র অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। কারখানার কাজের ধারাও তাহাদের কাছে একেবারে নূতন। এখানে তাহাদিগকে ঘড়ি ধরিয়া কাজ করিতে হয়। ক্রমাগত একভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করা তাহাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। এইসমস্ত কারণে প্রথম ধাক্কাতেই তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং এইভাবে মজুরি করা অপেক্ষা নিজের গ্রামে দারিদ্র্যের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে তাহারা ব্যগ্র হইয়া উঠে। অনেক নূতন মজুর এই প্রকারে গ্রামে ফিরিয়া যায়।

যেসকল লোক গ্রাম হইতে মজুরি করিতে আসে তাহাদের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল থাকে এবং তাহারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে পারে। অসুস্থ, বৃদ্ধ বা বেকার হইয়া পড়িলে গ্রামের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহাদের এমন একটা জায়গা মেলে যেখানে তাহারা কিছু দিন গিয়া থাকিতে পারে। স্ত্রী-মজুরের সন্তান-সম্ভাবনা হইলে অনেক সময়ে তাহারা গ্রামে চলিয়া যায়।

গ্রামের সহিত সম্বন্ধ থাকার দরুণ সহরের যেরূপ সুবিধা আছে গ্রামেরও সেইরূপ সহর থাকার জন্য সুবিধা আছে। সাধারণতঃ, কৃষির উৎপন্নের পরিমাণ অনিশ্চিত। জমির ফসল যদি কোন কারণে আশানুরূপ না হয় গ্রামের লোক তখন সহরে আসিয়া কারখানায় মজুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। গ্রাম ও সহরের পরস্পর সম্বন্ধের জন্য সাধারণ লোকের যেমন আয় বৃদ্ধি হয় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও বিস্তার হয়। সহরে বাস করার দরুণ বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হয় ও মনের স্বাধীনতা আসে তাহা গ্রাম্য জীবনের সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে অনেকটা সহায়তা করে।

অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মজুর সংগ্রহের বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তাহা ভাল না পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে গ্রামের সহিত সম্বন্ধবিহীন, সম্পর্কবিহীন মজুর-সৃষ্টিই বাঞ্ছনীয়। কমিশনের মতে এখন যে ব্যবস্থা আছে তাহাই ভাল এবং ইহাকে নষ্ট না করিয়া বরং উৎসাহ দেওয়াই উচিত। তবে তাঁহারা বলেন যে এমন কতকগুলি নিয়ম করিয়া দেওয়া দরকার যাহার দ্বারা সুশৃঙ্খলভাবে কাজ হইতে পারে।

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে লক্ষ লক্ষ মজুরের আয়ব্যয় ও জীবনধারা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কঠিন কাজ। শুধু দেশ বড় বা সংখ্যা অধিক বলিয়া নয়, জলবায়ু, জাতি, ধর্ম্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও উপার্জ্জনের বিভিন্নতা এত বেশী যে, কোনও একটি মাপকাঠি দ্বারা মজুরদের সাংসারিক অবস্থার বিচার করা এক প্রকার অসম্ভব। সকল রকম কল কারখানার মজুরদের আয়ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করাও অতিশয় কঠিন ব্যাপার। মাঝে মাঝে গবর্ণমেণ্ট যেসব রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহার দ্বারা দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে খুব অল্পই সংবাদ পাওয়া যায়।

মজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সময় রয়্যাল কমিশনকেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রত্যেক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়াও তাঁহারা আশানুরূপ তথ্যসংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদের রিপোর্টে মোটামুটিভাবে তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

## কাপড়ের কল

এখন কতগুলি বড় বড় শিল্পের মজুরির হার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ১৯২৯ সনের হিসাবে দেখা যায়, ভারতে মোট কাপড়ের

কল ছিল ২৯৫টি। ইহার মধ্যে কেবল বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেই ছিল ২০৩টি, বাকী ৯২টি অন্যান্য প্রদেশে। এইসকল কলে কাজ করে মোট ৩,৩৮,০০০ লোক। তাহার মধ্যে বোম্বাইয়ে কাজ করে মোট ২,৩২,০০০ জন লোক এবং অন্যান্য প্রদেশে কাজ করে ১,০৬,০০।

বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে তিনটি সহরে কাপড়ের কলের তিনটি বড় কেন্দ্র আছে, যথা—বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং সোলাপুর। হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে প্রত্যহ গড়ে একজন পুরুষ মজুর রোজগার করে বোম্বাইয়ে—১৷৷০ টাকা, আমেদাবাদে ১৷৶৮ পাই এবং সোলাপুরে ১৲৫। প্রত্যেক স্ত্রী-মজুর ঐ ঐ স্থানে রোজগার করে ৷৷৵১১ পাই, ৸১০ আনা এবং ৷৶৮ পাই। এই হিসাবে পূরা মাসিক রোজগার পুরুষ মজুরের বোম্বাইয়ে ৪৪৵১০, আমেদাবাদে ৩৮৷০ এবং সোলাপুরে ২৬৷৷৶২ পাই। স্ত্রী-মজুরের বোম্বাইয়ে ২০৷১০, আমেদাবাদে ২১⁄১০ এবং সোলাপুরে ১১৷৶৭ পাই। অল্পবয়স্ক মজুরদের হিসাব আমেদাবাদে ও সোলাপুরে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, আমেদাবাদে তাহাদের আয় গড়ে রোজ ৷⁄১০ আনা এবং সোলাপুরে ৷০ আনা, মাসিক আয় আমেদাবাদে গড়ে ৯৷১০, এবং সোলাপুরে ৬৸⁄১০ পাই। অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে যুক্তপ্রদেশে গড়ে মাসিক আয় ২৫৲ হইতে ৩৩৲। বাংলায় মজুরির হার যুক্তপ্রদেশ অপেক্ষা কিছু বেশী।

## পাটের কল

পাটের কল বাংলার একপ্রকার একচেটিয়া সম্পত্তি এবং সমস্ত পাটের কল কলিকাতার উত্তরে ও দক্ষিণে গঙ্গার উভয় তীরে প্রায় ৬০ মাইল দীর্ঘ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। অবশ্য বাংলার একচেটিয়া

হইলেও ইহা বাঙ্গালীর নয় এবং প্রায় সমস্ত চটকলই ইয়োরোপীয় কলওয়ালাদের অধীন। এক একটী পাটের কলে কাপড়ের কলের তিনগুণ লোক কাজ করে। ১৯২৯ সনের হিসাবে দেখা যায় যে, ৯৫টি পাটের কলে ৩,৪৭,০০০ মজুর কাজ করে। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক মজুর বিভিন্ন বিভাগে ২৮৯ পাই হইতে ৯।৹ টাকা রোজগার করে।

## ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুদ্রব্যের কারখানা

এই সমস্ত কারখানার মজুরি অনেকটা দক্ষতার উপর নির্ভর করে, সেই জন্য ইহার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। রাজমিস্ত্রী, ছুতার মিস্ত্রী, কামার, ফিটার ও টার্ণার প্রভৃতির মজুরি সম্বন্ধে হিসাব লইয়া দেখা যায় যে, বোম্বাই সহর ও আমেদাবাদে ইহাদের মজুরি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। রাজমিস্ত্রী মাসে ৫০৲ হইতে ৭০৲ টাকা, ছুতার ও কামার ৬০৲ হইতে ৭৫৲ টাকা এবং ফিটার ও টার্ণার ৬৫৲ হইতে ৮০৲ টাকা মাহিয়ানা পায়। মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা, বিহার-উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশে ইহাদের মাহিনা অনেক কম—রাজমিস্ত্রী ৩০৲, ছুতার ৩৫৲, কামার, টার্ণার প্রায় ৪০৲ প্রতিমাসে রোজগার করে। পাঞ্জাব, দিল্লী, বার্ম্মা ও মধ্যপ্রদেশে মজুরির হার ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী।

## খনিজ-শিল্প

খনি আইন অনুসারে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষে ঐ মাসের গড়পড়তা দৈনিক আয়ের হিসাব খনির মালিককে গবর্ণমেণ্টের নিকট দিতে হয়। ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসের হিসাব হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়—

| | খাদের মধ্যে যাহারা কাজ করে | | পুকুর খাদে যাহারা কাজ করে | | খাদের বাহিরে যাহারা কাজ করে | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী |
| কয়লার খনি<br>( ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ<br>ও গিরিডি ) | ॥০<br>হইতে<br>৸/১০ | ।৶০<br>হইতে<br>॥১০ | ॥০<br>হইতে<br>৸/১৫ | ।৵০<br>হইতে<br>॥/০ | ॥০<br>হইতে<br>৸/৫ | ।/১৫<br>হইতে<br>।৵১৫ |
| অভ্রের খনি<br>(বিহার-উড়িষ্যা) | ।/০<br>হইতে<br>।৶৫ | ।০ | ।১৫<br>হইতে<br>।৶০ | ।০ | ॥৵৫<br>হইতে<br>॥/০ | ।০ |
| লৌহের খনি<br>(বিহার-উড়িষ্যা | — | | ।৶১৫<br>হইতে | ।/১৫ | ।৵১৫<br>হইতে | ।/০ |
| ম্যাঙ্গানিজ খনি<br>(মধ্যপ্রদেশ) | ।৶০<br>হইতে<br>॥৵৫ | — | ।৶১৫<br>হইতে<br>৸৵৫ | ।/৫ | ॥০<br>হইতে<br>১৻১৫ | ।১৫ |
| সীসার খনি<br>(ব্রহ্মদেশ) | ১।/১০<br>হইতে<br>২॥৶১৫ | — | ১৲ | — | ১।.৫<br>৩৸/০ | — |
| টিনের খনি<br>(ব্রহ্মদেশ) | ১।১৪<br>হইতে<br>১॥/০ | ১/০ | ১।/০<br>হইতে<br>১॥৶১০ | ৸/১০ | ১৶<br>হইতে<br>১॥/১০ | ৸৶৫ |
| লবণ<br>(পাঞ্জাব) | ১/১৫<br>হইতে<br>১॥৵১৫ | ॥/১৫ | ৩৵০ | — | ৸/১৫<br>হইতে<br>১/৫ | |

কয়লার খাদের মজুরি টব হিসাবে দেওয়া হয়। এক টব কয়লা কাটিয়া তুলিতে পারিলে, যে কাটে ও যে তাহা ভর্ত্তি করে তাহারা প্রায় ।৶০ মজুরি পায়। প্রতি দিন ২ হইতে ৩ টব কয়লা তুলিতে পারা যায়। উপরে যে গড়পড়তা আয়ের হিসাব দেওয়া গেল তাহা হইতে মাসিক আয় কত তাহা বুঝা যাইবে না, কারণ মজুররা প্রায়ই কামাই করে। হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, একজন মজুরের মাসিক আয় ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা।

## ডক্ কুলী

রেঙ্গুনের ডক্‌কুলীর মজুরি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহারা প্রতিদিন ১৸০ করিয়া মজুরি পায়। বোম্বাইয়ে রোজের হার ৸৶০ হইতে ১৷৷০। করাচীতে ৸৴০ হইতে ৵৶০। সব কুলীর প্রতিদিন কাজ জোটে না এবং সেই হিসাবে বোম্বাইয়ে মাসিক আয় ৩২৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। কলিকাতায় ডক্‌কুলীর মাসিক আয় প্রায় ২০৲।

## দক্ষতাহীন মজুর

এই প্রকার মজুরদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, যাহারা নিয়মিতভাবে কারখানা প্রভৃতিতে কাজ করে। ইহারা সাধারণতঃ ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা মজুরি পায়। বোম্বাই ও ব্রহ্মপ্রদেশে ইহারা প্রায় ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করে। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা রোজ মজুরি করে। এই শ্রেণীর মজুর খুব বেশী। ইহাদের মজুরি ঐ স্থানের এবং ঐ সময়ের চাষের মজুরদিগের মজুরির উপর নির্ভর করে। তবে চাষী মজুরদিগের অপেক্ষা ইহারা মজুরি বেশী পায়। বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশে ইহাদের রোজের হার ৸০ আনার কিছু বেশী। দিল্লী ও পাঞ্জাবে ইহা অপেক্ষা কিছু কম। বাংলা, বিহার-

উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে পুরুষের রোজ ৷৷০ আনা, স্ত্রীলোকের ।৵০ আনা ও বালকের ।০ আনা। মান্দ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে মজুরি সর্ব্বাপেক্ষা কম, এক এক স্থানে পুরুষের মজুরি মোটে ।/০ আনা।

## মজুর পরিবারের আয়

মজুরদের জীবনধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে তাহাদের পারিবারিক আয়ব্যয়ের হিসাব লওয়া দরকার। ব্যক্তিগত আয়ব্যয় হইতে তাহাদের দৈনন্দিন জীবন ঠিক বুঝা যায় না। প্রত্যেক পরিবারের হিসাব লওয়াও খুব শক্ত ব্যাপার। ১৯২১ সনে বোম্বাইয়ের ২০০০ মজুর পরিবারের একটী হিসাব লওয়া হইয়াছিল। তাহাতে জানা যায় যে, প্রত্যেক পরিবারের গড়ে মাসিক আয় ৫২।১০। আজকাল অবশ্য মজুরির হার ও জিনিষপত্রের দাম অনেক কমিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, নাগপুরে মজুর পরিবারের মাসিক আয় গড়ে ৩০৲। কানপুর লক্ষ্নৌ ও গোরক্ষপুরে প্রায় ৩০৲। বাংলা এবং বিহার-উড়িষ্যায় ৩০৲ টাকার কিছু বেশী এবং পাঞ্জাবে ৩৫৲ টাকার বেশী। প্রত্যেক পরিবারে কয়জন করিয়া লোক আছে তাহার হিসাব করা কঠিন। রয়্যাল কমিশন চেষ্টা করিয়াও তাহা পারেন নাই। সাধারণতঃ, পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা উপায়ক্ষম লোকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কেননা যত বেশী রোজগার হইবে ততই সাংসারিক সাচ্ছল্য হইবে। তবে অল্পবয়সে বিবাহের দরুণ ছেলেপিলের ভার মজুরদের উপর খুব শীঘ্রই পড়ে।

## ব্যয়ের তালিকা

খরচের হিসাব হইতে মজুরদের জীবন সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানা যায়। ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সনে সোলাপুরে ও আমেদাবাদে যে হিসাব

লওয়া হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায়, প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৪ জন হইতে ৪ জনের কিছু বেশী লোক আছে। এইরূপ একটী পরিবারের মাসিক ব্যয় সোলাপুরে গড়ে ৩৭৸৴১১ পাই এবং আমেদাবাদে ৩৯।৴৮ পাই। এই দুই জায়গার খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল:—

| যে বাবদ ব্যয় | সোলাপুরে | | আমেদাবাদে | |
|---|---|---|---|---|
| খাদ্য | গড়পড়তা মাসিক ব্যয় | শতকরা অংশ | গড়পড়তা মাসিক ব্যয় | শতকরা অংশ |
| চাউল, গম, ইত্যাদি | ৯।৶০ | ২৫·০০ | ১১৷৷৶১১ | ২৯·৮৪ |
| ডাল | ১৷৴১ | ৩·৫০ | ১।৶৬ | ৩·৭৩ |
| চিনি ও মিষ্টান্ন | ১৴০ | ২·৮০ | ৸৶৭ | ২·৪৭ |
| মাংস | ১৷৷৵১ | ৪·৩১ | ৸৵১ | ২·২৪ |
| দুধ, ঘী | ১।৮ | ৩·৪১ | ৩৵১ | ৮·৫৯ |
| শাকসব্জী, ফল | ৸৶২ | ২·৫০ | ১৷৷৶১ | ৪·৩০ |
| তেল | ১৻৫ | ২·৬৫ | ৷৷৶১০ | ১·৮৮ |
| লবণ | ৶৮ | ০·৬১ | ৴৭ | ০·২৫ |
| মশলা, আচার | ১।৯ | ৩·৪৩ | ৷৷৶৯ | ১·৮৭ |
| চা | ৻১১ | ০·১৫ | ৵৪ | ০·৩৭ |
| অন্যান্য | ।৴৫ | ০·৮৯ | ৸৵১০ | ২·৩৬ |
| | ১৮৷৷৵৫ | ৪৯·২৫ | ২২৸৭ | ৫৭·৯০ |
| কাঠ, কয়লা, বাতি | ৩৷৷৵২ | ৯·৬০ | ২৸৪ | ৭·০৪ |
| কাপড় | ৪৷৷৶১০ | ১১·৮৬ | ৩৷৷৶৬ | ৯·৪৫ |
| বিছানা, তৈজসপত্র | ।৵১ | ১·০০ | ।৶৪ | ১·১৬ |
| ঘরভাড়া | ২।৵ | ৬·২৭ | ৪৷৷৴১১ | ১১·৭৪ |
| নাপিত, ধোপা, সাবান | ৸১০ | ২·১২ | ৸৶৯ | ২·৫০ |

| যে বাবদ ব্যয় | সোলাপুরে | | আমেদাবাদে | |
|---|---|---|---|---|
| | পড়পড়তা মাসিক ব্যয় | শতকরা অংশ | গড়পড়তা মাসিক ব্যয় | শতকরা অংশ |
| তামাক | ॥/৮ | ১·৬০ | ১৵৩ | ২·৯৭ |
| মদ | ৶/৯ | ২·২৭ | ॥৯ | ১·২৯ |
| দেশ হইতে যাতায়াত খরচ | ॥৵৬ | ১·৭৩ | ॥/১ | ১·৫০ |
| ধারের সুদ | ২॥৪ | ৬·৬৫ | — | — |
| খুচরা | ২৶৵৪ | ৭·৬৫ | ১॥৶৪ | ৪·৩৫ |
| মোট | ৩৭৶/১১ | ১০০·০০ | ৩৯৷/৮ | ১০০·০০ |

উপরের হিসাবে আমেদাবাদের মজুরদের সুদের জন্য যে খরচ হয় তাহা দেখান হয় নাই। অথচ উহারা খুব ঋণগ্রস্ত। মদ্যপানের খরচেরও হিসাব ঠিক পাওয়া যায় নাই। মদ্যপান মজুরদের মধ্যে যে কিরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার জন্য তাহারা কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় তাহা এই হিসাবে বুঝা যায় না। কিন্তু ১৯২৮।২৯ সনে মান্দ্রাজ প্রদেশের সমস্ত আয়ের এক-চতুর্থাংশের বেশী এবং বিহার-উড়িষ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কেবল আবগারীর আয় হইতে পাওয়া গিয়াছে। তা ছাড়া যে সমস্ত মজুরের হিসাব লওয়া হইয়াছে তাহাদের অবস্থা মোটের উপর ভাল। এইসমস্ত কারণে খরচের তালিকা যদিও খুব বিশ্বাসযোগ্য নহে, তথাপি ইহা হইতে মজুরদের সম্বন্ধে অনেক খবর জানা যায়। সুদের হিসাব বাদ দিলে দেখা যায় খাদ্য, কাঠ ও কয়লার খরচ, আলোর খরচ, কাপড়চোপড় ও ঘরভাড়াতে সমস্ত খরচের শতকরা ৮২৲ টাকা ব্যয় হয় সোলাপুরে, এবং ৮৪৲ টাকা ব্যয় হয় আমেদাবাদে। এই খরচ জীবন-ধারণের জন্য নিতান্ত দরকার। ইহা ছাড়া নাপিত, কাপড় পরিষ্কার এবং সামান্য কিছু

তৈজসপত্রেরও দরকার প্রত্যেক মজুরেরই হয়। তাহার উপর আবার রোগের চিকিৎসা, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের খরচ আছে এবং সামাজিক ব্যাপারের আবশ্যকীয় খরচও আছে। দেশে যাতায়াতের খরচও হিসাবে ধরিতে হইবে। এইসমস্ত আবশ্যকীয় খরচ বাদে ধারের জন্য যে সুদ দিতে হয় তাহাও বড় কম নয়। এইসমস্ত খরচ বাদে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা আমোদ-প্রমোদে ব্যয় হয়।

মজুরদের দারিদ্র্য সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই। উপরের হিসাব হইতে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। সবচেয়ে বেশী দুঃখের বিষয় এই যে, এত দুর্দ্দশা সত্ত্বেও তাহাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা নাই। শিক্ষার অভাবই ইহার জন্য দায়ী। ভালভাবে থাকার প্রয়োজনীয়তা বা কি করিলে ভালভাবে থাকা যায় তাহার জ্ঞান ইহাদের একেবারে নাই। আজকাল তবু চারিদিকে একটু জীবনের স্পন্দন দেখা যাইতেছে, এবং রয়্যাল কমিশনের সভ্যেরাও তাহার দ্বারা মজুরদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছেন। কমিশনের মতে যতদিন এই উন্নতির চেষ্টা দেশের জনসাধারণ, গবর্ণমেণ্ট, ধনিক ও শ্রমিক একযোগে না করিতেছে, ততদিন কোন উন্নতির আশা নাই। ইহা যে খুবই সত্য সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই চেষ্টার মূলে উপযুক্ত শিক্ষার প্রচার, জ্ঞানের প্রচার দরকার। তাহা না হইলে শ্রমিক আন্দোলনের কোন চেষ্টাই মজুরদের পক্ষে স্থায়িভাবে কল্যাণকর হইবে না।

ভারতের মজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দুইটী জিনিষ নজরে পড়ে, একটী দারিদ্র্য অপরটী কার্য্যকুশলতার অভাব। পাশ্চাত্য দেশের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে, এদেশের মজুরের উৎপাদন-শক্তি অনেক কম। মজুর কমিশন ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—শারীরিক ও মানসিক শক্তির অভাব। আসল কারণ একটী—সামর্থ্যের

অভাব। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে, যেভাবে মজুররা বাস করে বা খায়, তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল না থাকাই স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জীবনের উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছুই থাকা সম্ভর নয়। কাজেই আমরা দেখিতে পাই, দরিদ্রতার জন্য তাহারা ভালভাবে থাকিতে বা ভালভাবে খাইতে পরিতে পারে না। ইহার জন্য আবার তাহাদের উৎপাদন-শক্তি কম হয়। আবার এই উৎপাদন-শক্তি কম বলিয়া তাহারা দরিদ্রতায় কষ্ট পায়। এই সমস্তই পরস্পর কার্য্য-কারণ-সম্পর্কে জড়িত। মজুরদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে এইসমস্ত কারণেরই মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। একদিকে যেমন তাহাদের কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে অপর দিকে তেমনই তাহাদের আয়, বাসস্থান খাওয়া-পরার অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে।

মজুরির বৃদ্ধি যে দরকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অনেকের মতে এখন যে মজুরি আছে তাহাই যথেষ্ট এবং মজুররা উহাতে সন্তুষ্ট, বাড়াইলে তাহার অপব্যয় হইবে, ইত্যাদি। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের মত অল্পে তুষ্ট দেশেও গত দশ বৎসরে মজুরি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন মালের পরিমাণও বাড়িয়াছে। যে কম মজুরি পায় তাহা অপেক্ষা যে বেশী মজুরি পায় সে যে বেশী মন দিয়া খাটে তাহা আর বলিতে হইবে না। তাহা ছাড়া মজুরি বেশী দিলে দক্ষ লোকেরও অভাব হয় না, এবং তাহার ফলে মালিকের লাভ বেশী হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

## ঋণের বোঝা

মজুরদের দুরবস্থার জন্য ঋণের বোঝা যে অনেকটা দায়ী তাহা আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না, যদিও ঋণের পরিমাণের ঠিক

অঙ্ক পাওয়া কঠিন, তথাপি অধিকাংশ মজুরই যে ঋণের ভারে প্রপীড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে ঋণের বোঝা ঘাড়ে লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। পিতার ঋণ পরিশোধ করা শুধু আইনসঙ্গত নয়, ধর্ম্মসঙ্গতও বটে। ধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়মের জন্যও অনেককে ঋণ শোধের জন্যই গ্রাম ছাড়িয়া সহরে মজুরি করিতে আসিতে হয়। হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, বেশীর ভাগ শিল্প-কেন্দ্রে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মজুর বা মজুর-পরিবার ঋণগ্রস্ত। এই ঋণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাসিক মজুরির প্রায় তিনগুণ, এবং ইহার চেয়ে বেশীও দেখা যায়। সংসার-খরচের জন্য প্রতি মাসে যে ধারে খরিদ করা হয় তাহা এই ঋণের হিসাবে ধরা হয় নাই।

মজুররা যে মজুরি পায় আমরা দেখিয়াছি যে, তাহার প্রায় সবই জীবন-ধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতেই খরচ হয়। কাজেই তিন মাসের মজুরির সমান ঋণের বোঝা তাহাদের পক্ষে কম নয়। ইহার উপর আবার সুদের হার এই বোঝা আরও বাড়াইয়া দেয়। সাধারণতঃ, সুদের হার মাসিক "টাকা প্রতি এক আনা" অর্থাৎ শতকরা বাৎসরিক ৭৫৲ টাকা। ইহার মানে যদি কাহারও ৩ মাসের মজুরির সমান ধার থাকে তবে সেই মজুরকে তাহার মাসের মাহিয়ানার শতকরা ২০৲ টাকা সুদ বাবদ দিতে হয়। ইহা ছাড়া আসল পরিশোধের কিস্তিবন্দী নিয়ম আছে; বন্ধক থাকিলে সুদ কম হয়, তবে ঋণ পরিশোধের নিয়ম খুব কঠিন। সুদের হার ১৫০৲ টাকা কিংবা তাহার বেশী হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে বাংলার সাধারণ সুদের হার শতকরা ১২ হইতে ২৪। ইহা কখনও কখনও ২২৫ অবধি হয়। মধ্যপ্রদেশের হার ২৫% হইতে ১৫০%, যুক্তপ্রদেশের সাধারণতঃ ৭৫%। বাংলার পাটের কল অঞ্চলে সুদের হার গড়ে ৭৪%, তবে সময় সময় ৩২৫%

অবধি দেখা গিয়াছে। পাঞ্জাবে সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে ৭৫% হইতে ১৫০%।

চুক্তি অনুযায়ী বড় একটা ঋণ পরিশোধ হয় না। তাহা ছাড়া মহাজনেরাও চায় না যে, শীঘ্র শীঘ্র ঋণ শোধ হইয়া যায়। সুদ পাইলেই তাহারা খুসী থাকে। সুদও যে নিয়মিতভাবে শোধ হয় তাহা নয়। ক্রমশঃ সুদে আসলে এত বাড়িয়া যায় যে, তাহা পরিশোধের আর উপায় থাকে না; তখন মহাজন মজুরের সমস্ত মাহিয়ানা লইয়া তাহাকে পেট চালাইবার মত খরচ দেয়, কখনও কখনও তাহার পরিবারের সকলকে সেইভাবে খাটাইয়া লয়। ঋণ বাবদ ঠিক কত টাকা দিতে হয় তাহাব হিসাব বা ঋণের পরিমাণ বা সুদের হার কত তাহার হিসাব ঠিকমত পাওয়া কঠিন। ঋণ বাবদ টাকায় এক আনা না বলিয়া ১২ মাসের মধ্যে ১ মাসের মাহিয়ানা তাহাদিগকে দিতে হয় বলিলে বোধ হয় অনেকটা ঠিক হয়। এ সম্বন্ধে মজুর কমিশনকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, মজুরকে তাহার উদ্বৃত্ত সমস্ত টাকাই মহাজনকে দিতে হয়। এই উদ্বৃত্ত টাকা মজুররা যে অনাবশ্যক সকে খরচ করিত তাহা নয়, ভালভাবে থাকিবার জন্য যে খরচের দরকার তাহা হইতেই এই টাকা বাঁচাইয়া ঋণ শোধ করিতে হয়। অনেক সময় এমন হয় যে, আসল পরিশোধের কোন উপায়ই থাকে না, অথচ মাসের পর মাস নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে কষ্ট দিয়া কেবল সুদের বাবদই টাকা গুনিয়া দিয়া যাইতে হয়। ঋণের টাকা যাহাতে প্রথমেই আদায় করিতে পারা যায় তাহার জন্য মহাজনেরা খুব সাবধান থাকে। সেই জন্য প্রতি "হপ্তা"র দিন বা মাহিয়ানার দিনই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কারখানার দরজায় কাবুলী ও অন্য মহাজন দেনদার মজুরকে ধরিবার জন্য পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কখনও

কখনও আফিসের ভিতর হইতেই তাহারা আপনাদের প্রাপ্য কাটিয়া লয়।

এই ঋণের জন্য মজুরদিগকে যে শুধু আর্থিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় তাহা নয়, ইহা তাহাদের কার্য্যদক্ষতার মূলেও কুঠারাঘাত করে। রয়্যাল কমিশনও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ঋণের বোঝার জন্য মজুরদের কাজে মন লাগে না এবং কার্য্যদক্ষতাও জন্মে না। ঋণগ্রস্ত মজুর মনদিয়া কাজ করে না; কেন না সে জানে যে, ইহার ফলে যে লাভ হইবে তাহা তাহার পকেটে না গিয়া কেবল মহাজনদেরই উদর পূর্ণ করিবে। অনেকে আবার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও কোন মতে পেট চালান ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না। লোকে অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়াই অধিকতর পরিশ্রম করে, কিন্তু ভারতের মজুরের সে ভরসা একেবারেই নাই।

ঋণের কারণের মধ্যে পর্ব্বোপলক্ষে খরচ, বিশেষতঃ বিবাহের খরচই প্রধান। জন্ম, মৃত্যু এবং অন্যান্য সাংসারিক ঘটনাতে অল্প স্বল্প ধার করিতে হয়। ইহা ছাড়া অসুখের সময়, চাকুরী গেলে বা কারখানার কাজ বন্ধ হইলেও ধার হয়। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সনে বোম্বাইয়ে যে ধর্ম্মঘট হয় তাহাতে ঋণের বোঝা মজুরদের ঘাড়ে যথেষ্ট চাপিয়াছে। মজুরদিগকে বন্ধনে পড়িতে হয় বিবাহের খরচের জন্য। অধিক সুদে এক বৎসরের মজুরি ধার করা খুবই সাধারণ ঘটনা। সামাজিক ব্যাপারে নিজের সাধ্যের অতীত খরচ করার প্রবৃত্তি বন্ধ হইলে মজুরদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

## কারখানার মজুরদের আর্থিক অবস্থা

কেবল যে কারখানার মজুরদিগকে ধার করিতে হয় তাহা নয়। ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের উপরই এই ঋণের বোঝা চাপিয়া

আছে। ভারতীয় কৃষকের ঋণের কথা আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। কিন্তু ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে চাষী মজুরের সহিত কারখানার মজুরেব একটু পার্থক্য আছে। চাষীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ধার করে তাহা চাষের কাজের জন্য অল্পদিনের মেয়াদে এবং ফসলের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা পরিশোধ করিতে পারে। তাহা ছাড়া তাহারা এক স্থানেই থাকে। কিন্তু কারখানার মজুর কখনও এক স্থানে থাকে না। আজ এক কারখানায় কাল আর এক কারখানায়, আজ এক কেন্দ্রে কাল আর এক কেন্দ্রে, আজ গ্রামে, কাল সহরে, এইভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। মজুরিরও স্থিরতা নাই, থাকিবারও স্থিরতা নাই। ফসলের জন্য অল্পদিনের মেয়াদে ধার লওয়ার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা কারখানার মজুরদের পক্ষে সম্ভব নয়। গহনা বন্ধক বা বিক্রয় একবারের বেশী দুইবার হইতে পারে না। এই সমস্ত কারণে ঋণ পরিশোধ অনেকটা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে এবং এই জন্য মজুরদিগকে অত্যধিক সুদ দিতে হয়। সমস্ত ক্ষেত্রেই যে মহাজনরা খুব বেশী লাভ করে তাহা নয়। অনেক সময়ই তাহাদিগকে আসল টাকা উঠাইবার আশা ত্যাগ করিতে হয়।

## সমবায় সমিতি

কৃষক ও কারখানার মজুরদের এই পার্থক্যের ফলে সমবায় সমিতি কৃষকদের মধ্যে যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে এই শ্রেণীর মজুরদের মধ্যে সেরূপ করে নাই। ইহাদের স্থিরতার অভাবই সমবায়ের প্রধান অন্তরায়। যেসব কলকারখানায় স্থায়ী মজুর আছে সেখানে সমবায় কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে। রেলওয়েতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্থায়ী মজুর আছে; সেই জন্য সেখানে সমবায় সমিতি বেশ কাজ করিতেছে। ইহাদের সফলতার অন্য একটী কারণ এই যে, রেল কর্ত্তৃপক্ষ সমবায়ের কার্য্যকলাপ দেখেন এবং মাহিয়ানা হইতে ঋণের টাকা কিস্তি হিসাবে

কাটিয়া লন। বি, বি, সি, আই রেলের সমবায় সমিতি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কাজ দেখাইয়াছে। ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত সমিতি মোট ধার দিয়াছে ১ কোটী টাকার উপর। তাহাতে লোকসান অতি সামান্য হইয়াছে। কোন সভ্য দু'জন প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ডওয়ালা সভ্য জামীনস্বরূপ দিতে পারিলে পূর্ব্বে এই সমিতি তাঁহাকে ধার দিত। তাহাতে অল্প কর্ম্মচারীই ধারের সুযোগ পাইত। এখন ৫ বৎসর চাকুরী করিতেছে এইরূপ দুজন জামীন হইলেই ধার দেওয়া হয়। ইহাদ্বারা অল্প মাহিয়ানার কর্ম্মচারীও ধারের সুযোগ পায়। কিন্তু এই ধার দেওয়া হয় কেবল মাত্র মহাজনদিগের দেনা শোধ করিবার জন্য। যাহাতে এই ভাবে দেনা শোধ হয় তাহার জন্য রেলের কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করেন। রয়্যাল কমিশন বলেন, যদি "লেবার অফিসার" নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে তাহারা ব্যক্তিগতভাবে মজুরদের সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও যেরূপ সুবিধা করিতে পারিবে তেমনই তাহাদিগকে মহাজনদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে। সমবায় সমিতি আরম্ভ হইবার সময় প্রথমে মালিকের উচিত সমিতির মূলধন গঠন করিবার জন্য টাকা ধার দেওয়া।

## দেনার বিপদ

কিন্তু সমবায় সমিতির যথেষ্ট প্রচার হইলেও তাহা মজুরদের আসল সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। অনেকে "ক্রেডিট" বা ধার পাইবার ক্ষমতা দেখিয়া মজুরদের অবস্থা বিচার করেন। কিন্তু অপর শ্রেণীর মজুরদের সম্বন্ধে যাহাই হউক, কারখানার মজুরদের পক্ষে এই ক্ষমতার কোন আবশ্যকতা নাই। বরং ইহা তাহাদের পক্ষে খুব মারাত্মক। রয়্যাল কমিশন ইহাকে অভিশাপ বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেক সময় বিপদ-আপদে টাকা ধার করা দরকার হয়, কিন্তু এই ধার

আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। এইভাবে পাওয়া না গেলেও, যদি ইতিমধ্যেই তাহারা ঋণগ্রস্ত না থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ অল্প সুদে অপরের কাছে পাওয়া যাইতে পারিত। যাহা হউক বর্ত্তমান অবস্থাতেও যদি তাহারা অল্প সুদে এই সমস্ত ধার পায় তাহা হইলে তাহাদের কিছু আরাম হয়। বড় বড় দেনা সাধারণতঃ সামাজিক ব্যাপারের জন্য হয়। এই দেনার কোনও সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। কাজেই এই প্রকার ঋণ-গ্রহণের ক্ষমতা যত কম থাকে ততই মঙ্গল। ঋণ-পরিশোধের উপায় থাকুক বা না থাকুক বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে অতি সহজেই ঋণ পাওয়া যাইতে পারে। এই জন্যও মজুরদের ঋণগ্রস্ত হইবার পক্ষে খুব সুবিধা হয়। মজুরদের নিরক্ষরতা এবং শিক্ষার অভাবও ইহাতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতের ভাবনা ইহাদের নাই বলিলেই হয়। একটী টিপসহির পরিবর্ত্তে দুই এক শত টাকার লোভ ইহারা সামলাইতে পারে না। তাহাতে যে আজীবন দাসখত লিখিয়া দেওয়া হয়, সে চিন্তা ইহারা করে না। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা সাদা কাগজে টিপ সহি করিয়া দেয়—আসল ও সুদের হার মহাজনই পরে বসাইয়া দেয়। "৫০ টাকার পরিবর্ত্তে ১০০ টাকা আসল লিখিয়া রাখা খুবই সাধারণ ব্যাপার এবং দেনদার যে ইহা জানিয়া শুনিয়াও কিছু বলে না, সেটাও খুব বিচিত্র ব্যাপার নয়।" সাধারণতঃ, মজুরদের হিসাবপত্র বা হ্যাণ্ডনোট বা হাতচিঠির কোন নকল থাকে না। মহাজনদের খাতাপত্র বা হিসাব নিকাশের উপরই তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। অনেক সময় চক্র-বৃদ্ধি হারে সুদ যে কিরূপ দাঁড়ায় তাহাও মজুররা ঠিক বুঝিতে পারে না বা বুঝিবার কোন চেষ্টা করে না। শিক্ষার অভাবই এইসমস্ত দোষের জন্য দায়ী। প্রধানতঃ, এই জন্যই তাহারা আপনার বা পরিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা না রাখিয়া অনাবশ্যক ঋণের বোঝা বাড়াইয়া তোলে।

## সুদ সম্পর্কে আইন

প্রায় সকল দেশের শাস্ত্রে ও আইনে অত্যধিক সুদ লওয়ার বিরুদ্ধে বিধান আছে, ভারতেও তাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশে এ সম্পর্কে আইন ছিল না। গত কয়েক বৎসর হইতে আইন দ্বারা বেশী সুদ লওয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। ১৯১৮ সনের যে আইন আছে ( দি ইউজুরিয়াস্ অ্যাক্ট টেন অব ১৯১৮ ) তাহা দ্বারা যদি আদালত বিবেচনা করেন যে, সুদের হার অতিরিক্ত এবং দেনদার ও মহাজনের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা অন্যায় তাহা হইলে দেনা পাওনার হিসাব আমূল পরিবর্ত্তন করিতে পারেন এবং সুদের পরিমাণ কমাইতে পারেন। ঐ আইনের ২য় ধারায় অতিরিক্ত সুদের এই ভাবে অর্থ করা হইয়াছে। যথা—আদালতের মতে টাকা ধার দিবার সময় যেটুকু অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া সুদ লওয়া উচিত ছিল তাহার বেশী। এই অনিশ্চয়তার পরিমাণ নির্দ্ধারণের সময় আদালত নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন—যথা—কোন জামীন বা বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল কিনা, দেনদারের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল, দেনদার পূর্ব্বে যদি কোন টাকা ধার লইয়া থাকে তবে তাহার ফলে কি হইয়াছিল ও মহাজন তাহা জানিত কিনা কিম্বা তাহার জানা উচিত ছিল কিনা। ঋণের চুক্তি অন্যায় কিনা তাহা নিরূপণ করিবার সময় আদালত বিবেচনা করিবেন, দেনদার ও পাওনাদারের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং পাওনাদারের টাকার প্রয়োজনীয়তা সে সময় কিরূপ ছিল। আইনের চক্ষে দেখিলে আমরা যে সুদের কথা আলোচনা করিতেছি তাহার কোনটিই "অতিরিক্ত" বলা চলিবে না। কেন না ভবিষ্যতে টাকা ফেরত পাইবার অনিশ্চয়তা এখানে সবটুকুই আছে। কাজেই এই আইন দ্বারা বিশেষ কিছু ফললাভ হয় নাই। তাহা

ছাড়া বিচারের সময় আইনের কড়াকড়ির ফলে আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

## আইনের বিরুদ্ধে মতামত

উপযুক্ত আইন দ্বারা অতিরিক্ত সুদ বন্ধ করার সেরূপ চেষ্টা হয় নাই বলিয়া দেশের লোক যে এরূপ সুদ পছন্দ করে তাহা নয়; বরং জনসাধারণ ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন চালাইতে চায়। ভাল রকম চেষ্টা এ পর্য্যন্ত যে হয় নাই রয়্যাল কমিশনের মতে তাহার দুইটি কারণ আছে—একটি চুক্তির নৈতিক ভিত্তি এবং অপরটি আইনের কার্য্যকারিতার উপরে অবিশ্বাস। প্রথম কারণটির কোন যথার্থ মূল্য থাকিতে পারে না। একদিকে সুদখোর মহাজন আর অপর দিকে নিরক্ষর মজুর। ইহাদের চুক্তির মূলে কোন নীতি বা ধর্ম্মের বিধান থাকিতেই পারে না। একটি দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে বা কোন সামাজিক ব্যাপারে এই অশিক্ষিত ভবিষ্যতের ভাবনাহীন কারখানার মজুরের পক্ষে কিছু অর্থের বিনিময়ে দাসখত লিখিয়া দেওয়া বিচিত্র নয়। সুদ সম্পর্কে যেসকল আইন আছে তাহার কার্য্যকারিতার অভাবের উপর লোকের যে ধারণা বদ্ধমূল আছে তাহাও দূর করা দরকার। অকেজো আইন থাকা অপেক্ষা তুলিয়া দেওয়া ভাল। কেন না, তাহা না হইলে আইনের উপর লোকের বিশ্বাস নষ্ট হয়। তেমনই আবার বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন আইন নাই যাহা লোকে এড়াইতে না পারে। কিন্তু তাই বলিয়া অন্যায়কে আইনতঃ বাধা দিবার চেষ্টা না করার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। মজুরদিগকে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতে দিবার জন্য উপযুক্ত আইনের খুব প্রয়োজন, এবং যাহাতে কার্য্যতঃ তাহা প্রতিপালিত হয় তাহাও দেখা দরকার। মজুরদের ঋণের বোঝা একটি দারুণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অন্ততঃ, কাগজে কলমে উপযুক্ত আইন থাকিলেও লোকশিক্ষার পক্ষে ইহা ভাল। কারণ তাহা হইলে লোকে ইহা বুঝিতে পারে যে, অতিরিক্ত সুদ লওয়াটা অন্যায় এবং অনেক মহাজনেরও বেশী সুদ লইবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে।

# গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের আর্থিক কথা*

শ্রীসুষমা সেনগুপ্তা, এম্-এ

মেয়েদের, বিশেষতঃ গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের আর্থিক কথা জিনিষটা জগতে নতুন। গৃহস্থ ঘর বলিতেই যে ধরণের ঘরের কথা আমাদের মনে উদিত হয় সেখানে বাড়ীর পুরুষেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে টাকা নিয়ে আসেন, আর গৃহিণী সেই টাকা দিয়ে গৃহের যাবতীয় দরকারী খরচপত্র করেন। অর্থের খরচের অংশটা গিন্নীর, অর্থসংগ্রহের ভাগটা পুরুষের। সেই খরচের মধ্যেও কত টাকা কি বাবদ ব্যয় হবে না হবে তা কোন স্থলে গৃহিণীর হাতে দেওয়া থাকে কোন বাড়ীতে কর্ত্তা সেটাও নিজের হাতে রাখেন। সে সব ক্ষেত্রে আর্থিক কথার মধ্যে গিন্নীর মোটেই ভাগ থাকে না। তিনি কেবল সুষ্ঠুভাবে সংসার-পরিচালনার পরিশ্রমটুকু করবার অধিকারী। "আর্থিক কথা" বলতে আমরা অর্থসংগ্রহের কথাটাই প্রধানতঃ বুঝি, এবং সেদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে মেয়েদের আলাদা কোন আর্থিক কথা ছিল না।

মেয়েদের যে একটা আলাদা আর্থিক সমস্যা আছে বা থাকতে পারে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন বা বিচার-বিতর্কটা জোরসে আরম্ভ হয়েছে হালে। এর কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ আছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর যখন ইয়োরোপে দলে দলে পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য সজ্জিত হল, তখন সেদেশে যত রকমের অসামরিক বাইরের কাজ পুরুষরা করত সে সমস্ত মেয়েরাই চালিয়ে নিল। এই যে ঘটনাটি ঘট্‌ল এতে মেয়েরা

---

* "আর্থিক উন্নতি" বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (এপ্রিল ১৯৩৩)। তালতলায় অনুষ্ঠিত কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। এর পরে মহাযুদ্ধের অবসানে তাদের আর পুরোপুরি ঘরে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হল না, মুক্তজীবনের আস্বাদ তারা পেয়েছে, নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় তারা পেয়েছে, সব ব্যাপারে পুরুষের মুখচেয়ে চলবার জীবনে তাদের আর ফিরিয়ে আনা গেল না। ফলে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে তাদের বাইরের নানারকম কাজে ঢোকা বেড়েই চল্ল। সংসার থেকে বেরিয়ে এসে ১০।১২ ঘণ্টা করে বাইরের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার গতানুগতিক ধারাও অনেকটা গেল বদলে, ফলে মেয়েদের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জীবনযাত্রার গতি গেল ঘুরে। আনুষঙ্গিক বহু সমস্যার উদয় হল। তার সমাধান যে কিভাবে হবে সে কথা বলা এখনো সম্ভব নয়।

আমাদের দেশেও একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের যুগের সূচনা দেখা দিয়েছে। ব্রাহ্ম যুগ থেকেই মেয়েদের শিক্ষা ও পর্দ্দাপ্রথা দূর করবার চেষ্টা চলছে এবং এই আন্দোলন আস্তে আস্তে গড়িয়ে এগিয়ে চলছিল। ধীরে ধীরে সহরে এবং গ্রামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে পর্দ্দাপ্রথাটা উঠে যাচ্ছিল। এর মধ্যে দেশে এলো আইন অমান্য আন্দোলন, সমগ্র ভারতের পর্দ্দা উঠল কেঁপে। দলে দলে বেরিয়ে এলো মেয়ের দল,—শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই ; সঙ্গে সঙ্গে এলো জগৎব্যাপী অর্থনৈতিক সমস্যা। সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের আর্থিক কথাটা খুব সজোরে সমাজের সামনে দেখা দিল।

মেয়েদের আলাদা আর্থিক কথা জিনিষটা সমাজের সামনে আগেও ছিল এবং এতদিন ধরে ধীরে ধীরে তার সমাধানের চেষ্টাও সমাজসেবীরা করছিলেন। সেটা কেবলমাত্র একটা বিশিষ্ট নারী-সমাজের সমস্যা ছিল, এত ব্যাপকভাবে ছিল না। সেটা ছিল বালবিধবা বা স্বামিপরিত্যক্তাদের কথা। বালবিধবা বা স্বামিপরিত্যক্তা আমাদের

দেশে কম নেই। তারা পরের সংসারে গলগ্রহ হয়ে সুখে কাল কাটায় না। কাজেই তারা যদি নিজের জীবন চালাবার জন্য কিছু উপায় করতে পারে সেদিকে কিছু চেষ্টা করা দরকার, এই উদ্দেশ্যে চারদিকে বিধবাশ্রম শিল্পাশ্রম প্রভৃতি আস্তে আস্তে গড়ে উঠছিল ; কিন্তু এতে সমাজের কাঠামোতে কোন আঘাত করে না, কাজেই এ প্রশ্ন একটা বিশিষ্ট প্রশ্ন হয়ে এতদিন ওঠেনি। এ কাজটা সমাজ-সেবার একটা অঙ্গ বলেই সকলে দেখে এসেছে। বালবিধবা এবং স্বামিপরিত্যক্তাদের জন্য যে বিশেষভাবে সাহায্য করা দরকার এর মূলেও এই মনোভাব রয়েছে যে, আদতে এদের যাঁর ভরণপোষণ করবার কথা তাঁর অবর্ত্তমানতা হেতুই এদের ভরণপোষণের সমস্যা। এ ছাড়া মেয়েদের শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর এক শ্রেণীর নারীকর্ম্মী দেখতে পাই যাঁরা হয়ত মনের মত পাত্রের অভাবে কি অন্য কোন কারণে চিরকুমারী থেকে মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীগিরি কিংবা ডাক্তারী ইত্যাদি করে জীবন কাটিয়ে দিলেন। তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সমস্যা খুব ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে।

আগে আমাদের দেশে গৃহস্থ জীবনের ধারা যেভাবে প্রবাহিত ছিল তাতে বিয়ে জিনিষটা নিয়ে কেউ বেশী মাথা ঘামাত না। ওটা কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারের অন্তর্গত ছিল না বল্লেই চলে, মোটামুটি একটা সামাজিক ব্যাপার ছিল। আগে লোকের ধারণা ছিল যে, সমাজের স্থিতির জন্য প্রত্যেক পুরুষ এবং প্রত্যেক মেয়ের বিয়ে হওয়া দরকার ; এজন্য যা কিছু দরকার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন উদ্যোগী হয়ে করতেন, বধূ এবং আনুষঙ্গিক সন্তানাদির জন্যও ছেলের বিশেষ ভাবনা ছিল না। বিয়ে করে নিশ্চিন্তচিত্তে যতদিন ভাল কাজ না জোটে ততদিন পুরুষ অপেক্ষা করতে পারত এবং রোজগার হলে সে টাকা সমস্ত সংসারের জন্য ব্যয়িত হত। একান্নবর্ত্তী পরিবারের

সবাই আয়ও করত পরিবারের জন্য, ব্যয়ও করত পরিবারের জন্য। প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিজের ভরণপোষণের জন্য নিজের চিন্তা এত গুরুতর ছিল না।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাল কি মন্দ, সেটা কেন ভেঙ্গে যাচ্ছে, ভাঙ্গা উচিত কি না, তা নিয়ে বহু আলোচনা বহুবার হয়ে গেছে। কাজেই তা নিয়ে অযথা এ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে মোট কথা এই যে, বর্ত্তমান জগতে একান্নবর্ত্তী পরিবার আর চলছে না, পুরুষ এখন বিয়ে করলে তার স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাদির ভার তার নিজেরই ঘাড়ে নিতে হয়, এ ছাড়া লোকের জীবনযাত্রার মাপকাঠি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আগে যাতে চলত এখন তাতে চলে না, তার ওপর এই জগৎব্যাপী অর্থসমস্যার ফলে অধিকাংশ যুবক বেকার বসে আছে। এ অবস্থায় বিয়ে করতে হঠাৎ আর কেউ রাজী নয়। বিয়ে করে পরিবারকে না খেতে দিতে পারার চাইতে বিয়ে না করা যে ভাল, এ কথা সবাই ভাল করেই বুঝেছে। ফলে দেশে অবিবাহিত শিক্ষিত যুবকযুবতীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর ফলে দেশে যেসব মেয়েরা লেখাপড়া শিখে বিয়ে করছে না, তারা দেখছে যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে রোজগার না করলে তাদের আদর্শ অনুযায়ী বাস করা অসম্ভব। গৃহস্থ জীবনযাপন করতে হলে একটু ভাল স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে থাকা দরকার, ছেলেপিলেদের একটু পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দেওয়া দরকার, তাদের ভাল লেখাপড়া শেখান দরকার। অন্ততঃ এটুকু না করতে পারলে তাদের গৃহী হবার সক না রাখাই ভাল। এইটুকু চালাতে হলেই আজকাল অনেক ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের রোজগারের দরকার হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া স্বামী যাদের ত্যাগ করেছেন বা যাঁরা বিধবা তাদের ত রোজগার করা দরকারই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যবিত্ত অবস্থার কুমারী, সধবা এবং বিধবা

সব রকমের মেয়েদেরই রোজগার করা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যই দরকার, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ছেড়ে দিলেও। এতকাল মেয়েদের সম্বন্ধে একটা ভাব চলে এসেছে, যে কোনমতে মেয়েদের একটা বিয়ে দিতে পারলেই অন্ততঃ তাদের খাওয়াপরা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল ; সেটা আর বর্ত্তমান অবস্থায় খাটছে না।

এখন এই যে মেয়েদের রোজগার করবার দরকার হয়ে পড়ছে, এ জিনিষটার দিকেও লোকের নজর একটু একটু করে পড়ছে। বর্ত্তমানে ঘরের বাইরে মেয়েদের কার্য্যক্ষেত্র খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রধানতঃ, ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীগিরি ও ডাক্তারি এই দুটী কাজেই মেয়েরা নিযুক্ত হয়, আজকাল ব্যবসায়াদির প্রচার বিভাগে এবং দুটি একটি মেয়ে আপিসের কাজে ঢুকতে সুরু করেছেন। বিবাহিত মেয়েদের সন্তানাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঘরেই থাকতে হয়। কাজেই তাঁদের রোজগারের কথা উঠলেই গৃহশিল্পের কথা উঠে পড়ে। ঘরে বসে যে মেয়েরা কত রকম কাজ করতে পারে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে, কাজেই পুনরালোচনা অনাবশ্যক। তবে গৃহশিল্প জিনিষটা মন্দের ভাল অর্থাৎ একান্ত অভাবস্থলে অবসর সময়ে কিছু না করার চাইতে ভাল। কিন্তু গৃহশিল্পের একটা সুবিধা এই যে, ঘরের মেয়েরা অবসর সময়ে ঘরে বসে যদি শিল্পকার্য্য করে কিছু পয়সা উপায় করতে পারে, তাতে গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালীর কোন ব্যাঘাত ঘটে না। মা যদি বাইরে কাজ করতে যান ; অমনি প্রশ্ন উঠবে ছেলেপিলের কি উপায় হবে? বিশেষ দুরবস্থা ঘটলে মাকে ঝি চাকরের কাছে ছেলেপিলে রেখে যেতে হয়, কিন্তু সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে ছেলেপিলেদের অযত্ন হয়, মায়ের মনেও শান্তি থাকে না, এবং সমাজে ব্যাপকভাবে এ ব্যবস্থা হলে সমাজের পক্ষেও সেটা কল্যাণকর হবে না। তবে এক একটা

বিশেষ ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে মায়ের এ ব্যবস্থা করতে হয়। মেয়েদের রোজগারের প্রচেষ্টার প্রথম অবস্থায় গৃহিণীদের পক্ষে গৃহশিল্পটা আদরণীয় হবে, এবং সেটাই একমাত্র উপায় হবে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ ব্যবস্থা চিরদিন চলবে না। কেন না, ঘরে বসে গৃহশিল্প-চর্চ্চার মধ্যে কতগুলো অসুবিধে আছে। প্রথম এবং প্রধান হ'ল তৈরী জিনিষগুলি বিক্রী করবার ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয় কথা হল বিক্রী করতে পারলেও এ থেকে খুব বেশী রোজগার করা কোনদিনই সম্ভব হয় না বলে যাঁদের বেশী রোজগার করবার ক্ষমতা আছে, তাঁদের বেশী দিন এইভাবের উপায়ের মধ্যে আটকে রাখা যাবে না। সংসারের সুরাহা করবার জন্য তাঁরা হয়ত বাইরে গিয়ে কাজ করতে চাইবেন।

মেয়েরা ঘরের বাইরে কাজ করতে আরম্ভ করলেই তাঁদের ছেলেপিলে রক্ষণাবেক্ষণের একটা সুব্যবস্থা করার দরকার হবে। এদিক্ দিয়েও মেয়েদের একটা কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী হবে। পাঁচ বাড়ীর মা কাজ করতে গেলে তাঁদের যদি দশটি শিশু থাকে তাঁদের হয়ত আবার আর একজন শিক্ষিতা মা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। এ জন্য যে মায়েদের ছেলে তিনি রাখছেন তাঁরা তাঁকে মাইনে হিসাবে কিছু কিছু দিলে ফলে ছয়জন মায়েরই কিছু রোজগার করবার সুবিধা হয়, ছেলেপিলেদেরও ভাল রক্ষণাবেক্ষণ হয়। এ সমস্ত জিনিষ অন্য অন্য দেশে রাষ্ট্র থেকে পরিচালিত হয়। কাজে নিযুক্তা মায়েদের জন্য ফ্যাক্টরীর সঙ্গে সঙ্গে ক্রেশ, নার্সারি প্রভৃতি রাখবার ব্যবস্থা হয়, তাতে মায়েরা নিশ্চিন্তে শিশুদের উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে রেখে যেতে পারেন। আমাদের দেশে অবশ্য সম্প্রতি এসব নিজেদের চেষ্টায়ই গড়ে তুলতে হবে।

আর একটা প্রধান কথা হচ্ছে এই, মেয়েদের রোজগার করতে

হবে বল্লেই তো আর হবে না, তাদের রোজগারের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা খুঁজে বের করতে হবে এবং এদিক্ দিয়ে প্রচেষ্টার প্রধান সহায়ক হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। ভবিষ্যতে যখন অধিকাংশ মেয়েকেই রোজগার করে খেতে হবে, তখন সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের এমন কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে তারা ভবিষ্যতে দরকার হলে কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারে। এজন্য কিছু স্থকুমার শিল্প ও গৃহশিল্পাদি স্কুলের পড়ার সঙ্গেই শেখান যায়। এ ছাড়া যারা উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম তাদের ইস্কুলের পড়া শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে একটা কোন বিশেষ অর্থকরী শিক্ষা দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এদিক্ দিয়ে বর্ত্তমান অবস্থায়ও মেয়েদের শর্টহ্যাণ্ড, টাইপ রাইটিং বুক-কিপিং ও একাউণ্টেন্সি, ফোটোগ্রাফি, নার্সিং, মিড্‌ওয়াইফারি কিংবা টেলিফোন কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে টেলিফোনের কাজ ইত্যাদি নানা রকম অর্থোপার্জ্জনের উপায় শিখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। একবার এদিকে চিন্তা এবং চেষ্টা স্থরু হলে ক্রমশঃ নানাদিকে পথ আপনিই বের হতে থাকবে।

মোট কথা এই যে, চিন্তাশীল বাপমায়েরও এখন এদিকে দৃষ্টি পড়া উচিত। মেয়েদের যখন কুমারী, সধবা, বিধবা সব অবস্থাতেই রোজগার করবার দরকার হতে পারে, তখন আর মেয়েদের যেমন তেমন করে মানুষ করলে চলবে না। তাদেরও ভাল করে মানুষ করে তুলতে হবে। ছেলেকে মানুষ করবার সময়ে বাপের চিন্তার অবধি থাকে না, শুধু লেখাপড়া শেখালেই তো হবে না, কি করে খাবে, যাতে ভালভাবে থাকতে পারে, ভাল রোজগার করতে পারে যাতে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে লড়াই করে দাঁড়াতে পারে, সেই দিকে নজর রেখে ছেলেকে মানুষ করা হয়। মেয়েকে লেখাপড়া শেখালেও

মাবাপের তাকে মানুষ করার দিকে নজর থাকে না। আসল কথা মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। তার ভাগ্য নির্ভর করবে পরের ওপর। লেখাপড়া? যতদিন বিয়ে না হয় যেটুকু করে করুক্। কিন্তু তাই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে আর চলবে না। প্রথমতঃ, মেয়েকে ভাল বিয়ে দেওয়া যায়। বিয়ে ভাল না দিতে পারলে মেয়ে যদি জামাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে পারে তাতে সংসারের একটু উন্নতি হবে; আর যদি ভাল বিয়েও হয়, তবু যদি কোন দৈব দুর্বিপাক ঘটে মেয়ে যেন নিজের এবং পুত্রকন্যার ভার নিজের ঘাড়েই তুলে নিতে পারে। স্বামী বেঁচে থাকলেও অমানুষ হতে পারে। তার সঙ্গে দারুণ মনোমালিন্য ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রাণান্তকর অপমান সয়ে স্বামীর ঘর মেয়ের করতে হয় না যদি তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে। এই সব নানাদিক্ ভেবে মেয়েকে মানুষ করা মা-বাপের কর্ত্তব্য। মেয়েও মানুষ, তার শারীরিক অভাব অভিযোগ, আরাম বিরাম, মান অপমান বোধ, সবই পুরুষেরই মত। কাজেই তাকেও মানুষ করে গড়ার দিকেই নজর দেওয়া দরকার।

এতক্ষণ মেয়েদের রোজগার করবার মূলে শারীরিক প্রয়োজনের কথাই শুধু বলেছি, কিন্তু এর ফলে একটা মানসিক পরিবর্ত্তনও সমাজ-জীবনে আসতে বাধ্য। এতদিন ধরে সমাজে মেয়েদের ভাগ্যে পুরুষের অধীনতা স্বতঃসিদ্ধের মত চলে আসছে। তারও মূলে আছে মেয়েদের আর্থিক অধীনতা। যাই হোক্ না কেন, কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য যে মেয়েদের পুরুষের মুখ চেয়ে পড়ে থাকতেই হবে, এটা জানা কথা বলেই এতদিন মেয়েদের উপরে অনেক নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা চলে এসেছে। মেয়েরাও নীরবে সব সয়ে এসেছে। আজ যদি মেয়েরা বুঝতে পারে যে, এদিক্ দিয়ে তারা কারো অধীন নয়, তাহলে তাদের নিজেদের ওপর ধারণা এবং পুরুষদের তাদের প্রতি

মনোভাব উল্টে যেতে বাধ্য। ইয়োরোপে এবং আমাদের দেশেও, এ কথার সত্যতা মেয়েরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এইজন্যই ইয়োরোপে যুদ্ধাবসানে যখন মেয়েদের বাইরের কাজ করবার দরকার ঘুচে গেল, তখনো মেয়েরা তাদের ঘরে ঠিক আগের জায়গাটিতে আর ফিরে গেল না। আমাদের দেশেও বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার ফলে মেয়েদের বাধ্য হয়ে রোজগারের পথে নামতে হচ্ছে। কিন্তু একবার আত্মশক্তির পরিচয় পেলে আর তাকে চার দেয়ালে আবদ্ধ সম্পূর্ণ পরাধীন জীবনে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হবে না। ফলে এই যে মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্রে নামা এ একটা নারীজীবনের প্রগতি, যেটা সমাজে এসে পড়েছে এবং যার গতি আর রোধ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কাজেই এ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তা করা এবং ভালরূপে উপায় করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, পিতামাতার দরকার প্রত্যেকটি মেয়ের ভাল শিক্ষাদানের চেষ্টা করা। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তব্য সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের বিশেষ অর্থকরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। এবং তৃতীয়তঃ, দরকার সঙ্গে সঙ্গে শিশুপ্রতিষ্ঠান খোলার—যেখানে মাতারা কাজ করবার জন্য বাইরে যেতে হলে শিশুদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে রেখে যেতে পারেন। এই সমস্ত কাজ ব্যাপকভাবে করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য দরকার রাষ্ট্রের সাহায্যের। শিশুদের নার্সারি, কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল, বিশেষ অর্থকরী শিক্ষালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে মনুষ্যত্বের পথে নিয়ে যাওয়া যে রাষ্ট্রের কাজ সে ধারণা আমাদের দেশে প্রচলিত হতে এখনো দেরী আছে। তবে যতদিন রাষ্ট্রের সাহায্য না পাওয়া যায় ততদিন আমাদের আপনআপন ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে যতটুকু সম্ভব কাজ করে যেতে হবে।

# একালের নবদ্বীপ-পরিক্রমা*

অ্যাড্‌ভোকেট পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

সম্পাদক, "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, অতীতের কথা দূরে থাকুক বর্ত্তমান নবদ্বীপ সম্বন্ধেও সব কথা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার। এখানে নৈয়ায়িকের অভাব নাই, বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীরও প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান, ও সব কথা লিখিতে চেষ্টা করিলে ঠকিয়া যাইব। উহা না লিখিলে নবদ্বীপের সম্মান বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হইবে না; কারণ নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্চ্চার কথা অনেকেই জানেন। আমি শুধু তথাকার আথিক তথ্য যৎকিঞ্চিৎ জানাইতে চেষ্টা করিব।

নবদ্বীপ লম্বায় দেড় মাইল ও চওড়ায় এক মাইল। গঙ্গা প্রথমে নবদ্বীপের পশ্চিম সীমানায় ছিল, তৎপরে উত্তর সীমানায় সরিয়া যায়; এক্ষণে পূর্ব্ব দিকে আসিয়াছে। গঙ্গার সঙ্গে আর একটী নদী—"খোড়ে" বা জলাঙ্গী আসিয়া মিশিয়াছে। "খোড়ে" নদী বরাবর কৃষ্ণনগরের পদতল দিয়া বহিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গায় অনেকটা চড়া পড়িয়াছে, উক্ত চড়ার উপরে নূতন ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইতেছে।

"নবদ্বীপ" নামটীর দুইটী কারণ শুনা যায়। কেহ বলেন যে, নবদ্বীপ অর্থে নূতন দ্বীপ বুঝায় এবং সেই জন্যই উহার "নবদ্বীপ" নামকরণ হইয়াছিল। আবার কেহ বলেন যে, নয়টী দ্বীপ আছে বলিয়া নবদ্বীপ নাম হইয়াছে। নয়টী দ্বীপের নাম যাহা শুনিলাম তাহা এই:

* "আর্থিক উন্নতি," বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (এপ্রিল-মে ১৯৩৩)।

১ম অগ্রদ্বীপ, ২য় কুলিয়া, ৩য় বিদ্যানগর, ৪র্থ মাধাই, ৫ম পুরাতন মায়াপুর, ৬ষ্ঠ মায়াপুর, ৭ম বল্লাল ঢিবী, ৮ম নবদ্বীপ, ৯ম বাউনপুর।

লোক-সংখ্যা ১৯,০০০। তন্মধ্যে ৪০০ মুসলমান। অধিকাংশ লোকই ধর্ম্মচর্চ্চায় দিন যাপন করে। সুতরাং কাজ বলিতে এখানে কিছুই নাই। চাষী-মজুর এখানে নাই। জেলে, মাঝি, মিস্ত্রী, শিল্পী প্রভৃতি শ্রেণীর মজুরই আছে। নবদ্বীপের ঐ কয় শ্রেণীর মজুর বাদ দিলে আর সকলেই নির্ব্বিকারভাবে কীর্ত্তনাদি করিয়া অথবা দানের উপর, অথবা সন্তানাদির উপার্জ্জনের উপর অথবা জমিজমার আয়ের উপর জীবন ধারণ করে। সাধারণ দানের উপর অনেক লোকই নির্ভর করে। সেই জন্যই নবদ্বীপে ভিক্ষুক নাই বলিলেই হয়। "ভজনাশ্রম," "অনাথ ভবন" প্রভৃতি দাতব্য প্রতিষ্ঠান (চ্যারিট্যাব্‌ল্ ইনষ্টিটিউশন্) এখানে থাকাতে গরীব স্ত্রীলোকেরা যথেষ্ট সাহায্য পায়। প্রাতঃকালে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা ভজনাশ্রমে আসিয়া বড় দালানে জমায়েত হয়। তৎপরে সেখানে নাম গান করে এবং যাইবার সময় চাল ডাল প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য লইয়া যায়। কখন কোন বড় লোক আসিলে তাঁহারা শীতবস্ত্র, পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি দান করিয়া যান।

যাত্রীরা প্রথমে আসিয়া যদি কোথায়ও আশ্রয় না পায় তাহা হইলে "লজিং হাউস" বা যাত্রী নিবাসে আশ্রয় লইতে পারে। তথায় আহারাদি পাওয়া যায় না, শুধু থাকিতে পারা যায়।

লজিং হাউস কমিটি কর্ত্তৃক একটী হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে। এখানে কেবলমাত্র কলেরা ও বসন্ত রোগের চিকিৎসা হয়। নবদ্বীপে আর একটী হাঁসপাতাল আছে তাহার নাম "গ্যারেট হসপিট্যাল"। এখানে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য দুইটী মাত্র ঘর আছে। রোগে আক্রান্ত হইলে এখানে লোকে আসে। প্রতি শয্যায় মাসিক (সমস্ত

ধরিয়া ) ২৫৲ করিয়া খরচা পড়ে। উহারই সংলগ্ন একটী প্রসূতি-আগার আছে। দুইজন ডাক্তার ও একজন মাত্র সেবিকা আছেন। রাত্রে রোগীরা একলা থাকে। কারণ রাত্রে সেবিকা নিযুক্ত করার মত অর্থের অসম্ভাব। আর একখানি ঘর তৈয়ারী হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে শয্যা ( বেড্ ) ঠিক হয় নাই। এমার্জেন্সি ডিপার্টমেণ্টে দিন প্রায় ১০০ থেকে ১২৫ জন রোগী আসে। প্রত্যেকের নিকট এক পয়সা করিয়া লওয়া হয়। এইরূপে প্রায় বৎসরে সাতশত কি আটশত টাকা উঠে। সাধারণের দান, মিউনিসিপ্যালিটীর খয়রাত ও গবর্ণমেণ্টের কিছু গ্রাণ্ট প্রভৃতি পাইয়া কোন গতিকে এই হাঁসপাতালটী চলিতেছে। দেখিয়া মনে হইল লোকের অনেক অভাবই এই হাঁস-পাতাল বিদূরিত করিতে পারিত, কিন্তু অর্থাভাবে সেসব অভাব মোচন করা যাইতেছে না। আরও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় নবদ্বীপে আছে। এখানে মাত্র প্রাতঃকালে ঔষধ বিতরণ করা হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতির নাম এখানে সাধারণের মধ্যে একেবারেই প্রচলিত নাই ; কো-অপারেটিভ সিসটেম এখানে প্রবেশ-লাভ করে নাই। এখনও এখানকার লোকে ব্যাঙ্ক বা কো-অপারেটিভের নাম করিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে।

রাস্তাঘাট একেবারে মন্দ নহে। চওড়া হিসাবে খুব বড় না হইলেও নেহাৎ ছোট নহে। এখানে পাকা রাস্তা ১৫ মাইল এবং কাঁচা রাস্তা ১১ মাইল। পাকা রাস্তাগুলি দেখিলে কলিকাতার পুরাণ গলির কথা মনে পড়ে। এখন যদিও কলিকাতার প্রায় সমস্ত পথে পিচ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু বৎসর দুয়েক পূর্ব্বেও ইটের খোয়া ফেলিয়া পিটিয়া দেওয়া হইত। নবদ্বীপের পাকা রাস্তার অবস্থা ঠিক তদ্রূপ। কোথাও বা ইট পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু মেরামত অভাবে স্থানে স্থানে রাস্তার ভীষণ অবস্থা হইয়াছে।

সবচেয়ে মনে লাগে মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার। নবদ্বীপে যখন ঠাকুর দর্শন করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, তখন পয়সার তাগাদা আর অব্রাহ্মণদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার বড়ই প্রাণে লাগিল। মনে হইল আমাদের স্বদেশবাসী এবং ধর্ম্মের পাণ্ডারাই শোষক উপাধির যোগ্য। "গোঁসাই" নামক জীব যে ঈশ্বরের নামে ফাঁকি দিয়া অত্যাচার করে সেদিকে কি কাহারও নজর পড়ে না? প্রত্যেক মন্দিরে সাড়ে পাঁচ আনা, চার আনা, তিন আনা মাথা-পিছু না দিলে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। মনে করুন কোন গরীব লোক স্ত্রীপুত্র লইয়া আসিয়াছে, মোট আটজন; তাহা হইলে, তাহাদের প্রত্যেক মন্দিরে ।০ আনা হিসাবে ধরিলে দুই টাকা করিয়া প্রবেশ মূল্য ধরিয়া দিতে হইবে। যদি আটটী মন্দির দর্শন করে তাহা হইলে ১৬৲ ষোল টাকা খরচা শুধু ঠাকুর দেখার জন্য পড়িবে। শোষক আর কাহাকে বলে?

## নবদ্বীপের শিল্প

এখানে ইট তৈয়ারী, সুরকীর কল, কাঁসা ও পিতলের জিনিষপত্র তৈয়ারী এবং কুমারের কাজই হইল প্রধান শিল্প। ইট তৈয়ারী সম্বন্ধে দু'একটী কথা এখানে বলা যাক। আমার বন্ধু এবং সহকর্ম্মী অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বাগ্‌চি নবদ্বীপের মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বাগ্‌চি মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বাগ্‌চি মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাগ্‌চি মহাশয়ের একটী ইট্ তৈয়ারীর কারখানা আছে। তাঁহারা ইট্ তৈয়ারী করিয়া স্থানীয় খরিদ্দারকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। তিনিই দয়া করিয়া ইট্ তৈয়ারীর উপায় দেখাইয়া দেন। যতটা দেখিয়াছি জানাইতে চেষ্টা করিব।

ইট্ তৈয়ারীর প্রোসেস্ বা নিয়ম অতি সহজ। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বুলসাহেবের আবিষ্কৃত ইট প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইংরেজীতে এক একটী ভাঁটীকে কিল্ন্ বলে। কিল্নগুলি দেখিতে ডিমের মত, ইংরেজীতে ওভ্যাল টাইপ্ বলা হয়। কিল্নের মধ্যে খানিকটা জায়গা ভরাট থাকে এবং পাশে পাশে ইট সাজাইয়া আগুন ধরাইবার জায়গা থাকে। যেখানে কিল্নের মুখ থাকে সেইখানেই কয়লার আগুন করিয়া দেওয়া হয়। এবং সেই দিকের ইট পোড়া হইলে, ভিতরের দিকে আগুন ক্রমশঃ টানিয়া আনে। টানিয়া আনিবার সময় ধারের দিকে কাঁচা ইটের উপরে মধ্যে ফাঁক থাকে। সেই ফাঁক দিয়া আগুন বাড়াইবার জন্য কয়লা ফেলিয়া দেয়।

কিল্নে যে ইট্ হয় তাহা চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর ইট্, দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট্, তৃতীয় শ্রেণীর ইট্ এবং চতুর্থ শ্রেণীর ইট্। প্রথম শ্রেণীর ইটে সমানভাবে তাপ পাইয়া ইট্ সুন্দরভাবে প্রস্তুত হয়। তাহার অপেক্ষা যে থাকের ইট কম তাপ পায় তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট বলে। এই রকম আরও অল্প তাপ যে ইটে পায় সেই ইটকে তৃতীয় শ্রেণীর ইট বলে। চতুর্থ শ্রেণীর ইটকে ঝামা বলে। এখানে প্রথম শ্রেণীর ইটের দাম ১১৲।১২৲ টাকা করিয়া গাড়ী।

এখানে যে মজুর খাটে তাহারা সকলেই গোরক্ষপুর থেকে আসে। মেয়ে, পুরুষ ও ছোট ছেলে সকলেই কাজ করে। বাগচির ইটের কারখানায় প্রায় একশত হইতে দেড়শত লোক খাটে। ইহাদের মাহিনা বিভিন্ন রকমে দেওয়া হয়:

(১) মাস হিসাবে।

(২) কন্ট্রাক্ট হিসাবে।

(৩) দৈনিক পারিশ্রমিক হিসাবে।

মাস হিসাবে মিস্ত্রী আছে, তাহাদের মাহিনা ২৫৲ থেকে ৩০৲ টাকার মধ্যে। কনট্রাক্ট হিসাবে যে লোক খাটে তাহাদের নিয়ম ১০০০ ইট তৈয়ারি করিয়া শুকাইয়া দিলে ১৷৷০ করিয়া পাইবে। দৈনিক হিসাবে যাহারা মজুরি পায় তাহাদের একটা নিয়ম আছে। কড়ি হিসাবে তাহাদের মজুরি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সাড়ে সাত গণ্ডা কড়িতে এক আনা করিয়া ধরা হয়। মনে করুন একটি ছোট ছেলে ইট বহন করিতেছে। তাহার মোট-পিছু একটি করিয়া কড়ি সে পাইবে। এই রকম করিয়া যখন সাড়ে সাত গণ্ডা কড়ি জমা হইবে তখন সে এক আনা পাইবে।

বাঙ্গলা দেশের মধ্যে নবদ্বীপ অতি প্রাচীন শহর। এখানে যে শিল্প বহুকাল ধরিয়া রহিয়াছে তাহাতে বাঙ্গালী মজুরের মুখ না দেখিয়া একান্ত দুঃখিত হইলাম। অনেক স্থানেই দেখি বাহির হইতে লোক আমদানি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর কি শিখিবার কিছুই নাই?

পাঁজার ইট দিয়া মানুষের বুকভোর উঁচু দেওয়াল চতুর্দ্দিকে ঘেরা। ইটের মধ্যে চূণ বা সুরকী নাই, কেবল মাত্র ইট সাজান। তাহার মধ্যে মধ্যে শতশত ছিদ্র রহিয়াছে। উপরে খড়ের চালা। অতি ছোট একটী প্রবেশদ্বার, জানালার কোন আবশ্যক আছে বলিয়া মনে হইল না। এই রকমের ঘরে তাহারা বসবাস করে।

আহার সম্বন্ধে জানিলাম যে, তাহারা সাধারণতঃ চাল ডাল এক সঙ্গে খিচুড়ি করিয়া খাইতে খুবই ভালবাসে। সময়ের অভাবে কখনও কখনও ছাতু খাইয়া থাকে। অসুখ করিলে ডাক্তার দেখান তাহাদের স্বভাববিরুদ্ধ)। সম্পত্তির মধ্যে একখানি থালা, একটি লোটা, আর কাহারও কাহারও দু'একটি বাটী বা জলের গামলা। গায়ে শীতবস্ত্র দেখি নাই। সাদা মোটা থান কাপড়ই পুরুষ মেয়ে

সকলে পরে। কাপড় কাচার রেওয়াজ তাহাদের মধ্যে খুবই কম। সকলেরই দেখি "কালী মাইর" প্রতি খুব ভক্তি। কারণ, দেখিলাম যে ইটের পাঁজায় প্রথম আগুন দিবার পূর্ব্বে মায়ের পূজা করিয়া তবে আগুন ধরায়। তাহারা জাতিতে হিন্দু; কিন্তু আহারে হিন্দুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ শূকর, গরু প্রভৃতি যাহা পায় তাহাই সানন্দে আহার করে।

## নবদ্বীপে পিতল-কাঁসার শিল্প

পূর্ব্বে নবদ্বীপ পিতল-কাঁসার কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও আছে, তবে পূর্ব্বের মত প্রতিপত্তি নাই। নবদ্বীপের পিতলকাঁসার শিল্পই শিল্পরাজ্যে তার গৌরবের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিলাম তাহাতে কাঁসারিদের অবস্থা খুবই খারাপ বলিয়া মনে হইল। এখন মাত্র ৭০ ঘর কাঁসারি আছে। তাহারা শুধু মজুরি পাইয়াই জীবনধারণ করে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত পিতলকাঁসা পিটিয়া, গালাইয়া, আগুনের তাপ পোহাইয়া কোন গতিকে জীর্ণদেহ মলিন কাপড়ে আবৃত করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ দু'বেলা দুমুঠা আহার করে। কিন্তু আসল টাকা পায় জোড়াসাঁকোর কাঁসারির দোকানীরা আর যত "মিড্‌লম্যান" (মধ্যবর্ত্তী) ব্যবসাদার এবং মহাজনরা। এই সব দোকানীরা উক্ত কাঁসারিদের নিকট হইতে মণকরা বা সেরকরা হিসাবে তৈয়ারী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লয়, তাহার উপর ঐ মণকরা সেরকরা হিসাবে একটা মজুরি ধরিয়া দেয়। সাধারণতঃ, পিতলের কাজে মজুররা বাজারে মণকরা ৮৲ টাকার মধ্যেই মজুরি পায় এবং কাঁসার কাজে সেরকরা ১৷৹ থেকে ১৷৵৹, খুব বেশী ১৸৹ পর্য্যন্ত মজুরি পায়। জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, দৈনিক একটি লোক ১৲ থেকে

১॥০ টাকা পর্য্যন্ত উপস্থিত বাজারে রোজগার করিতে পারে। তাহা হইলে তাহার মাসিক আয় দাঁড়ায় ৩০৲ থেকে ৪৫৲ টাকার মধ্যে। দৈনিক খরচ তাহার সব ধরিয়া প্রায় ১৲ টাকা। কাজেই "যত্র আয় তত্র ব্যয়" হইতেছে। তবে ইহাও শুনিলাম যে, তাহারা এক-কালে ( অর্থাৎ বাজার যখন ভাল ছিল ) ৩৲ থেকে ৫৲ টাকার মধ্যে প্রত্যহ রোজগার করিয়াছে। কারণ তখন মজুরি ছিল বেশী।

মজুরির পার্থক্য হইবার কারণ এই যে, কাজ হিসাবে মজুরি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যদি অধিক কারুকার্য্য থাকে তাহা হইলে মজুরি বেশী হইবে। যেমন প্রথম যখন গ্যাসবাটী বাহির হয় তখন আবিষ্কারকর্ত্তা সের-পিছু ১০৲।১২৲ টাকা পর্য্যন্ত মজুরি পাইয়াছে এবং এখনও গ্যাসবাটী, টেক্কা থালা, জলতরঙ্গ ডিস্, আয়না ডিস্ প্রভৃতির মজুরি ১॥৵০, ১॥৶০ ( সেরকরা ) পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

নবদ্বীপে যে যে দ্রব্য নির্ম্মিত হয় তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে :—

পিতলের কাজ—হাতা, খুন্তি, ছোট বাটী প্রভৃতি।

কাঁসার কাজ—গ্যাসবাটী, টেক্কা থালা, হরতন ডিস, আয়না ডিস্, জলতরঙ্গ ডিস, বাটী, গেলাস ইত্যাদি।

ঐ সব দ্রব্যাদির স্থানীয় বিক্রয় খুবই কম। সমস্তই চালান হইয়া কলিকাতায় আসে।

এই গরীব কাঁসারিরা যাহাতে আরও কিছু বেশী পায় সে সম্বন্ধে দেশের লোকের ভাবা আবশ্যক। বোধ হয় কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স স্থাপিত হইলে "মিড্‌লম্যানের" কবল হইতে এই গরীবেরা বাঁচিতে পারে এবং ক্রেতাদেরও সুবিধা হইতে পারে। কারণ তাহাতে বিক্রেতা এবং ক্রেতা সোজাসুজি বাণিজ্য করিবে।

## কুম্ভকারের কথা

এখানে কুম্ভকার বা কুমোর অনেক ঘর ছিল, কিন্তু কমিয়া আসিতেছে। কুমোরেরা এখন মাত্র ঠাকুর আর পুতুল গড়িয়া দিন যাপন করে। অন্য মাটীর কারুকার্য্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহাদের পুতুল ও ঠাকুরের গড়নের মধ্যেও বিশেষ কারুকার্য্য দেখিতে পাইলাম না। সব মূর্ত্তিই খুব ছোট ধরণের এবং মূর্ত্তির মধ্যে একটা ভাব আনার ক্ষমতা কোথাও দেখিলাম না। মাত্র চোখমুখ, হাত পা দিয়া একটী মনুষ্যাকৃতি গড়িয়া দিয়াই তাহারা খালাস।

## নবদ্বীপের মাঝি

মজুর-শ্রেণীর মধ্যে "মাঝি" মজুরই দেখিলাম অধিক। মাঝিরা ফেরি নৌকা করিয়া পারাপার করে, অর্থাৎ নবদ্বীপের ঘাট থেকে কৃষ্ণনগরের ঘাটে পৌঁছাইয়া দেয় বা বাবুদের লইয়া গঙ্গায় বেড়ায়। পারাপারের জন্য মাথাপিছু চারি পয়সা করিয়া লয় এবং এক ঘণ্টা বেড়াইলে পাঁচ আনা বা ছয় আনা দিলে সন্তুষ্ট হয়। নবদ্বীপের ঘাটে দুইটী মাঝির সঙ্গে দু'দিন আলাপ করিয়া যাহা জানিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিলাম।

প্রথম মাঝির নাম "ধর্ম্ম"। তাহার বাড়ী কৃষ্ণনগরের নিকটে। নৌকায় উঠিয়া তাহার সহিত যে যে কথা হইল তাহা নিম্নে বলিতেছি।

প্রঃ—তোমার নাম কি?

উঃ—আমার নাম ধর্ম্ম।

প্রঃ—তোমার বয়স কত হবে?

উঃ—এই গোটা পনর হবে।

প্রঃ—বাঃ! এত অল্প বয়সে তুমি নৌকা বাইতে শিখেছ? কত ক'রে দৈনিক রোজগার হয়?

উঃ—কোন দিন আট আনাও পাই, কোনদিন বার আনাও পাই।

প্রঃ—তাহলে মাসে তোমার গড়পড়তায় ১৫৲ থেকে ১৮৲ রোজগার হয়?

উঃ—'হাঁ, বাবু তা' হয়।

প্রঃ—তোমার আর কে আছে?

উঃ—বাবা আছে, মা আছে, এক দাদা আছে।

প্রঃ—তোমার বাবা ও দাদা কি করে?

উঃ—আমার দাদা নবদ্বীপে ওই ওঘাটে নৌকা বায়। বাবা কৃষ্ণনগরে নৌকা বায়।

প্রঃ—তোমরা তা' হ'লে সংসারে চারজন মাত্র।

উঃ—হাঁ বাবু।

প্রঃ—কত খরচ পড়ে?

উঃ—তা' জানি না বাবু।

প্রঃ—তোমাদের জমিজমা কিছু আছে?

উঃ—না বাবু, এই নৌকাই আমাদের সম্বল।

দ্বিতীয় দিন সকাল ৮টার সময় মাড়োয়ারীর ঘাটে একখানি নৌকায় উঠিলাম। তাহার মাঝির সহিত নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল:—

প্রঃ—তোমার নাম কি?

উঃ—আমার নাম সনাতন।

প্রঃ—কোথায় বাড়ী?

উঃ—নবদ্বীপেই বাড়ী বাবু।

প্রঃ—কোন্ পাড়ায়?

উঃ—বাউনপুরে।

প্রঃ—প্রত্যহ তোমার কত আয় হয়?

উঃ—দশ আনা, বার আনা রোজই হয়, মেলা বা পরবের সময় পাঁচসিকা, দেড়টাকাও পাই।

প্রঃ—মাসিক গড়ে কত আয় হয়?

উঃ—প্রায় ৩০৲।

প্রঃ—তোমার কয়টী ছেলেপিলে?

উঃ—আমার বাবু দুইটী মেয়ে আর একটী ছোট ছেলে।

প্রঃ—তোমাদের মেয়ের বিয়েতে টাকা লাগে?

উঃ—না বাবু, আমরা গরীব মানুষ, টাকা দিতে পারবো কেন?

প্রঃ—তোমার দুটি মেয়েরই কি বিয়ে হ'য়ে গেছে?

উঃ—না, একটী মেয়ের এখনও বিয়ে হয় নি। আপনাদের বাবু কি আইন হয়েছে, সেই জন্যে আর ১৪ বৎসরের নীচে বিয়ে দিতে পারি না। তা' বাবু ভালই হয়েছে, ছোট বয়সে বিধবা হ'য়ে থাকা কি কষ্ট!

প্রঃ—তোমার তা' হ'লে বাড়ীতে কয়টী লোক আছে?

উঃ—আমরা তিনটী প্রাণী, আমি, আমার স্ত্রী, আর ছোট মেয়েটী।

প্রঃ—তোমার দিন খরচা হয় কত?

উঃ—সব নিয়ে প্রায় আনা বার খরচা হয়। ছোট ছেলের দুধের খরচাটা বড্ড হয়।

প্রঃ—তোমরা সকালে কি খাও?

উঃ—সাধারণতঃ বাসিভাত খেয়ে বা'র হই, আর দুপুর বেলা গিয়ে ভাত খাই।

প্রঃ—রাত্রিতে কি খাও?

উঃ—ভাতই খাই বাবু।

প্রঃ—ডাল, তরকারী মাছ এ সব দরকার হয় তো ?

উঃ—কড়ায়ের ডালই বেশী খাই বাবু, আর একটা টক্ হ'লেই আমাদের ভাল খাওয়া হয়।

প্রঃ—মাসে তাহ'লে তোমার খরচা এই টাকা ২৫৲ পড়ে, কাপড় ও অন্যান্য খরচা ধ'রে ?

উঃ—হাঁ ঐরকমই পড়ে।

## নবদ্বীপের মিউনিসিপ্যালিটি

ইহার বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক ৮৬০০০৲। কোন্ কোন্ দিক্ থেকে মিউনিসিপ্যালিটির আয় হয় তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

১। বাটীর ট্যাক্স

২। ল্যাট্রিন্ ট্যাক্স (পাইখানার জন্য ট্যাক্স)। মিউনিসিপ্যালিটির বন্দোবস্ত করা লোকেই নবদ্বীপবাসীর পাইখানা পরিষ্কার করিয়া থাকে। তজ্জন্য একটী ট্যাক্স দিতে হয়।

৩। ফেরির (পারাপারের নৌকা) থেকে যে আয় হয় তাহার অর্দ্ধেক।

৪। লাইসেন্স ফি।

৫। গ্রাণ্ট।

৬। অন্যান্য।

নিম্নে খরচার তালিকা দেওয়া গেল :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | সাধারণ লোকজনের মাহিনার জন্য পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের রাস্তায় জল দিবার জন্য এবং রাস্তায় আলোর জন্য | ... | ৪৭০৫৪৲ |
| ২। | কনসারভেন্সি | ... | ২৪৮৫৯৲ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩। | বিদ্যালয় ও পুস্তকাগারে গ্রাণ্ট | ... | ৪৩৫০৲ |
| ৪। | হাঁসপাতালে গ্রাণ্ট | ... | ১৮০০৲ |
| | মোট খরচা | ... | ৭৮০৬৩৲ |

মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় জল দিবার জন্য যে বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে তজ্জন্য নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ধূলার প্রতিপত্তি অনেক কমিয়াছে। "রোড্ ওয়াটারিং কার" দ্বারা ১৫ মাইল পাকা রাস্তা, এবং ১১ মাইল কাঁচা রাস্তায় প্রত্যহ জল দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক রাস্তায় একটী বা দুইটি করিয়া কল আছে, তাহা হইতে লোকেরা কেবল পানীয় জল গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কাপড় কাচা, স্নান করা প্রভৃতি নানারকমে উক্ত পানীয় জল ব্যবহার করা হয়।

প্রাত্যাহিক জলের খরচা মোটমাট ৮,০০০ গ্যালন। মিউনিসিপ্যালিটির যে রিজার্ভ ট্যাঙ্ক আছে তাহাতে প্রত্যহ জল তোলা হয় ১২,০০০ গ্যালন। একটী ৩০০ ফুট গভীর পাতকুয়া খনন করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে পাম্পে করিয়া সকালে দেড়ঘণ্টা ও বৈকালে দেড়ঘণ্টা জল তোলা হয়। ঘণ্টায় ৪,০০০ গ্যালন করিয়া জল উঠে। উক্ত বার হাজার গ্যালন জলের মধ্যে আট হাজার গ্যালন লোকের পানীয় হিসাবে খরচা হয়। বাকী ৪,০০০ গ্যালন জল রাস্তায় দেওয়া হয়। পানীয় জলের রিজার্ভ হইতে যে ৪,০০০ গ্যালন রাস্তায় দেওয়া হয় সেটা একরকম নষ্ট করাই হয়। কারণ অন্য জলও রাস্তায় দেওয়া যাইতে পারে। সেই কারণে একটী পুষ্করিণী হইতে নূতন হাতপাম্পে জল তুলিয়া রাস্তায় দিবার ব্যবস্থা হইবে। কূয়ার জল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে অনেক ধাতব পদার্থ মিশ্রিত আছে, তাহার জন্য সাধারণের স্বাস্থ্যের খুবই উপকার হইয়াছে।

উপস্থিত সমগ্র নবদ্বীপে ১৬৮টী কেরোসিন তৈলের আলো পথে রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত করে। নবদ্বীপকে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিবার জন্য কোন একটী ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

ব্লিচিং পাউডার দিয়া প্রত্যহ পাইখানাগুলি পরিষ্কার করা হয়।

আগামী বৎসরে নূতন ধরণের সারফেস্ ড্রেন করিবার ব্যবস্থা হইবে। অতি অল্পদিন হইল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ড্রেনেজ স্কিম্ আনান হইয়াছে এবং সেই অনুযায়ী ড্রেনেজের পরিবর্ত্তন করা হইবে।

নগরের স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। হেল্‌থ অফিসার এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা মেলার সময় সাধারণ যাত্রীর সুবিধা ও স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থার জন্য সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকেন। কলেরার ইন্‌অকিউলেশন্, ঔষধ প্রভৃতি বিনা মূল্যে যাত্রীদিগকে দেওয়া হয়। যাত্রীদের জন্য পাইখানার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

নবদ্বীপে বাড়ী করিতে হইলে মিউনিসিপ্যালিটির কতগুলি আইন অনুযায়ী বাড়ী তুলিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রথমে বাড়ী আরম্ভ করিবার সময় রাস্তা থেকে ৩৷ কাঠা জমি ছাড়িয়া দিতে হয়।

১। যে রাস্তাটী রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে "পোড়ামা তলা" অবধি গিয়াছে সেই রাস্তায় এবং "রেলওয়ে ফিডার" রোড্ যেটী চারিচা পাড়া রোড্ হইয়া পোড়ামা তলা অবধি গিয়াছে সেই রাস্তায় নূতন করিয়া খোয়া দেওয়া হইয়াছে।

২। রাস্তায় জল দিবার জন্য একটী নূতন গাড়ী কেনা হইয়াছে।

৩। বিনা ট্যাক্সে সাধারণকে পানীয় জল দিবার জন্য একটী

৩০০ ফুট গভীর টিউবওয়েল খনন করা হইয়াছে এবং ২৫টী হাইড্রাণ্ট বসান হইয়াছে।

৪। মুসলমানদের গোর দিবার জন্য একটী জমি ক্রয় করা হইয়াছে এবং আর একটী ট্রেন্‌চিং গ্রাউণ্ড কেনা হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে ১২ জন কমিশনার আছেন। তন্মধ্যে আট জন নির্ব্বাচিত, বাকী ৪ জন মনোনীত।

চেয়ারম্যান মহাশয় তাঁহার সহকারী ভাইস্-চেয়ারম্যানের সাহায্যে সকল কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। এখানে এক্‌সিকিউটিভ্ অফিসার বলিয়া কোন কর্ম্মচারী নাই।

# সান্ধ্য সম্মেলন

## অধ্যাপক বাণেশ্বর দাসের উদ্যোগে

১৯৩৩ সনের ২১শে মে অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস বালীগঞ্জ ২২নং সাউথ এণ্ড্ পার্কস্থ তাঁহার নূতন বাসভবনে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সদস্যগণ এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে এক প্রীতি-সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সপত্নীক অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডাঃ অমূল্য উকীল, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত, ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বীরেন দাশগুপ্ত, ডাঃ হেমচন্দ্র যোশী (সম্পাদক "বিশ্বমিত্র"), শ্রীযুক্ত বামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্তা সুষমা সেনগুপ্তা, শ্রীযুক্তা সুলেখা দাশগুপ্তা, শ্রীযুক্তা সুরমা মিত্র, শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী, মিঃ গোখ্‌টে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুধাকান্ত দে, পঙ্কজকুমার মুখার্জ্জী, সুধীশরঞ্জন বিশ্বাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিষদের অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মৌলিক "বীমা ব্যবসায় সোভিয়েট রুশিয়া" সম্বন্ধে একটি আলোচনা আরম্ভ করেন। গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক সরকার কর্ত্তৃক মুখবন্ধ অবতারণার পর মণীন্দ্র বাবু বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

# বীমা-ব্যবসায় সোভিয়েট রুশিয়া*

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক, বি-এ, এফ্-আর ইকন-এস্ (লণ্ডন)

গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, সম্পাদক, "ইনশিওর্যান্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ" ও "ক্লাইভ ষ্ট্রীট"

রুশ বিপ্লবের পর হইতে রুশিয়ার সমাজে, রাষ্ট্রে এবং অর্থনীতিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে তাহা অর্থনৈতিক গবেষণার প্রচুর তথ্য দান করিতেছে। ১৯২২ সনে লেনিনের "নয়া আর্থিক নীতি"র প্রচলনেই রুশিয়াতে আর্থিক উন্নতির প্রারম্ভ। এই আর্থিক নীতি পরিচালনার ভার পড়ে গস্প্ল্যানের উপর। কিন্তু ১৯২৮ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেশী সাফল্য দেখা যায় না। উৎপাদনের দিক্ হইতে ১৯২৮ সনেই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। এই বৎসর রুশিয়া প্রাগ্যুদ্ধ যুগের উৎপাদনের কোঠায় আসিয়া পৌঁছে। ১৯২৮ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর রুশিয়া তাহার অর্থ নৈতিক জীবনে যে অসাধ্যসাধন করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন।

রুশিয়াতে বীমা ব্যবসা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও এই নয়া আর্থিক নীতির একটি বিশেষ রূপ এবং অংশ মাত্র। রুশিয়াতে ব্যক্তিগত কিংবা সমিতিভুক্ত কোন বীমা-কোম্পানী নাই। সমস্ত ব্যবসাটাই রাষ্ট্রের নিজস্ব এবং রুশিয়ার মন্ত্রিসভা "কাউন্সিল অব্ দি পিপল্স্ কমিসার্স" কর্ত্তৃক পরিচালিত। ১৯২১ সনের ৬ই অক্টোবর

---

* ১৯৩৩ সনের ২১মে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত। স্থান ২২ সাউথ এণ্ড পার্ক বালীগঞ্জ কলিকাতা (অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাসের বাসভবন)। আর্থিক উন্নতি, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৪০, জুন-জুলাই ১৯৩৩।

তারিখে মন্ত্রিসভায় গৃহীত একটি বিশেষ আইন অনুসারে রুশিয়ার বীমা-ব্যবসাকে রাষ্ট্রের নিজস্ব অর্থাৎ সরকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। শুধু কয়েক প্রকার সমবায়-সমিতিকে বে-সরকারীভাবে ব্যবসা করিবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাহাতে এই সর্ত্ত থাকে যে, এই সমবায় সমিতিগুলিকে তাহাদের নিয়মাবলী রুশিয়ার বীমা বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে। রুশিয়ার এই সরকারী বীমা বিভাগের নাম "গস্‌ট্রাখ্"। সমবায় সমিতি সম্বন্ধে আরও সর্ত্ত থাকে যে, তাহাদের দায়িত্বের কতক অংশ এই গস্‌ট্রাখের কাছে বীমা করিতে হইবে। গস্‌ট্রাখের কার্য্যকলাপ মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিভাগের পর্য্যবেক্ষণে এবং তত্ত্বাবধানে থাকে। গস্‌ট্রাখের বিভিন্ন প্রদেশের এবং মফঃস্বলের শাখাগুলি শুধু ইহার প্রধান অফিসের কাছেই দায়ী থাকে। কিন্তু রুশিয়ার সামাজিক বীমা-প্রণালী, অর্থাৎ স্বাস্থ্য-বীমা, বেকার-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা, মজুরদের ক্ষতিপূরণ-বীমা ইত্যাদি মন্ত্রিসভার মজুর বিভাগের উপর ন্যস্ত।

মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিভাগের উপর নিম্নলিখিত কয় প্রকারের বীমার ভার ন্যস্ত আছে, যথা জীবনবীমা, বাধ্যতামূলক অগ্নিবীমা, কৃষকবিত্ত বীমা, কৃষিবীমা, মাল সরবরাহ বীমা, ইত্যাদি। এই নানা প্রকারের বীমার দ্বারা রুশিয়ার জনসাধারণের জীবনে এবং ব্যবসায় স্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রিক জীবনেও এই স্বাচ্ছন্দ্যের জ্যোতি কিরূপ ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। সকল শ্রেণীর মধ্যে বীমার উপকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপলব্ধি হইয়াছে কৃষকদের জীবনে এবং তাহাদের সংসারে এক অভাবনীয় সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে এই জাতীয় বীমা যে উন্নতি করিয়াছে তাহার তালিক নিম্নরূপ :—

কোটি রুব্‌ল

( এক রুব্‌ল্—অন্যূন ১ টাকা পাঁচ আনা )

| বীমা | ১৯২২-২৩ | ১৯২৬-২৭ | ১৯২৭-২৮ |
|---|---|---|---|
| কৃষক বিত্ত | ১.৭০ | ১.৯৯ | ২.০৪ |
| গো-মহিষ ইত্যাদি | ১.১০ | ১.৩২ | ১.৮৫ |
| অশ্ব প্রভৃতি | ২.৯২ | ৩.৭৬ | ৪.০৪ |
| অনাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি ইঃ | ১১.৩৫ | ৩৭.৬২ | ১৮.৮৯ |

ইহা ছাড়া কৃষকদের ব্যক্তিগক বীমার পরিমাণও গড়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষকবিত্ত ও কৃষিবীমার দরুণ ১৯২৭-২৮ সম্বৎসরে গস্‌ট্রাখের ৭২১ কোটি রুব্‌লের দায়িত্ব ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সম্বৎসরে ছিল মাত্র ৫৭৮ কোটি। খুব গরীব কৃষকদিগকে বিনা প্রিমিয়ামে বীমার পলিসি দেওয়া হয়, অর্থাৎ যাহাদের কোনরূপ সঞ্চয়ের স্থবিধা নাই তাহাদিগকে বিনা চাঁদাতেই বীমার স্থবিধা দেওয়া হয়। এই অতিরিক্ত স্থবিধা গস্‌ট্রাখের সাধারণ বীমা ব্যবসার লাভ হইতে দেওয়া হয়। ১৯২৭-২৮ সনে এইরূপ অতিরিক্ত বীমার পরিমাণ ছিল সমুদায় কৃষক বীমার এক-অষ্টমাংশ এবং এই প্রকার বীমা চালাইতে ঐ বৎসরে ১৮২৫ হাজার রুব্‌ল্ ব্যয় হয়।

## জীবন বীমা

জীবন বীমার পরিমাণও রুশিয়াতে অত্যন্ত দ্রুত বাড়িতেছে। জীবন বীমার কাজ দুই বিভাগে সাধারণতঃ হইয়া থাকে। প্রথম বিভাগে ব্যবসাজীবীদিগকে ও দ্বিতীয় বিভাগে কৃষিজীবীদিগকে লওয়া হয়। এই দ্বিতীয় বিভাগের কাজ মাত্র ১৯২৭ সনে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ, তাহার পূর্ব্বে রুশিয়াতে জীবন বীমার প্রসার মোটেই হয় নাই।

অবশ্য প্রাগ্‌বিপ্লব যুগের কথা আমরা বিবেচনা করিতেছি না। ১লা অক্টোবর, ১৯২৭ হইতে ৩০শে জুন, ১৯২৮, এই নয় মাসে রুশিয়ার বীমা বিভাগ ২৬ লক্ষ ৯৫ হাজার রুব্‌ল্‌ প্রিমিয়াম আদায় করিয়াছে, এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত ব্যবসাজীবী শ্রেণীতে ৩০০,০০০ এবং কৃষিজীবী শ্রেণীতে ১০০,০০০ লোক বীমা গ্রহণ করিয়াছে। এই সংখ্যা কেবল প্রথম বৎসরের কাজের ফল; পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে ইহাদের সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার ঠিক বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। জীবন বীমার নিয়মাবলী ক্রমশই এমন সরল এবং উদার করা যাইতেছে যাহাতে জীবন বীমা অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে এই ব্যবসা নিঃসন্দেহ অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

## বাধ্যতামূলক অগ্নিবীমা

রুশিয়াতে ব্যক্তিমাত্রেরই ঘর-বাড়ী এবং দালান-কোঠার উপর অগ্নিবীমা করিতে হয়। যেসমস্ত বসবাস করিবার উপযোগী ঘরের মূল্য ২০০ রুব্‌ল্‌ পর্য্যন্ত এবং বহির্ব্বাটীর মূল্য ৫০ রুব্‌ল্‌ পর্য্যন্ত তাহাদের সম্পূর্ণ মূল্যের উপরেই অগ্নিবীমা করিতে হয়। অন্যান্য ব্যক্তিগত ঘর-বাড়ীর জন্য সম্পূর্ণ মূল্যের অর্দ্ধাংশের উপর অগ্নিবীমা করিলেই চলে, কিন্তু কোনও ঘর-বাড়ীই বিনা বীমায় থাকিবে না।

যেসমস্ত সরকারী ঘরবাড়ী কিংবা বড় বড় দালান কোন ব্যক্তি-বিশেষকে অথবা সমিতি-বিশেষকে ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়, তাহাদের সম্পূর্ণ মূল্যের উপরই অগ্নিবীমা করিতে হয়। এইরূপ যত সম্পত্তি বন্ধকী অবস্থায় আছে তাহাদেরও সম্পূর্ণ মূল্যের উপর বীমা হয়। ১৯২৭-২৮ সনে নয় মাসে এইরূপ বাধ্যতামূলক অগ্নিবীমার উপর গস্‌ট্রাখ ৫,৬৯৯,৫৬২ রুব্‌ল্‌ প্রিমিয়াম পায়।

## সম্পত্তি বীমা

রুশিয়াতে সকলপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরেই বীমা গৃহীত হয়। কোন সম্পত্তির পূর্ণ মূল্যের অর্দ্ধাংশের উপর প্রিমিয়াম দিলেই সম্পূর্ণ বিত্তের দায়িত্ব গসট্রাখ্ গ্রহণ করে। ১৮২৭-২৮ সনে নয় মাসে এই জাতীয় বীমার দরুণ ৩৫,২৩৮,১০০ রুব্‌ল্ প্রিমিয়াম আদায় হয়। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের এবং অন্যান্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের উপযোগী বীমার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং অস্থাবর সম্পত্তির উপরে বেশী পরিমাণে বীমা গৃহীত হইয়া থাকে। যদিও এই বীমা বাধ্যতামূলক নহে। এই জাতীয় বীমার চাঁদা খুব লঘু।

## মাল সরবরাহ বীমা

রুশিয়াতে যত প্রকার বীমার ব্যবসা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে মাল সরবরাহ বীমাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রয়োজনীয়। রুশিয়া খুব বড় দেশ, তাহার আয়তনও অত্যন্ত বড়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাল সরবরাহ করা বর্ত্তমানে সমস্ত রুশিয়ার শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের একান্ত সহায়ক, এবং ইহাদের সমৃদ্ধির জন্য নিরাপদে মাল সরবরাহ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা ছাড়া রুশিয়া ক্রমশই একটি বৃহৎ বাণিজ্যপ্রধান দেশ হইয়া উঠিতেছে। তাহার কৃষিজাত দ্রব্যসম্ভার, শিল্পজাত দ্রব্যসমৃদ্ধি এবং বর্দ্ধিষ্ণু লোক-সংখ্যা নিয়মিত এবং দায়িত্বপূর্ণ মাল-সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকিলে কিছুতেই টিঁকিতে পারে না। সেইজন্য শুধু দেশের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাল সরবরাহের জন্য বীমার ব্যবস্থা থাকিলেই চলে না, সমুদায় আমদানি এবং রপ্তানির উপর বীমার প্রসার পৌছাইয়া দেওয়া দরকার। কিন্তু রুশিয়াতে আমদানি রপ্তানির উপর যে পরিমাণ বীমা সংঘটিত হয় তাহা

আন্তপ্রাদেশিক মাল-সরবরাহ বীমার তুলনায় খুবই সামান্য। বহির্ব্বাণিজ্যের উপরও যাহাতে বীমার প্রসার বজায় থাকে সেই জন্য প্রত্যেক প্রদেশেই গস্‌ট্রাখের শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নৌবীমা ইত্যাদি যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার উপরে ঐ শাখাগুলির নজর রাখিতে হয়। রুশিয়ার বাহিরেও তাহাদের নিজস্ব এই প্রকার বীমা পরিচালনার জন্য রুশিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধিদের উপর ভার থাকে। ১৯২৭ সনের অক্টোবর হইতে ১৯২৮ সনের জুন পর্য্যন্ত এই নয় মাসের জন্য মাল সরবরাহ বীমার পরিমাণ ইত্যাদির বিবরণ এইখানে দেওয়া গেল।

| প্রদেশ | বীমা-বেষ্টিত মালের মূল্য | প্রিমিয়াম আদায় রুবল্ |
|---|---|---|
| যুক্ত রুশিয়া | ৫৩,৪৫,৭৩,০০০ | ১৭,৪০,৪০০ |
| ইউক্রেনিয়া | ১৪,৪৪,৭৭,০০০ | ৪,১৩,১০০ |
| ট্রান্‌স্‌-ককেশিয়া | ৯,১৬,৮২,০০০ | ১,৪৮,১০০ |
| হোয়াইট্‌ রুশিয়া | ৮৫,৯৪,০০০ | ২০,০০০ |
| উজ্‌বেক্‌ | ১৮,০৭,০০০ | ৩৬,০০০ |
| টারকোম্যান্‌ রুশিয়া | ৯৮,৯৫,০০০ | ১৩,৪০০ |
| গস্‌ট্রাখের প্রধান অফিস | ৫৩,৯৬,৩৭,০০০ | ১৬,৮৩,৮০০ |
| মোট | ১৩৩,০৬,৬৫,০০০ | ৪৪,৫৭,৮০০ |

## গস্‌ট্রাখ্‌

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, রুশিয়ার বীমা বিভাগ কি উপায়ে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি একটা নিশ্চিত স্বাধীনতার উপরে স্থাপিত করিয়াছে। রুশিয়ার প্রত্যেকটি লোকের জীবন হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেকটি ঘর-বাড়ী এবং ছোটখাট শিল্প এবং ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানকে গস্ট্রাখ্ কি উপায়ে ক্ষতি এবং অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়া সমগ্র দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতেছে, তাহা চিন্তার বিষয়, এবং যে কোন আর্থিক উন্নতি অভিলাষী জাতিরই অনুকরণীয়। শুধু তাহাই নহে, গস্ট্রাখ্ সকল প্রকার বীমার দরুণ যে পরিমাণ প্রিমিয়াম আদায় করে তাহা দ্বারা দেশীয় সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ধমনীতে রক্তসঞ্চার করে, এবং অর্থনৈতিক সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রপাতির সাল্‌সা জোগায়। এই সব কারণে রুশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে গস্ট্রাখের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী।

সমগ্র রুশিয়াতে ছয় হাজার সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে। ভারতবর্ষে যেমন সরকারী পোষ্টাল্ বীমার কাজ সমস্ত পোষ্ট আফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক বিভাগ করে, রুশিয়াতে তেমন প্রত্যেক সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গস্ট্রাখের প্রতিনিধিরূপে কাজ করে। এই উপায়ে গস্ট্রাখের পরিচালনার ব্যয় অত্যন্ত কম হয়। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত এই বিভাগের পরিচালনা-ব্যয় হইয়াছে গড়ে শতকরা ৬ রুব্‌ল। ১৯৩১ সনে গস্ট্রাখ্ কেবল মাত্র জীবন এবং দুর্ঘটনা বীমা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বীমার কার্য্যে ৮৮০ লক্ষ রুব্‌ল্ লাভ করিয়াছে। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে সর্ব্বসাকল্যে গস্ট্রাখ্ ২২০ কোটি রুব্‌ল প্রিমিয়াম বাবদ পাইয়াছে এবং ১১৫ কোটি রুব্‌লের দাবী মিটাইয়াছে, অর্থাৎ আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয় হইয়াছে। গস্ট্রাখের আয় হইতে সর্ব্বসাধারণের সুবিধা এবং উন্নতিকল্পে অন্যূন ২০ কোটি রুব্‌ল্ ব্যয়িত হইয়াছে। এই জাতীয় কাজের মধ্যে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য, যথা, অগ্নি-নিবারক প্রণালীর ব্যবস্থা, গো-মহিষ ইত্যাদির মধ্যে মহামারীর আক্রমণ উচ্ছেদ, স্বাস্থ্য এবং ব্যায়াম ক্রীড়াদির বন্দোবস্ত, জলপ্লাবন নিরোধ, ইত্যাদি। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত এবং সমাজ-পরিচালিত বীমা-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া কিরূপে দেশের

প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে এবং সমবায়মূলক বীমার প্রচলন দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে। ১৯১৭ সনের রুশিয়া ১৯৩১ সনের ভারতবর্ষ হইতে বিশেষ কোন ভাল অবস্থায় ছিল না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ত নয়ই। কিন্তু এই ১৫ বৎসরের ধনসাম্যবাদের ফলে রুশিয়াতে যে নূতন যুগ আসিয়াছে ভারতবর্ষের কাছে তাহা স্বপ্ন।

আমাদের দেশে আমাদের দেওয়া বীমার প্রিমিয়ামের লাভ হইতে আমাদের গ্রামের ঝোপঝাড় পরিষ্কার হইবে, কচুরী ম্যালেরিয়া, জলকষ্ট বিতাড়িত হইবে, ইহা আমরা হয়ত ভাবিতেও পারি না। সরকার যে পরিমাণে বীমা বিভাগের ধনকোষ হইতে দেশের সামাজিক এবং আর্থিক উৎকর্ষের জন্য ব্যয় করিতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে বীমা কোম্পানীগুলি তাহা করিতে পারে না। কিন্তু যতদিন দেশের আর্থিক পদ্ধতি পরিচালনার ভার দেশের লোকের হাতে না আসিবে ততদিন পর্য্যন্ত বীমা ব্যবসাটাকে রাষ্ট্রভুক্ত করিয়া লাভ নাই। গস্‌ট্রাখের আয়-ব্যয়ের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা এইরূপ :—

| আয় | হাজার রুব্‌ল |
|---|---|
| নগদ মুদ্রা হাতে এবং ব্যাঙ্কে ... | ১৭৪,৩৬১ |
| অন্যান্য ব্যবসায় লগ্না ... ... | ১,৭৩৪ |
| বিবিধ লগ্নী ... ... ... | ৫৭৬,০৫১ |
| স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ... ... | ২৩,০০০ |
| ঋণ ... ... ... | ৯,১৪৭ |
| ঋণীদের কাছে পাওনা ... ... | ১২১,৯১০ |
| অগ্রীম প্রদত্ত খরচের অংশ ... ... | ৩২,৩৮৫ |
| মোট | ৯১৭,৮৮৯ |

| ব্যয় | হাজার রুব্ল |
|---|---|
| মূলধন ... ... ... | ১০,০০০ |
| রিজার্ভ ফণ্ড ... ... ... | ১৫৪,৮২৬ |
| অতিরিক্ত রিজার্ভ ... ... | ২,৫০০ |
| নিরাকরণ এবং দূরীকরণ প্রণালী ফণ্ড ... | ১১০,৯৬০ |
| বেতন-ভোগীদের ফণ্ড ... ... | ১,২৭৮ |
| সম্পত্তি রক্ষণ ফণ্ড ... ... | ১৬১ |
| প্রিমিয়াম রিজার্ভ ... ... | ৪০৬,৭৭৮ |
| দাবী রিজার্ভ ফণ্ড ... ... | ৩৪,৪৪৫ |
| অন্যান্য রিজার্ভ ... ... | ৮৪,০৯৩ |
| পাওনাদারদের দরুণ রিজার্ভ ... ... | ৭৪৪ |
| দেনাদারদের দরুণ রিজার্ভ ... ... | ২৩,৮৬৭ |
| লাভ ... ... ... | ৮৮,১৯৯ |
| মোট . | ৯১৭.৮৮৯ |

## সার্ব্বজনীন সামাজিক বীমা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সামাজিক বীমা, বেকার বীমা, স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি রুশিয়ার মন্ত্রিসভার মজুর বিভাগের অন্তর্গত। উহা মন্ত্রিসভার অর্থ নৈতিক বিভাগের অধীন নয়। রুশিয়াতে মজুরদের দৈনন্দিন জীবনে ধনসাম্যবাদ যে কত বড় স্বাচ্ছন্দ্যের এবং সমন্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু এই উৎকর্ষ সাধনের জন্য বীমার কৃতিত্বও যথেষ্ট। রুশিয়াতে প্রত্যেক মজুরকেই বীমা করিতে হয়। শুধু অত্যন্ত প্রান্তবাসী কৃষকদিগকে বীমা করাইতে বাধ্য করা যায় না, কারণ সেখানে বীমা বিভাগের কোন শাখা নাই। এই সার্ব্বজনীন সামাজিক বীমার উপকারিতা নিম্নরূপ :

১। ডাক্তার এবং ঔষধের ব্যবস্থা।

২। আংশিক অক্ষমতার জন্য অর্থসাহায্য, যথা—ব্যাধি, সন্তান-প্রসব, কোয়ার‍্যান্‌টাইন, ব্যাধি-শুশ্রূষা, ইত্যাদি।

৩। বিশেষ সাহায্য (রোগীর শুশ্রূষা, শব-সংকারের ব্যবস্থা, ইত্যাদি)।

৪। বেকার-সাহায্য।

৫। সম্পূর্ণ অক্ষমতার জন্য সাহায্য।

৬। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির অকালমৃত্যুর পর দুঃস্থ পরিবারের ভরণপোষণ করা ইত্যাদি।

এই সামাজিক বীমার তহবিলের সৃষ্টি হয় যাহারা এই বীমা করে তাহাদের প্রিমিয়াম হইতে। এই প্রকার বীমার চাঁদা অধিকাংশ ব্যবসা-গৃহ, শিল্প-প্রতিষ্ঠান অথবা অন্যান্য কারখানাগুলি জোগায়। নিম্নে ১৯২৩ হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত কিভাবে এই বিভাগের বীমাকারীদের সংখ্যা বাড়িয়াছে তাহা দেওয়া গেল :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯২৩ | ... | ৪৯ লক্ষ | ১৯২৬ | ... | ৮০ লক্ষ |
| ১৯২৪ | ... | ৫৫ ,, | ১৯২৭ | ... | ৯২ ,, |
| ১৯২৫ | ... | ৬৪ ,, | ১৯২৮ | ... | ৯৭ ,, |

মজুরদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে স্বাস্থ্যাবাসে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কোন স্ত্রীমজুর যদি গর্ভবতী হয় তবে তাহাকে ১০ হইতে ১৬ রুব্‌ল্‌ পর্য্যন্ত মাসিক বেতন দেওয়া হয় এবং প্রসবের আগে দুই মাস এবং পরে দুই মাস ছুটি—ঐরূপ বেতনে—দেওয়া হয়। এই সব সুবিধা ক্রমাগতই রুশিয়াতে বাড়ান হইতেছে। নানা শ্রেণীর মজুর ও বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধা অনুসারে নানাপ্রকার সুবিধার বন্দোবস্ত আছে এবং ক্রিমিয়া, ককেসাস্‌ ও ওডেসাতে কয়েকটি স্বাস্থ্যাবাস স্থাপিত হইয়াছে এবং সেখানে ২০০ লোকের চিকিৎসার স্থান হইতে

পারে। আরও নানাস্থানে বিশ্রাম-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় হাজার হাজার মজুর যাইয়া বিশ্রাম করিতে পারে এবং এইসকল বিশ্রাম-ভবন স্থাপনের জন্য ১৯২৮ সনে ৫ লক্ষ রুব্‌ল্ ব্যয় করা হয়।

## বেকার বীমা

রুশিয়াতে বেকার বীমার ব্যবস্থাও হইয়াছে। গ্রাম হইতে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের লোক শিল্প-প্রসারের এবং কারখানা বিস্তারের গুজব শুনিয়া মজুরবৃত্তির এবং অধিকতর উপার্জ্জনের আশায় সহরে আসে। যখন কারখানাগুলি সেইসমস্ত লোকদের জন্য কাজ সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন তাহারা গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারে না। তাহাদিগকে অলসভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। এইভাবেই রুশিয়াতে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯২৪-২৫ সম্বৎসরে ৮,৪৮,০০০ বেকার ছিল এবং ১৯২৮ সনের ১লা অক্টোবর বেকার-সংখ্যা ১,৩৭,৪৯,০০০ হইয়াছে।

সাধারণতঃ, তিন উপায়ে এই বেকার-সমস্যার সমাধান হইতেছে। প্রথমতঃ, দুঃস্থ বেকারদিগকে সরকারী সামাজিক বীমা ফণ্ড্ হইতে অর্থসাহায্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ প্রকারের সার্ব্বজনীন কাজের অনুষ্ঠান করিয়া বেকারদের ঐ কাজে নিযুক্ত করা হয়, যথা, সাধারণের পার্ক, রাস্তা, ভূমির উৎকর্ষ সাধন করা, অনুন্নত বনজঙ্গল পরিষ্কার করা, ইত্যাদি। ১৯২৪-২৫ সম্বৎসরে দৈনিক ৪০,০০০ বেকারকে ঐরূপ সার্ব্বজনীন কাজে নিযুক্ত করা হয়। এই কাজের বাবদ প্রত্যেক মজুরকে দৈনিক ১ রুব্‌ল ৫০ কোপেক্ হারে দেওয়া হয়।

সামাজিক বীমা তহবিল হইতে ১৯২৬-২৭ সম্বৎসরে ৮,৪৬ লক্ষ রুব্‌ল্ এবং ১৯২৭-২৮ সম্বৎসরে ১০ কোটি রুব্‌ল্ বেকারদিগকে দেওয়া

হইয়াছে। ইহা ছাড়া ট্রেড্ ইউনিয়নগুলিও সাধ্যানুসারে ( মাসিক জনপ্রতি ৩-১৮ রুব্‌ল্ ) বেকার তহবিলে সাহায্য করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, বেকারদিগকে সকল প্রকার ট্যাক্স হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। সহরে জল, বৈদ্যুতিক আলো, বাসস্থান যানবাহন প্রভৃতির জন্য বেকারদের ট্যাক্স দিতে হয় না।

সেণ্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ান কাউন্সিল হইতে যে বিবৃতি বাহির হয় তাহাতে দেখা গেল যে, ১৯২৬ সনে ৪,৬০ লক্ষ রুব্‌ল্ বেকার মজুরদিগকে নগদ সাহায্য করা হইয়াছে এবং আরও ৫ কোটি রুব্‌ল্ এর উপযুক্ত কাজের যোগাড় করিয়া দিয়াছে। ১৯২৬ সনে ১০ কোটি রুব্‌ল্ শুধু বেকার বীমার পিছনে খরচ হইয়াছে।

এখানে যাহা বলা হইল, ইহা ছাড়াও গসট্রাখ্ নানা প্রকারের বীমার কার্য্য করে এবং সমাজ হিতকর পদ্ধতির অনুসরণ করে। শুধু বীমা বিজ্ঞানের চিরাচরিত পন্থা অনুসরণ করিলেই এবং গণিতশাস্ত্রের চর্চ্চা করিলেই যে দেশের মঙ্গল সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিবে না, রুশিয়া এই কথাটা বুঝিয়াছে এবং সেই অনুসারে গসট্রাখের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যাহারা ব্যক্তিগত কিংবা সমিতিভুক্ত বীমা কোম্পানীর পরিচালনা দ্বারা দেশ-হিতৈষণার লম্ফ ঝম্ফ করেন রুশিয়ার বীমা ব্যবসার এই ব্যাপকতা তাহাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ, রুশিয়ার রাজনৈতিক পদ্ধতির সঙ্গে এইরূপ বীমা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য যে-কোন প্রণালী অত্যন্ত খাপছাড়া এবং অপ্রাসঙ্গিত হইত। যেসকল মজুর বাধ্যতামূলক বীমা ছাড়াও জীবনবীমা করিতে চাহে তাহাদিগকে শতকরা ২০ রুব্‌ল্ প্রিমিয়াম হইতে বাদ দিয়া দেওয়া হয়। যে সমস্ত সরকারী দালান এবং ঘর বিদ্যা কিংবা ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য ভাড়া দেওয়া হয় তাহাদের বীমার উপর চাঁদা সাধারণ প্রিমিয়ামের অর্দ্ধেক হারে দিলেই চলিতে পারে। এইরূপ আরও অনেক প্রকার সুবিধা

আছে। যেভাবে লোককে সকল প্রকার ক্ষতির এবং অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা করা যায় সেজন্য বন্দোবস্ত আছে।

## আলোচনা

বক্তৃতাশেষে আলোচনা আরম্ভ হয় এবং উপস্থিত সকলেই উহাতে যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা সুষমা সেনগুপ্ত বিতর্কের প্রারম্ভে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও ব্যক্তিগত বীমা প্রচেষ্টা কিরূপে খাপ খায় সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত বি, পি সেনগুপ্ত বলেন যে ব্যক্তিগত বীমার কোনই প্রয়োজন নাই। অধ্যাপক সরকার সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, "গস্‌ট্রাখ" বীমা পরিচালনের জন্য সরকারী বিভাগ মাত্র। কমিউনিষ্ট রুশিয়ায় বীমাকারী লোকজনের সংখ্যা বিলাত বা জার্ম্মাণি অপেক্ষা অনেক কম।

ডক্টর লাহা বলেন যে সোভিয়েট রুশিয়ায় রাষ্ট্রই সমস্ত লোকের রক্ষণাবেক্ষণ করে; সুতরাং সেখানে আবার বীমা ব্যবস্থা কেন তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এবং বক্তা সকলকে বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেন।

ডাঃ উকীল বলেন যে, রুশিয়ায় সঞ্চয় বেআইনী, লোকে একমাত্র বীমার মধ্যেই যাকিছু সঞ্চয় করিতে পারে।

রুশিয়া (১৯১৭)=ভারতবর্ষ (১৯৩১) বিনয়বাবুর প্রচারিত এই সাম্যসম্বন্ধ সম্পর্কে সুধীশরঞ্জন বিশ্বাস জানিতে চান।

কৃষকদের ঋণভার এদেশে বীমাব্যবসায় যথেষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। রুশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া এদেশে কৃষকদের ঋণভার লাঘব করা যায় কিনা শ্রীযুক্ত জিতেন সেনগুপ্ত সে সম্বন্ধে তদন্তের কথা উত্থাপন করেন।

অধ্যাপক সরকার বলেন যে, ঋণভার দেখিয়া কোনো জাতিকে গরীব সমঝানো ঠিক নয়। সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কতকগুলি আইন-কানুনের অভাব বহুকাল হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছে। অপর দিকে মনে রাখা আবশ্যক যে, সমগ্র জাতির বা উহার অংশ-বিশেষের ঋণভার জাতীয় সমৃদ্ধিরই পরিচায়ক; কারণ উহাদ্বারা ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। তাছাড়া দারিদ্র্য--রেখার উপরেও বহুলোক আছে যাহারা এখন পর্য্যন্ত বীমা করে নাই।

ডাক্তার সুরেশ রায় শ্রেণীগত বীমাকে সমস্যা-সমাধানের উপায় বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

শ্রীযুক্ত বীরেন দাসগুপ্ত রুশিয়ার বীমার পুঁজিতান্ত্রিক দিক্‌টার উপর জোর দেন।

ডাঃ উকীল বলেন, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা রাস্তাঘাট, হাঁসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রুশিয়া অধিকতর জনহিতকর কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছে।

## বিনয় সরকারের মতামত

আলোচনায় আরও অনেকে যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় বাইরের অনেক লোক উপস্থিত থাকায় উপসংহারে অধ্যাপক সরকার পরিষদের উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, পরিষদটী একটী স্কুল বা টোলের মত। গবেষকগণই একমাত্র সদস্য। বর্ত্তমানে গবেষক-সংখ্যা মাত্র আটজন। গবেষকগণের প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী এম এ, বি এল, বা তাহার সমকক্ষ। ইহারা সকলেই কোনো না কোনো পেশায় মোতায়েন আছেন, এবং আপন আপন কাজ বা পেশাকেই ইহারা অর্থনৈতিক গবেষণার ল্যাবরেটরী রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। গবেষকদিগকে বিশেষ কোন মত

গ্রহণ বা প্রচার করিতে হয় না। তাহারা আপন আপন মতামত গড়িয়া তুলে, এমন কি মতামত সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে আমূল পার্থক্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে। গবেষকদিগকে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসার স্থানসমূহ পরিদর্শন এবং শিল্প, ব্যবসা ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে হয়। আমদানি-রপ্তানির হৌস, রেল-কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, বীমা-প্রতিষ্ঠান, সরকারী ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতির রিপোর্ট লইয়াও ইহাদিগকে আলোচনা করিতে হয়। তাছাড়া দুনিয়ার বিভিন্নদেশে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যন্ত্রবিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা হইতেও তথ্যসংগ্রহ করিতে হয়। গবেষকদের আর একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহারা বাংলা ভাষার সাহায্যে গবেষণা পরিচালনা করেন। বাংলা ভাষায় উচ্চদরের অর্থনৈতিক সাহিত্যের গোড়া-পত্তনও পরিষদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক সরকার বলেন যে, সরকারী বীমা মাত্রই কমিউনিষ্টপন্থী নয়।

আমাদের দেশের মত সোভিয়েট রুশিয়াতেও দুই শ্রেণীর বীমা আছে যথা:—(১) দ্রব্যগত ও (২) ব্যক্তিগত। রুশিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে রাষ্ট্র বীমা-ব্যবসায় এমন ব্যাপক একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছে। রুশিয়ার ব্যক্তিগত বীমা সমাজবীমারই অংশ-বিশেষ এবং ইহা জীবনবীমারই সমস্ত কাজ পরিচালনা করিতেছে। "গস্‌ট্রাখ্‌" বা ষ্টেট ইনসিওরেন্স কোম্পানীর হাতে দ্রব্য-বীমার ভার অর্পিত আছে; এই বিভাগে কিছু-কিছু জীবন-বীমার কাজও চলে। ভারতে সমাজবীমা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত।

কিন্তু রুশিয়ার বীমা-ব্যবসায় এমন কিছু নাই তথাকথিত ধনতান্ত্রিক দেশগুলাতে যাহার কোনই সন্ধান মিলে না।

বীমা-ব্যবসায় রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারের আদর্শ প্রথমে

ফ্রান্সে পরিকল্পিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উহা আংশিক ভাবে ঐ দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার পর ইয়োরোপের অগ্রগামী দেশগুলায় ক্রমে বীমা-ব্যবসার কতকগুলি শাখায় রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বা নিয়ন্ত্রণের নীতি গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বীমার তত্ত্ব বা রেওয়াজ কোনো দিক্ দিয়াই সোভিয়েট রুশিয়া মৌলিকতার দাবী করিতে পারে না, এবং উহা কমিউনিজমের অঙ্গীভূতও নহে।

## সমাজবীমার অগ্রদূত জার্ম্মাণি

তত্ত্ব বা রেওয়াজের দিক্ হইতে সমাজবীমার সহিতও কমিউনিজমের কোনো নাড়ীর যোগ নাই বা সোভিয়েট রুশিয়া কর্ত্তৃক ইহা ধরাতলে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বিসমার্কের আমলের জার্ম্মাণিই এবিষয়ে অগ্রদূত। তিনিই গত শতাব্দীর অষ্টম দশকের প্রারম্ভে এসম্বন্ধে প্রথম আইন-কানুন প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমানে রুশিয়া অপেক্ষা জার্ম্মণি ও বিলাত মাথা-পিছু সমাজবীমা (রোগ, দুর্ঘটনা, অক্ষমতা) হিসাবে বহুগুণ বেশী অগ্রসর। রুশিয়াকে বর্ত্তমান জার্ম্মাণ-বিলাতী মাপকাঠিতে পৌঁছাইবার জন্য অন্ততপক্ষে আরও এক পুরুষকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

শাসন-প্রণালী তথা প্রকারভেদ দুই দিক্ হইতেই রুশিয়ার বীমা-ব্যবসা ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন ধরণের। ব্যবসা-প্রণালী ও গড়ন দুই দিক্ দিয়াই রুশীয় বীমা-ব্যবসা ভারতবর্ষের চোখ ফুটাইতে সমর্থ। দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে ধরণেরই হউক না কেন, বীমাব্যবসার মাপজোক ও অর্থনীতি বাস্তবিকই বিশ্বজনীন।

## বীমাব্যবসায় রুশিয়ার জুড়িদার জাপান

১৯২৮-২৯ সনে গসট্রাখের প্রিমিয়াম আয় দাঁড়ায় ২৬৮ মিলিয়ন রুবল (এক রুবল প্রায় দেড় টাকার সমান)। জীবন-বীমার

প্রিমিয়াম আয় প্রায় ৯ মিলিয়ন রুব্‌ল। সুতরাং রুশিয়ার সরকারী বীমা-কোম্পানীর দ্রব্য-বীমা খাতে প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ৩৯ কোটী (৩৯০ মিলিয়ন) টাকা ধরা যাইতে পারে। ১৯২৯ সনে এই খাতে আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬ মিলিয়ন টাকা। এই বৎসর জাপানের এই খাতে আয় ১২০ মিলিয়ন ইয়েন (প্রায় ১৫০ মিলিয়ন টাকা)। মাথাপিছু হিসাবে জাপান ও রুশিয়ার আয় প্রায় সমান অর্থাৎ ২ টাকা ৫ আনা।

## সোভিয়েট বীমার পরিচালনা

প্রায় ৩৫ মিলিয়ন রুব্‌লের এই লাভের নিম্নলিখিতরূপ বিলি-ব্যবস্থা করা হইয়াছিল:—(১) রিজার্ভ তহবিল ১২ মিলিয়ন (২) নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির জন্য ১২ মিলিয়ন (৩) মজুরদের গৃহ ৫ মিলিয়ন (৪) গভর্ণমেণ্ট ৪ মিলিয়ন (৫) কর্ম্মচারীদের ইনামবখসিস ২ মিলিয়ন।

১৯২৯ সনের উদ্বর্ত্তপত্রে নিম্নলিখিতরূপ পাঁচদফা রিজার্ভের (প্রায় ৩১২ মিলিয়ন রুব্‌ল) উল্লেখ ছিল:—(১) স্পেশ্যাল রিজার্ভ পুঁজি ২৫ মিলিয়ন (২) রিজার্ভ পুঁজি ৭২ মিলিয়ন (৩) স্পেশ্যাল তহবিল ৫৬ মিলিয়ন (৪) প্রিমিয়াম রিজার্ভ ৬১ মিলিয়ন।

যে সমস্ত সম্পদের উপর বীমা করা হয় না সেই সমস্ত সম্পদ্‌ হইতে শতকরা ৫০ ভাগ প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে।

গরীব লোকদিগকে রিবেট দেওয়া হয়; এবং মোট প্রিমিয়ামকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

চতুর্থ বৎসর ১৯২৪-২৫ সনে প্রিমিয়াম আয়ের ১৯.৮% পরিচালন খরচা দাঁড়াইয়াছিল; ১৯২৮-২৯ সনে এই বাবদ খরচা ১১.৫%তে হ্রাস পায়।

## কৃষিঋণ ও বীমা

কৃষিঋণ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে বীমা-ব্যবসা রীতিমত প্রসারলাভ করিতে পারে। কৃষকদের ঋণভার যতদিন স্থায়ী আকারে পিতা হইতে পুত্রের স্কন্ধে ভর করিতে থাকিবে ততদিন জমির উপর তাহার আংশিক অধিকার মাত্র আছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ জমিতে অংশতঃ উত্তমর্ণের অধিকার মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সমবায়-ঋণ, সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতের আমলে রপ্তানির সুবিধা, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক, উত্তরাধিকার ও জমি বিভাগ-বিষয়ক কঠোরতর আইন এবং আরও নানাপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারা কৃষকদের এই ঋণভারের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাইতে পারে। জমির উপর কৃষকদের অধিকার-বৃদ্ধি তথা উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে ডাকঘরে টাকা জমার এবং ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয়ের মত বীমা করার দিকেও চাষীদের ঝোঁক পড়িতে পারে। এজেণ্টগণ চেষ্টা করিলে বর্ত্তমান অবস্থাতেও কৃষকদিগকে বীমা করাইতে পারে। কারণ তাহারা ছাতা ক্রয়, স্কুলে ছেলে পাঠানো, বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে অক্লেশে টাকাকড়ি খরচ করিয়া থাকে। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিচার করিলে বীমা খরিদ করা জীবন-যাত্রা-প্রণালীরই একটা অঙ্গ-বিশেষ। ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির তালিকা-ভুক্ত রূপেই ইহাকে সমঝিতে হইবে। কৃষিঋণ এবং সাধারণ দারিদ্র্য দূর না হওয়া পর্য্যন্ত বীমা-কর্ম্মীদের অপেক্ষা করিবার কোন কারণ নাই। চাষীদের মধ্যে কতকগুলি বীমা-পত্র প্রচলন করিতে পারিলে ঐ ঋণের ভারই কিছু কমিয়া আসিবে, আর চাষীরা সমৃদ্ধির স্বাদ চাখিবারও অবসর পাইবে।

রাত্রি ৯ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সপত্নীক অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস অতিথিদিগকে চা ও জলযোগ পরিবেষণ করিয়া তৃপ্ত করেন।

# বিশ্ব-বাণিজ্যে ভারতের দান*

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল

গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, রিকার্ডোর অনুবাদক

## বিশ্ববাণিজ্য কি বস্তু

বর্ত্তমান জগতে আর্থিক ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল জাতি কোথাও নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। সকল জাতির পর-নির্ভরতা সমান নহে; কাহাকেও বিদেশী জিনিষের উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়, কাহাকেও কম; কোন কোন দেশ স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্য-বোধ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আর্থিক পরাধীনতার পাশ মোচন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে এবং তজ্জন্য শুল্ক-দেওয়াল ও অন্য নানা প্রকার নীতি অবলম্বন করিয়াছে,—বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে আবার এই প্রবৃত্তি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে; তথাপি একথা সত্য যে, বর্ত্তমান যুগে এক দেশের সহিত অন্য দেশের লেনদেন একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় না, উচ্চ কর চাপাইয়া তাহা কতকটা খর্ব্ব বা অন্য খাতে প্রবাহিত করা যায় মাত্র। বিশ্ব বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য বর্ত্তমান দুনিয়ার সভ্যতার অন্যতম লক্ষণ। এমন কি, যাঁরা আমদানি কমাইবার বা বন্ধ করিবার অর্থাৎ বিদেশী জিনিষ বয়কটের ঘোরতর পক্ষপাতী তাঁরাও বুঝেন বিদেশে স্বদেশী জিনিষ বিক্রয় অর্থাৎ রপ্তানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিশ্ব-বাণিজ্য বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য কি বস্তু একবার বিশ্লেষণ

---

* "আর্থিক উন্নতি", আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৪০ (জুন, জুলাই ১৯৩৩)। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে আলোচিত, ২৮মে ১৯৩৩।

করিয়া দেখা যাক্। বলা বাহুল্য, অন্য বহু আর্থিক ধ্যান-ধারণার মত এ সম্বন্ধেও মানুষের চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ব-বাণিজ্য বলিতে শুধু দেশ হইতে দেশান্তরে মাল চলাচল, পণ্য কেনা-বেচা বা আমদানি রপ্তানি বুঝায় না। অদৃশ্য খাতেও এক দেশের সহিত অন্য দেশের বহু দিকে আদান-প্রদান চলে। এক দেশ নানা প্রকারে অন্য দেশের সেবা করিয়া দাম লইতে পারে, অথবা দেশে দেশে সেবায় বিনিময় হইতে পারে। সভ্য দেশসমূহের জাহাজগুলি সকল দেশের মাল ও যাত্রী পৃথিবীর সর্ব্বত্র বহন করিয়া লইয়া যায়। তারপর ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহও নানাপ্রকারে দেশে ও বিদেশে লোকের কাজ করিয়া দিতেছে। এক এক দেশ পৃথিবীর বহু বিভিন্ন স্থানে এইরূপ প্রতিষ্ঠান মোতায়েন রাখিয়া সেবা করিতেছে। এইসকল "সেবা" বিশ্ববাণিজ্যের অন্তর্গত বস্তু।

দেশ হইতে দেশে শুধু মাল নয় পুঁজি চলাচলও ঘটে। গত মহাযুদ্ধের সময় ও তারপর এই পুঁজি চলাচল কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে ও তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গতি কিরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়। বর্ত্তমান যুগে কোন দেশই সমৃদ্ধ ও ধনী দেশের নিকট হইতে টাকা ধার না লইয়া নিজের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে না। টাকা ধার লইয়া অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তরে সুদ শোধ করিতে হয়। উত্তমর্ণ দেশ টাকাই পাঠাক বা তার বদলে মালই পাঠাক, সুদও টাকাতেই শোধ হোক্ কি মালে রূপান্তরিত হোক্ কিছু আসে যায় না,—এইরূপ পুঁজির চলাচল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অংশবিশেষ। যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন অর্থশাস্ত্রী আলোচনা করিয়াছেন। আমি এ দুটিকে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম সমস্যারূপে গণ্য করিতে অভ্যস্ত। কারণ এ দুটির ফলে

বিপুল ক্রয়-শক্তি বা পুঁজি এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছুটিয়া চলিয়া যায়।

লোক চলাচলও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিষয়। কোন কোন দেশের "ঔপনিবেশিক সমস্যা" লইয়া রীতিমত মাথা ঘামাইতে হয়। ঔপনিবেশিকেরা দেশের মধ্যে মজুরি-হ্রাস প্রভৃতি তো ঘটায়-ই তা ছাড়া ইহারা অর্জ্জিত অর্থের কিছু কিছু অংশ স্বদেশে পাঠাইতে পারে। প্রতি বৎসর ইয়োরামেরিকা ও জাপানের লোকেরা দলবলসুদ্ধ পৃথিবীর নানা স্থানে পর্য্যটনে বাহির হয়। ইহারা দেশের বাহিরে বহু খরচপত্রও করে। ইয়োরামেরিকা ও এশিয়ার পড়ুয়ারা পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতে যায় ও যতদিন বিদেশে থাকে টাকা খরচ করে। এইরূপ বিভিন্ন দফার খরচগুলি, টাকা-প্রেরণ বা টাকা-আনয়ন, ঔপনিবেশিকের পরিশ্রম-দান ও উপার্জ্জন, বিশ্ব-বাণিজ্যের অঙ্গপুষ্টি করিয়া থাকে।

উপরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে "বিশ্ব" বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য কিরূপ ব্যাপক বস্তু। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন দেশে লোকবল এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সেই সেই দেশে আর স্থান ও খাদ্যের সঙ্কুলান হয় না; বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা দ্বারা শিল্প-বিপ্লব ও আনুষঙ্গিক শিল্পোন্নতি বর্ত্তমান যুগে সদাসর্ব্বদা ঘটিতেছে; যাতায়াতের ও মাল-চলাচলের সুবিধা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে; এইসব ও অন্যান্য কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির পরস্পরের উপর আর্থিক নির্ভরতা ঘুচিতেছে না। অধিকন্তু এইসকল কারণ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতিও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

এক দেশের সহিত অন্য দেশের "অদৃশ্য" খাতে যে আদান-প্রদান চলে, তাহা সর্ব্বত্র সমান নহে; কোথাও কোথাও ইহার গুরুত্ব ও মূল্য বেশী। কিন্তু তথাপি সর্ব্বত্রই ইহা মোট বাণিজ্যের অল্পাংশ মাত্র।

দেশে দেশে পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানিই বিশ্ব বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান ঘটনা। প্রথমতঃ, বিদেশে মাল বেচা ও বিদেশী মাল কেনা, স্বাভাবিক অবস্থায়, স্বদেশী সওদাগরের ধান্ধা হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, এক দেশ হইতে অন্য দেশে মাল পাঠান সব চেয়ে সুবিধাজনক। পুঁজিই হোক্ বা সুদের টাকাই হোক্ সাধারণতঃ মাল দ্বারা শোধ করা দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি এমন বলিতেছি না, সোনা বা টাকার চলাচল হয় না, কিন্তু কোন দেশ অন্য দেশকে তখনি সোনা প্রেরণ করে যখন অন্য কোন উপায় আর হাতে থাকে না। যতক্ষণ মাল পাঠাইয়া চলে, ততক্ষণ কেহ সোনা পাঠায় না। লোক চলাচল এবং "সেবার"ও একটা সীমা আছে। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশ-প্রীতি এই দুই দফাকে সকল দেশেই খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং দাঁড়ায় এই যে, আমরা যদি বিশ্ব বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের আলোচনার নিমিত্ত শুধু পণ্য আমদানি-রপ্তানির দিকে চোখ রাখি তো তাহাতে বাণিজ্যের গতি বুঝিতে ও তদ্বিষয়ে নানারূপ সিদ্ধান্ত করিতে আমাদের বিশেষ ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বিশ্ব বাণিজ্য সম্বন্ধে ইহাই সাধারণভাবে প্রযোজ্য কথা,—নানাবিধ কারণের সমাবেশে যদি এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তো তখন ব্যতিক্রম-গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখাই সমীচীন।

১৯২৭ সন হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে পৃথিবীর আমদানি-রপ্তানির হিসাব এইরূপ :

তালিকা নং ১

| সন | আমদানি<br>কোটি ডলার | রপ্তানি<br>কোটি ডলার | মোট<br>কোটি ডলার |
|---|---|---|---|
| ১৯২৭ | ৩৩৭৬.৪ | ৩১৩৭.৮ | ৬৫১৪.২ |
| ১৯২৮ | ৩৪৬৩.৯ | ৩২৪৯ ৯ | ৬৭১৩.৮ |

| সন | আমদানি | রপ্তানি | মোট |
|---|---|---|---|
| | কোটি ডলার | কোটি ডলার | কোটি ডলার |
| ১৯২৯ | ৩৫৬০.৭ | ৩৩০৫.২ | ৬৮৬৫.৯ |
| ১৯৩০ | ২৯০৮.২ | ২৬৪৮.৯ | ৫৫৫৭.১ |
| ১৯৩১ | ২০৯০.৪ | ১৮৮৭.৮ | ৩৯৭৮.২ |
| ১৯৩২ (জাম্ন-জুন) | ৬৫৬.২ | ৫৭৫.৭ | ১২৩১.৯ |

উপরের তালিকা দ্বারা মূল্যের দিক্ হইতে বিশ্ব-বাণিজ্যের বহরটার একটা আন্দাজ হইবে। গত তিন বৎসর যাবৎ পৃথিবীব্যাপী ঘোরতর দুর্য্যোগ চলিতেছে, সেজন্য আন্তর্জ্জাতিক মাল-চলাচল প্রথমতঃ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ মূল্যে হ্রাস পাইয়াছে। ফলে বিশ্ব-বাণিজ্যের মূল্য, যতটা উচিত ছিল, তার চেয়েও বেশী কমিয়াছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা মোটামুটি ২০০ কোটি ধরিলে মাথা-পিছু আমদানির পরিমাণ ১৭½ ডলার বা ৬১৲ টাকার উপর হইতে ১০ ডলার বা ৩৫৲ টাকার উপর পর্য্যন্ত নামিয়াছে; মাথা-পিছু রপ্তানি নামিয়াছে ১৬½ ডলার বা ৫৮৲ টাকা হইতে প্রায় ৯½ ডলারে বা ৩৩৲ টাকায়; আর মোট বাণিজ্যের দাম মাথা-পিছু ৩৪ ডলার বা ১২০৲ টাকা হইতে ১৯½ ডলারে বা ৬৮৲ টাকায় নামিয়াছে।

এখন দেখা যাউক এই বিপুল আদান-প্রদানের সহিত ভারতের সম্পর্কটা কি।

## বিশ্ব এবং ভারত

বিশ্ব-বাণিজ্যের যে খতিয়ান দিয়াছি, তার মধ্যে ভারতের দানও নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার বিশেষ কোন মূল্য আছে অথবা নাই তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার।

প্রথমতঃ, ভারত বলিতে শুধু বৃটিশ ভারতই বুঝিয়া থাকি। বৃটিশ ভারতের বাহিরে বিপুল ভূমিখণ্ডে বহুসংখ্যক লোক দেশবিদেশের সহিত আদান-প্রদানের সম্পর্ক পাতাইয়াছে, সে সম্বন্ধে তথ্যতালিকা পর্য্যাপ্ত নহে, এবং যাহা আছে তাহা লইয়া আলোচনা করিব না।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য যথেষ্ট জটিল ব্যাপার। সাধারণতঃ, ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য অনুকূল বাণিজ্য অর্থাৎ প্রতি বৎসরের আমদানি রপ্তানির হিসাব হইতে দেখা যায় রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য আমদানির পরিমাণ ও মূল্যের চেয়ে বেশী হইয়া থাকে। ধনরত্ন এবং অদৃশ্য আদান-প্রদানের হিসাব ধরিবার পরও ভারতবর্ষের অন্য দেশ হইতে সোনা পাইবার কথা। কিন্তু ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে শেষ পর্য্যন্ত হাতে তো কিছু থাকেই না, উপরন্তু আমাদিগকেই ঘর থেকে টাকা পাঠাইতে হয়। এই অবস্থার জন্য প্রথমতঃ দায়ী বিদেশী পুঁজির ব্যবহার, দ্বিতীয়তঃ দায়ী "হোম চার্জ্জেস" বা সরকারী পাওনা বলিয়া অতি পরিচিত বস্তু। বিদেশী পুঁজির দাদন লওয়া হইয়াছে, তজ্জন্য সুদ তো প্রতি বৎসরই দিতে হইতেছে, আবার যে ঋণ শোধের সময় আসে তাহাও শোধ করিতে হয়। নানা বিদেশবাসীর নিকট হইতে এই টাকা ধার লওয়া হইলেও, বিলাতই আমাদের পুঁজির প্রধান যোগানদার। আমাদের দেশের অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যে বিদেশী পুঁজির ভালমন্দ সম্বন্ধে ঘোরতর মতদ্বৈধ দেখা যায়। ভাল হোক্, মন্দ হোক্, ইহা যে আমাদের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, সেটুকু জানা প্রয়োজন। কোন দেশ অন্য দেশের কাছে টাকা ধার লইলে সর্ব্বদা যে টাকাটাই সোজাসুজি চলিয়া আসে তাহা নহে, টাকা না পাঠাইয়া উত্তমর্ণ দেশ মালও পাঠাইতে পারে। সুদের কিস্তি অথবা ধার পরিশোধের সময় অধমর্ণ দেশ তেমনি মাল পাঠাইয়া তাহা করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, বিদেশী পুঁজি সম্বন্ধে

কোন প্রকার আলোচনা করিব না। "সরকারী পাওনা" সম্বন্ধেও উচ্চবাচ্য করিব না, যদিও জানি ইহাকে গালি দেন নাই এমন দেশভক্ত অর্থশাস্ত্রী আমাদের দেশে প্রায় কেহ নাই। সম্প্রতি একমাত্র পণ্যের আমদানি-রপ্তানির প্রতিই সমুদয় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব। তবে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, ভারতের মোট বহির্ব্বাণিজ্যের শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ অংশ আমদানি-রপ্তানি ; বাকী ৫ হইতে ১০ অংশ ধনরত্নের আমদানি-রপ্তানি, গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পণ্য ও ধনরত্ন আমদানি-রপ্তানি।

গত ছয় বৎসরের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের মূল্য নিম্নরূপ :—

তালিকা নং ২

| | ১৯২৭-২৮ | ১৯২৮-২৯ | ১৯২৯-৩০ | ১৯৩০-৩১ | ১৯৩১-৩২ | ১৯৩২-৩৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | কোটি | কোটি | কোটি | কোটি | কোটি | কোটি |
| আমদানি—টাকায় | ২৪৯·৮৪ | ২৫৩·৩১ | ২৪০·৮০ | ১৬৪·৭৯ | ১২৬·৩৭ | ·১৩২·২৭ |
| ডলারে | ৭১·৩৮ | ৭২·৩৬ | ৬৩·০৮ | ৫২·৭৯ | ৩৬·১১ | ৩৭·৭৯ |
| ভারতীয় | | | | | | |
| রপ্তানি—টাকায় | ৩১৯·১৫ | ৩৩০·১৩ | ৩১০·৮১ | ২২০·৪৯ | ১৫৫·৮৯ | ১৩২·৪৩ |
| বিদেশী | | | | | | |
| রপ্তানি ,, | ৯·৫৪ | ৭·৮৩ | ৭·১৩ | ৫·১৪ | ৪·৬৬ | ৩·৩২ |
| মোট রপ্তানি ,, | ৩২৮·৬৯ | ৩৩৭·৯৬ | ৩১৭·৯৩ | ২২৫·৬৪ | ১৬০·৫৫ | ১৩৫·৭৫ |
| ডলারে | ৯৩·৯২ | ৯৬·৫৭ | ৯০ ৮৪ | ৬৪·৪৫ | ৪৫·৮৭ | ৩৮ ৭৯ |
| মোট | | | | | | |
| বাণিজ্য—টাকায় | ৫৭৮·৫৩ | ৫৯১·২৭ | ৫৫৮·৭৩ | ৩৯০·৪৩ | ২৮৬ ৯২ | ২৬৮ ০২ |
| ডলারে | ১৬৫·৩০ | ১৬৮·৯৩ | ১৫৯·৯২ | ১১১·৫৪ | ৮১·৯৮ | ৭৬·৫৮ |

প্রথম তালিকার সহিত এই দ্বিতীয় তালিকার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে বিশ্বের আমদানি-রপ্তানি ও মোট বাণিজ্যে ভারতের দান কতটা রহিয়াছে। তুলনার পক্ষে একটা অসুবিধা এই যে, ভারতীয়

বাণিজ্যের বাৎসরিক হিসাব এপ্রিল হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত, কিন্তু বিশ্ব-বাণিজ্যে জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর অবধি অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। তথাপি মোটামুটি হিসাবের পক্ষে এই দুই রকম বাৎসরিক হিসাবও কাজে লাগিবে। তুলনার সম্পর্কে দ্রষ্টব্য এই যে, ভারতীয় বাণিজ্যের বেলায় প্রায় সকল বৎসরে আমদানির চেয়ে রপ্তানি অনেক বেশী। সুতরাং একথা বলিলে ভুল হইবে না যে, বিশ্ব-বাণিজ্য হইতে ভারতীয় রপ্তানি বাদ দিলে উহার ক্ষতির পরিমাণ ভারতীয় আমদানি বাদ দেওয়ার চেয়ে বেশী হইবে। সাদা কথায়, বুঝিতে হইবে দুনিয়ার বিভিন্ন ঘাটে ভারতীয় বাণিজ্যের তরণী ভিড়িলে তার শুধু হাতে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই, ভারতীয় পণ্য কিনিবার আগ্রহ অনেক দেশের আছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে যাঁরা বিলাতী বা বিদেশী মাল বর্জ্জনের অত্যন্ত পক্ষপাতী অথচ বিদেশে পণ্য বেচিতে চান অর্থাৎ রপ্তানি বাড়ুক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা সম্ভবতঃ ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে, দুনিয়ার মোট বাণিজ্য বাড়াতে ভারতের বিশেষ স্বার্থ। কারণ দুনিয়ার বাণিজ্য কমিতে থাকিলে, এই কমার জন্য ভারতীয় আমদানি যত দ্রুতবেগে কমে, ভারতীয় রপ্তানি তার চেয়ে ঢের বেশী দ্রুতবেগে কমে। পণ্য আমদানি-রপ্তানির হিসাবে আমদানির মূল্য রপ্তানির মূল্যকে ছাড়াইয়া যায় এরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানকালে ভারতে বিরল ছিল। অথচ ১৯৩২-৩৩ সনে প্রায় তাহাই ঘটিয়াছে। স্বীকার করি, নানাপ্রকার কারণের যোগাযোগে তাহা সম্ভব হইয়াছে; কিন্তু আমাদের ইচ্ছাকৃত আমদানি-হ্রাস প্রভৃতিকে কতক পরিমাণে মাত্র তজ্জন্য দায়ী করা যায়, সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। বস্তুতঃ, বয়কট বা বর্জ্জন আন্দোলনের ভালমন্দ আলোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু বিশ্ব-বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত যে আমাদের আমদানি-

রপ্তানির, বিশেষতঃ রপ্তানির, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াই আমি খালাস।

## দেশবিদেশের মাপে ভারত

বিশ্ব-বাণিজ্য একটি অখণ্ড বস্তু নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের আমদানি-রপ্তানি ও মোট বাণিজ্য উহার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সকল দেশের দানের মূল্য ও পরিমাণ সমান নহে; কোন দেশ বেশী, কোন দেশ কম দিতে সমর্থ হয়। উপরে দ্বিতীয় তালিকায় বাণিজ্যের যে অঙ্কগুলি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ভারতীয় বাণিজ্য সমগ্র বিশ্ব-বাণিজ্যের শতকরা কত অংশ তাহা বলা যায়। তুলনায় সমালোচনার জন্য ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের শতকরা অংশও জানা প্রয়োজন। কিন্তু পৃথিবীর সমুদয় দেশের সহিত এরূপ তুলনা সম্ভবপর নহে বলিয়া সাধারণতঃ বিলাত, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান এই কয়টি বড় দেশের মাপেই ভারতকে দেখিতে চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ, বিশ্ব-বাণিজ্যে এই দেশগুলির দানের পরিমাণ কিরূপ ব্যাপক তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

তালিকা নং ৩

বিলাত

| | ১৯২৭ কোটি পাঃ | ১৯২৮ কোটি পাঃ | ১৯২৯ কোটি পাঃ | ১৯৩০ কোটি পাঃ | ১৯৩১ কোটি পাঃ |
|---|---|---|---|---|---|
| আমদানি | ১২১·৮৩ | ১১৯·৫৬ | ১২২·০৮ | ১০৪·৪৪ | ৮৬·১৩ |
| রপ্তানি | ৭০·৯১ | ৭২·৩৬ | ৭২·৯৩ | ৫৭·০৮ | ৩৯·০৬ |
| মোট | ১৯২·৭৪ | ১৯১·৯২ | ১৯৫·০১ | ১৬১·৫২ | ১২৫·১৯ |

### আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

| | কোটি ডলার | কোটি ডলার | কোটি ডলার | কোটি ডলার | কোটি ডলার |
|---|---|---|---|---|---|
| আমদানি | ৪১৮·৪৭ | ৪০৯·১৪ | ৪৪০·০১ | ৩৭৮·১১ | ২৩৭·৮০ |
| রপ্তানি | ৪৭৫·৮৯ | ৫০৩·০১ | ৫১৫·৭৪ | ৩০৬·১০ | ২০৯·০৬ |
| মোট | ৮৯৪·৩৬ | ৯১২·১৬ | ৯৫৫·৭৫ | ৬৮৪·২১ | ৪৪৬ ৮৬ |

### জার্ম্মাণি

| | কোটি রা-মা | কোটি রা-মা | কোটি রা-মা | কোটি রা-মা | কোটি রা-মা |
|---|---|---|---|---|---|
| আমদানি | ১৪২২·৮ | ১৪৬৫·১ | ১৩৪৪·৭ | ১০৩৯·৩ | ৬৭২·৭ |
| রপ্তানি | ১০৮০·১ | ১২০৩·০ | ১৩৪৮·৩ | ১২০৩·৫ | ৯৫৯·৮ |
| মোট | ২৫০২·৯ | ২৬৬৮·১ | ২৬৯৩·০ | ২২৪২·৮ | ১৬৩২·৫ |

### ফ্রান্স

| | কোটি ফ্রাঁ | কোটি ফ্রাঁ | কোটি ফ্রাঁ |
|---|---|---|---|
| আমদানি | ৫২৯৯·৬ | ৫৩৪৩·৬ | ৫৮২৮·৫ |
| রপ্তানি | ৫৫১৯·৬ | ৫১৩৭·৫ | ৫০০৭·২ |
| মোট | ১০৮১৯·২ | ১০৪৮১·১ | ১০৮৩৫·৭ |

### ইতালি

| | কোটি লিঃ | কোটি লিঃ | কোটি লিঃ |
|---|---|---|---|
| আমদানি | ২০৩৭·৫ | ২১৯২·০ | ২১৩০·০ |
| রপ্তানি | ১৫৬৩·৪ | ১৪৫৫·৯ | ১৪৮৮·৭ |
| মোট | ৩৬০০·৯ | ৩৬৪৭·৯ | ৩৬১৮·৭ |

জাপান

| | কোটি ইঃ | কোটি ইঃ | কোটি ইঃ |
|---|---|---|---|
| আমদানি | ২১৭'৬৮ | ২১৯'৩৭ | ২২১'৩৪ |
| রপ্তানি | ১৯১'৪১ | ১৯১'১৮ | ২১০'৩৭ |
| মোট | ৪০৯'০৯ | ৪১০'৫৫ | ৪৩১'৭১ |

এই ছয়টি দেশের বাণিজ্যের মূল্য সমগ্র বিশ্ব-বাণিজ্যের অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী। বিভিন্ন দেশের বহির্ব্বাণিজ্য যত বিস্তৃতি লাভ করিতেছে তত এই সব বড় দেশের হিস্যা কমিয়া যাইতেছে। ৯০ বৎসর পূর্ব্বে একা বিলাতই বিশ্ব-বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ পুষ্ট করিত। বিলাতের সেদিন আর নাই। বিলাতের পক্ষে ইহা দুর্দ্দিন বলিয়া বিবেচিত হইলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বৃহত্তর ভাগ পাইয়া দুর্দ্দিন বলিয়া মনে করিতে পারে না। সেই সময়ে বিলাত, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স একত্রে বিশ্ব-বাণিজ্যের অর্দ্ধাংশ দান করিতে সমর্থ ছিল। নীচের তালিকায় কয়েকটি দেশের বিশ্ব-বাণিজ্যের হিস্যা দেখান যাইতেছে ঃ

তালিকা নং ৪

| সন | মোট আমদানি ও রপ্তানি বিলিয়ন ডলার | বিলাতের শতকরা অংশ | যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা অংশ | জার্ম্মাণির শতকরা অংশ | ফ্রান্সের শতকরা অংশ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮৪০ | ২'৮ | ৩২ | ৮ | | ১০ |
| ১৮৬০ | ৭'২ | ২৫ | ৯ | | ১১ |
| ১৮৮০ | ১৪'৮ | ২৩ | ১০ | ৯ | ১১ |
| ১৯০০ | ২০'১ | ২১ | ১১ | ১২ | ৮ |
| ১৯১৩ | ৪০'৪ | ১৭ | ১৫ | ১২ | ৭ |
| ১৯২৯ | ৬৬'৭ | ১৪ | ১৪ | ১০ | ৬ |

এই সঙ্গে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য বিশ্ব-বাণিজ্যের শতকরা কত অংশ তার হিসাবও জুড়িয়া দেওয়া যাইতেছে :

| ১৯২৭-২৮ | ১৯২৮-২৯ | ১৯২৯-৩০ | ১৯৩০-৩১ | ১৯৩১-৩২ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ২.৫৪ | ২.৫২ | ২.৩৩ | ২.০১ | ২.০৬ |

বিগত শত বৎসরের মধ্যে বিশ্ব-বাণিজ্য ৩০ গুণেরও অধিক মূল্যের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক দেশেরই বহির্ব্বাণিজ্যের মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু শতকরা অংশের হিসাবে দেশবিশেষের স্থানের ওলট্-পালট্ ঘটিয়াছে। যে যুক্তরাষ্ট্র বিলাতের বহু নিম্নে ছিল, আজ সে বিলাতের সহিত একাসনে বসিয়াছে। বিশ্ব-বাণিজ্যও বিশ্বশক্তির অন্যতম বিকাশ। এই বিশ্বশক্তির ভারকেন্দ্র বারে বারে বদলাইয়া যায়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে সাধারণতঃ জগতের মঙ্গল সূচিত হয়। বিশ্ব-বাণিজ্য-জাত লাভ যত বেশী দেশের মধ্যে বণ্টিত হয়, জগতের তত শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গতি যথাসম্ভব অপ্রতিহত রাখাতেই যথার্থ জাতীয় মঙ্গল সাধিত হয়, বর্ত্তমান লেখকের ইহা অভিমত। এ সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা এই বলিবার আছে যে, কোন ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ আবশ্যক নহে আমি তাহা বলি না। শুধু এই বলিতে চাই, শুল্ক-দেওয়াল বিশ্ব-বাণিজ্যকে এবং সেই জন্য জাতীয় বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একটু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি—দুনিয়ার বাণিজ্য কমিলে ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্য বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়—তাহা সত্য হইলে, শুল্ক-দেওয়ালের অনিষ্টকারিতা সহজেই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তবে এসম্পর্কে বক্তব্য এই যে, কোন একটি দেশ একাকী অবাধ বাণিজ্যে ব্রতী হইলে সে দেশের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ভিন্ন উপায় থাকিবে না। যতক্ষণ সমুদয় দেশ অবাধ বাণিজ্য বা প্রায় অবাধ বাণিজ্য অবলম্বন না করে, ততক্ষণ কোন দেশের পক্ষে বেশী দিন অবাধ বাণিজ্য অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয় না।

এখানে অবাধ ও সংরক্ষিত বাণিজ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, প্রাসঙ্গিকভাবে দু'একটি কথা বলিলাম মাত্র।

কত বড় দেশ ভারতবর্ষ! এত লোক, এত বড় আয়তন! অথচ সেই দেশ বিশ্ব-বাণিজ্যের শতকরা দুই অথবা আড়াই অংশ মাত্র জোগাইয়া থাকে। তন্মধ্যে আমদানি ও রপ্তানিতে বাঁটোয়ারা হইয়া বিশ্বের মোট আমদানি-রপ্তানির শতকরা এক এক অংশ মাত্র ভারতবর্ষের দান। এই এক অংশেরও দাম কোটি কোটি টাকা এবং বিশ্বের বহুতর দেশ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি ভারতীয় বেপারী ও সওদাগরমাত্রকেই অবহিত হইয়া জাতীয় হিস্যা বাড়াইতে হইবে। এমন দিন যদি আসে যখন বিভিন্ন দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তৃতির ফলে বড় দেশগুলির হিস্যা কমিয়া যাইবে, তাহা হইলে তখন ভারতের শতকরা এক অংশ হিস্যার মূল্যও অনেক হইবে। কিন্তু সেদিন যখন আসে নাই, তখন ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্ত্তব্য। আর এইরূপে ভারতীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলেই সেদিন শীঘ্র সমাগত হইবে।

## ভারতের সহিত বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ

বিশ্বের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ একটুখানি বুঝিবার চেষ্টা করা গেল। এখন কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের বেচা-কেনার হিসাব কিঞ্চিৎ লওয়া যাউক। নীচের তালিকায় কোন্ দেশ হইতে আমদানি ও কোন্ দেশে রপ্তানি মোট আমদানি-রপ্তানির কত অংশ তাহা দেখান যাইতেছে:

তালিকা নং ৫

| | ১৯২৮ | | ১৯২৯ | |
|---|---|---|---|---|
| | আমদানি | রপ্তানি | আমদানি | রপ্তানি |
| বিলাত | ৪৬.২ | ৩১.৯ | ৪২.৪ | ২১.২ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৬.৮ | ১১.৭ | ৬.৬ | ১২.০ |
| জার্ম্মাণি | ৬.৬ | ১০.৩ | ৬.৩ | ৯.১ |
| ফ্রান্স | ১.৯ | ৫.৪ | ১.৮ | ৫.১ |
| জাপান | ৬.৬ | ১০.২ | ৯.২ | ১০.৬ |
| ইতালি | ৩.০ | ৪.৫ | ২.৭ | ৪.১ |
| বেলজিয়াম | ৩.০ | ৩.৯ | ২.৮ | ৪.১ |
| জাভা | ৭.২ | ০.৯ | ৬.২ | ১.৩ |

১৯৩০-৩১

| | আমদানি | রপ্তানি | মোট |
|---|---|---|---|
| বিলাত | ৩৭.২ | ২৩.৮ | ২৯.৬ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৯.২ | ৯.৪ | ৯.৩ |
| জার্ম্মাণি | ৭.৫ | ৬.৪ | ৬.৮ |
| ফ্রান্স | ১.৮ | ৫.০ | ৩.৬ |
| জাপান | ৮.৮ | ১০.৬ | ৯.৮ |
| ইতালি | ২.৭ | ৩.৫ | ৩.২ |
| বেলজিয়াম | ২.৮ | ৩.৪ | ৩.১ |
| জাভা | ৬.৩ | ১.২ | ৩.৩ |

১৯৩১-৩২

| | আমদানি | রপ্তানি | মোট |
|---|---|---|---|
| বিলাত | ৩৫.৫ | ২৮.২ | ৩১.৪ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ১০.২ | ৮.৯ | ৯.৪ |
| জার্ম্মাণি | ৮.১ | ৬.৩ | ৭.১ |
| ফ্রান্স | ১.৭ | ৪.৮ | ৩.৪ |
| জাপান | ১০.৬ | ৮.৭ | ৯.৫ |
| ইতালি | ২.৮ | ৩.৪ | ৩.২ |
| বেলজিয়াম | ২.৪ | ২.৮ | ২.৬ |
| জাভা | ৩.৮ | ১.১ | ২.৪ |

উপরের তালিকা হইতে ভারতের সহিত বিলাতের ও অন্যান্য দেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রথমেই ইহা চোখে পড়ে যে, বিলাতী পণ্যের উপর ভারতের নির্ভরতা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বিলাত হইতে আসিত, এখন এক-তৃতীয়াংশ আসে; ইহাও বেশী। বিলাতের বিরুদ্ধে বর্জ্জন আন্দোলন চালানো বিলাতী পণ্য আমদানি হ্রাসের একটি কারণ হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় এই আন্দোলন না চালাইলেও স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে আমদানি ধীরে ধীরে হ্রাস পাইত। সাধারণতঃ, বিলাত ভিন্ন অন্য বড় দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে আমরা সেগুলি হইতে যত দামের মাল কিনি সেগুলিতে তদপেক্ষা বেশী দামের মাল বেচিয়া থাকি, কিন্তু বিলাতের সহিত আমাদের প্রতিকূল বাণিজ্য। বিলাতের ঠিক নীচেই যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্ম্মাণি ভারতের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্য টক্কর দিতেছে। এ তিনের মধ্যে ভারতীয় বাজার দখল করা নিয়া যেরূপ প্রতিযোগিতা চলে, ভারতীয় মাল কিনা সম্বন্ধেও ইহারা সেরূপ প্রতিযোগিতা করে। বস্তুতঃ,

রাজনৈতিক কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও এই তিনটি দেশ আমাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যকে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ করিয়াছে। তথাপি, দুঃখের বিষয় এই যে, না মোট বাণিজ্যে, না আমদানি বাণিজ্যে, না রপ্তানি বাণিজ্যে এই তিনটি দেশ একত্রে বিলাতের সমান। বলা বাহুল্য, এ অবস্থা স্বাভাবিক নহে। যে কারণে বিশ্ববাণিজ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হওয়ার প্রয়োজন, ঠিক সেই কারণে আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য প্রধানতঃ বিলতের সঙ্গে হওয়া মঙ্গলকর নহে। ফ্রান্স আজও আমাদের কাছ হইতে যথেষ্ট মাল কিনে, অথচ আমরা ফরাসী মালের কদর করি না। ইতালির সহিতও আমাদের বাণিজ্যিক মিত্রতা আরো অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বড় বড় দেশগুলির সহিত আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যের অনুপাত আরো ঢের বাড়িবার অবকাশ রহিয়াছে। একদিকে যেমন আমাদের জার্ম্মাণ, মার্কিণ, ফরাসী, জাপানী, ইতালীয় রুচি অনুযায়ী আরো অনেক মাল তৈরী করিয়া ঐ সব দেশের বাজারে বাজারে তাহা বেচিতে হইবে, অন্য দিকে তেমনি জার্ম্মাণ, মার্কিণ, ফরাসী, জাপানী, ইতালীয় প্রভৃতি বিচিত্র মাল কিনিয়া আমাদের আর্থিক জীবনকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতে হইবে। এই দুই দিকেই ভারত-সন্তানেরা মাথা ঘামাইতে ও পুঁজি খাটাইতে অগ্রসর হউন। কিন্তু ইহাতে যেন এরূপ বুঝা না হয় যে, বিলাতের সহিত আমাদের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বা মূল্য কমিয়া যায় ইহা আমরা বাঞ্ছা করি। বরং আমরা চাই, তাহা আরো বাড়ুক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চাই যে, মার্কিণ প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য আরো অনেক বেশী বাড়ুক।

বড় বড় কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ আরো একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক্।

তালিকা নং ৬

বিলাত

| | কোটি টাকা<br>১৯২৮-২৯ | কোটি টাকা<br>১৯২৯-৩০ | কোটি টাকা<br>১৯৩০-৩১ | কোটি টাকা<br>১৯৩১-৩২ |
|---|---|---|---|---|
| মোট আমদানি | ১১৩·২৪ | ১০৩·১০ | ৬১·২৯ | ৪৪·৮১ |
| তূলা, কাঁচা | ·১২ | ·০৫ | ·২৭ | ·০৪ |
| টুইষ্ট ও ইয়ার্ণ | ২·৫৬ | ২·৯৬ | ১·২৭ | ১·২২ |
| পীস্‌গুড্‌স্ | | | | |
| গ্রে | ১৩·৭৮ | ১১·৭৬ | ২·৮১ | ·৯৬ |
| সাদা | ১৪·২৩ | ১২·০৩ | ৫·২৩ | ৪·০২ |
| রং করা | ১১·৯৯ | ৯·৫০ | ৪·৪৭ | ২·৮৫ |
| অন্যান্য | ১·৫১ | ১·৫৫ | ·৮৬ | ·৮৩ |
| রাসায়নিক | ১·৪৭ | ১·৫৯ | ১·৪১ | ১·৪০ |
| ছুরি কাঁচি | ১·৮৩ | ১·৮০ | ১·৩১ | ·৯৬ |
| যন্ত্রপাতি | ২·৮৮ | ৩·০৩ | ২·৫৫ | ১·৮৩ |
| মেশিনারি | ১৪·০৯ | ১৩·৬৮ | ১০·৭২ | ৭·৭৩ |
| ধাতু—লোহা, ইস্পাত | ১১·৯৬ | ৯·২৯ | ৫·১৩ | ৬·১১ |
| প্রভিশন | ২·২৫ | ২·৩৫ | ১·৯৪ | ১·৫১ |
| মোট রপ্তানি, ভারতীয় | ৬৯·০৪ | ১০৩·১০ | ৬১·২৮ | ৪৪·৮১ |
| পুনঃ রপ্তানি | ৩·৩২ | ২·৬২ | ২·০৯ | ১·৯২ |
| চা | ২২·৩১ | ২২·১৯ | ১৯·৯৫ | ১৬·৯৩ |
| হাইড ও স্কিন কাঁচা | ·৩৯ | ·৩৬ | ·৪০ | ·৪৯ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| হাইড্ ও স্কিন্ পাকা | ৭˙৮৫ | ৬˙৯৭ | ৫˙৭৪ | ৪˙৮৫ |
| পাট, কাঁচা | ৭˙৫৭ | ৫˙৫৬ | ২˙২৩ | ৩˙১১ |
| ,, গানি থলে | ২˙০৬ | ২˙০১ | ১˙২১ | ১˙১৪ |
| ,, ,, কাপড় | ˙৬৫ | ১˙১৫ | ˙৫৯ | ˙৭০ |
| লাক্ষা | ২˙০৫ | ১˙৫৯ | ˙৭০ | ˙৪৫ |
| সীসা | | ১˙৫৪ | ১˙৫৭ | ১˙১০ |
| বীজ | ৩˙১৮ | ৪˙২৫ | ২˙৬৯ | ১˙৯৯ |
| পশম, কাঁচা | ৩˙৯৪ | ৩˙৫২ | ২˙২৭ | ২˙৪৯ |
| তৈরী শিল্প | ˙৪৭ | ˙৩৪ | ˙৩৮ | ˙৪১ |

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মোট আমদানি | ১৭˙৩৬ | ১৭˙৬৬ | ১৫˙১৫ | ১২˙৯০ |
| তুলা, কাঁচা | | ˙২০ | ˙৮৩ | ২˙২৪ |
| ,, পীসগুড্ | ˙৭৯ | ˙৮৮ | ˙২৪ | ˙৩০ |
| তৈল, খনিজ | ২˙৬২ | ৩˙১২ | ৬˙৬৮ | ৩˙১৬ |
| মোটরকার | ৩˙৬৪ | ৪˙৪৫ | ২˙৪১ | ১˙০৭ |
| মোট রপ্তানি | ৫৯˙১১ | ৩৬˙৩৩ | ২০˙৬০ | ১৩˙৮৬ |
| পাট, কাঁচা | ৩˙৪৪ | ২˙৫২ | ১˙০৪ | ˙৯১ |
| ,, গানি থলে | ˙৫৮ | ˙৫১ | ˙২৫ | ˙১৪ |
| ,, ,, শিট | ১৯˙৬২ | ১৮˙২৫ | ১০˙৬৬ | ৬˙৫৭ |
| হাইড্ ও স্কিন কাঁচা | ৪˙১৬ | ৩˙৯৪ | ২˙৬০ | ১˙৭৯ |
| পাকা | ˙৮৬ | ˙৫৪ | ˙০৮ | ˙০৪ |
| লাক্ষা | ৪˙০১ | ৩˙২৩ | ১˙২৫ | ˙৭২ |

জার্ম্মাণি

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মোট আমদানি | ১৫'৮ | ১৫'৭৯ | ১২'৩৩ | ১০'২০ |
| রংএর জিনিষ | ১'৫৬ | ১'২৯ | ১'৬১ | ১'৭১ |
| মেশিনারি | ১'১৪ | ১'৭৪ | ১'১৮ | ১'১২ |
| ধাতু | ২'৯২ | ২'৯০ | ২'৩১ | ১'৫২ |
| ছুরি কাঁচি | ১'০৮ | '৩৪ | '২৩ | '২০ |
| মোট রপ্তানি | ৩২'৩২ | ২৬'৬১ | ১৪'২৬ | ১০'০১ |
| তূলা, কাঁচা | ৫'৭১ | ৪'৮৯ | ৩'৩০ | ১'৪৮ |
| ,, ওয়েষ্ট | | '০৭ | '০৫ | '০৫ |
| পাট, কাঁচা | ৮'৯৬ | ৭'৪০ | ৩'৫০ | ২'৪৪ |
| চাউল, আকাঁড়া | ২'৮৯ | ৩'৩১ | ১'৩৩ | ১'৫৬ |
| বীজ | সাধারণতঃ ২ কোটি টাকার উপর মূল্যের | | | |

ফ্রান্স

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মোট আমদানি | ৪'৭০ | ৪'৫৭ | ২'৮৯ | ২'১৭ |
| মদ | '৬৪ | '৬৪ | '৫১ | '২৭ |
| ধাতু, তামা | '২১ | '১৮ | '২০ | '১৩ |
| রবার শিল্প | | '২২ | '১৭ | '১৬ |
| পশম ,, | '৬৭ | '৬৭ | '২৮ | '২০ |
| মোট রপ্তানি | ১৭'৭৭ | ১৬'৮১ | ১১'০৮ | ৭'৬৪ |
| বীজ | | | | |
| বাদাম | ৫'২৫ | ৪'৮৪ | ২'৮৭ | ৩'৫৩ |
| লিনসীড্ | '৯৯ | ১'১৪ | '৫৩ | '৫৫ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| পাট, কাঁচা | ৪'০৫ | ৩'৬২ | ১'৮৫ | '৯৯ |
| ,, থলে ও কাপড় | '০৪ | '০৭ | '০৩ | '০২ |
| তুলা, কাঁচা | ৩'৫৬ | ৩'৯২ | ২'৬৮ | '৭৮ |

ইতালি

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মোট আমদানি | ৭'৩৬ | ৬'৭৩ | ৪'৫১ | ৩'৫৯ |

বয়ন-শিল্পদ্রব্য ব্যতীত অন্য সকল আমদানির মূল্য ৫০ লক্ষ টাকার নীচে। শুধু তুলার শিল্পদ্রব্য ১৯২৮-২৯—১'৩১ কোটি টাকা। প্রধান প্রধান দ্রব্য—রাসায়নিক, ফল ও তরকারী, মেশিন, ধাতু, কাগজ, ইত্যাদি।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মোট রপ্তানি | ১৫'১৮ | ১১'৩২ | ৭'৮৫ | ৫'৪১ |
| তুলা, কাঁচা | ৬'৬২ | ৫'৭৯ | ৩'৭৮ | ১'৬২ |
| বীজ | | | | |
| বাদাম | | ১'২৩ | ১'১৩ | ১'২৮ |
| পাট, কাঁচা | ২'২৮ | ১'৯০ | '৯২ | '৮৬ |

জাপান

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মোট আমদানি | ১৭'৬৮ | ২৫'৫৯ | ১৪'৫১ | ১৩'৩৩ |
| কৃত্রিম রেশম | | ১'৪৫ | ১'৫৪ | ২'১৬ |
| গেঞ্জি, মোজা | ১'২৫ | ১'২৩ | '৭৬ | '৪১ |
| তুলা | | | | |
| পীস্‌গুড্‌স্ | ৮'৫৯ | ১২'৭০ | ৫'১৩ | ৫'৪৫ |
| ইয়ার্ণ | ১'২৪ | ১'৬৪ | '৮৪ | '৮৩ |
| শিল্প | '১৭ | '১৭ | '১২ | '০৯ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| রেশম শিল্প | ১·৬৭ | ১·৬০ | ·৮৯ | ১·০০ |

গ্লাস ও কাচের বাসন আমদানি বৃদ্ধি পাইতেছে।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মোট রপ্তানি | ৩৪·৪৩ | ৩২·২৭ | ২৩·৭৩ | ১৩·৯৪ |
| তূলা, কাঁচা | ২৯·০২ | ২৭·৩০ | ২১·৬০ | ১১·০৫ |
| লোহা ও ইস্পাত | ১·৮৭ | ১·৮১ | ·৮০ | ·৮৬ |

## ভারতীয় বাণিজ্যের মূল্য-নির্ণয়

আশা করি, এতক্ষণে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের দানটা কি তাহা কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইয়াছে। বিশ্বের ভাণ্ডারে ভারতের বাণিজ্য যতটা নগণ্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ভারতের আদানপ্রদানের সম্পর্ক সেরূপ নগণ্য নহে। নীচের তালিকায় কয়েকটি দেশের মোট আমদানির কত অংশ ভারতীয় এবং মোট রপ্তানির কত অংশ ভারতীয় তাহা দেখান যাইতেছে :

তালিকা নং ৭

১৯২৮

| | আমদানি | | রপ্তানি | |
|---|---|---|---|---|
| জার্ম্মাণি কোটি মাঃ | ৭১·১৪ | ৪·৭% | ২২·২৯ | ১·৮% |
| যুক্তরাষ্ট্র কোটি ডঃ | ১৪·৮৯ | ৩·৬% | ৫·৩৭ | ১·০% |
| ফ্রান্স কোঃ ফ্রাঁ | ২৬৫·২৫ | ৪·৯% | ৫০·৫৬ | ১·০% |
| ইতালি কোঃ লিঃ | ১১৩·৭৪ | ৫·২% | ৫২·৯১ | ৩·৬% |
| জাপান কোঃ ইঃ | ২৮·৫৫ | ১৩·০% | ১৪·৬০ | ৭·৪% |
| বিলাত কোঃ পাঃ | ৫·০১ | ৪·৭% | ৮·৩৯ | ১·৬% |

১৯২৯

| | আমদানি | | রপ্তানি | |
|---|---|---|---|---|
| জার্ম্মাণি কোঃ মাঃ | ৬২·৩৭ | ৪·৬% | ২২·০৪ | ১·৬% |
| যুক্তরাষ্ট্র কোটি ডঃ | ১৪·৯৩ | ৩·৪% | ৫·৫৪ | ১·০% |
| ফ্রান্স কোঃ ফ্রাঁ | — | — | — | — |
| ইতালি কোঃ লিঃ | ১১১·০৭ | ৫·৪% | ৪২·৪৭ | ২·৮% |
| জাপান কোন ইঃ | ২৮·৮১ | ১৩·০% | ১৯·৮১ | ৯·২% |
| বিলাত কোঃ পাঃ | ৪·৮৮ | ৪·৪% | ৭·৮২ | ১০·৭% |

কয়েকটি প্রধান পণ্য আমরা কোন্ দেশ হইতে মোট মূল্যের শতকরা কত অংশ আমদানি অথবা কোন্ দেশে কত অংশ রপ্তানি করি, এই সঙ্গে তারও একটা তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

তালিকা নং ৮

আমদানি

| | ১৯১৩-১৪ | ১৯৩০-৩১ | ১৯৩১-৩২ |
|---|---|---|---|
| | তূলার জিনিষ | | |
| বিলাত | ৯০·১ | ৫৮·০ | ৫১·৬ |
| জাপান | ১·৮ | ৩০·৩ | ৩৫·২ |
| | লোহা ও ইস্পাত | | |
| বিলাত | ৬৯·৯ | ৫২·৩ | ৫৩·৮ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ২·৬ | ৪·৬ | ২·২ |
| জার্ম্মাণি | ১৪·৫ | ৬·৯ | ৭·৩ |
| বেলজিয়াম | ১১·৫ | ২৪·৯ | ২৪·২ |
| | ছুরি কাঁচি | | |
| বিলাত | ৫৭·২ | ৩৬·৪ | ৩৬·৮ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | ৯.৭ | ১২.৫ | ১০.৩ |
| জার্ম্মাণি | ১৮.২ | ২৯.৯ | ২৯.১ |
| জাপান | ১.৫ | ৫.৮ | ৬.১ |
| | মোটর কার | | |
| বিলাত | ৭১.৩ | ২৩.৭ | ৩১.১ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ১৫.১ | ৪৮.৩ | ৪৮.৪ |
| ইতালি | — | ৪.৫ | ৪.৮ |
| | খনিজ তেল | | |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৫৬.১ | ৩৫.১ | ৩৪.৯ |
| পারশ্য | ৩.৭ | ২২.০ | ২৬.১ |
| বোর্ণিও | ২৫.১ | ১৩.১ | ১২.৩ |
| রুশিয়া | .৯ | ২৩.১ | ২০.৪ |
| | চিনি | | |
| জাভা | ৭১.৮ | ৯০.০ | ৭৩.৫ |
| | মেশিন | | |
| বিলাত | ৮৯.৮ | ৭১.৭ | ৭০.৮ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৩.৩ | ১১.৪ | ১১.১ |
| জার্ম্মাণি | ৫.৬ | ৮.২ | ১০.৩ |
| | যন্ত্রপাতি | | |
| বিলাত | ৭৫.৩ | ৫৩.৪ | ৪৯.৬ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৮.০ | ১৬.৪ | ১৭.০ |
| জার্ম্মাণি | ৮.২ | ১৫.৭ | ১৬.৫ |
| | রেশম শিল্প | | |
| জার্ম্মাণি | ৭.২ | ৩.১ | ৩.৩ |
| জাপান | ৪৬.৮ | ৩.১ | ১.৯ |
| চীন | ২০.৬ | ৩৬.২ | ৩০.৮ |

## রপ্তানি

| | ১৯১৩-১৪ | ১৯৩০-৩১ | ১৯৩১-৩২ |
|---|---|---|---|
| | **চা** | | |
| বিলাত | ৭২'৪ | ৮৪ ৭ | ৮৭'১ |
| | **পাট ( পাকা )** | | |
| বিলাত | ৬'৩ | ৫'৭ | ৮'৫ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৪১'৫ | ৩৪'[illegible] | ৩১'৭ |
| আর্জেন্টিনা | ১০'৪ | ১০'৪ | ৬'৩ |
| জাভা | ২'৫ | ৫'১ | ৪ ৫ |
| | **পাট ( কাঁচা )** | | |
| বিলাত | ৩৫'০ | ১৭'৩ | ২৭'৮ |
| জার্ম্মাণি | ২১'৮ | ২৭'২ | ২১'৭ |
| ফ্রান্স | ৯'৯ | ১৪'৩ | ৮'৮ |
| ইতালি | ৫'৫ | ৭'১ | ৭'৭ |
| বেলজিয়াম | '৫ | ৭'৭ | ৭'৫ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ১১'৯ | ৮'১ | ৮'১ |
| | **তুলা ( কাঁচা )** | | |
| জার্ম্মাণি | ১৭'৬ | ৭'১ | ৬'৩ |
| বিলাত | ৩'৫ | ৬'৫ | ৬'৬ |
| ফ্রান্স | — | ৫'৮ | ৩'৪ |
| ইতালি | ৭'৭ | ৮'১ | ৬'৯ |
| জাপান | ৪৭'২ | ৪৫'৩ | ৪৭'১ |
| বেলজিয়াম | ১০'৩ | ৫'৭ | ৫'১ |
| চীন | ১'৭ | ১৬'০ | ১৯'৩ |

তৈল বীজ

| | | | |
|---|---|---|---|
| বিলাত | ২২˙২ | ১৫˙০ | ১৩˙০ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ১˙২ | ৩˙৭ | ৪˙২ |
| জার্ম্মাণি | ১৬˙০ | ১৩˙১ | ১৩˙৭ |
| ফ্রান্স | ৩১˙৪ | ২১˙৯ | ৩০˙৯ |
| ইতালি | ৫˙০ | ১১˙২ | ১৩˙৮ |
| নেদারল্যাণ্ড | ১৮˙৩ | ১৫˙৪ | ৬˙৮ |

হাইড্ ও স্কিন

| | | | |
|---|---|---|---|
| বিলাত | ২৫˙৯ | ৫১˙৫ | ৫৯˙৯ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ২৪˙৩ | ২২˙০ | ২০˙৫ |
| জার্ম্মাণি | ২০˙৩ | ৫˙৮ | ৩˙৯ |

খাদ্যশস্য

| | | | |
|---|---|---|---|
| বিলাত | ২৬˙৭ | ৮˙৪ | ৬˙১ |
| সিংহল | ১১˙৫ | ২০˙১ | ১৯˙৭ |
| জার্ম্মাণি | ৭˙৮ | ৫˙২ | ৮˙৬ |

আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে একটা ধারণা এই প্রচলিত আছে যে, দেশের আমদানি কমাইয়া যতদূর সম্ভব রপ্তানি বাড়ানোই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। এই ধারণা ইয়োরোপেও পূর্ব্বে প্রবল আকারে বিদ্যমান ছিল, এবং এখনও অনেকের মন হইতে বিদূরিত হয় নাই। তত্ত্বের দিক্ হইতে ইহার কিছুমাত্র আলোচনা না করিয়া ভারতীয় আমদানি রপ্তানির অন্তর্গত বিভিন্ন দ্রব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রপ্তানি দ্বারা বাহির হইতে আমরা যেমন অর্থোপার্জ্জন করি, আমদানি দ্বারা সেইরূপ নিজেদের অভাব মিটাই অথবা অভাবের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করি। আমাদের দেশে বহির্ব্বাণিজ্য

লইয়া আলোচনা সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনো দেশবিদেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন এমনসকল সওদাগরের সহিত লিখিয়ে পড়িয়ে অর্থশাস্ত্রীদের পরিচয় হয় নাই। বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার জন্য উভয়ের মধ্যে অচিরে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার।

সকল দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ সমান নহে। বিলাত আমদানি বাণিজ্যের উপর যতটা নির্ভর করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে ততটা করিতে হয় না। নানা প্রকার কারণে এইরূপ ঘটে, কোন কোন কারণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার হাত মানুষের নাই। বিভিন্ন দেশের সমগ্র উৎপাদনের ও ব্যবহারের কত অংশ বহির্ব্বাণিজ্য তার খাঁটি তথ্য-তালিকা জানা নাই। তাহা জানা থাকিলে ভারতকে শতকরা কত অংশ বাণিজ্যের জন্য পরের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা বলিয়া দেওয়া চলিত। কিন্তু কোন বিষয়ে রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হইলে যে চোখে অন্ধকার দেখিতে হয় তাহা এবারে পাটের দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হইয়াছে। বাংলার সম্পদ্ পাটের উপর কতটা নির্ভর করে এবং বাংলার ক্ষতিতে যে ভারতেরও ক্ষতি হয়, তাহা হাতে কলমে দেখান হইয়া গিয়াছে। পাটের দৃষ্টান্তে যদি ভারত-সন্তান বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করে তাহা হইলে আপনা হইতে নানা প্রশ্ন আসিয়া জুটিবে ও তার সমাধানের চেষ্টা হইবে। বস্তুতঃ, কোন্ দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ কিরূপ এবং কেন তার অবনতি বা উন্নতি হইতেছে সে সম্বন্ধে সওদাগরের মত অর্থশাস্ত্রীকেও সন্ধান লইতে হইবে। যেমন, আমরা ফরাসীদের কাছ থেকে খুব কম মাল কেন কিনি, যদিও ফরাসী আমাদের ভাল ক্রেতা, জাপানের সহিত আমাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ অপকারী কি না, ইত্যাদি বহুতর বিষয়ে আমাদিগকে মগজ চালাইতে হইবে।

সম্প্রতি মুদ্রা, সিক্কা প্রভৃতির দিকে দেশের লোকের মনোযোগ বেশী আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, সিক্কা-নীতি বা মুদ্রা-নীতি বিদেশী বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও, প্রধান বিষয় দেশে দেশে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান। ভারত-সন্তানকে জগতের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারে আরো দান করিতে হইবে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার হইতে আরো অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা মুদ্রা-সমস্যা নয়, তাহা বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রথম পাঠ। যে জাত যথেষ্ট পরিমাণে লইতে জানে না অথবা লইতে ভয় পায়, সে জাত যে বিশেষ কিছু দিতেও সমর্থ হইবে না, সে কথা অন্যান্য ক্ষেত্রের মত বিশ্ব-বাণিজ্যের ব্যাপারেও খাটে। সুতরাং দরকার, আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বহুতর ভারত-সন্তান আত্ম-নিয়োগ করিয়া দেশকে ও জগৎকে সমৃদ্ধ করিবে।

বিশ্ব-বাণিজ্য এক বিপুল বস্তু, ইহার আলোচনাতেও মনের প্রসারতা বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। আমদানি-রপ্তানি লাভক্ষতির ব্যাপার হইলেও ইহা সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে কোটি কোটি লোকের অর্থোপার্জ্জনের উপায় করিয়া দিয়াছে। আনুষঙ্গিকভাবে বিশ্ববাণিজ্যের সহায়ক যান-বাহনের কাজেও বহু লোক লিপ্ত হইবার অবকাশ পাইয়াছে। দেশ-বিদেশের লোকজনের সহিত মেলামেশার ফলে মানসিক সম্পদ্ বৃদ্ধির কথার উল্লেখ না হয় না-ই করিলাম, দেশবিদেশের কত আবিষ্কারক ও গুণী বা ওস্তাদ শিল্পীই না মানবের অভাবকে বিচিত্র করিবার ও সওদাগরকে সেই বিচিত্র অভাব পূরণ করিবার অবকাশ দিয়াছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখি। তাহা হইলে ভারত যে বিশ্ব-বাণিজ্যে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে তাহাতে আনন্দ বোধ করিতে পারিব।

# পূর্ব্ববঙ্গের হাটবাজার

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহা, এম-এ ( কমার্স )

গবেষক বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

রবিবার ২৩শে জুলাই ( ১৯৩৩ ) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অধিবেশনে অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ সাহা, এম-এ ( কমার্স ) পূর্ব্ববঙ্গের হাটবাজার সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং প্রস্তাবটী যথারীতি গৃহীত হয়।

## যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

অধ্যাপক সরকারের প্রস্তাব নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে নব্য বাঙ্গলার অবর্ণনীয় ক্ষতি হইল। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার অকাল মৃত্যু না হইলে তাঁহার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বে আগামী দশবৎসরে দেশের অসীম মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। যাঁহারা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র এবং ভারত শাসনতন্ত্র ভারতবর্ষের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবেন, এমন লোকই নব্যবাংলার প্রয়োজন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এমন একজন লোক ছিলেন; যতীন্দ্রমোহন এমন আর একজন লোক ছিলেন; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শেষ জীবনে যে আদর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,

গত সাত বৎসর যাবৎ যতীন্দ্রমোহন সেই ভাবুকতাপূর্ণ আদর্শই প্রচার করিতেছিলেন।"

## হাটবাজারের তথ্য

শোক প্রকাশের পর বিজয় বাবু হাটবাজার সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেন।

বিজয়বাবু তাঁহার ব্যবসা-জগতের অভিজ্ঞতামূলক অনেক নূতন এবং আবশ্যক তথ্য সভায় বিবৃত করেন। কিরূপভাবে পূর্ব্ববঙ্গের আমদানিরপ্তানির ব্যবসা বাঙ্গালীর হাত হইতে ভাটিয়া এবং মাড়োয়ারীর হাতে গিয়া পড়িতেছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়া এবং এইরূপ হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াই বিজয়বাবু ক্ষান্ত হন নাই, কি করিয়া এই ব্যবসা বাঙ্গালীর হাতে আনা যায় তিনি তাহার সন্ধানও দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী ব্যবসাজগতে এইরূপ পিছাইয়া পড়িতেছে বলিয়া বিশেষ কোন নৈরাশ্যের কারণ নাই। অনেক উচ্চ-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক ব্যবসাকে যেভাবে ধরিয়াছে তাহাতে অচিরাৎ ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালীর লুপ্ত ঐশ্বর্য্য পুনরুদ্ধার করা যাইবে।

সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের নাম এইখানে দেওয়া গেল :—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইণ্ডিয়ান আকাডেমি নিউ ইয়র্ক), ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, মণীন্দ্র-মোহন মৌলিক, সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়, বাদল গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দে, সুশীলকুমার সেনগুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়, জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গিরিজামোহন সান্যাল, অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, সুশীল ঘোষ (নিখিল বঙ্গ লাইব্রেরী সম্মেলন), কামাখ্যা বসু, প্রফুল্লকুমার দাস, চারুচন্দ্র বসু।

# সান্ধ্য-সম্মেলন

## "ইন্‌শিওর‍্যান্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ"র সম্পাদক ডাক্তার সুরেশ রায়ের উদ্যোগে

"ইন্‌শিওরেন্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ" পত্রের ম্যানেজিং এডিটর ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায় গত ২৭শে আগষ্ট (১৯৩৩) রবিবার সেণ্ট্রাল হোটেলে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ডিরেক্টর এবং গবেষকবৃন্দকে প্রীতিসম্মেলনে সম্বর্দ্ধিত করেন। বোম্বাইয়ের স্যর লালুভাই শ্যামলদাস সি-আই-ই, জে-পি এবং স্যর এস এন পোচখানাওয়ালা উক্ত সম্মেলনে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার পরিষদের উদ্দেশ্য বিবৃত করেন এবং বর্ত্তমান সময়ের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সভ্যগণ কিরূপ-ভাবে গবেষণা করিতেছেন তাহারও আভাষ প্রদান করেন। তৎপরে তিনি সভ্যগণকে স্যর লালুভাই এবং স্যর পোচখানাওয়ালার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। পরিষদের ডিরেক্টর এবং সভ্যগণকে ভারতের দুইজন কৃতী ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে আসিবার সুবিধা প্রদানের জন্য অধ্যাপক সরকার ডাক্তার সুরেশ রায়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

স্যর লালুভাই শ্যামলদাস প্রত্যুত্তরে বলেন যে, রিসার্চ্চ ফেলোদের (গবেষকদের) আংশিক ভাবে কার্য্য করিবার পরিবর্ত্তে সমগ্র সময় গবেষণায় লিপ্ত থাকা উচিত।

স্যর এস এন পোচখানাওয়ালা ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসা এবং

উহার উন্নতিকল্পে বাংলার অংশ-গ্রহণ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, শিল্প এবং বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যাহাতে বাংলার যুবকগণ সত্য-সত্যই আপনাদের যোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক পরিচালনা শিক্ষা দিলে চলিবে না, তাহাদিগকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ও বাট্টানীতি সম্বন্ধেও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান বলেন যে, রিসার্চ্চ ফেলোদের গবেষণা আন্তর্জ্জাতিক ভাব অপেক্ষা অধিকতর জাতীয়ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত।

অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস এবং ডাক্তার অমূল্য উকিলও বক্তৃতা করেন। ডাক্তার সুরেশ রায় এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সেন অতিথি-গণকে আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করেন।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

স্যর লালুভাই শ্যামলদাস, স্যর এস এন পোচখানাওয়ালা, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও তাঁহার পত্নী, সস্ত্রীক মিঃ গগনবিহারীলাল মেটা, মিসেস সুষমা সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ সুবোধ মিত্র, শ্রীযুক্ত বীরেন দাশগুপ্ত, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল, মিঃ ওয়াই বি পেটেল, শ্রীযুক্ত ডি-পি খৈতান, মিঃ এন এল পুরী, মিঃ ভি সি নানাবাতি, মিঃ অমৃতলাল ওঝা, মিঃ সি এস রঙ্গস্বামী, শ্রীযুক্ত আই বি সেন, মিঃ এ সি সেন, শ্রীযুক্ত এন এম রায় চৌধুরী, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নাগ,

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত জিতেন সেনগুপ্ত, মণি মৌলিক, সুধাকান্ত দে, পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়, বাদল গঙ্গোপাধ্যায়, মিঃ এন কে সাহা, মিঃ এন সি রায়, সুধাংশু রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পি আর গুপ্ত, শ্রীযুক্ত এস কে চৌধুরী, কাপ্তেন এস সি সেনগুপ্ত, মিঃ এইচ এন দাসগুপ্ত, মিঃ এম এন রায় চৌধুরী এবং মিঃ এন ব্যানার্জি।

# বাংলার মজুর ও শ্রেণী-সমস্যা*

শ্রীবাদল গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার জমি অতিশয় উর্ব্বরা। অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করে। এরূপ কৃষিজীবীর সংখ্যা বাংলাদেশে শতকরা নব্বই জন। বাংলাদেশের লোক-সংখ্যা গত ১৯৩১ সনের আদমসুমারীর রিপোর্ট অনুসারে ৫০,১১৪,০০০। এদের মধ্যে মাথার ঘাম পায় ফেলে গতর খাটিয়ে যাদের রুটির সংস্থান করতে হয় তাদের এবং তাদের অধীনস্থদের সংখ্যা ১৩,৭৫০,০০০ ও ৬,৬৩,০০০ অর্থাৎ কিনা এই দু'য়েতে মিলে শতকরা ২৯ জন। আর যারা কাজ না ক'রে পরের শ্রমের উপর বসে বসে খায়, সেই পরশ্রমোপজীবীদের সংখ্যা ৩৫,৬৯৯,০০০ অর্থাৎ শতকরা ৭১ জন। ১৯২১ সনে বাংলাদেশে ঐ সংখ্যাগুলি ছিল শতকরা ৩৫ ও ৬৫।

বহু পূর্ব্বেকার কথা, বাংলাদেশে তখন বহুপ্রকারের কুটীর-শিল্প ছিল। বস্ত্র, পিতল এবং কাঁসার বাসন, লৌহজাত দ্রব্যাদি বাংলায় প্রচুর পরিমাণে তৈরী হ'ত। আজও বাংলার কুটীর-শিল্প কিছু-কিছু আছে—তার মধ্যে বস্ত্র-শিল্পই প্রধান। বাংলাদেশের কুটীর-শিল্পের মধ্যে আজও যা টি*ঁকে আছে তা হচ্ছে পাটের তৈরী আসন, মাদুর, পাটি, ঢাকার শাঁখা, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে চিনি তৈরী করবার কয়েকটী কারখানাও আছে।

* ১৯৩৩ সনের ২৭শে আগষ্ট বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত। (ক্লাইভ ষ্ট্রীট পত্রিকায় প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৪০ (সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)।

তাদের কাজ বর্ত্তমানে ভালই চলছে। মাটীর খেলনা, মূর্ত্তি প্রভৃতি তৈরী করবার জন্য কৃষ্ণনগর বিখ্যাত। সারা বাংলাতে কুটীর-শিল্পে যত কারিগর কাজ করে তাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে ৯০০,০০০। এই সংখ্যাটী বড় নয়। মরুতে মরুতে এখনও বাংলার কুটীর-শিল্প বেঁচে রয়েছে এবং উপরোক্ত লোকগুলোর অন্নসংস্থানও হচ্ছে তাই থেকে। তথাকথিত শিল্পোন্নতির সাথে সাথে এই কুটীর-শিল্পগুলোকেও হয়তো পটল তুলতে হ'বে এবং তখন এই কারিগরের দল বেকার-সংখ্যা বাড়িয়ে তুলবে। সঙ্কীর্ণচেতা জাতীয়তাবাদীর দল এক মুখেই একবার বলে কুটীরশিল্পের উন্নতি করতে আবার বলে 'স্বদেশী' করে দেশে যন্ত্র-শিল্পের উন্নতিসাধন করতে। এরা একবারও চিন্তা করে দেখে না দেশকে শিল্পোন্নত করা অর্থে কি বুঝায় এবং শিল্পোন্নতি বৃটিশ-শাসিত ভারতে আদৌ সম্ভবপর কিনা। এ সব কথা ভাববার প্রয়োজন সনাতনী পুঁজিপতিরা এতটুকুও বোধ করে না।

কারখানা আইন অনুসারে ১৯৩১ সনে বাংলাদেশের মজুরের সংখ্যা ছিল ৪৮০,০০০। যেখানে ১০ জন অথবা ততোঽধিক মজুর কাজ করে তাকেই কারখানা হিসাবে ধরা হয়। উপরে যাদের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তারা খোদ মজুর। এ ছাড়া কলকারখানাতেও কাজ করে এবং অন্য-কিছু পেশাও সাথে সাথে আছে এমনধারা মজুরের সংখ্যা ১৯৩১ সনে বাংলাদেশে ছিল ১,৩৮২,০০০। এই দুইটী সংখ্যা থেকে অনায়াসে আমরা জানতে পেরেছি যে, বাংলাদেশের কুটীর-শিল্পের কারিগরদের সংখ্যা ৯০০,০০০।

## চাষী

বাংলার মজুর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলার চাষীকে একেবারে বাদ দিলে চলে না। বাংলার চাষীকে মজুর বলছি না

—কারণ তার জমি আছে। সে জমির মালিক। কিন্তু সব চাষীরই জমাজমি নেই। অধিকাংশ চাষীই অন্য চাষীর জমিতে খেটে নিজের ও পরিবারের রুটীর সংস্থান করে। এই প্রকার জমিহীন চাষীরই সংখ্যা বেশী এবং এদের চাষী বা গরীব চাষী প্রভৃতি না ব'লে আমরা এদের বল্‌বো চাষ-মজুর বা ক্ষেত-মজুর। বাংলার অধিকাংশ চাষ-মজুরই বাঙ্গালী মুসলমান। কোন জমিদার বা তালুকদারের প্রজা এরা। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে যে সামান্য দিন-মজুরি এরা কামায় তা থেকে জমিদারি খাজনা, পথকরের খাজনা, মহাজনের সুদ প্রভৃতি দিয়ে এই হতভাগ্যের দল পেট ভরে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত পর্য্যন্ত খেতে পায় না। ডাক্তার খরচ, সোনারূপা, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি সামান্য যা-কিছু হয়তো ছিল তা আস্তে আস্তে সব গিয়েছে জমিদার, তালুকদার ও মহাজনের হাতে। শুধু বাংলা কেন গোটা ভারতের চাষী ও চাষ-মজুর আজ ঋণভারে জর্জ্জরিত। অথচ এখনও আমাদের দেশে অনেক তথাকথিত পণ্ডিতপুঙ্গবের দল মজুরের বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করবার সময় শতমুখে জমিদার-শ্রেণীকে ভূয়সী প্রশংসা করে থাকেন এবং একথাও বলেন যে, এই ঋণভারটা সমৃদ্ধির লক্ষণ। যাঁরা এই রকম ধরণের উক্তি করেন তাঁরা প্রকৃত গবেষণা করেন না—গবেষণাটা তাঁদের নিকট একটা বিলাসমাত্র।

কল, কারখানা, খনি, ক্ষেত প্রভৃতি স্থানে বাংলাদেশে যারা কাজ করে, তাদের সংখ্যা ১৪,৪১৩,০০০; এরা সকলেই মজুর—যদি সাধারণভাবে ধরা যায়। মজুর অর্থে যদি তাদেরই শুধু ধরা হয় যারা ধনবানদের শৃঙ্খলদ্বারা বন্দী, যাদের হারাবার কিছুই নেই ঐ শৃঙ্খলের বন্ধন ব্যতীত, অর্থাৎ যাদের বলা হয় 'প্রলেতারিয়েত' বা সর্ব্বহারা, তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। সারা ভারতে তেমনি ধারা

মজুর অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ—৩৫ কোটী লোকের মধ্যে। এখানে যাদের নিয়ে আলোচনা করা হবে তারা খোদ মজুর বা প্রলেতারিয়েত নয়—যারা গতর খাটিয়ে কল, কারখানা, খনি, মাঠে কাজ করছে, অথচ অনেকেরই হয়তো বা কিছু-কিছু জমাজমিও আছে, তাদেরও ধরা হয়েছে।

বাংলার সব মজুর বাঙ্গালী নয়। অধিকাংশই বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ হতে আমদানি। বাঙ্গালী খুবই কম। যে সমস্ত বাঙ্গালী মজুর আজকাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কল-কারখানা প্রভৃতিতে তারা সবাই দক্ষ মজুর হয়ে কাজ করছে। রেলওয়ে কারখানা, কাপড়ের কল, পাটের কারখানা, বন্দুক ও গোলাবারুদের কারখানা, ধাতু ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা প্রভৃতিতে বাঙ্গালী মজুরের সংখ্যা বেশী এবং এরা সকলেই দক্ষ মজুর। মোট-বহার, পাট-কাটার, বা ধাঙ্গর, মেথর প্রভৃতির কাজ করতে বাঙ্গালী মজুর বড় একটা দেখাই যায় না। বাংলা দেশে বিস্তর অ-বাঙ্গালী মজুর কাজ করছে বলে অনেক বাঙ্গালী নেতা বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের ভয় যে বাংলা অ-বাঙ্গালীর হাতে চলে যাচ্ছে। বাংলাকে শুষে খাচ্ছে অ-বাঙ্গালী।

## যন্ত্র-শিল্প

সেই বহুদিন পূর্ব্বেকার বাংলার কথা ধরছি; বাংলাদেশে তখনও যন্ত্রশিল্পের প্রচলন স্থরু হয়নি। প্রলেতারিয়েত তখন জন্মগ্রহণও ক'রে নি। প্রলেতারিয়েতের জন্ম হয়েছে যন্ত্রশিল্পের সাথে সাথে। যন্ত্রশিল্পের সাথে কুটীরশিল্প পাল্লা দিয়ে উৎপাদন করতে সমর্থ হলো না। তাই কুটীর-শিল্প লোপ পেতে লাগ্‌লো ধীরে ধীরে। এমনিভাবে যন্ত্রশিল্পের জন্ম ও বৃদ্ধি শুধু বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না,

ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলাতেও তাহাই হচ্ছিলো এবং সেখান হতেও কুটীর-শিল্প উঠে যেতে লাগলো। এখানে একটা কথা বল্‌ছি যে, বাংলাদেশের মত অন্যান্য দেশে কুটীরশিল্প অতটা উন্নত ছিল না। ঐ সমস্ত প্রদেশের লোকেরা চাষবাসই করতো বেশী। সুতরাং বাংলার বাইরে থেকে যেসমস্ত মজুর আমদানি হয়েছে তারা প্রধানতঃ চাষী হলেও বাংলার মজুররা সাধারণতঃ চাষী শ্রেণী থেকে আসে নি। অবশ্য তারা এসেছে গ্রামদেশ থেকেই যেখানে চাষবাস হচ্ছে, কিন্তু পেশা ছিল তাদের কুটীর-শিল্প। এদের অধিকাংশেরই নিজেদের জমিজমা নেই, কেবলমাত্র মাথা গোঁজবার মত একটু ভিটে ছাড়া। এরা কেউ তাঁতী, কেউ কর্ম্মকার, কেউ কুম্ভকার, কারুর হয়তো ছিল চিনি কি গুড়ের ব্যবসা, কেউ চাষমজুর, কেউ মুটেমজুর, ইত্যাদি। পূর্ব্বে নানারকম কুটীর-শিল্প নিয়ে ছিল বলেই বাঙ্গালীরা প্রথমে এসেই কল বা কারখানাতে নিপুণতার সঙ্গে দক্ষ মজুরের কাজ করতে পারে। বর্ত্তমানে অবশ্য যেসমস্ত মজুর আস্‌ছে তারা বেশীর ভাগই চাষী, কেন না গ্রামে এখন কুটীর-শিল্প নেই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। ঋণগ্রস্ত হওয়ায় যেসব চাষীর জমিজমা জমিদার, তালুকদার ও মহাজন প্রভৃতির কাছে গিয়ে পড়েছে, তারাই আস্‌ছে আজ দলে দলে কল ও কারখানাতে মজুরগিরি করতে সহরে ও বন্দরে। গ্রাম থেকে আসবার সময় সহরে ও বন্দরে অনেক পয়সা রোজগার করতে পারবে এই আশা নিয়ে তারা আসে; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত একটা আবহাওয়া ও সংসর্গে এসে তাদের জীবনটা প্রথম অতিশয় ভয়াবহ হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে অনেকের সব ধাতস্থ হয় এবং অনেকে সহ্য করতে না পেরে পুনরায় গ্রামে ফিরে যায়।

বহুবিধ কারণে আজ পল্লীর শান্ত লোকগুলো দলে দলে সহরে

এসে কল ও কারখানার দরজায় ভিড় জমাচ্ছে। কেবল রুটী নয় সনাতনী পল্লীর নানাপ্রকার কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে যেসমস্ত তথাকথিত আইন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি গড়ে উঠেছে তারই অস্বাভাবিক চাপে শান্ত পল্লীবাসীরা পল্লী ত্যাগ করে সহরে আসতে বাধ্য হয়, হাজার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। যন্ত্রশিল্পের দৈনন্দিন বৃদ্ধির সাথে সাথে কুটীর-শিল্প উঠে যাওয়ায় পল্লীবাসী হয়ে পড়ে বেকার। আর্থিক চাপে পড়ে পরিবারের রুটী যোগাড় করবার জন্য তারা পথ খুঁজে পায় না। যারা অস্পৃশ্য তাদের পল্লী-সমাজে কোন স্থান নেই। সামাজিক কোন ব্যাপারে তারা যোগদান করতে পারে না। স্পৃশ্য যারা তারা এদের কুকুর বিড়ালের মত ঘৃণা করে। পল্লীর নৈতিক আইন-কানুন এত সঙ্কীর্ণ যে, এই অস্পৃশ্যদের সেথায় লাঞ্ছনার আর সীমা নেই। তাই এরা সহরে পালিয়ে বাঁচে। কিন্তু সহরে এসেও এরা সহরকে আপনার করে নিতে পারে না—দেশের তরে প্রাণ এদের ছটফট করে। সুযোগ পেলেই পল্লী অভিমুখে ছোটে। সুতরাং পাশ্চাত্যের ন্যায় আজও বাংলা বা ভারতে পল্লীত্যাগী পুরোপুরি সহুরে মজুরশ্রেণী তেমন পরিষ্কারভাবে এ পর্য্যন্ত গড়ে ওঠেনি।

বাংলার মজুর বাঙ্গালী কি অ-বাঙ্গালী সে প্রশ্ন নিয়ে মাতামাতি করবার কোন তাৎপর্য্য আছে বলে আমার মনে হয় না। দেশে হিন্দু-মুসলমান একটা সাম্প্রদায়িক সমস্যা আনয়ন করেছে মুসলমান মোল্লা এবং হিন্দু পুরুতের দল। তেমনি তথাকথিত জাতীয়তাবাদীর দল বাঙ্গালী, অ-বাঙ্গালী, বোম্বাই, অ-বোম্বাই, "হরিজন" ( অস্পৃশ্য ) স্পৃশ্য প্রভৃতি সর্ব্বনেশে বুলির আমদানি করে আমাদের সমাজটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে বিভাগ করে ফেল্‌ছে নিজেদের স্বার্থ অটুট রাখবার জন্য। আমরা তাই ওদের সুরে সুর মিলিয়ে ওদের সাথে অগ্রসর হতে পারবো না। আমরা দেখ্‌ছি সমাজ দুইভাগে

বিভক্ত—একদিকে মজুরশ্রেণী (শোষিত) অপরদিকে ধনিক শ্রেণী শোষক।

## মজুরদের কর্ম্মকেন্দ্র

বাংলাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মজুর কাজ করে রেলওয়ে ও পাটের কল এবং কারখানাগুলোতে। সারা ভারতের ৯৪টী পাটের কলের মধ্যে ৫০টীই বাংলাদেশে অবস্থিত। এই কলগুলিতে প্রায় ৪ লক্ষ মজুর কাজ করতে পারে; কিন্তু এদের মধ্যে আজ প্রায় অর্দ্ধেক বেকার। কেননা এখানে কলওয়ালারা ধনতান্ত্রিক প্রণালীতে কলকারখানা চালায় বলে অনেক মজুর কাজ থেকে জবাব পেয়েছে। অধিকাংশ পাটের কলগুলোই ইয়োরোপীয়দের হাতে। কতকটা মাড়োয়ারীদের। বাংলার একটা পাটকলে বোম্বাইয়ের কাপড়কল অপেক্ষা তিনগুণ অধিক মজুর কাজ করে। যে সমস্ত মজুর পাটকলে কাজ করে তারা হপ্তা হিসাবে মজুরি পায়। মিলে এদের দু'রকমের কাজ করতে হয়—"মাল্‌টিপ্‌ল্‌ শিফ্‌ট" ও "সিঙ্গ্‌ল্‌ শিফ্‌ট"। প্রথমটায় কাজ চলে একাধিক ক্ষেপে; দ্বিতীয়টায় এক ক্ষেপে। কখনো কখনো হপ্তা হয় পাঁচদিনে কখনো চারদিনে। আইনতঃ হপ্তায় ওদের খাটা উচিত ৫০ থেকে ৬৬ ঘণ্টা; কিন্তু অনেক সময় এরও অধিক ওদের খাটান হয় বিনা মজুরিতে পাটকলে ও চটকলে; অনেক রকমের কাজ এবং সেই ভাবেই মজুরি দেওয়া হয়। চারদিনে হপ্তা হলে ওরা মজুরি পায় ৮ টাকা ২ আনা ৯ পাই থেকে ২ টাকা ১২ আনা ৯ পাই পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে—যেমন চট্‌ বুনট্‌, হেসিয়ান বুনট্‌, চট্‌ জড়ানো, হেসিয়ান জড়ানো ইত্যাদি। যখন ৫ দিনে হপ্তা হয় তখন ওদের ৯৷৷০ থেকে ৩৷৷/৯ পর্য্যন্ত হপ্তায় দেওয়া হয়। এগুলো সব মাল্‌টিপ্‌ল শিফ্‌টের মজুরি। সিঙ্গ্‌ল শিফ্‌টের মজুরি ৯৷৷০ থেকে

৪।৴৩ পর্য্যন্ত। এখানে সাড়ে পাঁচদিনে হপ্তা ধরা হয়। উপরোক্ত মজুরির তালিকা দেখে মনে হয় ওদের রোজগার ভালই ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কোন মজুরই পুরোপুরি টাকা পায় না। জরিমানা, সর্দ্দার ও উপরওয়ালা বাবুদের ঘুষ দিয়ে ওদের মাসে ৫৲ থেকে ১২৲ টাকার বেশী বড় একটা থাকে না। মিলকর্ত্তাদের নানারকমের জুলুম। চট্ বুনছে, মিল মালিক এসে বল্লেন "কিছুই হয়নি—খুলে ফেলে আবার নতুন করে বোন" ইত্যাদি। এই ক'রে এমন দিনও যায় যে, সমস্ত দিন খেটেও ওরা কিছুই পায় না।

যাতে এমনিধারা জুলুম না হ'তে পারে, মজুরেরা যাতে বেশী না খাটে, সেজন্য সরকারী কর্ম্মচারী রয়েছে। এদের সংখ্যা সারা বাংলার জন্য ১৯২৯ সনে ছিল—প্রধান ইন্স্পেক্টর ১ জন, ইন্স্পেক্টর ২ জন। ১৯২৯ সন হতে তাদের সংখ্যা হয়েছে প্রধান ইন্স্পেক্টর ১ জন, ইন্স্পেক্টর ৬ জন, সহকারী ইন্স্পেক্টর ৩ জন। এতগুলো কলকারখানাতে সব সময় কি প্রকারের বে-আইনী জুলুম মজুরদের উপর হচ্ছে তার বিশেষ খোঁজখবর রাখবার পক্ষে এই কয়েকটী কর্ম্মচারী যথেষ্ট বলে মনে হয় না।

রেলওয়ে মজুরদের সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় আমরা ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ধাতুশিল্পের মজুরদের কথাও বল্‌বো। বাংলাতে খড়্গপুর, লিলুয়া, কাঁচড়াপাড়াতেই রেলের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারখানা। এখানে লক্ষাধিক মজুর কাজ করে, কারখানাতে যে সমস্ত কাজে বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রয়োজন সেই সমস্ত কাজে প্রচুর বাঙ্গালী দেখা যায়। যারা কারখানাতে কাজ করে তাদের মজুরি ১২৲ টাকা থেকে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। কুলীরা অর্থাৎ লাইনের কুলীরা ১০৲ টাকা থেকে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত পায়। আমরা কেরাণী, ষ্টেশন্ মাষ্টার প্রভৃতির কথা ধরছি না। বাংলাদেশে ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুশিল্পের

কারখানা ১৩৫টী এবং এখানে সর্ব্বসমেত ৮,০৫,০০০ হাজার মজুর কাজ করে। এদের মধ্যেও আজ অনেক বেকার বসে আছে যদিও সকলেরই কাজ পাওয়া উচিত।

কাপড় কল ও সূতা কলের সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৩টী। আরও অনেক কলের নাম শুন্‌তে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সেগুলো এখনো কাজ সুরু করেনি। এই ১৫টী কলে ১৬,০০০ এর উপরে মজুর কাজ করে। যন্ত্রশিল্প আজও বাংলাতে তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি। বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং সোলাপুরে যন্ত্রশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। বাংলাতে কাপড় ও সূতাকলে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় প্রকার মজুরই কাজ করে। এদের বেতন যুক্তপ্রদেশ অপেক্ষা কিছু বেশী, কিন্তু বোম্বাই, আমেদাবাদ ও সোলাপুরের তুলনায় অনেক কম। এখানে মেয়ে মজুর ও পুরুষ মজুরের মাসিক বেতন যথাক্রমে ২৫৲ টাকা ও ৩৫৲ টাকা। কিন্তু বাস্তবিকই উপরিউক্ত বেতন তারা পায় না। এখানেও সেই সর্দ্দারের ঘুষ এবং মিল মালিকের ঘুষ, জরিমানা ইত্যাদি জুলুম এদের সর্ব্বস্বান্ত করে দিচ্ছে।

বাংলার খনিজ শিল্পের কথা বল্‌তে কয়লার খনিই বুঝায়। আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে ২০৮টী খনি দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো সব কয়লার। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের আরও ৮টী খনি আছে। সেগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। কলিকাতার ২৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো বলে স্থানগুলি থেকে ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ কয়লা উৎপন্ন হয়। এই জায়গাগুলো কয়লার খনির জন্য প্রসিদ্ধ। রাণীগঞ্জের বেশী অংশটাই বাংলার মধ্যে। এখানে সর্ব্বসমেত ৪৪,৩০৩ মজুর কাজ করে। খাদের নীচে যারা কাজ করে তাদের সংখ্যা ২৯,৪৯৭। এগুলো সব কয়লার খনিতে কাজ করে এবং এছাড়া বাকী ৮টী খনিতে ৮৭৪ জন মজুর কাজ করে। এখানে

খাদের নীচে কোন কাজ নেই। পুরুষ ও মেয়ে উভয় প্রকার মজুরই খনিতে কাজ করে। এখানে মজুররা সবাই কোল, ভীল ও সাঁওতাল—সব অসভ্য পাহাড়ে। ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা এরা খাটে। মজুরির হার অত্যন্ত কম। নানাপ্রকার বিষাক্ত গ্যাসের দরুণ খাদের নীচে যাওয়া ভয়ানক বিপজ্জনক। এমনি ধারা কাজের জন্য কোন বিশেষ মজুরি দেওয়া হয় না। এখানে তিন রকমের কাজ। কয়লা কাটা, বালতীতে ভর্ত্তি করা, এবং সেগুলো যথাস্থানে বয়ে নিয়ে যাওয়া। এসব কাজের জন্য পুরুষেরা দৈনিক ॥০ থেকে ॥৶০ আনা এবং মেয়েরা ।৵০ আনা থেকে ।৶০ আনা পায়। মজুরি টন হিসাবে দেওয়া হয়। প্রতি টনে পুরুষেরা পায় ।৵০ আনা এবং মেয়েরা ৵০ আনা থেকে ।০ আনা। কখনো কখনো টনে ৴০ মাত্র দেওয়া হয়। দৈনিক দু'টনের বেশী কাজ করা যায় না। সুতরাং তাদের উপার্জ্জনটা কত তা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বাংলা দেশে চা-বাগান ২৭৮টী। দার্জ্জিলিং ও টিরাই অঞ্চলের বাগানগুলিতে ৬৬,০০০ লোক কাজ করে। ডুয়ার অঞ্চলে যত মজুর কাজ করে তাদের সংখ্যা ১,২৬,০০০। জলপাইগুড়ি ও চট্টগ্রামে চা-মজুরের সংখ্যা ১,২৫,৬৩২ ও ৫,৭৪৫। এখানে যেসমস্ত মজুর কাজ করে তাদের অধিকাংশই নেপালী। সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিম বর্ব্বরজাতীয় মজুরও এখানে কাজ করবার জন্য আমদানি করা হয়। মেয়ে, পুরুষ ও বালক সব রকম মজুরই এখানে আছে। মজুরির হার মাসিক পুরুষদের ১৩৲, মেয়েদের ১১৲ এবং বালকদের ৭৲ টাকা। এই মজুরি ওরা পুরোপুরি পায় না। এখানেও সর্দ্দারের ঘুষ, মালিকের জুলুম, জরিমানা প্রভৃতি ব্যাপারগুলো রয়েছে।

বাংলাদেশে আর এক রকমের মজুর আছে। তারা কাজ করে

ট্রাম ও বাসে। ট্রাম বাংলাদেশে কলিকাতা সহরে ব্যতীত আর কোথাও নেই। ট্রাম, বাস, মোটরগাড়ী, ট্যাক্সী প্রভৃতিতে কলিকাতা সহরে সর্ব্বসমেত ৩৩,৯০০ লোক খাটবার জন্য প্রস্তুত। এদের মধ্যে অনেক বেকার। ট্রামের ড্রাইভার ও কন্‌ডাক্‌টারের মজুরি সমান। বাসে ড্রাইভারদের মাইনে বেশী, আর কন্‌ডাক্‌টারদের কম। এরা প্রায় ১০ ঘণ্টা খাটে ট্রামে। বাসে তারও বেশী। ট্রামে যদিও খাটবার ঘণ্টা সম্বন্ধে কিছু আইনকানুন আছে, বাসে তা নেই। অথচ লাইসেন্স দেবার সময় যত ইচ্ছা দিয়েই যাচ্ছে। সর্ব্বসমেত সরকার বাহাদুর ড্রাইভার কন্‌ডাক্‌টার প্রভৃতির লাইসেন্স ইস্যু করেছেন ৩৪,১৮৭ খানা; কিন্তু প্রয়োজন মাত্র ২৭,৮৭১ জন লোকের। এদের উপার্জ্জনের অধিকাংশই যায় পুলিসের সাথে মোকদ্দমা করে জরিমানা দিয়ে। বাসে কন্‌ডাক্‌টাররা দৈনিক ১৲ পায় এবং ড্রাইভাররা ১৷৵০ থেকে ২ টাকা। ট্রামে উভয়েই পায় ১৲ টাকা।

কলিকাতা একটী বৃহৎ বন্দর। সুতরাং এই বন্দরেও বহু লোক কাজ করে। এ-ছাড়া নাবিক, সারেঙ্গ, প্রভৃতি যারা সমুদ্রগামী জাহাজে কাজ করে তারা অধিকাংশই বাঙ্গালী মুসলমান। তারা আসে সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী অঞ্চল থেকে। এটা ওদের একচেটিয়া ব্যবসা। এরা এই কাজে অতিশয় পাকা। যথেষ্ট লোক এখানে কাজ করে। এদের বেতন ২৫৲ থেকে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

বাংলাদেশে ৩১২টী ধানের কল আছে। এখানে মেয়ে-মজুরের সংখ্যা বেশী। প্রায় ৩৫,০০০ হাজার মজুর এইসব কলগুলোতে কাজ করে। কলিকাতায় টালীগঞ্জে ৬৯টী ধান কল আছে। এখানে ১৫,০০০ মজুর। ধানকলে যারা কাজ করে তাদের দৈনিক মজুরি

।০ আনা থেকে ।৶০ মাত্র। এত কম মজুরি পায় বলে টালীগঞ্জের মজুরেরা কিছুদিন পূর্ব্বে মজুরি বাড়াবার জন্য ষ্ট্রাইক করেছিল।

নিম্নে অন্যান্য কতকগুলো শিল্প, যা বাংলাতে গড়ে উঠেছে, তার একটী তালিকা দেওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কত মজুর সেখানে খাটে তাও দেওয়া গেল।—

| কল | সংখ্যা | মজুর-সংখ্যা |
|---|---|---|
| হোসিয়ারী | ১৫ | জানা যায় না |
| দেশলাই | ১৩ | ৬০০০ |
| তেল | ৫৯ | ৩০০০ |
| কাগজ | ৩ | ৪০০০ |
| কাচ | ৬ | ৬০০ |
| সাবান | ৪০ | জানা যায় না |
| চিনি | ৫ | ,, |
| হাড়ের কল | ৩ | ,, |
| গম | ৭ | ,, |

## মজুর-সঙ্ঘ

যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে যখন 'প্রলেতারিয়েত' বা মজুর-শ্রেণীর জন্ম হয় তখন ভারতে ট্রেড্ ইউনিয়ন মজুর-সঙ্ঘ আন্দোলন সুরু হয় প্রথম বোম্বাই সহরে। বোম্বাইতে একটা মিল হ্যাণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন তৈরী হয় কল ও কারখানার মজুরদের দাবী-দাওয়ার জন্য লড়াই করতে। তারপর ১৯২০ সনে নিখিল-ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়। ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত ৮৭টী রেজেষ্টারী করা ইউনিয়ন ছিল এবং তাতে মজুর মেম্বারের সংখ্যা ছিল ১৮৩,০০০। মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে যারা মজুর আন্দোলন চালায়

মজুরশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণার্থ তাদের মধ্যে দু'টী দল আছে; একদল কমিউনিষ্ট, যাঁরা শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করেন এবং মজুরের বন্ধু ও নেতা। অপর দল শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করেন। তাঁরা মজুর ও ধনিকের মধ্যে যখন সংগ্রাম বাধে সেটাকে আপোষে মিটিয়ে দিতে চান। এরা ধনিক শ্রেণীর দালাল। অনেক কংগ্রেসী ও স্বরাজী নেতাও আজ মজুর-বন্ধু সেজেছেন। তারা মজুরপার্টির সৃষ্টি করেছেন মজুরশ্রেণীর মাথার উপর কাঁটাল ভাঙ্গতে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কাউন্সিলে শ্রমিকদের জন্য যে ৮টা স্থান দেওয়া হয়েছে তা অধিকার করা। সুতরাং বাংলার মজুর-আন্দোলনে এই বিভিন্ন প্রকারের লোক আছে। এক কমিউনিষ্টরা ব্যতীত কেউ মজুরের বন্ধু হতে পারে না। যারা মজুর পার্টি সৃষ্টি করেছে তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীন ভারতে ইংলণ্ডের লেবারপার্টির মত একটী পার্টিদ্বারা ভারতকে শাসন করা। তাহলে ভারতের মজুরদের যে কি অবস্থা হবে তা ইংলণ্ডের মজুরের দিকে তাকালেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তথাকথিত মজুর-নেতাদের কাছ থেকে মজুরদের অনেক দূরে পড়ে থাকতে হবে। বাংলাদেশে এই ধরণের একটী 'লেবার পার্টি' হয়েছে তথাকথিত মজুর-প্রেমিকদের নিয়ে।

বাংলাদেশে রেজেষ্টারী-করা ইউনিয়নের সংখ্যা ৪০টী থেকে ৫০টী পর্য্যন্ত। এই ইউনিয়নগুলির অধিকাংশই বাবু ইউনিয়ন এবং মালিকদের ইউনিয়ন। প্রকৃত মজুরদের রেজেষ্টারীকৃত ইউনিয়ন বাংলাদেশে খুবই কম।

## শিল্পোন্নতি

শিল্পোন্নতি অর্থে যা বুঝায় বাংলাদেশে বা ভারতে তা হতে পারে না। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা বাংলা বা ভারতকে শিল্পোন্নত করতে

পারে না। ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল নিয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা নানা প্রকার জিনিষপত্র তৈরী করে ভারতের বাজারে বিক্রী করার জন্য ভারতবর্ষকে বাজার হিসাবে রাখা হয়েছে। অধিকন্তু ভারতীয় বা বাংলার তথাকথিত বুর্জ্জোয়াশ্রেণী অতিশয় সনাতনী। শিল্প-বিপ্লবের জন্য তারা আদৌ প্রস্তুত নয়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয়তার ভাঁওতা ঝেড়ে ভারতের গণশ্রেণীকে সর্ব্বতোভাবে শোষণ করে নিজেদের পয়সার থলে ভারি করা।

যথার্থরূপ শিল্পোন্নতি না হ'লেও তার জন্য কাঁচা মালের সঙ্গে সঙ্গে 'কাঁচা' মানুষের অভাব হচ্ছে না, যাদের ঘরে খাবার নেই, কুটীর-শিল্প ধ্বংস হওয়ার দরুণ যাদের রুটী গেছে, কৃষিকার্য্য পাওয়াও যাদের অসম্ভব—কেননা আপ্রাণ পরিশ্রম করেও সেখানে কিছু মিলে না, লোকের সেথায় আজ আর প্রয়োজন নেই,—এত কমে গেছে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য যে চাষী পর্য্যন্ত আজ আর চাষ করতে চাইছে না—অথচ দৈহিক শ্রম বেচে খাওয়া ছাড়া এদের এখন গত্যন্তর না থাকাতে এরা সব হয়ে পড়েছে বেকার। শিল্প-বাণিজ্যের কর্ণধারগণ তারস্বরে বলছে আরও শিল্পোন্নতি করে কলকারখানা বাড়ালে এমনি ধারা ভয়াবহ বেকার-সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি শিল্পোন্নতির সাথে সাথে বেকার-সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এ রকম কেবল বাংলাতে নয়, সারা দুনিয়া জুড়ে হু হু করে বেকার-সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। যারা খোদ-মজুর তাদের খাঁটি বেকার সংখ্যা জানা যায় না—সে সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্তও কোন সংখ্যাতালিকা তৈরী হয়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার, মজুর শ্রেণীর বেকার এবং আরও যাবতীয় বেকারদের জড়িয়ে বাংলার বেকারদের যে সংখ্যা গণনা করা হয়েছে সেই অনুসারে বাংলার সংখ্যা ৮৫ লক্ষ। এই বেকারদের মধ্যে অনেকের কাজ করতে করতে কাজ গেছে এবং

অনেকে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কাজ পাচ্ছে না। যাই হোক ধনতান্ত্রিক প্রণালীতে শিল্প-বাণিজ্যের বৃদ্ধির সাথে সাথেই এই অতিরিক্ত শ্রমিক-বাহিনীর সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং এদের আমরা বেকারই বলবো।

ধরা যাক্ শিল্প বাণিজ্যের বাংলাদেশে আকস্মিক সম্প্রসারণ হলো এবং এই অতিরিক্ত শ্রমিক-বাহিনীর কিয়দংশ কাজও পেলো। এমন কি ধরা যাক্, সমস্ত বেকার শ্রমিকই কাজ পেলো অনেকগুলো কল-কারখানার নতুন সৃষ্টি হওয়াতে। বাংলা শিল্প-বাণিজ্যে ইংল্যণ্ড বা জার্ম্মাণি, আমেরিকার মতো উন্নত হলো ( যদিও কতকগুলি কারণে বর্ত্তমানে তা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ) তথাপি শ্রমিককুলের বেকার-সমস্যা তথা দারিদ্র্য-সমস্যার সামাধান হবে না। ধনতান্ত্রিক প্রণালীতে শিল্প-বাণিজ্য চলার দরুণ ইংল্যণ্ড ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোতে যেমন বেকারের সংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাংলাদেশ সেই প্রণালীর উপর ভিত্তি করে যখন শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির প্রয়াস পাবে তখন এদেশও এই বেকার-সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে না। ধনতান্ত্রিক প্রণালীতে উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে প্রাচুর্য্য ও দারিদ্র্যের চরম অবস্থা। এই প্রণালীতে উৎপাদনের মধ্যে এই যে অসামঞ্জস্য—অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে উৎপাদন কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক সেই উৎপাদনের ফলভোগ—যদি দূর করা না যায়,—সমষ্টিগতভাবে উৎপাদনের সাথে সাথে সমভাবে সেই উৎপাদন-ফলকে বণ্টন করে দিয়ে—তাহলে কোনদিনও মজুর-শ্রেণীর যাবতীয় দুঃখ, দারিদ্র্য, শোষণ ও লাঞ্ছনার অবসান হতে পারে না। যে প্রণালীতে আজ উৎপাদন ও বণ্টন চল্‌ছে তার আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে নূতন প্রণালীতে।

বাংলাদেশে শ্রমিক-কুলের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবধি নেই। তারা কাপড় তৈরী করে, পরণে তাদের কাপড় নেই ; তারা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত

করে, তাদের আহার্য্য নেই; তারা বড় বড় দালান কোঠা, অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, তাদের বাসস্থান নেই। রাস্তায়, গলিতে, ফুটপাথে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কেঁপে তারা দিনরাত কাটায়। বাংলাদেশে যেগুলো মজুরদের বস্তি তার দৃশ্য যে কি ভয়াবহ তা নিজের চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। ছোট ছোট আস্তানা —আলো বাতাস কোন দিনও সেথায় প্রবেশ করতে পারে না। সর্ব্বদাই স্যাঁৎসেঁতে ভিজে। গরুর ঘর, ঘোড়ার আস্তাবল, শূকরের খোঁয়াড় পর্য্যন্ত এই বস্তিগুলো অপেক্ষা শতগুণে ভাল। সেখানে তবু মানুষ থাকতে পারে, কিন্তু এখানে মানুষ থাকতে পারে না। একটা আস্তানা তার মধ্যে ৫ থেকে ১০ জন লোক থাকে। ভিতরে একটুকুও স্থান নেই। লোক সেখানে হাঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু ওদের ওখানে না থেকে উপায় নেই। একটা বস্তি যেখানে ২০০ থেকে ৫০০ লোক থাকে সেখানে একটা মাত্র জলের কল। জলের ভয়ানক অভাব। এই বস্তিগুলোতে একবার যদি কলেরা বা বসন্ত একজনের হয় তাহলে অনতিকাল মধ্যে দেখতে দেখতে বস্তিকে বস্তি উজাড় হয়ে যায়। পোড়াবার বা কবর দেবার জন্য লোক থাকে না। তারপর যা ওদের আয় তা থেকে চিকিৎসা করান সম্ভবপর নয়। বিনাপথ্যে, বিনা চিকিৎসায় এরা একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পয়সার অভাবে এরা শিক্ষা-লাভ করতে পারে না, এবং শিক্ষার অভাবে এরা অন্ধ হয়ে আছে। এমনি ধারা শোচনীয় অবস্থাতে বাস করছে বাংলার মজুর।

বাংলা দেশের জনবৃন্দের এই শোচনীয় অবস্থার সমাধান কেমন করে হতে পারে, সে প্রশ্ন বহু বৎসর ধরে আজ পর্য্যন্ত অনেকবারই উঠেছে, কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা এখন পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি। এই উপলক্ষে সভাসমিতি যথেষ্ট হয়েছে, প্ল্যানেরও ত্রুটি নেই। বলা বাহুল্য, গলাবাজি যথেষ্ট হয়ে থাকলেও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিলাভ তো

ঘটেই নাই, উপরন্তু গত তিন চার বৎসর ধরে অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেশের মনীষীরা আবার ভাব্ছেন, কিসে এর সমাধান হতে পারে।

## স্বদেশী আন্দোলন

এ প্রশ্ন কবে প্রথম উঠেছিল জানি না, তবে যেদিন প্রথম এর সমাধানের চেষ্টা হয় বাংলার ইতিহাসের পাঠকদের তা অজানা নেই। স্বদেশী কারখানা তৈরী কর্তে হবে, স্বদেশী শিল্পের উন্নতি-সাধন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—এ বুলি কাহারও শুন্তে বাকী নেই। চল্তি শতাব্দীর সুরু হতে আজ পর্য্যন্ত কারণে-অকারণে সর্ব্বত্রই আমরা ও কথাগুলি নিরন্তর শুনে আস্ছি। যাঁরা "স্বদেশী" করে ১৯০৫ সন হতে গলা ফাটিয়ে যাচ্ছেন তাদের অভিমত এই যে, যেসব পণ্য বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আমদানি হয়, সেসকল জিনিষ আমরা যদি নিজেরাই তৈরী কর্তে পারি তবে বহু টাকা সমুদ্র পাড়ি না দিয়ে এ দেশেই থেকে যাবে, সুতরাং দেশ সমৃদ্ধ হবে। ১৯০৫ সন হতে জনমত চিরদিন সাধ্যমত স্বদেশী সমর্থন করে এসেছে। পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমান কালের মধ্যে অনেকগুলি স্বদেশী-শিল্পও গড়ে উঠেছে, দেশী কোম্পানীগুলি অংশীদারদের মোটা লভ্যাংশও দিয়েছে। যে পরিমাণ অর্থ এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি না থাক্লে বিদেশে চলে যেত—তা দেশেই রয়ে যাচ্ছে। সুতরাং 'স্বদেশী' মতবাদ অনুযায়ী লোকের অবস্থা কতক পরিমাণে ভালই হয়েছে, ধরে নিতে হবে। বৎসরের পর বৎসর ধরে কত নবনব শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্বদেশী ধনিকদের অর্থে স্থাপিত ও পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু জনসাধারণের দারিদ্র্য তো এতটুকু কম্ল না। ভারতবর্ষে ইন্ডাষ্ট্রিগুলির সম্যক পরিপুষ্টি-লাভ হয় নি, এর এখনও শিশুকাল, এ কথা মানি; এদের দ্রুতগতিতে

পুষ্ট হওয়ার যে একান্ত প্রয়োজন তা-ও বুঝি। কিন্তু পূর্ব্বে ভারতবাসীদের নিজেদের যতগুলি কল-কারখানা ছিল এখন যখন তা তদপেক্ষা বৃদ্ধিলাভ করেছে, তখন বোধ হয় একথা ভাবা অযৌক্তিক হবে না যে, ভারতবর্ষের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা পরিপূর্ণভাবে না হলেও পূর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছল হয়েছে।

কিন্তু তা হয় নি। পূর্ব্বে ইহা বোঝা শক্ত হলেও ১৯৩০ সন হতে যে সঙ্কটের ভিতর দিয়ে এখনও আমরা চলে আস্‌ছি তা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হওয়া তো দূরের কথা—আরও বহুগুণ মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি এক শ্রেণীর লোক গাইতে সুরু করেছেন যে, বাংলার জনসাধারণের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ হচ্ছে অবাঙ্গালী ভারতবাসী কর্ত্তৃক বাংলার কল-কারখানা, ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রভৃতির পরিচালনা। তাই 'স্বদেশী' জিনিষ ব্যবহার করা সত্ত্বেও বাংলার অর্থ বাঙ্গালীর হাতে থাকে না। বাঙ্গালীর দুর্দ্দশার সীমা নেই। বাংলার টাকায় বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা ফেঁপে উঠ্‌ছে, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা অঙ্কপাত হচ্ছে, বাঙ্গালী যেমন, তেমনই আছে। কল-কারখানা, ব্যবসা, বাণিজ্য বাঙ্গালীর হাতে এলেই তার সকল দুঃখের অবসান হবে। যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁরা কি জানেন না যে, বোম্বাই, আমেদাবাদ বা মাড়োয়ার সকল স্থানেই জনসাধারণ অর্থাৎ হাজার করা নয় শত নিরানব্বুই জন লোক আজও যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে? বোম্বাইয়ের শত শত প্রসিদ্ধ ধনীর বাসভবনের কয়েক মাইলের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দুর্গন্ধপূর্ণ নোংরা চালাতে কোনও প্রকারে কায়ক্লেশে বাংলার শ্রমিকদেরই মত জীবন অতিবাহিত করছে। কৃষকদের অবস্থাও ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই কম-বেশী একই প্রকার ভারাক্রান্ত। ইয়োরোপের নিকট তো বোম্বাইয়ের কল-

কারখানা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। সেখানে বোম্বাই, বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক কথা নেই। প্রায় সকল দেশেই নিজ নিজ 'স্বদেশী' ধনিকগণ তাঁদের স্বদেশে বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক প্রণালীতে উৎপাদন করবার ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। যাঁরা আজ 'বাংলা বাঙ্গালীর জন্য' এই ধুয়া তুলেছেন তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বাঙ্গালী কলওয়ালা, ব্যবসায়ী এবং বাঙ্গালী ব্যাঙ্কারের প্রচুর পরিমাণে আবির্ভাব হলেই বাংলার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে। সুতরাং যেসকল দেশে এগুলি সেই দেশবাসী লোকের হাতে রয়েছে সে সকল দেশের কথাই দেখা যাক।

## দারিদ্র্য ও বেকার

ইংলণ্ডে বর্ত্তমান যন্ত্রশিল্পের প্রথম উদ্ভব হয়েছে এবং সেখানকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অধিকারী প্রায় সকলেই ইংরেজ। শিল্পজাত প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই ইংরেজ ক্রেতা তাহার 'স্বদেশী' কারখানা থেকে কেনে। ইংলণ্ডের টাকা এইরূপে ইংলণ্ডেই থেকে যায়, উপরন্তু বিদেশে মাল রপ্তানি করেও ইংরেজ কলওয়ালা ও বণিকগণ প্রতিবৎসর বহু টাকা বিদেশ হতে ঘরে আনে। একদিন ছিল যখন ইংলণ্ড সারা পৃথিবীর কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; এমন স্থান ধরাপৃষ্ঠে ছিল না যেখানে ইংলণ্ডে তৈরী মাল ব্যবহৃত না হত। গৃহের অভাব মিটিয়ে বাইরের বাজারে মাল কাটতি করবার জন্যই বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। দেশ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যালাইজড্‌ হলেই যদি দেশের অর্থাৎ জনসাধারণের অবস্থা ভাল হত তবে ইংলণ্ডে দরিদ্র বা বেকার কেহ না থাকাই উচিত ছিল। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে পর্ব্বতপ্রমাণ অর্থ ইংলণ্ডে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে,

সে দেশ থেকে অভাব শব্দটি বোধ হয় চিরতরেই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। অথচ দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সহিত যাঁরা পরিচয় রাখেন অন্ততঃ তাঁরা সকলেই জানেন, ইংলণ্ডের বেকার-সমস্যা কিরূপ জটিল অবস্থা ধারণ করেছে। স্বজাতীয় পুলিসের সঙ্গে ইংরেজ শ্রমিকের সংঘর্ষের ব্যাপার বিরল নয়। একমাত্র পুলিস, ফৌজ প্রভৃতি দ্বারাই স্বাধীন ইংলণ্ডের 'স্বাধীন' শ্রমিকদের মাথা ঠাণ্ডা করে রাখ্‌তে হচ্ছে। অথচ বৃটিশ সাম্রাজ্যে তো সূর্য্য অস্ত যায় না। তারপর ধরুন ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কথা। এরা সকলেই অনেক পরে ধনতান্ত্রিক প্রণালীতে উৎপাদন সুরু করলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইংলণ্ডের সমকক্ষ তো হয়েইছে, অনেকক্ষেত্রে ইংলণ্ডকে পরাজিতও করেছে। নিতান্ত শিশুরাও আমেরিকা বল্‌তে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবেরদের দেশই বোঝে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত অর্থশালী পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ হয় নাই। কিন্তু আমেরিকায় কতজন কোটিপতি আছে, কতগুলি আকাশস্পর্শী প্রাসাদ আছে প্রভৃতি তথ্য ছাড়া অন্যান্য খবরও যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন যে, কি ঘৃণিত দারিদ্র্যই না সেখানে নিয়ত জনগণকে নিষ্পেষিত করছে। বেকারের দল সেখানে প্রত্যহই এত অধিক বাড়্‌ছে যে, তা সহসা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। আমেরিকার সর্ব্বত্র 'স্বদেশী' সৈনিকদলকে ধনিকগণ 'শ্রমিক দমনে' নিযুক্ত করেছে এবং আজও করছে। এরূপ অবস্থা শুধু ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর সকল ধনতান্ত্রিক "স্বাধীন" দেশেই চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

## শ্রেণী-সংগ্রাম

আজ শ্রমিক-আন্দোলন বিপ্লবী ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনা হারে দারিদ্র্যে ও শোষণে নিষ্পেষিত ও শোষিত

হয়ে বুভুক্ষু নরনারী আজ দেখ্ছে বর্ত্তমান সমাজ কোনদিনই তাদের অন্ন-সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজের ধুরন্ধরগণ আবার গবেষণা করতে সুরু করেছেন কি উপায়ে এই বিপ্লবী গণআন্দোলনকে থামিয়ে রাখতে পারা যায়। জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক কোটীপতিদের কনফারেন্স বসছে, দেশে দেশে 'স্বদেশী' লক্ষপতিদের পরামর্শ হচ্ছে, বক্তৃতার ত্রুটি নেই, প্ল্যানেরও বৈচিত্র্যের সীমা নেই, কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং। আজ তাই নতুন উপায়ে ক্ষুধাতুরগণকে বিপথে চালনা করবার চেষ্টা হচ্ছে, ঘুণধরা তথাকথিত জাতীয়তাবাদকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা চলছে। দারিদ্র্য যে বর্ত্তমান সমাজ-প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী ফল সে তথ্য চাপা দেবার জন্য জাতীয়তাবাদী ধনিকশ্রেণীর চিন্তার অবধি নেই। স্বদেশপ্রেমের ভাঁওতাতে জনগণ আর ভুলছে না। ইহারই ফলে ইটালী ও জার্ম্মাণিতে ফাসিজ্‌ম্ অথবা উগ্র জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ নিবাদী হুকুমতের জন্ম।

'বাংলা বাঙ্গালীর জন্য', বোম্বাই বোম্বেওয়ালার জন্য', 'পাঞ্জাব পাঞ্জাবীদের জন্য' প্রভৃতি শূন্যগর্ভ বুলি যে শ্রেণীর মনোবৃত্তি-প্রসূত, 'জার্ম্মাণি খাঁটি আর্য্যবংশ-সম্ভূত জার্ম্মাণদের জন্য' শ্লোগান্‌টীও সেই শ্রেণীর বুলি। ধনতন্ত্র আজ যে অচল হয়ে পড়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই ; কিন্তু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ইহুদীগণই যখন জার্ম্মাণির অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে তখন সে কথা অস্বীকার করি কেন ? ইহুদীরাই দেশের সমস্ত টাকা লুটে নিয়ে জার্ম্মাণ শ্রমিকদের দারিদ্র্য ঘটিয়েছে, এ কথাটা শ্রমিকদের বিশ্বাস করাতে পারলে খাঁটি খৃষ্টানদের সিন্দুক তো ভরে উঠবেই, জনগণের অসন্তোষটাও কিছুকালের মত স্থগিত থাকতে পারে। কারণ এতবড় একটা পরিবর্ত্তন ঘটে গেল, তাই জাতির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কর্‌তে তো কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে। বলা বাহুল্য স্বাধীন জার্ম্মাণিতে যে জিনিষটা আজ ফাসিজ্‌মের

রূপ নিয়েছে তাহাই ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিকতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। এতে অর্থ কোন ব্যক্তিবিশেষের হাত হতে অন্য আর একজনের হাতে যাচ্ছে, জনগণের সঙ্গে সে অর্থের কোনই সম্বন্ধ থাকে না। যদি জনগণের হাতে অর্থ থাকতো তাহলে জনগণের আজ ক্রয় করবার ক্ষমতা নেই কেন? বিদেশী বণিক্‌রা ভারতীয় স্বদেশী বণিক্‌দের বলছে যে, শিল্পোন্নতি করতে হবে—শ্রমিক ও কৃষককে আরও শুষ্‌তে এতটুকুও পশ্চাৎপদ হবে না। জাপানী বণিক্‌রা ভারতীয় বণিক্‌দের সাথে কিভাবে রফা করবে তা আমরা জানি।

বর্ত্তমান যন্ত্র-শিল্পের এই পরিণতি দেখে আমাদের দেশে আর এক শ্রেণীর লোক ইয়োরোপের দিকে আঙ্গুল নেড়ে বলছে—দেখ ইয়োরোপের কি ভীষণ অবস্থা, যন্ত্রদৈত্য ইয়োরোপে কি ভীষণ দারিদ্র্যের সৃষ্টি করেছে। মুষ্টিমেয় নরনারীর হস্তে প্রভূত পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীভূত থাকা সত্ত্বেও ইয়োরোপের জনসাধারণ যেমন দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এমনটি তো কৈ আমাদের দরিদ্র ভারতবর্ষে এখনও হয়নি। তাঁরা আরো বলছেন যন্ত্রশিল্প এখনও ভারতবর্ষে সম্যক পুষ্টিলাভ করে নি; কিন্তু যতটুকু করেছে তারই ফলে আমাদের দেশ উৎসন্ন যেতে বসেছে। সুতরাং প্রয়োজন নাই আমাদের আধুনিক সভ্যতায়। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ফিরে গেলেই আমাদের অন্নসমস্যার সমাধান হবে। তাই তাঁরা প্রোগ্রাম নিয়ে আসছেন চরকা, খদ্দর প্রভৃতির। এদের হেড্‌কোয়ার্টার এতদিন ছিল সবরমতীতে, এখন উঠে এসেছে পুণার পর্ণকুটীতে? আর একদল পণ্ডিচারীতে বসে বলছেন ভগবৎ উপাসনা দ্বারা নৈতিক ও মানসিক বল সঞ্চয় করে বাংলা তথা ভারতের যাবতীয় দুঃখ, দুর্দ্দশা, দারিদ্র্য, গ্লানি প্রভৃতি অচিরে দূর করে ফেলবে। এদের উত্তর দেওয়াও এক শক্ত ব্যাপার। কারণ যাই বলা হোক না কেন, এরা নিরন্তর ঘাড় নেড়ে বলে যাবেন,

আগের দিনে এমনটি ছিল না। অথচ ইতিহাসের সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয় লাভও যাঁর ঘটেছে তিনিই জানেন, প্রথম ক্লান প্রথায় পরিচালিত সমাজ যেদিন ভেঙ্গে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বারা গঠিত সমাজে পরিণত হল, দারিদ্র্য ও অত্যাচারের জন্ম সেদিন থেকে। এপর্য্যন্ত সামাজিক অবস্থার যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা গেলো তা থেকে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, শ্রেণী-সংগ্রাম অতিশয় প্রখরভাবে আমাদের সমাজে বর্ত্তমান। এই শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে যে আমূল পরিবর্ত্তনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়, তাতে প্রতিক্রিয়াশীল সনাতনী ভারতের সামন্ত বুর্জ্জোয়ারা আঁৎকে ওঠে। সনাতনী ঘুণধরা সমাজকে তারা আরও জোরে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। কিন্তু ঘুণধরা সমাজ তাদের চাপ আর সইতে না পেরে প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বসে পড়ছে এবং গোটা সমাজটাও সাথে সাথে আমূল পরিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

# লাক্ষা-ব্যবসায় বাঙালী*

### শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রভৃতির উদ্যোগে কলিকাতায় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্ কায়েম হওয়ার পর বর্ত্তমানে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক গবেষণা-ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসর কালের কার্য্যাবলী পরিষদ্ কর্ত্তৃক একখানি স্মারক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তিকায় পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কাজের চৌহদ্দী ইত্যাদি নানা বিষয় স্থান লাভ করিয়াছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র সুধী-মণ্ডলী, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবাদিক-সঙ্ঘ, ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্য-সভা-সমূহের সহিত পরিষদের যোগাযোগের বৃত্তান্তও পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। পরলোকগত মেজর বামনদাস বসু, আই-এম-এস, ইহার প্রথম সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমানে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতি আছেন।

পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের বাস-ভবন কলিকাতা ৪৫নং পুলিস হাসপাতাল রোডে একটী অনুষ্ঠান হয় এবং বিনয়বাবুর পত্নী শ্রীযুক্তা ইডা সরকার পরিষদের ডিরেক্টার ও গবেষকদিগকে এক সান্ধ্য-সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করেন (৮ই অক্টোবর ১৯৩৩)। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জী 'লাক্ষাশিল্পে বাঙালী' সম্বন্ধে একটী তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সম্মিলনীতে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, ডাক্তার সুরেশ রায়, বৈমানিক বীরেন রায়, শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন মৌলিক,

---

* বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের ১৯৩৩ সনের ৮ই অক্টোবর তারিখের অধিবেশনে পঠিত। ('ক্লাইভ ষ্ট্রীট', কার্ত্তিক ১৩৪০, অক্টোবর ১৯৩৩)।

শ্রীযুক্ত সুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, হরিদাস পালিত, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ সাহা, নিবারণচন্দ্র চাটার্জ্জী প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ]

আমাদের দেশে কত রকম উপকরণ প্রকৃতি দেবী উপহার দিয়াছেন যাহার সম্যক ব্যবহার ও ব্যবসা আমরা নির্ব্বিকারতা-প্রসূত অনুশীলন, অধ্যয়ন ও অনুসন্ধিৎসার অভাবে ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি এবং অবজ্ঞা করিতেছি; জ্ঞান, অনুশীলন এবং অধ্যাপনার অভাবেই যে ইহা ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ জ্ঞানের আকরস্বরূপ বর্ণনা ও ইতিহাস কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই। সেই সকল দ্রব্যপরিচয় এবং তাহার গবেষণার সাহায্যে আজ জার্ম্মাণি, জাপান, ইংলণ্ড ইত্যাদি প্রতিভাসম্পন্ন জাতিসকল সভ্যতা ও বাণিজ্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। আমরা কিন্তু তাহার কোন খবরই রাখিনা; নিজেদের রত্নভাণ্ডারের সন্ধান যাহারা জানে না এবং জানিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে না, তাহাদের দুঃখ কে ঘুচাইবে? নিজের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা নিজেকে করিতে হইবে, অপরে তাহা করিবে না; অপরে বড় জোর সহানুভূতি মাত্র প্রকাশ করে। স্বার্থসিদ্ধির যদি কোনও আশা থাকে তবেই অপরে সাহায্য করে। কিন্তু সে সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য তদপেক্ষা বহুগুণ মূল্য দান করিতে হয়। সে দান জ্ঞান ও সংবাদ। ইহারই সাহায্যে সাহায্যদাতা নিজের জন্য বেশী লাভ করিতে পারে। প্রথমেই আমাদের জানা কর্ত্তব্য আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ প্রকৃতিজাত কোনও দ্রব্য, যেমন লাক্ষা, সম্বন্ধে কি জ্ঞান, গবেষণা ও সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিত্যনৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারে, ঔষধ-পথ্যে ইহার ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কি অভিজ্ঞতা ছিল তাহার সন্ধান লইতে হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কি কি কার্য্যে ইহার ব্যবহার হইত এবং আধুনিক

গবেষণার ফলে আরও কি নূতন ব্যবহার করা সম্ভব, কাঁচা মাল রপ্তানি এবং লাক্ষা হইতে প্রস্তুত বহুবিধ দৈনিক বা সাময়িক ব্যবহারোপযোগী জিনিষ-পত্রাদি কি তৈয়ারি হইত, হয় বা হইতে পারে, বিদেশে ইহার চলন কিরূপ ছিল এবং এখন কিরূপ হয় বা হইতে পারে, আধুনিক রাসায়নিক ও বস্তু-বিচার শাস্ত্রাদিতে ইহার কি ব্যবহার হয়, ইত্যাদি জ্ঞান অর্জ্জন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ডাক্তার ওয়াট্‌ প্রণীত "ডিকশনারি অব্‌ ইকনমিক প্রডাক্‌টস" নামক দ্রব্য-বিষয়ক অভিধান গ্রন্থে ইহার বহু সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান-জগতের ক্রমোন্নতির সহিত বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আরও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা জানা অত্যন্ত আবশ্যক; বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি, অর্থ ও বাণিজ্যনীতি-বিশারদগণের সমিতি ইত্যাদি হইতে এ সম্বন্ধে তথ্য প্রচার আবশ্যক। কিন্তু অর্থ, সামর্থ্য ও সহানুভূতির অভাবে কিছুই হইতেছে না। আমরা অজ্ঞই থাকিয়া যাইতেছি; সাময়িক পত্রাদি দেশের বর্ত্তমান নানাবিধ বৃহত্তর সমস্যা লইয়া এতই ব্যস্ত যে, তাহাতে এজাতীয় জ্ঞান ও সংবাদ-প্রচার যথোপযুক্ত হয় না; যাহারা পুরুষানুক্রমিক এ ব্যবসা করিয়া আসিতেছে তাহাদের নিকট হইতে নানা বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু, সি, আই, ই মহাশয় সম্প্রতি "অলক্ত" বা আল্‌তা সম্বন্ধে যৎসামান্য তথ্য "গন্ধ-বণিক্‌" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্বজাতির দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা ও অন্যবিধ তথ্য গন্ধবণিক-জাতীয়দের মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে। কারণ ইহা এক সময়ে তাঁহাদেরই একরকম একচেটিয়া ব্যবসা ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এখন কয়জন আছেন যাঁহারা ইহার সম্যক তথ্য অবগত আছেন? ইঁহারাই বিবিধ প্রাচীন, প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-প্রস্তুত গৃহস্থের ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যের সম্যক তথ্য অবগত ছিলেন

এবং অনেক গন্ধবণিক্ পরিবারের স্ত্রীলোকেরা এরূপ বহুবিধ দ্রব্য স্বহস্তে তৈয়ারী করিতেন ; কয়েকটী ধনী পরিবার এই কার্য্যের জন্য মজুরি দিয়া প্রতিবেশী স্ত্রীলোকদের সাহায্য লইতেন ; দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর এক একটী গৃহ এক একটী স্ত্রীজাতি-পরিচালিত কারখানাবিশেষ বলিয়া মনে হইত। এদেশের তন্তুবায়, গন্ধবণিক্, মোদক, তিলি ও তাম্বূলীদের পরিবারগুলি এক একটী উটজ শিল্পের কারখানা ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে কারখানায় ফ্যাক্টরী আইন, বয়সের সীমা বা বিধিনিষেধ ছিল না ; প্রবীণা গৃহিণীগণই বালক-বালিকা, প্রৌঢ়া-বৃদ্ধাদের উপযুক্ত কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। কিন্তু বঙ্কিমযুগ হইতে এই জাতীয় পরিবারের মধ্যে আধুনিক বিদ্যাশিক্ষা প্রণালীর প্রচলনের ফলে স্ত্রীজাতির গৃহকর্ম্মে অনাস্থা, এবং সভ্যতার নূতন আদর্শ অক্ষর-পরিচয় ও পুস্তক-পাঠে অত্যুৎসাহ ইত্যাদির জন্য গৃহস্থ পরিবারের মধ্য হইতে গৃহ-শিল্পের তিরোধান ঘটিতে আরম্ভ হয়। বিলাস-দ্রব্য নির্ম্মাণে ইহাদের মনোযোগ কিয়ৎপরিমাণে আকৃষ্ট হয়, এবং নিত্যকার ব্যবহারিক জিনিষ নির্ম্মাণের উপর ক্রমশঃ অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়। আজ যে আল্পনা শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা ও উচ্চশিক্ষিত শিল্পীর দল চেষ্টা করিতেছেন, কেতাবী বিদ্যাশিক্ষা-প্ররোচনার ফলেই যে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিম-সাহিত্যে স্ত্রীজাতির আদরণীয় যেসকল অবসর-কার্য্যের বা শিল্পের পরিচয় পাই সেগুলিতে ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহের জন্যই নানাবিধ উটজ নিত্যব্যবহার্য্য শিল্প অনাদৃত এবং ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে। জনৈক অর্থনৈতিক পণ্ডিত বঙ্কিম-যুগকে এদেশের আর্থিক প্রগতির ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিতেছেন ; কিন্তু বস্তুতঃ বঙ্কিম যুগেই যে স্ত্রী-হস্ত-প্রস্তুত নানারূপ শিল্পকার্য্য লোপ পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জাতীয় শিল্প বিলাস-দ্রব্যে ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যে বিস্তৃত ছিল। উল্-বোনা

তখন দরিদ্র গৃহস্থ বধূর অর্থাগমের উপায় ছিল। লাক্ষা হইতে তাহারা নানাবিধ পুত্তলিকা ও সৌখীন আসবাব তৈয়ারী করিত; এইরূপ আরও বহুবিধ গৃহশিল্পের দ্বারা মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র গৃহস্থের বধূ, কন্যা ও গৃহিণীরা সংসারের আয়ের পথ সৃজন করিতেন। বঙ্কিম-সাহিত্যে এমন একটা ভাবের ও রুচির প্রবাহ ছুটিল যাহাতে স্ত্রীলোকদের পক্ষে কোনও রূপ অর্থকরী শিল্প-চর্চ্চা "ছোটলোকের কাজ" বলিয়া ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইল। এ জাতীয় শিল্পোদ্ভূত জিনিষ বহু পরিমাণে তৈয়ারী হইত না এবং প্রত্যেক শিল্পী ও গৃহ কারখানার এক একটী বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহার জন্য প্রত্যেক গৃহ-কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের বিশিষ্ট চাহিদা ছিল। "অমুকদের বাড়ীর মেয়েদের বোনা বা তৈয়ারী ফুলের ন্যায় ফুল-পাতা আর কেহ করিতে পারে না", "সূক্ষ্ম ও বিচিত্র রংএর বাহার আর কেহ ফলাইতে পারে না", "অমুক মেয়ে বা বউ আম, জাম ও ফলসমূহ এমন সুন্দর তৈয়ারী করে যে তাহার তুলনা হয় না," ইত্যাদি কথা তখন খুবই শুনা যাইত। রাশি-কার্য্য-পদ্ধতি অনুযায়ী কারখানায় কলের সাহায্যে প্রস্তুত রাশীকৃত জিনিষে এরূপ বৈশিষ্ট্য থাকে না, কাজেই সে ক্ষেত্রে জিনিষের ইতর-বিশেষ-বিচারের ক্ষমতারও আবশ্যক হয় না। কারিকর যতই শিল্প-নিপুণ হউক না কেন, তাহার প্রস্তুত জিনিষের মধ্য দিয়া তাহার কোনও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না, ফলে মুড়ি-মিছরির এক দর হইয়া যায় এবং শিল্পীর ঐকান্তিকতা, অধ্যবসায় ও নূতন-কিছু করিবার মত উদ্ভাবনী ক্ষমতার পুষ্টি হয় না। শিল্প ও শিল্পীর পক্ষে ইহা অতীব অনিষ্টকর। আজ যে লাক্ষার কথার অবতারণা করিয়াছি এই লাক্ষা-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। আমার স্থির বিশ্বাস কারখানাওয়ালারা ইহাদের সহিত কতকগুলি বিষয়ে প্রতি-যোগিতা কিছুতেই করিতে পারিত না, যদি গন্ধ-বণিক্ সমাজ ঘর ছাড়িয়া পরের দিকে ধাবমান না হইতেন। আমি এমন

একটী কারবারের সন্ধান পাইয়াছিলাম যাহা বলিলে অনেকে কাল্পনিক মন-গড়া গল্প বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুসময়ে এই কারবারটীর সন্ধান পাই। ইহা হইতেছে চিঠি-লেখার কাগজ ও খামে ব্ল্যাকবর্ডার ছাপিবার বা কাল-রেখা "টানিবার" প্রকরণ। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই শিল্পটী কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি বিশিষ্ট পরিবারের একটি সামান্ত বহরের একচেটিয়া শিল্প ছিল; এই পরিবারটী বিশেষ ধনী গৃহস্থ। ইঁহারা কয়েক লক্ষ টাকা এবং বহু ভূসম্পত্তি ও কারবারের মালিক। ইঁহাদের পরিবারের স্ত্রীলোকদের হাতে তৈয়ারি ব্ল্যাকবর্ডারযুক্ত চিঠির কাগজ ও খাম কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ষ্টেশনারদের কাছে আদৃত হইত। সাহেব দোকানদারেরা পূর্ব্বে বিলাত হইতে মূল্যবান ব্ল্যাকবর্ডার-যুক্ত কাগজ ও খাম আমদানি করিতেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা এই কার্য্য এরূপ উৎকর্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেন যে, ইংরেজ দোকানদারেরা সন্ধান পাইয়া ঐরূপ কাগজ ইত্যাদি এইখানেই তৈয়ারী করাইতে লাগিলেন; ফলে তাঁহারা বহু লোকসানের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। কারণ কাগজ বহুদিন গুদামে আনাইয়া রাখিলে নানা কারণে তাহা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটিলে সহসা কাল-রেখাটানা কাগজের আবশ্যক হওয়ায়, কলিকাতার বড় বড় সরকারী ছাপাখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টসকল মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন; উচ্চজাতীয় কাগজে কাল রেখাটানার কাজ ছাপাখানার কলে হয় না, যাহা হওয়া সম্ভব তাহা নিকৃষ্ট মামুলী কার্য্যে ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু উৎকৃষ্ট অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য কাগজে ছাপাখানার ছাপা কাল বর্ডার একেবারে অনুপযুক্ত। প্রত্যেক সরকারী ছাপাখানায় তখন এই কার্য্যের নানাবিধ পরীক্ষা ও চেষ্টা চলিতে লাগিল; রাশি রাশি পুস্তক ও বৃহৎ বৃহৎ পাত্রে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের

আমদানি হইতে লাগিল; প্রাচীন অভিজ্ঞ দপ্তরী-জমাদারগণ দিনরাত পরীক্ষা করিয়াও আসল কার্য্যপদ্ধতি বাহির করিতে পারিল না। থ্যাকার, নিউম্যান, ট্রেল কোং ইত্যাদি কয়েক ঘর সৌখীন ষ্টেশনারী দোকানদার পূর্ব্বোক্ত পরিবারের সন্ধান জানিতেন। তাঁহারা উহাদের এত কাজের অর্ডার দিলেন যে, দিনরাত বহু বালিকা ও স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়াও মাল তৈয়ারী করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন এই "সামান্য" কার্য্যে অভিজ্ঞতার জন্য এই পরিবারের কত আদর ও অর্থ রোজগার হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। খোদ বড়লাট, ছোটলাটসমূহের ব্যবহার্য্য কাগজ, খাম এই পরিবার জোগাইয়াছিলেন; প্রথমে সাহেব-দোকানদারদের মারফৎ, পরে খাস ষ্টেশনারী আফিসের মারফৎ গভর্ণমেণ্টের আবশ্যকীয় মাল সরবরাহ হইতে লাগিল। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের প্রেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ চামার্স ব্যতীত আর কাহারও কার্য্য শিল্প-চাতুর্য্যে সাফল্য লাভ করে নাই। এই কার্য্যে লাক্ষা একটী প্রধান উপকরণ ছিল, কিন্তু লাক্ষাকে কিভাবে অন্য কি কি উপকরণের সহিত ব্যবহার করিলে আবশ্যক মত সূক্ষ্মতা, পারিপাট্য, ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদি রক্ষিত হয় তাহা কেহই ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তখন আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যাহা হউক ব্যাপারটী এখন সামান্য বলিয়া মনে হইলেও ইহার সাহায্যে উক্ত পরিবার লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং তাহা সম্পূর্ণ স্ত্রীলোকদের হাতের কার্য্যের সাহায্যে। গৃহ-শিল্পের দ্বারা সময়ে সময়ে কিরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভবান হইতে পারা যায় এবং শত শত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরাও কিরূপে সসম্মানে দু'পয়সা রোজগার করিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্যই ঘটনাটীর উল্লেখ করিলাম। কল-কারখানার সাহায্যের জন্য বসিয়া থাকিলে সে সময়ে গভর্ণমেণ্ট ও দেশস্থ ধনী সম্প্রদায়কে ছাপাখানায় প্রস্তুত নিকৃষ্ট জিনিষেই সন্তুষ্ট হইতে হইত। সম্রাট এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যু-

কালেও বাঙালী স্ত্রীলোকদের এই শিল্প-অভিজ্ঞতা এদেশের বহু অর্থ এদেশেই রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

লাক্ষার কারবারে যুদ্ধের সময়ে কয়েক ঘর লোক লক্ষপতি হইয়াছিল এবং গ্রামোফোন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে ইহার সম্মান ও মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু অতিলোভী, দূরদৃষ্টিহীন, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অধ্যবসায়, উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসার অভাবেই এই কারবারটী নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

যাঁহারা লাক্ষা-চাষ এবং উহার বিভিন্ন প্রকরণ জানিতেন তাঁহারা যদি রপ্তানি-কার্য্যেও নিজেরা নিযুক্ত থাকিতেন এবং বিদেশের কারবারের সম্যক সন্ধান রাখিতেন, তাহা হইলে এত শীঘ্র ইহার বাজার নষ্ট হইত না, এবং এক রকম জিনিষের চাহিদা কমিলে অন্য আবশ্যকীয় জিনিষ প্রবর্ত্তন করিয়া বা অন্য দেশে উহার চল্‌তি করিয়া তাঁহারা মূল কারবারটী রক্ষা করিতে পারিতেন। অজ্ঞতা ইত্যাদির ফলেই নানাবিধ ব্যবসার সমূহ অনিষ্ট হইয়াছে। শুধু বিদেশে নহে, ভারতবর্ষেও লাক্ষা-দ্রব্যের কাটতি এবং ব্যবহার কত কমিয়া গিয়াছে তাহা বয়োবৃদ্ধের দল অতি সহজেই প্রমাণ করিতে পারিবেন। তবে যাঁহারা গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত রিপোর্টের অঙ্ক ভিন্ন আর কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। একথাও সত্য যে, শুধু রপ্তানি ও বহির্দ্দেশ হইতে আমদানির অঙ্ক ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টের আভ্যন্তরীণ ব্যবসার হিসাব বিশ্বাস-যোগ্য বা প্রামাণিক নহে। মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উৎপন্নের হিসাব ধরা হয়। কারখানা-ওয়ালারা আয়-কর, ফ্যাক্টরী আইন ইত্যাদির ভয়ে খাঁটি কোনও হিসাব বা রপ্তানির কেন্দ্রসকল প্রকাশ করে না। দাম, খরচ, লাভ ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাহাই; তবে অন্যান্য বিবরণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সংগৃহীত হইলেও ব্যবসা বা শিল্পের গুপ্তপ্রকরণ ও বিবিধ সংবাদ-

সকল উহা হইতে পাওয়া অসম্ভব। "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল" হিসাবে লোকে উহার তথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

পূর্ব্বে এদেশে গালা হইতে তৈয়ারী কত কারুকার্য্য-শোভিত খেল্‌না আসবাব, ফল, ফুল, চুড়ী, রুলী ইত্যাদি তৈয়ারী হইত তাহা বৃদ্ধেরা বর্ণনা করিতে পারেন, প্রত্যেক কারিকরের শিল্প-চাতুর্য্য বিভিন্ন এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রের তৈয়ারী জিনিষে একটী স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যে কারণে স্থান-ভেদে তৈরী জিনিষের আদর ও দামের ইতর-বিশেষ হইত। ব্যবসাদারেরা ও দোকানদারেরা তৈয়ারীকেন্দ্রের নাম নানাবিধ উপায়ে গোপন করিত; যেমন "দম্‌দম্‌ চুড়ী" দমদমার বিশ পঁচিশ ক্রোশের মধ্যেও তৈয়ারী হইত না; "বোম্বাই আম"—বোম্বাই প্রদেশের চৌহদ্দীর মধ্যে এ আমের চিহ্নও দেখা যায় না, অথচ নাম হইল "বোম্বাই" আম। এইসব ব্যবসাদারী চাতুরীর সাহায্য না লইলে দোকানদারদের লাভের সুবিধা হয় না এবং "মার্কা"র কদরও হয় না। লোকে মার্কা রেজেষ্টারী না করিয়া এইরূপ এক-একটা বিশিষ্ট নাম-করণের দ্বারা স্বীয় ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করিত। একই জিনিষের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে নামকরণ হইত, যাহাতে ঐক্যের সন্ধান পাইলেও নামের বিভিন্নতার দরুণ দরের উপর কথা কহিবার উপায় থাকিত না। যখন কাচের লাল-চুড়ীর আমদানি হয় নাই, তখন লাল গালার চুড়ীর বা রুলির প্রচলন ছিল। আমাদের দেশে যেমন লৌহ বলয় এয়োতীর চিহ্ন, তদ্রূপ বোম্বাই ও গুজরাটে লাল কাচের চুড়ী সধবার অবশ্য ব্যবহার্য্য; ১৯২১ সনে বিদেশী বর্জ্জনের সময় মহাত্মা গান্ধী শ্রীমতী কস্তুরীবাইকে তাঁহার হাতের লাল কাচের চুড়ী ভাঙ্গিবার আদেশ করেন। তখন শ্রীমতী সধবা হইয়া কিছুতেই উহা ভাঙ্গিতে স্বীকৃত হন নাই; ইহা লইয়া স্বামি-স্ত্রীতে সপ্তাহকাল বাক্য ও সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল; বন্ধুবান্ধবের

অনুরোধ উভয়েই রক্ষা করিতে নারাজ; অবশেষে মহাত্মাকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল; সধবার চিহ্ন-হিসাবে লাল কাচের চুড়ী যে-দেশে অপরিহার্য্য সে-দেশে কাচ প্রচলনের পূর্ব্ব যুগে নিশ্চয়ই লাল গালার চুড়ী বা রং-করা শাঁখার প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞ সুধীজন চেষ্টা করিয়া কাচের লাল চুড়ীর পরিবর্ত্তে যদি গালার লাল-রুলী (চুড়ীরই মত) প্রচলন করাইতে পারেন তাহা হইলে এ ব্যবসাটী পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উন্নতিশীল শিল্প-বৈজ্ঞানিকের দল ইহার অনুরূপ কোনও রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভাবনে যে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন তাহা মনে হয় না।* কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে এই লাল চুড়ীর শিল্প ও ব্যবসাটীর পুনরুদ্ধার যে না করা যায় এমনও মনে হয় না। সিংহভূম, রাঁচি, মানভূম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যেরূপ মনোরম ও বিভিন্ন কারুকার্য্যমণ্ডিত এবং বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তর, পুঁতি ইত্যাদির সাহায্যে চুড়ী তৈয়ারী হইত তাহা আর কোথায়ও দৃষ্ট হইত না; এই চুড়ীই "কাশীর চুড়ী" নামে বিখ্যাত হয়; কাশীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এইসকল দেশ হইতে নিজেদের পছন্দ-মত চুড়ী তৈয়ারী করাইয়া তাহার জন্মস্থান গোপন রাখিয়া উহাকে "কাশীর চুড়ী" নামে প্রচার করে। পরে ঐ সকল দেশ হইতে কারিকর আনাইয়া নিজেদের হেপাজতে কড়া সর্ত্ত ও খবরদারীতে রাখিয়া স্থানীয় কারিকর শিক্ষিত করাইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ঐ কয়টী জেলার নাম করিলাম। ইহা ব্যতীত গালার এমন সুদৃশ্য ফল কলিকাতার সন্নিকটে কয়েক বৎসর তৈয়ারী হইত যাহা দেখিয়া মনে

* বিজ্ঞানবিদ্ এডিসনের কারখানাতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস মহাশয় রাসায়নিক-লাক্ষা তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং এডিসনের কারখানায় ঐ কৃত্রিম গালাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হইত যে উহা বিলাতী, এবং কলের সাহায্যে ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত। এক একটী ফল আকৃতি অনুসারে একআনা হইতে চারিআনা পর্য্যন্ত দরে বিকাইত; আমার গৃহে এখনও এমন ফল আজ ৪০।৪৫ বৎসর যাবৎ আছে, অথচ তাহার বর্ণ আদৌ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ঔজ্জ্বল্য অতি সামান্য মাত্র কমিয়াছে, দেখিতে কাচের ন্যায় মসৃণ ও উজ্জ্বল, রঙ্গে কোনও ফাট ধরে নাই। এ কারিকরী ও শিল্প কেন লোপ পাইল? সস্তায় বিলাতী খেল্‌না যতই ইহার ব্যবহার নষ্ট করিয়া থাকুক, চেষ্টা করিলে অবশ্যই ইহা রক্ষা করা যাইতে পারিত; নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ হইলে অন্য কথা হইত; কিন্তু সখের আস্‌বাবী জিনিষের প্রত্যেকের এক একটী বৈশিষ্ট্য থাকে যাহার জন্য তাহার আদর চেষ্টা করিলেই রক্ষা করিতে পারা যায়। এই চেষ্টার অভাব এবং গড্ডালিকা প্রবাহে "গা-ভাসান" রোধ করিবার কোনও রূপ চেষ্টা না হওয়ায় ইহাদের অস্তিত্ব অতি দ্রুত লোপ পাইয়াছে, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। বিদেশী বণিক্ অনবরত আমাদের রুচি ও সংস্কারের পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে। মাটীর দেবতার স্থান এখন কাচের দেবতা অধিকার করিয়াছে। ইহাতে কি বিদেশী বণিকের কেরামতী নাই? কিন্তু যতই রুচির পরিবর্ত্তন হউক, কতকটা পূর্ব্ব রুচি থাকিয়া যাইবেই এবং চেষ্টা করিলে কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে কতকটা রক্ষা করাও সম্ভব এবং প্রসার বৃদ্ধি করাও যে না যায় তাহা নহে। সে বিষয়ে আমাদের কোন চেষ্টা আছে কি? যেসকল ধনী ও ব্যবসাদার এ ব্যবসায় লিপ্ত ছিল তাহাদেরই নির্ব্বুদ্ধিতা এবং ঔদাসীন্যের জন্য দেশের এবম্বিধ বহু শিল্প নষ্ট হইয়াছে। উপযুক্ত পরামর্শদাতা এবং ধনীর অভাব না হইলে সৌখীন গৃহজাত শিল্পের একেবারে ধ্বংস হয় না। নূতন ও পুরাতন রুচি অনবরত চক্রাকারে ঘুরিয়া চলে।

আমাদের দেশে যাহারা ব্যবসা, কি দোকানদারি করিত লেখা-পড়ার চর্চ্চা তাহাদের মধ্যে আদৌ ছিল না বলিলেই হয়; গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত নানাবিধ তথ্যপুস্তক ইংরেজীতে লিখিত হওয়ায় সে সকলের সংবাদই কেহ রাখিত না। তাহার চর্চ্চাও ছিল না। মাসিক ও সাময়িক পত্রাদিতে যাহা-কিছু আলোচনা হইতেছে তাহা হইতে যৎসামান্য সংবাদ এখন পাওয়া গেলেও দোকানদার ব্যবসাদারগণের নিকট এজাতীয় প্রবন্ধ-নিবন্ধের আদর খুব কম। অব্যবসায়ীর রচনা বলিয়াও এইসকল রচনার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হয় না। যাহা হউক এসকল বিষয়ে এখন আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় কিছু কিছু জ্ঞান বিস্তার হইতেছে; কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। উপযুক্ত লেখকের যথেষ্ট অভাব। এসকল অভাব পূরণ করিতে হইলে ব্যবসায়িগণকে উদ্যোগী হইতে হইবে; সমিতি স্থাপন করিয়া, উপযুক্ত বেতনভোগী লোক রাখিয়া আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সম্প্রদায়-বিশেষের সাহায্যে সংবাদপত্র বাহির করিতে এবং পরে তাহা নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উহা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলে অন্য প্রদেশের লোকেরা ইহা "মারিয়া" লইতে পারিবে না। ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালায় তথ্য-সংগ্রহ পুস্তক না থাকায় ইংরেজী-অনভিজ্ঞ সাধারণ ব্যবসাদারদিগের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; এ অভাব দূরীকরণ-মানসে "ঘরের কথা" নামক একখানি সংবাদ-সংগ্রহ পুস্তকের দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিতও হইয়াছিল; কিন্তু নিয়মিত পাঠকের অভাবে উহা বন্ধ হইয়া যায়। উদ্যোক্তারা* তিন বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ গ্রাহক এবং তাহাদের আগ্রহের সন্ধান না পাওয়ায় পুস্তক বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ব্যবসাদারগণ যদি

* মেসার্স সি, কে, সেন অ্যাণ্ড কোং (লিঃ) কলুটোলা, কলিকাতা।

সচেষ্ট হইয়া এরূপ তথ্যসংগ্রহ পুস্তকের প্রচারার্থ যত্নবান হন তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

গালা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কয়েকখানি তথ্যপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। গালা-রপ্তানির কাজও বড় কম ছিল না। তা ছাড়া এ দেশেই গালা হইতে বহুবিধ নিত্যকার প্রয়োজনীয় এবং সখের জিনিষও তৈয়ারী হইত।

কেবল বাংলা দেশ হইতে কত পরিমাণ ও মূল্যের কত গালা বহির্দ্দেশে রপ্তানি হইত, গত কয়েক বৎসরের সেই হিসাব দেখিলেও কি মনে হয় না যে এদেশের অন্ততঃ কিছু লোকের এই ব্যবসায় প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত? কয়েকটী জার্ম্মাণ ও ইংরেজ ব্যবসায়ী ইহার কারবার করিয়া কোটীপতি হইয়াছে, আর আমার বাংলা-বিহার প্রদেশের এই উৎপন্ন দ্রব্যটী কি আমাদের মনোযোগের বিষয় হইবে না?

বাংলা হইতে বিভিন্ন প্রকারের রপ্তানি গালার পরিমাণ ও মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

| | ১৯১৫-১৬ | ১৯১৬-১৭ | ১৯১৭-১৮ | ১৯১৮-১৯ | ১৯১৯-২০ |
|---|---|---|---|---|---|
| গালা—(টিক্‌লি বা বোতাম) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ১২,৫৭২ | ৩,০৭২ | ২,৭৫৯ | ৩,৫২০ | ১৩,৫৩৯ |
| মূল্য (টাকা) | ৫,৭০,৪০৫ | ১,৯২,৯৯০ | ৪,২৪,২২০ | ৫,৬২,৯৯৫ | ৩,৬১,০০৫ |
| গালা (চাঁচ) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৩,৫৮,৬২০ | ৩২৪,১৫১ | ২৮৭,১৬৪ | ২১৫,৮২৮ | ৩৩৭,৭১৭ |
| মূল্য (টাকা) | ১,৫৪,৭১,৩৬০ | ২,৫৪,৯৪,০১৫ | ৩,৪৯,৯০,৭৪০ | ২,৭০,৩৯,৭৭৫ | ১০,২৪,৯০,৯০৫ |
| গালা (বাতি) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৩,৪৯৭ | ৭,৪৫৯ | ১,৫০৪ | ৪ | ১,৪৮৩ |
| মূল্য (টাকা) | ১,১৩,৭৩০ | ৩,৫১,৮৪০ | ১,১৩,২৫০ | ৪০৫ | ১.০৯,১৭০ |

| | ১৯১৫-১৬ | ১৯১৬-১৭ | ১৯১৭-১৮ | ১৯১৮-১৯ | ১৯১৯-২০ |
|---|---|---|---|---|---|
| গালা (অন্যান্য) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ১৭,৪৯১ | ১৮,২৩০ | ২১,৫২৩ | ৬,৫৬৯ | ১৯,১২২ |
| মূল্য (টাকা) | ১,৯৬,৯৩৫ | ২,৬৭,৮৫৫ | ৫,৬৭,২৮৫ | ১,৮৭,২৯০ | ১৩,৮২,২৪৫ |
| সর্ব্বরকম (গালা) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৪,১৫,৭৮১ | ৩৮০,৭০১ | ৩১৯,৯০৮ | ২৩১,৪৯১ | ৩৭৩,৪৭৬ |
| মূল্য (টাকা) | ১,৭১,২৩,২৬৫ | ২,৭৯,৮৬,৫৩৫ | ৩,৭৪,৫৪,০১৯ | ২,৮৪,৬০,১২০ | ১০,৮৩,১৫,৮৫৫ |

| | ১৯২৭-২৮ | ১৯২৮-২৯ | ১৯২৯-৩০ | ১৯৩০-৩১ | ১৯৩১-৩২ |
|---|---|---|---|---|---|
| গালা (বোতাম) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ১৮,০৪২ | ২৪,৭১৪ | ২৪,১৭৫ | ২৩,৬৭৬ | ১৮,১৬৪ |
| মূল্য (টাকা) | ২৮,৩৯,২৪৫ | ৩৪,৪০,৮০৮ | ৩০,১২,০৭৭ | ১৭,২২,৩২১ | ৯,৪৮,০৯৯ |
| গালা (চাঁচ) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৪,০৪,২৫৯ | ৫,৩০,৪৬৭ | ৪,৯৮,২১৫ | ৩,৬৬,৪১৩ | ২,৯৭,০০২ |
| মূল্য (টাকা) | ৫,৬৮,৪৫,৭৯৫ | ৬,৮১,৫২,১২১ | ৫,৬৭,৯১,৪৮০ | ২,২৮,৬৪,২৯১ | ১,২৯,৮৩,৯৫৮ |
| গালা (বাতি) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৩,৯৭৫ | ৯৩,৫১৯ | ৩,৫৬০ | ৩,৩৮৫ | ৬,০২৬ |
| মূল্য (টাকা) | ৩,৮২,৬৬৪ | ১১,২৪,০৮৯ | ২,৮০,৪৫০ | ১,৫৩,৫৬০ | ১,৮৩,৫০৪ |
| গালা (অন্যান্য) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৫৬,৮৭০ | ৬৭,৭৩১ | ৭০,৪৮৫ | ৪৫,৯৮৪ | ৩০,৯৯২ |
| মূল্য (টাকা) | ২৬,১৬,৬০৯ | ২৬,৭৩,২৫৪ | ২৪,৪৮,৫৯৯ | ৮,২১,১৩৩ | ৪,০৭,৫৭২ |
| গালা (সর্ব্ব রকম) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৫,৩৪,৩০৯ | ৭,২১,৮০৩ | ৬,৫৮,৯০৯ | ৫,৪২,৮১৯ | ৪,৫৮,৫৭২ |
| মূল্য (টাকা) | ৬,৯১,১২,৭৪৬ | ৮,৪৭,৩৬,৩৭৩ | ৬,৮৮,২৪,৪৪৩ | ৩,১০,৫০,৩০০ | ১,৮২,৬৭,৮৬৬ |

সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি গালার হিসাব :—

| | ১৯২৪-২৫ | ১৯২৫-২৬ | ১৯২৬-২৭ | ১৯২৭-২৮ | ১৯২৮-২৯ |
|---|---|---|---|---|---|
| গালা (টিক্‌লি বা বোতাম) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ২১,৬১২ | ২১,৬৭৮ | ২০,৬২৬ | ১৮,০৪২ | ২৪,৭১৪ |
| মূল্য (টাকা) | ৪৪,৫০,১২২ | ৩৩,৩৪,৬৭৮ | ২১,৭৭,১৩৯ | ২৮,৩৯,২৪৫ | ৩৪,৪০,৮০৮ |

| | ১৯২৪-২৫ | ১৯২৫-২৬ | ১৯২৬-২৭ | ১৯২৭-২৮ | ১৯২৮-২৯ |
|---|---|---|---|---|---|
| গালা (সীড বা বীজ) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৩৫,১২৯ | ৩৭,১২৪ | ৮৯,৩৮৯ | ৫৪,৬৯৪ | ৯২,৪২০ |
| মূল্য (টাকা) | ৫৮,৪০,২৮৭ | ৪৪,২৯,১৬৪ | ৭২,৩৬,৩৯৮ | ৬৭,৭০,১৫২ | ১,০০,৫১,০৪৬ |
| গালা (সেল বা চাঁচ) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৩,২৭,২০০ | ৪,১৬,৫৯০ | ৪,২৪,৯৩৬ | ৪,০৪,৩৬৭ | ৫,২০,৭৪৬ |
| মূল্য (টাকা) | ৬,২৫,৬৩,৩৪৩ | ৫,৭৬,২৭,১৮২ | ৪,৩২,৪৪,৬৩১ | ৫,৬৮,৫৭,৪৩০ | ৬,৮১,৬১,১৬৮ |
| গালা (ষ্টিক বা বাতি) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৬,৪৯৪ | ২২,৭৮৩ | ৭,২২০ | ৯,১৩০ | ২৬,৫১৪ |
| মূল্য (টাকা) | ৭,৩৪,৭২১ | ১৯,২৫,৯৪৬ | ৪,৭১,৩৬৯ | ৭,৭৫,৬১৯ | ২০,৪৫,৫০৮ |
| গালা (অন্যান্য) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৩৬,৫৮২ | ৪১,৪৪৯ | ৪৯,৮৫৯ | ৫৭,৩৫১ | ৬৯,০০৯ |
| মূল্য (টাকা) | ১৯,১৭,৭৩৩ | ১৬,৯২,৯৯৮ | ১৫,৯৪,০৫১ | ২৬,৪৩,৪১০ | ২৭,২৬,৫৬৪ |

এখন সর্ব্বসমেত মোট রপ্তানির হিসাব দেখুন এবং কোন্ প্রদেশ হইতে কত পরিমাণ মাল রপ্তানি হইয়াছে এবং তাহার দাম কত পাওয়া গিয়াছে তাহাও দেখুন ; এই অর্থের সর্ব্বাধিক অংশ পাইয়াছে সেইসকল বিদেশী বণিক্ যাহারা কলিকাতায় বসিয়া ইহার কারবার করিতেছে। যাহারা উৎপাদন করিতেছে তাহাদের লাভ মজুরিমাত্র। মুসলমানগণই সাধারণতঃ ইহার উৎপাদন-কার্য্যে নিযুক্ত; হিন্দুর সংখ্যা অল্প। মুসলমান-নেতারা স্বজাতীয়দের অন্নরক্ষার জন্য এযাবৎ এদিকে কি চেষ্টা করিয়াছেন ?

## মোট রপ্তানি

| | ১৯২৪-২৫ | ১৯২৫-২৬ | ১৯২৬-২৭ | ১৯২৭-২৮ | ১৯২৮-২৯ |
|---|---|---|---|---|---|
| গালা (সর্ব্ব রকম) | | | | | |
| পরিমাণ (হন্দর) | ৪২৭,০১৭ | ৫৩৯,৯২৪ | ৫৯২,০৩০ | ৫৪৩,৫৮৪ | ৭৪৩,৪০৩ |
| মূল্য (টাকা) | ৭,৫৫,০৬,২০৬ | ৬,৯০,০৯,৯৬৮ | ৫,৪৭,২৩,৫৮৮ | ৬,৯৮,৮৫,৮৫৬ | ৮,৬৪,২৬,০৯৪ |

## প্রদেশ হিসাবে রপ্তানির মূল্য

| | ১৯২৪—২৫ | ১৯২৫—২৬ | ১৯২৬—২৭ | ১৯২৭—২৮ | ১৯২৮—২৯ |
|---|---|---|---|---|---|
| | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা |
| বাংলা | ৭,৫৩,৯১,৩০৮ | ৬,৮৭,৫৯,২৮৯ | ৫,৪২,৯৪,৫৭০ | ৬,৯১,১২,৭৪৬ | ৮,৪৭,৩৬,৩৭৩ |
| বোম্বাই | ৬,১২৩ | ২,৫২০ | ২,১৯,৫১৪ | ৩,২২,৪৪৬ | ৪,০৭,৪১৫ |
| সিন্ধু (করাচী) | ৪৫,৪৭৩ | ১৮,৮১৪ | ৩০,৯৫৭ | ৫৭,৬৯২ | ৮৯,৫৭৭ |
| মাদ্রাজ | ১০,২৭৫ | ২০৩ | ১০,০১৭ | ২৯৫ | ৩১১ |
| ব্রহ্ম | ৫৩,০২৭ | ২,২৯,১৪২ | ১,৬৮,৫৩০ | ৩,৯২,৬৭৭ | ১১,৯২,৪১৮ |
| মোট | ৭,৫৫,০৬,২০৬ | ৬,৯০,৩৯,৯৬৮ | ৫,৪৭,২৩,৫৮৮ | ৬,৯৮,৮৫,৮৫৬ | ৮,৬৪,২৬,০৯৪ |

এই বৃহৎ কারবার যাহা বাংলায় বর্ত্তমান, ইহার কতটুকু বাঙালীর হাতে তাহার পরিচয় কেহ কি দিতে পারেন? বাঙালী চাষ করে, বিদেশী কারবার করে; অপরাধ বা ত্রুটি কাহার? বাঙালী শ্রমিকের না ধনিকের?

ইহার পর ১৯২৯-৩০ সন হইতে এই ব্যবসার পতন আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৯২৯-৩০এর পর হইতে ১৯৩১-৩২ সনের মাল রপ্তানি ১৯১৫-১৬ হইতে ১৯১৯-২০ সনের রপ্তানির দেড় গুণ অর্থাৎ ১৯১৯-২০ সনে রপ্তানি ৩,৭৫,৭০৬ হন্দর এবং ১৯৩১-৩২ সনে রপ্তানি ৪,৬৮,৭২৪ হন্দর; মূল্য হিসাবে ১৯১৯-২০ সনের মালের জন্য পাওয়া গিয়াছিল ৭২,৬৩,৭১৭৲ এবং ১৯৩১-৩২ সনে পাওয়া গিয়াছে ১,৮৩,৯৪,১৭২ টাকা। সুতরাং মধ্যে যুদ্ধ এবং বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য যন্ত্রাদির জন্য যে অসামান্য রপ্তানিবৃদ্ধি হইয়াছিল তদপেক্ষা এখন মালের চাহিদা কম হইয়াছে; চাহিদা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল ১৯২৮-২৯ সনে। ঐ বৎসর মূল্য পাওয়া গিয়াছিল ৮,৬৪,২৬,০৯৪৲ টাকা এবং মালের পরিমাণ ছিল ৭,৪৩,৪০২ হন্দর। ক্রমশঃ

চাহিদা-বৃদ্ধির সহিত মালের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু কোথায় এবং কি কার্য্যের জন্য ইহার চালান হইত, আর কেনই বা উহা বন্ধ হইল ইহার সংবাদ কেহ রাখে নাই; স্থানীয় বাণিজ্য-সমিতিসকল এ বিষয়ে কোন সংবাদ রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে নাই। ফলে রপ্তানিকারক অপেক্ষা উৎপাদকই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বহির্দ্দেশে চাহিদা না থাকায় মহাজন মাল কেনা বন্ধ করিয়া অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল না। কিন্তু উৎপাদক যে মাল তৈয়ারী করিয়াছে সে মালের অবস্থা কি হইবে? মার খাইতে তাহারাই খাইল। বৎসরে দুইবার লাক্ষার "চাষ" হয়। চাষ একবার বাড়াইলে সহসা তাহা কমাইতে বা বন্ধ করিতে পারা যায় না; মহাজনও তাহাদের অসহায় অবস্থা বুঝিয়া ওৎ পাতিয়া দর আশাতিরিক্ত কম করিয়া দেয়। ফলে উৎপাদকই মারা যায়; মধ্যস্থ মহাজন ও রপ্তানি-কারক অপেক্ষা উৎপাদকের ক্ষতি একারণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। ইহাদের বাঁচাইবার উপায় কি? ইহারা নিরক্ষর, দুনিয়ার কোনও খবরই ইহারা রাখিতে পারে না; সম্বৎসর খাটিয়া মাল উৎপাদন করিল, পরে সহসা শুনিল ও দেখিল যে তাহার মালের চাহিদা নাই; এ অবস্থায় নানারূপ গার্হস্থ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান থাকিলে উদ্বৃত্ত মাল কাটাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে। দেশের বাণিজ্য-সঙ্ঘ ও চেম্বার অব্ কমার্সসকল এ বিষয়ে যদি দৃষ্টি রাখে তাহা হইলে গরীব চাষী এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যায় না। বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের বহির্ব্বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি যদি নিয়মিতরূপে আলোচিত হয় এবং চাষীদের বা শিল্পীদের পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিপদটা গুরুতর হয় না। আর এক কথা, এদেশের কাঁচামাল কোথায় ও কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তাহার সম্যক সংবাদ প্রত্যেক ব্যবসায়ী সঙ্ঘের নিকট থাকা এবং পাওয়া উচিত। এখন শুধু গভর্ণমেণ্টের

রিপোর্ট ব্যতীত আর কোথাও কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, এবং সে সংবাদও দুই বৎসরের পুরাতন। এদেশে যেসকল ব্যবসায়ি-প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের কাহারও নিকট কোনও চল্‌তি সংবাদ পাওয়া যায় না। সকলেই প্রত্নতত্ত্ববিদের ন্যায় পুরাতন তত্ত্ব লইয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত বাদানুবাদ করিবার বা যে কোনও বিষয়ে ফতোয়া দিবার জন্য সতত ব্যগ্র। ইঁহারা মনে করেন যে, এইরূপ মত জ্ঞাপন করাই সমিতিসকলের কর্ত্তব্য; নিজেদের মতের মূল্য ইঁহারা এত বেশী মনে করেন যে, মনে হয় ইঁহাদের মত না পাইলে গভর্ণমেণ্ট বুঝি অচল হইয়া থাকিবে। সমিতিসকলের এই মনোভাবের ও কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন না হইলে ব্যবসায়িগণ প্রত্যক্ষ উপকার কিছু অনুভব করিতে পারে না এবং এই জন্যই সমিতিগুলি অকেজো বা ব্যক্তিবিশেষের সোপানারোহণের সহায়ক হইয়া থাকে মাত্র।

এদেশের সমগ্র রপ্তানি গালার অর্দ্ধেকের উপর মাল যায় আমেরিকায়। আমেরিকা যা মাল লয় তাহার অর্দ্ধেক যায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে। ইহা ব্যতীত জার্ম্মাণি, ইটালী, ফ্রান্স, চিলি, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান ইত্যাদি রাজ্যেও যথেষ্ট পরিমাণ মাল রপ্তানি হইয়া থাকে। বাঙালী ধনী কারবারীদের কি এদিকে দৃষ্টি পড়িবে না? ক্ষুদ্র চিলি রাজ্যেও সাড়ে চারি লক্ষ টাকার লাক্ষা রপ্তানি হয়। একজন বাঙালী ধনীর কি এই একটী মাত্র দেশের সহিত রপ্তানি-কারবার হস্তগত করিবার ক্ষমতা নাই?

বেকার-সমস্যা, অর্থকৃচ্ছ্রতা, ব্যবসা-মন্দা ইত্যাদি সর্ব্ববিধ অনিষ্টের মূল কোথায়? এদেশের বহুবিধ পুরাতন ব্যবসা ও গৃহশিল্প নষ্ট হইল কেন? তাহার প্রধান কারণ এই যে আমাদের দেশের যাবতীয় রপ্তানি ও আমদানি ব্যবসা বিদেশীদের হস্তে। বিদেশী নানাজাতি বাংলার উৎপন্ন জিনিষের ব্যবসা করে, ফলে যে কারণে বাণিজ্যে

লক্ষ্মী বসতি করেন সেই কারণটী হইতে বাঙালী বঞ্চিত হয় বলিয়া আজ বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার। বাঙালী যে জিনিষ উৎপাদন করে তাহার মজুরি মাত্র তাহার প্রাপ্য, উহার ব্যবসা করিলে যাহা প্রাপ্য হয় তাহা যায় অন্যের পকেটে। বাঙালী যতদিন না নিজের দেশের উৎপন্ন মালের ব্যবসার প্রতি নজর দিতেছে ততদিন তাহার কোনও আশা ভরসা নাই। পাট, চাল, কয়লা, চা এবং অন্যান্য গৃহশিল্পজাত দ্রব্য যাহা আছে, তাহার ব্যবসাটা যদি নিজেদের হস্তগত হয় তাহা হইলে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার জন্য মূলধন তুলিবার আবশ্যকই হয় না। এ কথাটা দেশের ধনীরা যদি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। বাংলার লুপ্তশিল্প উদ্ধার করিলেই দেশ ধনী হইবে না; দেশকে ধনবান করিতে হইলে, আবশ্যক ধনীদের চেষ্টা, যাহাতে বাংলার যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্য সমূহের রপ্তানি, আড়ৎদারী ইত্যাদি কাজগুলি শিক্ষিত সমাজের কবলে আসিয়া পড়ে, নচেৎ কোনও ফলই হইবে না। বাঙালীদের-কলের কাপড় বাঙালীর পয়সায় তৈয়ারী হইলেও উহার কেনা-বেচা যদি বাঙালী ধনীর অর্থে না হয় তাহা হইলে আসল মোটা লাভ যাইবে পরের উদরে, আর কলওয়ালা ধনিগণ কেবল মজুরি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তাহাতে ধন-বৃদ্ধি হইবে কি প্রকারে? বাংলায় শিল্পের অভাব নাই, কৃষির অভাব নাই, অভাব ধনীর উৎসাহ ও ব্যবসায় অর্থ-নিয়োগ। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে ততক্ষণ ধন-বৃদ্ধি ও বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না।

লাক্ষার কথা বলিতে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি; লাক্ষা কি করিয়া জন্মাইতে হয়, কোথায় জন্মে ইত্যাদি সংবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই; সে বিষয়ে যথেষ্ট পুস্তক আছে; ব্যবসার হিসাবও আছে। যাঁহাদের চক্ষু আছে এবং যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু

সেসমস্ত সংবাদ তাঁহারা চেষ্টা করিলেই পাইবেন। পাইবেন সব, কেবল পাইবেন না অর্থ। এই অর্থ ধনীর সিন্দুকে বন্ধ। আজ ভারতবর্ষের মধ্যে কৃষিজ, খনিজ বা শিল্পজ সম্পদে বাংলার ন্যায় সম্পত্তিশালী কোনও প্রদেশই নহে, কিন্তু বাঙালী তবু দরিদ্র কেন তাহাই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসা পরের হাতে তুলিয়া দিলে দেশ যত দ্রব্যই উৎপন্ন করুক না কেন তাহার ধন-বৃদ্ধি হইবে না। বড় জোর জন কয়েক শ্রমিক প্রতিপালিত হইবে মাত্র। বোম্বাই প্রদেশে কয়টা কৃষিজ বা শিল্পজাত দ্রব্য আছে আর বাংলাতেই বা কয়টা আছে? বোম্বাইয়ের তুলা এবং সূতা ও কাপড়ের কল বাদ দিলে বোম্বাইয়ের থাকে কি? অথচ এই একটী মাত্র সম্বলের সাহায্যে বোম্বাই আজ সর্ব্বাধিক ধনী; শিল্প-বৃদ্ধি বা কৃষিজ পণ্য বৃদ্ধি করিয়া তাহার ধন-বৃদ্ধি হয় নাই; ধনবৃদ্ধি হইয়াছে স্থানীয় ব্যাপার স্বীয় হস্তে রাখিয়া। বাঙালীর কলে কাপড় হইতেছে উৎকৃষ্ট, কিন্তু কারবারে টাকার অভাবে আজ কলের উৎপন্নের ব্যবসা বা "বেপার" যাইতেছে বোম্বাইওয়ালার ঘরে। কেন? ইহার জন্য দায়ী কে? শ্রমিক, শিক্ষিত সমাজ না ধন-কুবেরগণ? বাংলার ধনী সম্প্রদায়ই বাঙালীর অবনতির কারণ, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। এখনও কুসীদজীবীদের ও ভূম্যধিকারি-দলের কি চৈতন্য হইবে না? এ পাপ বাংলায় আজ প্রবেশ করে নাই; ইংরেজ রাজ্যের পত্তন হইতেই ইহা চলিয়া আসিতেছে; জানি না ভগবান ইহাদের কতদিনে চৈতন্য সম্পাদন করিবেন। মতি শীল, কৃষ্ণ পান্তি প্রভৃতি ধনী হইয়াছিলেন ব্যবসা করিয়া; সুদে টাকা খাটাইয়া বা জমীদারি করিয়া তাঁহারা ধনবান হন নাই; ব্যবসাতে ধনবান হইয়া পরে জমীদার ও ভূম্যধিকারী হন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ বিলাসব্যসনে রত হওয়ায় বা অন্য পেশা

অবলম্বন করায় আজ তাহাদের বংশধরগণের কুদৃষ্টান্তে উদীয়মান যুবকগণ বিপথে পরিচালিত হইতেছে। আমার বিবেচনায় নূতন শিল্প স্থাপন অপেক্ষা বা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা যদি দেশের ধনী ও ব্যবসায়িগণ প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপাদন হইতে তাহার বিকি-কিনি, রপ্তানি-আমদানি ইত্যাদি সমুদয় কার্য্য পরিচালনা বাঙালীর অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা সম্পন্ন করেন, তবেই বাংলার দুঃখ ঘুচিতে পারে, নচেৎ নহে। আমাদের নিজেদের হাতে রপ্তানি ব্যবসাটী না থাকায় দরুণ বহু শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্যের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অতি-লাভ-লোভী বিদেশী বণিক্‌দের অর্থগৃধ্নুতার দরুণ ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলার, বহু কারবার নষ্ট হইয়াছে। আমার লিখিত বহু প্রবন্ধে আমি ইহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

## লাক্ষার ব্যবহার

লাক্ষা বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; বিভিন্ন শিল্পি-সম্প্রদায় বিভিন্ন কার্য্যে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে; রং ও পালিশে ইহার ব্যবহার অপরিহার্য্য; কাষ্ঠের উপর বহুবিধ প্রকারে ইহা পালিশের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ফ্রেঞ্চ পালিশ, বার্ণিশ ও ল্যাকার ওয়ার্কে ইহা প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য। ব্রহ্ম, চীন এবং জাপানের লোক ইহার সাহায্যে কাঠের উপর যেরকম পালিশ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কারুকার্য্য করিয়া থাকে, তাহা আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনও জাতিই নকল করিতে পারে নাই। অতি অল্পমূল্যের অকেজো কাঠের দ্বারা লাক্ষার সাহায্যে ঐ দেশবাসীরা এমন একটি শিল্প গঠন করিয়া তুলিয়াছে এবং উহার রহস্য গুপ্ত রাখিয়া আসিতেছে যাহা অন্য কোনও দেশের রাসায়নিক ও শিল্পী এখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বাঁশের নানাবিধ নিত্য-ব্যবহার্য্য ও সৌখীন দ্রব্য এই লাক্ষার সাহায্যে পালিশ হয় এবং বহুমূল্যে উহা

সর্ব্বত্র বিক্রী হয়। গ্রামোফোন, ডিক্টাফোন এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রের নানাকার্য্যে লাক্ষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত দলীল দস্তাবেজে ইহা বহুযুগ হইতে স্বীয় ব্যবহার অক্ষুন্ন রাখিয়া আসিতেছে। স্ত্রীলোকদের, বিশেষতঃ বাংলার স্ত্রীলোকদের, নানাবিধ প্রসাধন-দ্রব্যে ইহার ব্যবহার প্রচলিত। অধুনা তরল আল্‌তা নামক জলীয় পদার্থ নানা কারণে দেশী আল্‌তার পাতাকে স্থানচ্যুত করিয়াছে সত্য, কিন্তু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, প্রকৃত আল্‌তা বহু কারণে তরল আল্‌তা অপেক্ষা জনপ্রিয় হওয়া উচিত। প্রথমতঃ, তরল আল্‌তা নামক পদার্থে আল্‌তা বিন্দুমাত্র নাই, উহা জার্ম্মাণ রং হইতে প্রস্তুত। দেশী আল্‌তায় যেসকল গুণ ও উপকার বর্ত্তমান তরল আল্‌তায় তাহা আদৌ নাই। বহু পরিমাণে জল ব্যবহারের ফলে পদযুগলে যেসব চর্ম্মরোগ দেখা দেয় আলতা ব্যবহার করিলে জলোদ্ভূত ঐসকল ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না; তারপর ইহা রাখিবার জন্য অন্য পাত্রের আবশ্যক হয় না, কাপড় চোপড়ের সহিত আল্‌তা পাতা নির্ভয়ে রাখা যায়, রংএর দাগ লাগিবার বা শিশি ভাঙ্গিয়া গড়াইয়া পড়িয়া অন্য জিনিষে দাগ বা রং লাগিবার কোনও ভয় নাই। ইহার ওজন নগণ্য এবং সর্ব্বত্র নির্ব্বিবাদে ইহা সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করা যায়। তরল-আলতার শিশি ভাঙ্গিবার ভয় আছে, ছিপি খুলিয়া যাইয়া মাল নষ্ট হইবার ও অন্য জিনিষে দাগ লাগিবার ভয় আছে, তদুপরি ইহার ভার আছে এবং ডাকে লইতে ইহার মাশুল অধিক পড়ায় ইহার খরচ পাতা-আল্‌তা অপেক্ষা বেশী পড়ে। এই অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দিনে এসকল বিষয় সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত। তারপর তরল আল্‌তার খরচের অধিকাংশ নানা বাবদে—যথা মূল রং, শিশি, ছাপার খোল, লেবেল ইত্যাদি—ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়; ইহার দরুণ তৈয়ারী তরল আল্‌তার মূল্য অধিক পড়ে; সুগন্ধি এসেন্স

মিশ্রিত করিলে খরচ আরও বেশী পড়ে এবং উহার মূল্যও বিদেশে চলিয়া যায়। এসকল চিন্তা করিয়া সকলের কর্ত্তব্য এই আল্‌তা-শিল্প সম্বন্ধে পুনরায় মনঃসংযোগ করা ও উহার পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করা। ইহাতে অনেক গরীব-গৃহস্থের অন্ন সংস্থান হইবে, ইহা সম্পূর্ণ গার্হস্থ্য শিল্প এবং স্ত্রীলোকগণের উপরি আয়ের একটি সুগম রাস্তা বা উপায়। যেসকল জেলায় গালা উৎপন্ন হয় বা হইত তথাকার বহু গৃহস্থ পরিবার এই কার্য্যে বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত এবং পাইকারগণ লোক পাঠাইয়া প্রত্যেক গৃহস্থের ঘর হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া দেশ-বিদেশে চালান দিত। গন্ধবণিক্ সম্প্রদায় আল্‌তা ব্যবসার দিক্‌টা নিজেদের হস্তে রাখিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা অধিকতর ধনী বা অর্থবান হওয়ায় এ সব "ছোট" কার্য্যে আর মনঃসংযোগ করেন না। জার্ম্মাণ রং আমদানি ও তাহা তরল-আল্‌তা তৈরীতে ব্যবহার হইবার প্রথম পর্ব্বে যদি বণিক্-সম্প্রদায় স্বীয় স্বার্থ ও দেশের এই শিল্পটী রক্ষার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণের সাহায্যে পবিত্রতার অজুহাতে তাঁহারা ইহা নিশ্চয়ই বহু পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিতেন। অলক্ত বা আল্‌তা পূজাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ায় পবিত্রতার দিক্ হইতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ পূজা-কার্য্যে তরল-আল্‌তার ব্যবহার বন্ধ রাখিতে পারিতেন; ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পবিত্রতা রক্ষার অজুহাতে দেশের কতকগুলি শিল্প এখনও অব্যাহত রাখা হইয়াছে। যে সকল অর্থনৈতিক ও উগ্র স্বদেশী "ভক্ত"গণ ধর্ম্মের দোহাইএর ব্যবস্থাকে হেয় ও উপহাস্য করিয়া আনিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ, যেন লোকের ধর্ম্মভাবকে উপহাস করিয়া তাঁহারা সর্ব্বনাশের পথ আরও প্রশস্ত না করেন।

লাক্ষার ব্যবসা এখনও সজীব ব্যবসা। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক; ইহার উৎপাদন-ব্যয় যদি কম করিতে

পারা যায়, মধ্যস্থ নানাবিধ কারবারী যদি এদেশী হয়, তাহা হইলে বিদেশী জার্ম্মাণ, ইহুদী, সাহেব, আমেরিকান ইত্যাদি যাহারা এখন এই ব্যবসায় লিপ্ত, তাহাদের অপেক্ষা বহু কম লাভে এই দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে এবং তাহা হইলে ও পড়তা ন্যায্য হইলে আমদানিকারক বিদেশী জাতিসমূহ সন্তুষ্ট থাকিবে এবং ইহার চাহিদা ঠিক থাকিবে, বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। বিদেশী কারবারী স্বদেশী কারবারীর ন্যায় কম লাভে সন্তুষ্ট হয় না; যতদিন অন্য দেশের লোক উৎপাদন-মূল্যের সংবাদ পায় না ততদিন তাহারা বাধ্য হইয়া রপ্তানিকারকের দাবীমত দাম দিয়া থাকে; কিন্তু যখন তাহারা ঘরের খবর পায় তখনই তাহারা বিগড়াইয়া যায় এবং প্রতিনিধি-দ্রব্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। ভারতের রংএর কারবার যথা, নীল, কুসুমফুল, পিউড়ী ইত্যাদি দ্রব্যের কারবার বিদেশী রপ্তানি ব্যবসাদারের অর্থগৃধ্নুতার ফলে নষ্ট হইয়াছে; পাট, লাক্ষা, রেশম ইত্যাদিও যায় যায়; দেশের ব্যবসায়ি-সঙ্ঘ ও ধন-বিজ্ঞান সমিতিসকল কি এবিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা সম্মানজনক বা যৌক্তিক মনে করেন না?

উন্নত দেশগুলিতে কৃষি, শিল্প, খনিজ, আরণ্য ইত্যাদি দ্রব্যের উৎপাদনের ভার একশ্রেণীর উপর; ইহারা উৎপাদনের জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে; ধনী ইহাদের এই কার্য্যের জন্য অর্থ যোগায়। উৎপন্ন মাল সংগ্রহ, তাহার বিস্তার ও রপ্তানি-কার্য্যে অন্য একদল ধনী অর্থ যোগায়। খরিদ্দার সংগ্রহ ও তাহাদের মাল নানারকমে বিক্রয় করিবার জন্য আর একদল ধনী অর্থ যোগায়। আমাদের বাংলা দেশে কেবল সকলে মাল উৎপাদনের চেষ্টায় ব্যস্ত এবং যা দু'চার জন ধনী আছেন তাঁহারা এই দিকেই মনঃসংযোগ করেন; কিন্তু মালটা কাটাইবার জন্য যে সকল তোড়জোড়ের প্রয়োজন তদর্থে কেহ অর্থ ন্যস্ত করেন না;

ব্যাঙ্কগুলিও বাঙালী কারবারীকে রীতিমত সাহায্য করেনা। এই কারণে বাংলা আজ নানা সম্পদের অধিকারী হইয়াও বাণিজ্য-জগতে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। শুধু চীৎকার করিলে বা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিলে হইবেনা, চাই প্রত্যেক প্রকরণের জন্য অর্থের যোগাড়। নচেৎ সহস্র শিল্প ও অগণিত কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্য উৎপাদন করিলেও আমাদের দুঃখ কোন কালে ঘুচিবে না। কয়েকটা অর্থনৈতিক সমিতি, ব্যবসায়ী সমিতি ইত্যাদির সম্পর্কে আসিয়াছি। কিন্তু এই মূলনীতির দিকে কাহাকেও মনঃসংযোগ করিতে বড় একটা দেখি নাই।

মুৎসুদ্দীজাতীয় ধনীর প্রয়োজন এখন অত্যন্ত অধিক; বাঙালী ধনী এই কাজ করিয়া বিদেশী দরিদ্রকে কোটীপতি করিয়া দিয়াছে, বাঙালী মুৎসুদ্দীর সাহায্যেই বিলাতী কাপড় ও বিদেশী দ্রব্য আজ এদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; যদি ঐ জাতীয় বাঙালী মুৎসুদ্দী দেশীয় উৎপন্নের প্রতি আগ্রহবান হইয়া অর্থ ন্যস্ত করেন তাহা হইলেই বাঙালীর কৃষি ও শিল্প-সম্পদ্ বাঙালীর দুরবস্থা দূর করিতে পারিবে, নচেৎ নহে। নবশিল্প প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা উৎপন্ন দ্রব্য কাটাইবার ও উৎপাদককে সাহায্য করিবার ইচ্ছা লইয়া যদি বাঙালী ধনী কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তবেই মঙ্গল, নচেৎ শত সহস্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেও দেশের অবস্থার কণামাত্র উন্নতি হইবে না, ন্যস্ত মূলধন নষ্ট বা পরহস্তগত হইবে মাত্র।

## আলোচনা

বক্তৃতা-শেষে আলোচনা আরম্ভ হয়, এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলী বিতর্কে যোগদান করেন। অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস লাক্ষার স্থলাভিষিক্ত দ্রব্যসমূহের অর্থনৈতিক কিম্মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, ঐ

চিজ এখন আমেরিকা, জার্ম্মাণি প্রভৃতি বিজ্ঞানোন্নত দেশসমূহে গাদায় গাদায় প্রস্তুত হইতেছে, ফলে ভারতীয় লাক্ষার চাহিদা খুব কমিয়া গিয়া মাত্র যে পরিমাণ সিন্থেটিক লাক্ষার প্রয়োজন সেই পরিমাণে পরিণত হইয়াছে। বিখ্যাত এডিসন ফ্যাক্টরীতে কাজ করিবার সময় গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরী করিবার জন্য অধ্যাপক দাস কিভাবে সিন্থেটিক লাক্ষা প্রস্তুত করিতেন তাহা বর্ণনা করেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মৌলিক বলেন যে, লাক্ষার দরের এই উঠা-নামার জন্য অযথা উৎপাদনই দায়ী। চাহিদার দিকে নজর না রাখিয়া উৎপাদন করিবার ফলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তাঁহার মতে, ভারতীয় লাক্ষা-সমিতির পক্ষে প্রত্যেক বৎসর লাক্ষা-উৎপাদনের একটী পূর্ব্বাভাষ তৈরী করিয়া সম্ভব হইলে চাহিদা-মাফিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক সরকার গোটা বিতর্কটীর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, আথিক মন্দার জন্য বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে লাক্ষা রপ্তানি হ্রাস পাইলেও বর্ত্তমান রপ্তানির হার লড়াইয়ের পূর্ব্বের হার অপেক্ষা বেশী। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণিতে ভারতীয় লাক্ষার ব্যবহার হ্রাস পাইলেও জাপানে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং এ শিল্প সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। বিচিত্র ভবিষ্যৎই ইহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনি বলেন, পাট, কয়লা এবং তুলার মত এ শিল্পের প্রতিও বাংলাদেশের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

সরকার-পত্নীকে ধন্যবাদ প্রদানের পর অনুষ্ঠান সাঙ্গ হয়।

# ছোট বহরের চিনির কল*

অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, বি এস, সি এইচ ই, ইলিনয়, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণের পরামর্শদাতা

[ ১৯৩৩ সনের ৫ই নবেম্বর তারিখে ৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ৬ষ্ঠ বৎসরের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সদস্যগণ ছাড়া বহু খ্যাতনামা ব্যবসায়ীও সভায় যোগদান করেন, এবং বক্তা যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেক্‌নিক্যাল কলেজের অধ্যাপক বাণেশ্বর দাসের বক্তৃতার পর ইহারা সকলেই আলোচনায় যোগদান করেন।

সভাপতি কর্ত্তৃক কয়েকটী প্রাথমিক মন্তব্য প্রকাশের পর অধ্যাপক দাস বাংলায় ছোট-খাট চিনির কল প্রতিষ্ঠার সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ]

মালদহের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সাহা মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, মালদহে একটি চিনির কারখানা বসাইবার আয়োজন হইতেছে। এই কারখানার নাম দেওয়া হইয়াছে "মালদহ কো-অপারেটিভ সুগার মিল লিমিটেড্‌" এবং ইহা কালিয়াচক থানার অন্তর্গত পঞ্চাননপুরে স্থাপিত হইবে। এই কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা তুলিতে ইংরেজ বাজার সহরের গণ্যমান্য লোক লইয়া একটী 'অর্গ্যানিজেশন কমিটি' গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির

* "আর্থিক উন্নতি" কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৪০ ( অক্টোবর ও নবেম্বর ১৯৩৩ ) সংখ্যায় প্রকাশিত ( প্রবন্ধের নাম "মালদহে চিনির কারখানা" )।

সভ্য হইয়াছেন মালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত জে, এন্ তালুকদার, জমীদার শ্রীযুক্ত যত্নন্দন চৌধুরী, উকিল শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সাহা, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মদনমোহন মেষিয়ার ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌঃ জহুর আহ্মদ চৌধুরী। কমিটির সভ্যগণের নাম দেখিয়া স্বভাবতই আশা হয় যে, এই চিনির কারখানা স্থাপিত হইতে কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন অথবা অর্থাভাব ঘটিবে না।

মাননীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সাহা মহাশয়ের অনুরোধে আমি এই প্রবন্ধ লিখিতেছি এবং এ সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াছি। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি যে, মাণিকচক থানার অন্তর্গত শ্যামসুন্দরী গ্রামে আর একটি ছোট চিনির কারখানা খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। শ্যামসুন্দরী কাছারীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় এই কারখানা স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা।

মালদহ জেলায় এবৎসর নূতন জমিতে আকের চাষ হইয়াছে। কিন্তু চিনির কোন কারখানা না থাকায় এই আক উপযুক্ত দামে বিক্রী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং তজ্জন্য কৃষকদের আক হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে গুড়ের উৎপাদন খুব বেশী হইবে এবং সেইজন্য গুড়ের দামও কমিয়া যাইবে। গুড় প্রস্তুত করিতে কৃষকদের যে খরচ পড়িবে, গুড় বিক্রী করিয়া তাহাও উঠিয়া আসিবে কিনা সন্দেহ। গুড় প্রস্তুত দ্বারা কদাচিৎ কৃষকেরা আকের চাষে লাভবান হইতে পারে; আক হইতে চিনি প্রস্তুত করাই লাভ করিবার একমাত্র উপায়। আর আক হইতে যাহাতে বেশী পরিমাণে চিনি পাওয়া যায় ও চিনির রং শাদা হয় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

যে দুই জায়গায় (পঞ্চাননপুর, শ্যামসুন্দরী) চিনির কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, সেই দুইটি স্থানই গঙ্গার ধারে অবস্থিত এবং

চিনির কারখানা স্থাপনের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। দুইটি গ্রামেই এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানেও যথেষ্ট আকের চাষ হইয়াছে, কাজেই সস্তা আক পাওয়া যাইবে। প্রস্তুত চিনি বিক্রয় করিতে কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না। পঞ্চাননপুর ও শ্যামসুন্দরীর নিকটবর্ত্তী হাট-বাজারে ও ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদহ সহরে এই দুই কারখানায় প্রস্তুত চিনি সহজে ও ভাল দামে বিক্রী হইয়া যাইবে। দরকার হইলে নৌকাযোগে গঙ্গার অপর পারে মুর্শিদাবাদ জেলায় ও সাঁওতাল পরগণায় এই কারখানা দুইটির চিনি বিক্রী করা যাইতে পারিবে। জলপথে মাল চালান দিতে খরচ খুবই কম হইবে। কাজেই সকল দিক্ হইতে দেখা যাইতেছে যে, দুইটি কারখানাই চিনির কারবারে লাভবান হইবে।

চিনি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা মালদহ জেলায় এই প্রথম। কাজেই উদ্যোগিগণকে প্রথমটা অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। তবে যাঁহারা প্রথমে এই ব্যবসায় নামিবেন তাঁহারা লাভও খুব বেশী করিতে পারিবেন। অতএব আশা করি তাঁহারা বেশী লাভের আশায় অগ্রগামী হইবার দরুণ বাধাবিঘ্ন সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। কারখানার পরিচালনার ভার একজন সুদক্ষ লোকের হাতে রাখার দরকার হইবে এবং যন্ত্রপাতিগুলি ভালভাবে চালাইবার জন্য একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ ছোট কারখানা চালান অতি শক্ত ব্যাপার নহে। বুদ্ধি খাটাইয়া সাবধানতার সহিত কাজ করিলে শাদা চিনি প্রস্তুত হইবে এবং উৎপন্ন চিনির পরিমাণও বেশী হইবে।

এইরূপ চিনির কারখানা সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। এইরূপ কারখানায় (ওপ্‌ন্ প্যান প্রণালীর) ভাল লাভ করিতে হইলে ইহার উৎপাদন-সামর্থ্য দৈনিক এক টন

হওয়া উচিত। অর্থাৎ দৈনিক ১ টন চিনি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। কারখানার আয়তন এক টনের কম হইলে লাভ ভাল হইবে না। দৈনিক একটন চিনি প্রস্তুত করিতে যে যন্ত্রপাতি দরকার হইবে তাহার দাম দশ হাজার টাকার বেশী হইবে না। তারপর কারখানা চালাইবার জন্য আরও পাঁচ হাজার টাকা মূলধন লাগিবে। মোট পনর হাজার টাকা ফেলিতে পারিলে কারখানা বেশ চলিবে। এই প্রণালীতে চিনি তৈয়ার করিলে ১৪ মণ আক হইতে এক মণ চিনি প্রস্তুত হইবে। আকের দাম চারি আনা মণ ধরিলে ১৪ মণের দাম ৩৷৷০ টাকা হইবে। চিনি প্রস্তুত করিবার খরচ সব ধরিয়া চিনির মণকরা ১৷০ আনার বেশী হওয়া উচিত নহে। অতএব প্রতি মণ চিনি প্রস্তুত করিতে মোট ৪৸০ আনা খরচ পড়িবে। খুব বেশী হইলেও ৫৲ টাকার বেশী হইবে না। শুনিতে পাইলাম, মালদহে আক ৶০ আনা মণ দরে পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে খরচ আরও কম পড়িবে। বিহারে ও বাঙ্গলা দেশে অনেক জায়গায় ৶০ আনা মণ হিসাবে আক পাওয়া যায়। মালদহে চিনির দর নিশ্চয়ই ১০৲ টাকা মণের কম নহে। উপরিউক্ত চিনি ৮৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিলেও মণকরা ৩৲ টাকা লাভ থাকিবে। দৈনিক একটন চিনি প্রস্তুত করিলে দৈনিক ৮০৲ টাকার উপর লাভ থাকিবে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর লাভের ব্যবসা আর কি আছে? কারখানা ১০০ দিন চালাইলে ৮০০৲ টাকা লাভ থাকিবে। আক শেষ হইয়া গেলে উপরি উক্ত কারখানায় সহজেই গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে। তজ্জন্য আর কোন সরঞ্জাম কিনিতে হইবে না। গুড় যদি সস্তায় পাওয়া যায় ও সস্তার বাজারে কিনিয়া রাখা হয় তাহা হইলে গুড় হইতে চিনি তৈয়ার করিয়াও যথেষ্ট লাভ পাওয়া যাইবে।

মালদহ জেলায় বাৎসরিক যত চিনির দরকার হয় তাহা তৈয়ার

করিতে অনেকগুলি এক টনের কারখানা বসাইতে হইবে। অতএব পঞ্চাননপুর ও শ্যামসুন্দরীতে কারখানা বসাইতে উদ্যোগিগণ আর বিলম্ব করিবেন না। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই যন্ত্রপাতি বসান শেষ করিতে হইবে। কাজেই এখনই যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া উচিত। তাহা না করিলে যথাসময়ে কারখানা তৈয়ারী হইবে না। আর দেরীতে কাজ আরম্ভ করিলে লাভও কম হইবে। আমার খুব আশা হইতেছে যে, মালদহবাসী উক্ত কারখানার অনুষ্ঠানে বিশেষ সহানুভূতি দেখাইবেন ও অংশ ( শেয়ার ) ক্রয় করিয়া আর্থিক সহায়তা করিবেন। প্রথম কারখানা কৃতকার্য্য হইলে ভবিষ্যতে আরও অনেক কারখানা বসিবে এবং তাহাতে মালদহ জেলার বিশেষ উপকার হইবে।

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে আকের চাষ প্রচলিত আছে, অনেকের বিশ্বাস এই ভারতভূমিতে সর্ব্বপ্রথম আকের উৎপত্তি হইয়াছিল। আমাদের দেশের বহু প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে চিনির ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

ভারতবর্ষ আকের জন্মভূমি হইলেও আধুনিক যুগে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত চিনি বিদেশ হইতে আমদানি হয়। গোটা ভারতবর্ষে বাৎসরিক ১০,০০,০০০ টন চিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বঙ্গদেশ প্রায় ৫০,০০০ টন চিনি ব্যবহার করে।

আমাদের দেশে যে চিনির আমদানি হয় তাহার অধিকাংশই জাভা হইতে আসিয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রতিবৎসর যে চিনি বিদেশ হইতে আমদানি হয় তাহার মূল্য প্রায় ২০ কোটী টাকা। ইহার অর্দ্ধেকই বাঙ্গলা দেশের লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে দুনিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষে আকের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে হাওয়াই দ্বীপ, কিউবা ও জাভা আকের চাষে ভারতবর্ষকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, জাভা প্রভৃতি

আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আকের চাষ-আবাদ এবং সারের প্রয়োগ হয়। সেই জন্য এইসকল স্থানে বিঘা প্রতি আক ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বেশী উৎপন্ন হয়। তারপর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আজকাল নূতন নূতন রকমের আকের স্থষ্টি হইয়াছে এবং এইসকল আকে বেশী পরিমাণ চিনি থাকে। এই জাতীয় নূতন আকের প্রচলন আমাদের দেশেও ক্রমশঃ হইতেছে। তারপর আজকাল অনেক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে আক হইতে রস বাহির ও রস হইতে চিনি তৈয়ার করা হইয়া থাকে। এইসকল আধুনিক উন্নত প্রণালীর ও যন্ত্রাদির সাহায্যে বিঘা প্রতি চিনি জাভা প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাভায় বিঘা প্রতি প্রায় ৪০ মণ চিনি হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে বিঘা প্রতি গড়ে ১৫।২০ মণের বেশী চিনি হয় না।

আজকাল নূতন রকমের আকের প্রবর্ত্তন হওয়ায় ভারতবর্ষে বিঘা প্রতি আক বেশী জন্মাইতেছে এবং তাহাতে বিঘা প্রতি চিনি বেশী পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চিনি তৈয়ার করিলে আরও বেশী চিনি পাওয়া যাইবে। বাঙ্গলাদেশে যে আক উৎপন্ন হয় তাহাতে চিনির পরিমাণ বেশী থাকে। কাজেই বাঙ্গলা দেশে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বিঘা প্রতি বেশী চিনি উৎপন্ন হইবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকে একত্রে যত চিনি বৎসরে খাইয়া থাকে এক বঙ্গদেশের লোকে সেই পরিমাণ চিনি খাইয়া থাকে। অতএব বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশই চিনির কারখানা খুলিবার উপযুক্ত স্থল। বর্ত্তমানে বিদেশী চিনির উপর যে শুল্ক বসিয়াছে তাহার সাহায্য লইয়া মাড়োয়ারী ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ধনীরা বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে অনেক চিনির কারখানা খুলিয়া চিনি প্রস্তুত করিতেছেন এবং এই ব্যবসায়

প্রচুর লাভ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা চিনির কারবারে বেশী লাভের আশা থাকা সত্ত্বেও আজও একটিও চিনির কারখানা বাঙ্গালীর মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হইল না। এখনও যদি বাঙ্গালী ধনীদের চোখ না ফোটে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ধকারময়।

বিদেশী চিনির উপর ১৫ বৎসরের জন্য শুল্ক বসানো হইয়াছে। কাজেই এই ১৫ বৎসর চিনির ব্যবসায় যথেষ্ট লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫ বৎসর পরে শুল্ক উঠিয়া গেলে বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতায় দেশী চিনিকে দাঁড়াইতে হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আকের চাষ ও আধুনিক উন্নত প্রণালীতে আক হইতে চিনি উৎপাদন করিতে হইবে। অর্থাৎ বিঘা প্রতি আক বেশী জন্মাইতে হইবে এবং আকের মধ্যে যাহাতে বেশী চিনি থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে! ইহা না করিতে পারিলে প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশী চিনি কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিবে না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতবর্ষের ধনীরা, যাঁহারা চিনির ব্যবসায় লাখ লাখ টাকা ফেলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এখন হইতে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। আশা করি তাঁহারা ইহার সমাধান করিতে পারিবেন এবং ভারতবর্ষের চিনির ব্যবসাকে চিরদিনের জন্য শক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে যেন বিদেশী চিনি আর ভারতবর্ষে আসিতে না পারে।

আজকাল চিনির কারবারে লাভ করিতে হইলে বড় একটি কারখানার উৎপাদন-সামর্থ্য দৈনিক ৫০০ টন হওয়া উচিত। অর্থাৎ এই কারখানায় ২৪ ঘণ্টায় ৫০০ টন আক নিষ্পেষিত হওয়া দরকার এবং তাহা হইতে যে রস পাওয়া যাইবে তাহা চিনিতে পরিবর্তিত করিবার সাজসরঞ্জাম থাকা দরকার। এইরূপ কারখানা (৫০০ টন) স্থাপন করিতে ১০ হইতে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন চাই। বিদেশী চিনির

উপর শুল্ক স্থাপনের পর আমাদের দেশে যেসকল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই উৎপাদন-সামর্থ্য ৫০০ টন, কয়েকটা কারখানার সামর্থ্য ৫০০ টনেরও বেশী, আর কতগুলির ৫০০ টনের কম। ৫০০ টনের কম সামর্থ্যের কারখানাগুলি শেষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে কিনা সন্দেহ।

এখন ১০-১৫ লক্ষ টাকা মূলধন তোলা বাংলা দেশে একরকম অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে এবং সেই জন্যই আজ পর্য্যন্তও বাঙালীরা একটিও বড় চিনির কারখানা স্থাপন করিতে পারে নাই। এ অবস্থায় ছোট ছোট চিনির কারখানা অর্থাৎ দৈনিক ১ টন অথবা ½ টন চিনি তৈয়ারি করিবার কারখানা স্থাপন করা উচিত কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। এইসকল আলোচনার ফলে দেখা যাইতেছে যে, এইজাতীয় ছোট কারখানায় যথেষ্ট লাভের আশা আছে। বাংলাদেশে এইজাতীয় অনেকগুলা কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং যতদূর জানা যাইতেছে সেগুলি ভালভাবেই চলিতেছে। এইজাতীয় ছোট কারখানার অনেকগুলি সুবিধা আছে যাহা বড় কারখানার নাই। যথা, এই সকল ছোট কারখানা মফঃস্বলের যে-কোনো স্থানে (যেখানে আকের চাষ হয়) স্থাপন করা যাইতে পারে। তৈয়ারি চিনি স্থানীয় হাট-বাজারে ভাল দামে বিক্রী হইতে পারে। রেলওয়ের ভাড়া বাঁচিয়া যায় ও তাহাতে লাভ বাড়ে। দরকার মত ছোট কারখানা একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যাইতে ও সহজেই স্থাপন করা যাইতে পারে। খাঁটি দেশী চিনি বলিয়া স্থানীয় বাজারে চাহিদা বেশী হয় এবং দামও বেশী পাওয়া যায়। আকের দামও কম দিতে হয়। এইসকল ছোট কারখানা সুদক্ষ লোক লইয়া একটু ভালভাবে চালাইতে পারিলে বেশ শাদা চিনি তৈয়ারি করিতে পারা যায় এবং মণকরা চিনি তৈয়ার করিবার খরচ

এক টাকার বেশী হয় না। মূলধনও এরূপ কম লাগে যাহা বাঙ্গলাদেশের অনেকে ফেলিতে পারেন। আর বলা বাহুল্য এই মূলধনের উপর যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। বাঙ্গলাদেশে এই প্রকারের শতশত কল স্থাপিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা বহুলোকের উপজীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করা যায়। বড় মিলগুলি প্রতিযোগিতায় ছোট মিলগুলিকে অচল করিতে পারিবে না। বাঙ্গালী বাঙ্গলাদেশে চিনি তৈয়ার করিবার এক নয়া যুগ আনয়ন করিতে পারিবে।

## আলোচনা

বক্তৃতার শেষে যে আলোচনা হয় তাহাতে পাট-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত নির্ম্মল ঘোষ, চিনি-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত এম, এম, মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত নগেন চৌধুরি, শ্রীযুক্ত শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাজার দর, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আপন আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, আবার কেহ কেহ বক্তৃতা বা পরবর্ত্তী আলোচনায় উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অধিকতর তথ্য জ্ঞাত হইবার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করেন। অধ্যাপক দাশ এইসমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং আলোচনার ফলে বিষয়টী আরও বেশী পরিষ্কার হইয়া আসে।

## ছোট বহর সম্বন্ধে বিনয়বাবুর মতামত

গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক সরকার নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন। চিনি তথা অন্যান্য শিল্পের বেলাতেও উৎপাদনের বহর নিম্নলিখিত-রূপে কয়েকটী ক্রমবর্দ্ধমান শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা:— ১। কুটীর, ২। ছোটো-খাটো, ৩। মাঝারি, ৪। বড় ও ৫। বাঘা-বাঘা। উৎপাদনের এই বহরগুলি পৃথক পৃথক বাজার তথা

বিভিন্ন দর-দস্তুর-বিশিষ্ট। ফলতঃ নিট লাভের বেলায়ও সেইরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে বাঙালী জাতির পক্ষে ৫ হইতে ১৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুঁজি ঢালিয়া ছোটো-খাটো চিনির কল প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভবপর আর তাহাই বাঞ্ছনীয়। বড়-কিছু মোটের উপর বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয়। বাঙালী চাষীদেরও অবধারিতরূপে কিছু জমিতে সরিষা, তুলা, তামাক ও ইক্ষুর আবাদ করা দরকার। বাঙালীর প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায় দক্ষতা এবং আর্থিক মুরোদের দিক্ হইতে বিচার করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, যে-কোনো শ্রেণীর চিনির কল-কারখানা লইয়াই হউক বাংলায় এখনো বহু দিন স্বদেশী চিনি-শিল্প প্রসার লাভ করিতে পারিবে।

বিনয়বাবুর মতে,—বাঙালীর পক্ষে বর্ত্তমানে বড়গোছের কারবার ফাঁদা অসম্ভব। খুব জোর ক্বচিৎ কোথাও দু'একটা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। ছোট বহরের কারবারের উপরই এখনো অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঙালী ব্যবসায়ীদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। ছোট কারবারের মাল বেচিয়াও লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা আছে। এই কথা একমাত্র চিনির সম্বন্ধেই খাটে এরূপ নয়। অন্যান্য সকল বিষয়েও বাঙালীর পক্ষে ছোট বহরই একমাত্র ব্যবসার পথ।

উপসংহারে বিনয়বাবু বলেন,—আজও ভারতে (আর বাংলায়ও) গুড়ের চাহিদা কম নয়। অতএব গুড়ের চেয়ে খানিকটা উন্নত "মিষ্টি" জিনিষ যে-কোনো লোক তৈয়ারী করিতে পারিবে তাহার পক্ষেও একটা বাজার পাওয়া কঠিন হইবে না। পয়লা নম্বরের চিনি তৈয়ারি করিতে যাহারা অসমর্থ তাহারাও নিজ নিজ মালের জন্য এক একটা বাজার পাইতে পারিবে। মালদহের কথাই ধরিতেছি। এখানকার ছোট কারখানায় ঠিক কোন্ নম্বরের কোন্ শ্রেণীর আর কোন্ রঙের চিনি বাহির হইবে তাহা এখনো হয়ত বুঝা যাইতেছে

না। কিন্তু যাহাই বাহির হউক না কেন, তাহা কিনিবার লোক মালদহ জেলার ভিতরেই আর কিছু-কিছু আশে-পাশেও পাওয়া যাইবার কথা। তাহার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা পয়লা নম্বরের উৎকৃষ্ট চিনির সঙ্গে টক্করে ভয় পাইবার কোনো কারণ নাই।

অধিকন্তু জানিয়া রাখা ভাল যে, এখনো বাংলাদেশে (আর ভারতেও) বিদেশী চিনির আমদানি রুখিবার জন্য অনেক নতুন স্বদেশী কল কায়েম করা আবশ্যক। "অতি-উৎপাদনের" ভয় এখনো নাই। বাঙালীর পক্ষে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আহাম্মুকি। ছোট, বড়, মাঝারি, যে বহরেরই হউক চিনির কল বাঙালীর তাঁবে চালিত হওয়া উচিত।

সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ শিল্প-বাণিজ্যে ছোট বহরের কারবারের ঠাঁই এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। বড় বহরের কম-সে-কম মাঝারি বহরের যুগ চলিতেছে। বড় বা মাঝারি কারবার হইতে যেসকল মাল বাহির হয় তাহার সঙ্গে ছোট বহরের কারবারের মালের পক্ষে টক্কর দেওয়া খুবই কঠিন। এই সব সোজা কথা জানা সত্ত্বেও ছোট বহরের পক্ষে যুক্তি ঢুঁড়িয়া বাহির করিতেছি আর পাতি দিতেছি। তাহার একমাত্র কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙালী পুঁজিওয়ালাদের পক্ষে ছোট বহরের কারবার চালাইতে সুরু না করিলে বাঙালী জাত কোনো দিনই শিল্প-বাণিজ্যে মাথা খাড়া করিতে পারিবে না। গণ্ডা-গণ্ডা ডজন ডজন বা শত শত বাঙালী ছোট বহরের কারবারে হাত মক্‌স করিতে থাকুক। তাহাদের অনেককেই ফেল মারিতে হইতে পারে। কিন্তু এই ধরণের পরাজয়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতেই বাঙালী জাত কালে একদিন হয়ত কারবারী জাতে পরিণত হইতে পারে।

# কাপড়ের কলে বাঙালী*

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাশগুপ্ত, রাসায়নিক এঞ্জিনীয়ার

[১৯৩৩ সনের ১৯শে নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় ৯৬নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ষষ্ঠ বৎসরের দ্বিতীয় সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় নিউ ইণ্ডিয়া কটন মিলের শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দাশগুপ্ত কাপড় ছাপা ও রঞ্জন সম্বন্ধে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া "কাপড়ের কলে বাঙালী" শীর্ষক একটী বক্তৃতা করেন।

সভায় বহু যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাশেষে ইঁহারা সকলেই আলোচনায় যোগদান করিয়া নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সভায় যোগদানকারী ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেডের ভূতপূর্ব্ব পরিচালক শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব, হোম ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল অ্যাসোসিয়েশানের শ্রীযুক্ত আনন্দসুন্দর বসু, ওরিয়েণ্টাল ডায়ার্সের মিহিরকুমার দাস, যাদবপুর কলেজের অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, ডাঃ হেমচন্দ্র রায়, ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত, ইণ্ডো-সুইস্ ট্রেডিং কোম্পানীর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র দাশগুপ্ত, "আর্থিক উন্নতি"র ডিরেক্টার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট বক্তার পরিচয় প্রদান করিয়া অধ্যাপক সরকার বলেন যে, আলোচ্য বিষয়টী সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোনো

* "আর্থিক উন্নতি", কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত। (অক্টোবর ও নবেম্বর ১৯৩৩।)

কালেই আলোচনা তো হয়ই নাই, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষাতেও এই ধরণের বিষয় লইয়া ভারতীয় আলাপ-আলোচনার সংখ্যা অতীব নগণ্য।

প্রমোদবাবুর বক্তৃতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ]

## বড়োদার কলাভবন

আমি ১৯১৯ সনে বড়োদার কলাভবনে প্রবেশ করি। "কেমিক্যাল টেক্‌নলজি"—বিশেষভাবে রং ও তৎ-জাতীয় পদার্থ সম্বন্ধে শিক্ষা করিব স্থির করি।

বড়োদা "কলাভবন" বড়োদার মহারাজার একটি প্রধান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এখানে অর্থকরী ও অন্যান্য কলাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে নয়টি বিভাগ আছে। তন্মধ্যে ডাইং, প্রিন্টিং, উইভিং ও স্পিনিং অন্যতম। বিদেশে শিক্ষা-প্রাপ্ত প্রফেসারগণ খুব যত্ন-সহকারে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

এখানকার লেবরেটরী খুব বড় ও সুন্দর। সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের পরীক্ষা এখানে করা চলে। এখানকার কেমিক্যাল টেক্‌নলজি বিভাগের নানাজাতীয় রং পরীক্ষা করিবার লেবরেটরী খুব সুন্দর ও সমস্ত রকমের ব্যবস্থা বেশ আধুনিক।

এই বড়োদা কলাভবনে মহারাজা বিভিন্ন দেশীয় ছাত্রদের পড়িবার ও নানাবিধ ট্রেনিং পাইবার জন্য যথেষ্ট টাকা খরচ করিয়া সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এখানে কেমিক্যাল টেক্‌নলজি বিভাগে তিন বৎসর পড়িতে হয়। আমার কলেজে সায়েন্সের বিষয়গুলা পড়া ছিল বলিয়া সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। আমাদের সেকেণ্ড ইয়ারে লেবরেটরীতে সপ্তাহে ৩ দিন ৪ ঘণ্টা করিয়া ক্লাস হইত। কেমিক্যাল টেক্‌নলজির বিষয়ে সপ্তাহে ২ দিন ৪ ঘণ্টা করিয়া ক্লাস হইত।

থার্ডইয়ার ক্লাসে শুধু কেমিক্যাল টেক্‌নলজির থিওরেটিক্যাল ও প্রাকৃটিক্যাল ক্লাস হইত।

এখানে থিওরেটিক্যাল ও প্রাকৃটিক্যাল দুই-ই খুব ভাল হয়। এখানকার পড়া সমাপ্ত করিয়া আমি ১৯২২ সনে বোম্বে আসিলাম।

## তাবাছো ভাল্‌তেরা

বোম্বে আসিয়া আমি একটি সুইস্‌-ইটালিয়ান্‌ লেবরেটরী "তাবাছো ভালতেরা"তে কাজ নিলাম। সেই লেবরেটরীতে আমি কেমিষ্ট ও রং-পরীক্ষকভাবে নিযুক্ত হই। ইহাদের রং বোম্বাই ও ভারতীয় অন্যান্য কাপড়ের কলে প্রচলিত। বিভিন্ন মিল হইতে নমুনাস্বরূপ সূতা আসিলে সেই রংকরা সূতার নমুনা আমাদের পরীক্ষা করিতে হইত। আমার সঙ্গে আরো ৪ জন কেমিষ্ট ও রং-পরীক্ষক ছিলেন। আমিই একমাত্র বাঙালী ছিলাম।

যে সব রং ইহাদের কোম্পানী হইতে আসিত, সেই সব নানা জাতীয় রং পরীক্ষা করা হইলে মিলে পাঠান হইত। সেই সময় ইহাদের রংই বাজারে খুব প্রচলিত ছিল।

ইহা ছাড়া সূতা, রেশম ও পাটের উপর নানাবিধ রং করিয়া বিভিন্ন মিলে প্রচলনের চেষ্টায় পাঠান হইত।

আমাদের সকাল ৯॥০ টার সময় লেবরেটরীতে যাইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইত। দুপুরে ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ছুটী থাকিত। পরে ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইত।

এখানে প্রায় ১ বৎসর কাজ করার পরে আস্তে আস্তে "কাপড়ের কলে" প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

## বোম্বে কাপড়ের কল

আমি ১৯২৪ সনে কাপড়ের কলে প্রবেশ করি। প্রথমতঃ, করিমভাই মিলগুলির ভিন্ন ভিন্ন রং কলে ঘুরিলাম। ইহাদের মিলগুলির রং বিভাগ আধুনিক ভাবে তৈয়ারী। সমস্ত প্রকার রং ও ছাপার কাজ করিবার মত বিভিন্ন জাতীয় মেশিনের বন্দোবস্ত আছে। রং বিভাগের কাজ ইহাদের মিলের একটি বিশেষত্ব।

## করিমভাই মিল

আমি এই মিলে ৩।৪ মাস একজন পার্শী একস্‌পার্টের অধীনে এপ্রেন্‌টিস্‌ ভাবে কাজ শিখিয়াছিলাম। রং কলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ আমি দেখিতাম এবং দরকার অনুযায়ী যথাসম্ভব কাজে সাহায্য করিতাম। এখানে আমি শিক্ষানবীশ ভাবেই ছিলাম। এই মিলে থান রং করার কাজই বিশেষভাবে শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই মিলগুলিতে কিছু অভিজ্ঞতালাভের পরে আমি অন্য একটি মিলে গেলাম।

## মোরারজি গোকুলদাস ও অন্যান্য মিল

মোরারজি গোকুলদাস মিল বোম্বের একটি বেশ বড় কাপড়ের কল। এই কলের রং বিভাগের বিশেষত্ব এই যে, নানা প্রকার থান কাপড় কলে রং করিবার বন্দোবস্ত আছে। মেশিনের বন্দোবস্ত খুব ভাল। বিশেষতঃ, খাকি রংএর ড্রিল ও টুইল বেশ ভাল হয়। এখানকার মিলের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আমি "খাটাউ মাকানজি মিলে" যাই। এই মিলের রং কলও খুব সুন্দর এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন রকমের সুতা রং করা হয়।

তারপর, ই, ডি, সেস্থনএর মিলগুলির রং কল দেখিয়া প্রায় ১ বৎসর পরে আমেদাবাদে যাই। আমেদাবাদে কতকগুলা কাপড়ের কল দেখিয়া বাংলায় ঢাকেশ্বরী কটন মিলে আসি।

## ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্

১৯২৬ সনে আমি ঢাকেশ্বরী কটন মিলে প্রবেশ করি। এই মিলের রং কলের যাবতীয় কলকব্জা বসান হইল। নানাবিধ রং করার জন্য ৮টী কাঠের ভ্যাট ও সূতা সিদ্ধ করার জন্য একটি কিয়ার বসান হইল। ইহাতে এক সঙ্গে প্রায় ১২০০ পাউণ্ড সূতা বা কাপড় সিদ্ধ করা চলে।

সূতা এবং কাপড় রং ও ধোলাই হওয়ার পরে জল নিঙ্ড়াইবার জন্য একটি হাইড্রো-একস্ট্রাক্টর বসান হইল। ইহাতে প্রায় ১৫০ পাউণ্ড সূতা একসঙ্গে নিঙ্ড়ান হইত।

বিভিন্ন প্রকারের রং পরীক্ষা করার জন্য একটি লেবরেটরী খোলা হইল। বাজারের রং পরীক্ষা করিয়া রং করার জন্য নেওয়া হইত। এখানে দৈনিক ১০০০ পাউণ্ড সূতা রং ও ৫০০ পাউণ্ড সূতা ও কাপড় ধোলাই হইত।

এখানে ১॥ বৎসর কাজ করার পরে আমি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের "রং কলের" দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়া ১৯২৮ খৃঃ উহাতে যোগদান করিলাম।

## বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্

এই মিল শ্রীরামপুরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলা দেশের এই মিলটি অনেক হাত ঘুরিয়া বর্ত্তমানে মেসার্স ভট্টাচার্য্য,

চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং নামক ম্যানেজিং এজেণ্টসএর হাতে আছে। ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নরূপ :

১৮৯৪ খৃঃ বেঙ্গল স্পিনিং ও উইভিং কোম্পানী তখনকার চিফ্ জষ্টিস্ স্যর কুমার পেথেরাম দ্বারা স্থাপিত হয় এবং মেসার্স ভিমরাম এব্রাহিম্ অ্যাণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিযুক্ত হন। ইহারা অকৃতকার্য্য হওয়ায় ইহা ১৮৯৭ খৃঃ একজন ইংরেজ বণিকের হাতে যায়, এবং স ওয়ালেস অ্যাণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিযুক্ত হন। মিলের নাম বদল করিয়া শ্রীরামপুর কটন মিল নাম করা হয়।

ইহারাও মিল চালাইতে অক্ষম হন। মিলটি লিকুইডেশনে যায়। তৎপরে এই মিলটি বোম্বের মূল্‌জি গোবর্দ্ধনদাস হাতে নিয়া মিলের নাম লক্ষ্মী তুল্‌সী নামে পরিবর্ত্তিত করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদের হাতেও মিলটি সমৃদ্ধিশালী হইল না।

পরে ১৯০৬ খৃঃ স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের কয়েকজন নেতা ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন এবং ইহার নাম রাখিলেন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার পর মেসার্স ভট্টাচার্য্য চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্সি নিয়া মিলের কাজ চালাইতেছেন।

এই মিলে প্রায় ৩ বৎসর রং বিভাগে কাজ করার পরে বেঙ্গল সিল্ক মিলে রং বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করি। এখানে ভালভাবে কাজ করিয়া মিলের রংকলে যথেষ্ট উন্নতি দেখাইয়াছিলাম। রং ও কেমিক্যাল খরচ অনেক কম দেখাইয়াছিলাম, মজুর খরচও আংশিক ভাবে কম দেখাইয়াছিলাম।

## বেঙ্গল সিল্ক মিলস্

বেঙ্গল সিল্ক মিলস্ কলিকাতা উল্টাডিঙ্গিতে অবস্থিত। এই

মিলটি বহুকাল হইতে চলিতেছে। ইহাতে সিল্কের নানাবিধ জিনিষ তৈরী হয়, যথা, নানাপ্রকার রঙ্গীণ শাড়ী, বিভিন্ন নমুনার ও রংয়ের সার্টিং। কিন্তু সমস্তই কাঁচা রংএ তৈরী হইত। অনেকভাবে লেবরেটরীতে সিল্কের উপর রং করিয়া ঐ মিলে পাকা রংএর প্রচলন করিতে সমর্থ হই।

এখানে ঐ সূতা দিয়া সুন্দর সুন্দর সার্টিং ও শাড়ী তৈয়ারী হইত।

## কাপড়ের কলের রং

এখানে কাপড়ের কলের রং সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই—রং কলে তাঁত বিভাগ হইতে কোরা থান ও কাপড় ধোলাই ও বিভিন্ন জাতীয় রং করার জন্য আসে এবং স্পিনিং বিভাগ হইতেও কোরা সূতা ধোলাই ও নানাপ্রকার শেড্ করার জন্য নেওয়া হয়।

কোরা থান রং কিম্বা ধোলাই হওয়ার পরে ইস্ত্রি করিয়া ভাঁজ করা হয়।

## ধোলাই ( থান )

কোরা থান যদি ধোলাই করিতে হয় তবে কিভাবে কি করা হয় এই সম্বন্ধে আমি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিব। রং-কলে থান ও সূতা ধোলাই ও রং করার পূর্ব্বে জল পরীক্ষা করা দরকার।

সাধারণতঃ আমরা জানি যে জলের ভিতরে অনেক খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। রং বা ধোলাই করিবার পক্ষে কোন খনিজ মিশ্রিত জল একেবারেই ভাল নয়। রং কলে এত জলের প্রয়োজন হয়, যে

তাহা সকল সময় পরীক্ষা করিয়া দেখার সুবিধা হয় না। সব চাইতে ভাল উপায় নিম্নরূপ প্রতি ৪ গ্যালন গরম জলে, ২ তোলা সাবান দিলে যদি জল ঘোলা হইয়া যায়, এবং সাবান ভালভাবে মিশ্রিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, সে জল রং করিবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই নিম্ন-লিখিতরূপে জল ভাল করিয়া নেওয়া হয়।

৪ গ্যালন জলে সোডা অ্যাশ ২ তোলা, কষ্টিক সোডা ১ তোলা, আইজিপিন টি ১ তোলা দিয়া ফুটাইলেই জল ধোলাই করিবার উপযুক্ত হইবে।

## ধোলাইয়ের প্রণালী

থান কাপড় ধোলাই করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে বেশ ভাল ধোলাই হয়।

১। প্রথমতঃ থানগুলো ঠাণ্ডা জলে চৌবাচ্চায় ভিজাইতে হয়। ইহাতে কোরা থানের মাড় খানিকটা উঠিয়া যায়।

২। দ্বিতীয়তঃ ৩½° টডল সালফিউরিক এসিড্ জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

৩। তৃতীয়তঃ জলে বেশ ভাল করিয়া ধুইতে হয়।

৪। পরে ২° টডল কষ্টিক সোডা জলে ভিজাইতে হয়।

৫। তৎপরে কিয়ারএ ( সূতা ও থান সিদ্ধ করার কল—ইহা একটি বড় চৌবাচ্চার মত ) ষ্টিমের সাহায্যে সিদ্ধ করা হয়।

৪০ পাউণ্ড কষ্টিক সোডা, ২০ পাউণ্ড রেজিন, ২০০ গ্যালন জল দ্বারা ২৫০০ পাউণ্ড কাপড় ১০ পাউণ্ড ষ্টিম প্রেসারে ৬ ঘণ্টা সিদ্ধ করিতে হয়।

৬। দ্বিতীয়বার কিয়ারে ৭½ পাউণ্ড প্রেসারে ৩০ পাউণ্ড সোডা অ্যাশ ১৪০ গ্যালন জল দ্বারা ২ ঘণ্টা সিদ্ধ করিলেই চলে।

৭। ইহার পড়ে কাপড়গুলা প্রায় ১ ঘণ্টা গরম জলে ধোয়া হইলে পর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া, কাপড়ের জল নিঙড়ান হইলে কিয়ার হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে হয়।

৮। পরে ৩৫° টডল ব্লিচিং পাউডারে তিন ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

৯। তৎপরে জলে ধৌত করিয়া ৩½° টডল সাল‌ফিউরিক এসিড জলে ভিজাইতে হয়। পরে ভালভাবে মেশিনে ধুইতে হয়। এই মেশিনকে ধোলাই-কল বলা হয়।

১০। এইভাবে ধোলাই করা হইয়া গেলে, কাপড়ের জল মেশিনে নিঙড়ান হয়। এই মেশিনটিকে নিঙড়ান কল বলা হয়।

১১। ধোলাইর সময় কাপড়গুলা দড়ির মত লম্বা থাকে, তাই মেশিনের সাহায্যে খোলা হয়। এই মেশিনের নাম স্কাচার।

১২। পরে তিনটি রোলযুক্ত কেলেণ্ডার মেশিনের ও রোল ক্যালেণ্ডার মেশিনের সাহায্যে কাঠের রোলারে জড়ান হয়। ইহার পরে কাপড়গুলি রাসায়নিক দ্রব্য ও মাড়ের সাহায্যে চক্‌চকে বা ফিনিশ করা হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে শুকাইবার মেশিনে শুকাইয়া রোলারে জড়ান হয়। সুতা ধোলাইও প্রায় উপরিউক্ত ভাবেই হইয়া থাকে। অন্যান্য অনেক রকমে এবং নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ধোলাই হইয়া থাকে; কিন্তু সমস্ত বুঝান সম্ভব নয় বলিয়া একটি প্রক্রিয়ারই বর্ণনা করিলাম।

## রকমারি রং

সাধারণতঃ মিলের রং-কলে বেশীর ভাগই পাকা রংএর কাজ হয়। কাঁচা রং শুধু পাগড়ীর কাপড়, ছাতা ও ঐজাতীয় অন্যান্য জিনিষের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অনেক রকমের পাকা রং আছে। সাধারণতঃ ইহা নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত।

১। ডিরেক্ট
২। সালফার
৩। বেসিক্ ও এসিড্
৪। মরডেণ্ট ও এসিড্ ক্রোম, ইত্যাদি

ইহা ছাড়া প্রধান প্রচলিত পাকা রং

১। ইণ্ডানথ্রিন্ ও
২। নেপথল্

বিশেষভাবে বলিতে গেলে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য পর পর সমস্তগুলা রংএ ব্যবহৃত হয় তাহা অত্যন্ত জটিল ও তাহা বুঝান কষ্টসাধ্য। তথাপি নমুনাস্বরূপ আমি একটি প্রক্রিয়া বর্ণনা করিব।

ধরুন ইণ্ডানথ্রিন। কোরা সূতা ও কাপড় রং করার পূর্ব্বে আইজিপিন টি দ্বারা সিদ্ধ করিয়া নেওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ কোরা জিনিষে যথেষ্ট মাড় থাকে। ইহাতে কাপড় ও সূতার উপরে রং সমানভাবে ধরে এবং বর্ণও বেশ উজ্জ্বল হয়।

শুধু কোরা জিনিষগুলা এইভাবে সিদ্ধ করা দরকার, ধোলাই জিনিষ সিদ্ধ করা দরকার হয় না।

## রং করিবার প্রণালী

এই ইণ্ডানথ্রিন রং করিতে হইলে, কষ্টিক সোডা ও হাইড্রো-সালফাইটএ রং গুলিয়া নিতে হয়। ১০ পাউণ্ড সূতার রং করার হিসাব আমি এখানে দিব।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | জল | ... | ১০ গ্যালন |
| ২। | কষ্টিক সোডা ( হাল্কা শেডের জন্য ) | | ৪০ ,, |
| | ,, ,, ( পূর্ণ শেডের জন্য ) | | ৫০ ,, |
| ৩। | হাইড্রোসালফাইট | ... | ৩০ ,, |

যে পাত্রটিতে রং করা হয় তাহা কাঠের হওয়া বাঞ্ছনীয়। জলের উত্তাপ ১২০°-১৪০° ফারেনহিট রাখিতে হয়। এই গরমজলে কষ্টিক সোডা দিয়া নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে হাইড্রোসালফাইট পাউডার মিলাইতে হয়। পরে এই জলের সঙ্গে রং মিলাইয়া ভালভাবে নাড়িয়া আধ ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হয়।

পরে সুতা রংএর জলে দিতে হয় ও এক ঘণ্টা রং করিতে হয়। এই রং করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, জলের উত্তাপ ১২০° ফারেনহিটের নীচে না নামে। রং হইয়া গেলে সুতা সমানভাবে নিংড়াইয়া রাখিতে হয়। সুতার রং হাওয়ার সাহায্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকৃত রং দাঁড়ায়।

রং হওয়ার পরে সুতা বা কাপড় সাবান জলে সিদ্ধ করিলে রং খুব পাকা হয় এবং সুতার উজ্জ্বলতা বাড়িয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন রংএর কয়েকটি নাম, যথা—

১। ইণ্ডানথ্রিন ব্লু আর এস্ এন
২। ,, ইয়োলো থ্রি, জি, এফ
৩। ,, ব্রাউন জি, জি
৪। ,, ভায়লেট আর, আর
৫। ,, গ্রীন জি, জি,
৬। ,, রুবিন আর
৭। ,, অরেঞ্জ থি জি

## কালো রং

এখন আমি কালো রংএর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। পাকা কালো রং করিবার জন্য ইণ্ডোকারবন সি, এল কম্ বেশ ভাল। প্রতি বাণ্ডিল্ ১০ পাউণ্ড সূতার জন্য ৪৮ তোলা রংএর দরকার হয় এবং এই সঙ্গে সোডিয়াম সালফাইড ও লবণ মিশাইয়া প্রায় ১ ঘণ্টা রং করিতে হয়। সূতা রং হইয়া গেলে সেই সূতাই পুনরায় ১ তোলা ইণ্ডানথ্রিন ব্লু আর, এম, এন টি ১ তোলা ইণ্ডানথ্রিন ইয়োলো থ্রি জি এফ দ্বারা ইণ্ডানথ্রিন প্রণালী অনুযায়ী আধঘণ্টা রং করা হয়। রং করার পরে ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া সর্ব্বশেষে সাবানজলে উজ্জ্বলতা বাড়াবার জন্য ধুইতে হয়।

## নেপথল রং

এই রং মনোপোল সাবান ও গরমজলে খুব ভালভাবে মিশাইয়া নিতে হয়। পরে কষ্টিক সোডা ও জল মিশাইতে হয়। রং খুব ভালভাবে না মিশিলে সিদ্ধ করিয়া নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ এই রংএর জলে ইম্প্রেগ্রনেট করিতে হয়, পরে ডেভেলপিং লবণজলে সূতা বা কাপড় রং করিলে প্রকৃত রং হয়।

নেপথল রংএর ইম্প্রেগনেটিং সলিউশন ৭৫°—৮৫° ফারেন্‌হিট ও ডেভেলপিং ১২০°—১৪০° ফারেনহিট রাখা দরকার।

নেপথল রং করিয়া আমরা খুব উজ্জ্বল লাল, খয়ের, মেরুণ ও কমলা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের রং পাইতে পারি। এই সূতায় কাপড়ের পাড় খুব চক্‌চকে ও সুন্দর হয়। পাকা হিসাবেও বেশ ভাল।

## ফিনিশিং

এইভাবে নানা প্রকার থান ও কাপড় রং ও ধোলাই হইয়া গেলে

মাড়ের জলের সঙ্গে নিম্নলিখিত ফিনিশিং কেমিক্যাল দ্বারা চক্‌চকে করিতে হয়—রেমসিট ওয়ান ও আইজিপিন টি।

## মারসিরাইজিং

কষ্টিক সোডায় কাপড় মেশিনের সাহায্যে চালাইয়া নিলে খুব চক্‌চকে ও সুন্দর হয়। অবশ্য ইহাতে একটু অসুবিধাও আছে—কাপড়ের দৈর্ঘ্য একটু কমিয়া যায়। এই দৈর্ঘ্য বাড়াইতে হইলে মেশিনের সাহায্যে বাড়ান যায়। এই মেশিনের নাম ষ্ট্রেচিং বা ষ্টেন্‌টারিং মেশিন।

কাপড় ড্রাইং মেশিনে শুকাইয়া ক্যালেণ্ডার মেশিনে ইস্ত্রি করিয়া, ফোলডিং মেশিনে ভাঁজ করা হয়।

## রং-কলের বিবিধ কলকব্জা

এবার একটি রং-কলে কি কলকব্জা দরকার হয় তার বিবরণ আমি নিম্নে প্রদান করিব। ধরুন ৭৫০ খানা তাঁত ও ২৫০০০টি টেকো কাপড়ের কলটিতে আছে। তাহা হইলে নিম্নরূপ কলকব্জা আবশ্যক হইবে।

| | নাম | দাম |
|---|---|---|
| ১। | ১টি ধোলাই মেশিন তিনটি রোলারযুক্ত—ইহাতে থান কাপড় ধোলাই হইয়া থাকে ... | ১৪৫ পাউণ্ড |
| ২। | স্কাচার—থান ও কাপড় সোজা করিবার জন্য ... | ৮৬ ,, |
| ৩। | ওয়াটার ম্যান্‌গল ( তিন রোলারযুক্ত )—এই মেশিনে জল নিঙড়াইয়া কাপড় ফিনিশ করা হয় ... ... | ৪৫০ ,, |

| | নাম | দাম |
|---|---|---|
| ৪। | ষ্টার্চ ম্যান্‌গল ( দুই রোলারযুক্ত ) এই মেশিনে কাপড় নানাভাবে চক্‌চকে করা হয় ... | ২১৮ পাউণ্ড |
| ৫। | স্প্রে ড্যাম্পিং মেশিন—কাপড় ইস্ত্রি করার পূর্ব্বে একটু ভিজাইয়া নেওয়ার জন্য ... | ১২৯ ,, |
| ৬। | হরাইজেণ্টাল ড্রাইং মেশিন—এই মেশিনে থান ও কাপড় শুকান হয়। ইহাতে ২৩টি সিলিণ্ডার বা ষ্টিম ড্রাম থাকে ... | ১০৪৬ ,, |
| ৭। | তিন রোলার পেকিং মেশিন—এ মেশিনে রং করা কাপড়ের জল নিঙড়ান হয় ... | ২২৮ ,, |
| ৮। | তিন জোড়া ডাইং জিগার—ইহাতে কাপড় রং করা হয় ... ... ... | ২২৩ ,, |
| ৯। | একটি হাইড্রো এক্‌স্‌ট্রাক্‌টর—ইহাতে সূতার জল নিঙড়ান হয় ... ... | ১৯৮ ,, |
| ১০। | মেজারিং ও ফোল্ডিং মেশিন—কাপড় ফিনিশ হইয়া গেলে এই মেশিনে ভাঁজ করা হয় ... | ৯১ ,, |
| ১১। | একটি পাঁচ রোলার সংযুক্ত ক্যালেণ্ডার—ইহাতে কাপড় ইস্ত্রি করা হয় ... ... | ১০৩০ ,, |
| ১২। | এক টন একটি হাইপ্রেসার কিয়ার—ইহাতে কাপড় ও সূতা সিদ্ধ হয় ... ... | ২৩০ ,, |
| ১৩। | এক সেট্ সূতা রং করার কল ... ... | ৫১৩ ,, |
| | মোট খরচ | ৫৩৫৩ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় ৬৯,৫৮৯ টাকা) |

উপরিউক্ত একটি রং কলে নিম্নলিখিত হিসাবে সূতা ও কাপড় ধোলাই ও রং হইতে পারে। ইহার আনুমানিক রং, কেমিক্যাল ও মজুর খরচ নিম্নরূপ :

## সূতা

| বিভিন্ন রং | পরিমাণ | রং ও কেমিক্যাল খরচ | মজুর খরচ | মোট খরচ |
|---|---|---|---|---|
| | পাউণ্ড | টাকা | টাকা | টাকা |
| লাল, মেরুণ ও চকলেট | ১২৫০০০ | ১৪০০ | ৫০০ | ১৯০০ |
| ডার্কব্লু, ব্লু, গ্রীন | ১১০০০ | ২৪০০ | ২০০ | ২৬০০ |
| হাল্‌কা গ্রীন | ৫০০ | ৫০ | ১০ | ৬০ |
| ধোলাই | ১২০০০ | . ১২৫ | ৭৫ | ২০০ |
| কালো | ৬০০০ | ৩০১ | ৮০ | ৩৮০ |
| অন্যান্য রং | ১২০০ | ১২৫ | ২৫ | ১৫০ |
| মোট | ৪৩২০০ | ৪৪০০ | ৮৯০ | ৫২৯০ |

## কাপড়

| বিভিন্ন জাতীয় কাপড় | পরিমাণ | রং ও কেমিক্যাল খরচ | মজুর খরচ | মোট খরচ |
|---|---|---|---|---|
| | পাউণ্ড | টাকা | টাকা | টাকা |
| চেক্ কাপড় ধোলাই | ২৫০০ | ৩০ | ১৫ | ৪৫ |
| লংক্লথ ,, | ৫০০১ | ১০০ | ৩৫ | ১৩৫ |
| নানাবিধ থান রং | ১০,০০০ | ১৫০০ | ৫০ | ১৫৫০ |
| মোট | ১৭,৫০০ | ১৬৩০ | ১০০ | ১৭৩০ |

রং কলের মজুরদের গড়ে মাসিক মাহিয়ানার হার ২০।২৫ টাকা। এই প্রকার একটি রং কল চালাইতে হইলে ৪০।৪৫ জন মজুর দরকার

হয়। ইহা ছাড়া মজুরদের চালাইবার জন্য দুইজন মিস্ত্রির প্রয়োজন। একজন সূতা ও অপর জন কাপড়ের কাজ দেখিয়া থাকে। তাদের মাসিক বেতন ৬০।৭০৲ টাকা দিতে হয়।

## পরিশিষ্ট

কাপড়ের কলে রং-কলের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। এই বিভাগের উপর কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা দরকার। আজকাল বাজারে রঙ্গীণ জিনিষের যথেষ্ট কাটতি। সূতা তৈয়ারীতে যদি কোন দোষও থাকে, সেই সব দোষ রং করার পরে পরিলক্ষিত হয় না, এবং উহা বাজারে বেশ ভালভাবে চলিয়া যায়।

সুন্দর ও চাকচিক্যযুক্ত রং হইলে বাজারে জিনিষের দর বাড়িয়া যায়, এবং অনায়াসে বিক্রী হইতে পারে। একটা মিলে আধুনিক রংকল থাকিলে তাহাতে মিলের যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। এবং এই বিভাগের ভাল কাজের উপর মিলের সুনামও আংশিকভাবে নির্ভর করে।

আজকাল বাজারে দেখা যায় ছাপাশাড়ী ও ব্লাউজের কাপড় ইত্যাদি খুব প্রচলিত। কিন্তু আমাদের বাঙ্গলার সমস্ত মিল কর্ত্তৃপক্ষই এ বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীন। কোন মিলেই ছাপা হওয়ার মত আধুনিক ছাপা কলের বন্দোবস্ত নাই। আমার মনে হয় বাঙ্গলার মিলের মালিকেরা এই ছাপা কলের বন্দোবস্ত করিলে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন।

আর দুইটি বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

১। সমগ্র বাঙ্গলায় ১৫টি মাত্র কাপড়ের কল আছে; তন্মধ্যে ১৯০৫ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত মাত্র ৪টি মিল বাঙালীর অর্থে ও বাঙালীর পরিচালনায় স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য একটা অতি শুভ লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় প্রায় ৪০টি কাপড়ের

কল তালিকাভুক্ত হইয়াছে। এই মিলগুলি দিনে দিনে গড়িয়া উঠিলে বাঙ্গলার যে একটা গৌরব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই কাপড়ের কলগুলিতে রং-কলের ব্যবস্থা করা প্রথম হইতে সুবিধা-জনক হইবে না, কারণ ইহা একটু ব্যয়সাধ্য। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় এমন কোন বড় রং-কল নাই যে সমস্তগুলি মিলের রঙ্গীণ সূতা দিতে পারে।

তাই এই ছোট ছোট মিলগুলির চাহিদা যোগাড় করিলেই একটি বড় রং-কল সুন্দরভাবে চলিতে পারে। এ ধরণের একটি রং-কলের বাঙ্গলায় খুবই অভাব। ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বেশ আধুনিক-ভাবে একটি রং-কল বসান যায়। এ বিষয়ে আমি মিল মালিক ও ব্যবসায়িগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

২। রং-কলের যাবতীয় পাকা রং ও কেমিক্যাল দ্রব্যাদি প্রায় অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। দেশীয় রং হইতে বস্ত্রাদি রঞ্জন পূর্ব্বে অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানেও কিছু-কিছু আছে। রাসায়নিকগণের চেষ্টায় দেশীয় উপাদান হইতে রং প্রস্তুত হইলে একটি নূতন ব্যবসার ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

## আলোচনা

বক্তৃতাশেষে শ্রীযুক্ত মিহির সেন, সত্যসুন্দর দেব, বীরেন দাশগুপ্ত, ও আনন্দসুন্দর বসু এই ধরণের ব্যবসা পরিচালনের আবশ্যকতা বিবৃত করেন। বিদেশী সূতা সস্তা কাপড়ের কারণ কি না ডাঃ হেম রায় সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পরিষদের গবেষকগণও আলোচনায় যোগদান করেন। উপসংহারে অধ্যাপক সরকার বলেন গঠনমূলক মোসাবিদাদি-সহ ধনী ব্যক্তিগণ যদি বাঙ্গলায় কাপড় ও রঞ্জন ব্যবসায় পুঁজিনিয়োগ করেন তাহা হইলে লাভবানই হইবেন।

# মাপ ও ওজন

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এম-এ ( কেম্ব্রিজ ),
প্রেসিডেন্সি কলেজ ও অধ্যাপক শিশিরকুমার
মিত্র ডি এস্ সি (কলিকাতা) ডি এস্ সি
(প্যারিস), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

"আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর ১৯৩৩) যে বক্তৃতা করেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে যে নানারকমের মাপ প্রচলিত আছে তাহা উঠাইয়া দিয়া আধুনিক "মেট্রিক" প্রণালীর মাপ ভারতবর্ষে প্রচলন করার আবশ্যকতা বিষয়ে দুই বক্তাই নানাপ্রকার যুক্তি উপস্থিত করেন।

অধ্যাপক মহলানবিশ বলেন যে, তিনি সংখ্যাতত্ত্ববিদের দিক্ হইতে মাপ নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা বিচার করিবেন।

সংখ্যাতত্ত্ববিদের তরফ হইতে দেখা যায়, কোনও গবেষণা করিতে গেলে প্রথমেই সমগ্র ভারতে এক সুনিয়ন্ত্রিত মাপের অভাব ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য বা শস্য বা অন্য-কিছুর সংবাদ সংগৃহীত হইয়া আসিলে প্রথমেই দেখিতে হয় যে, কোন্ মাপ ব্যবহার করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে মাপের ঠিক পরিমাণ কি, জানা না থাকাতে এই সব সংবাদ হইতে ঠিক তথ্য বাহির করিতে অনেক বেগ পাইতে হয়। তারপর পরিমাণ জানা গেলেও বিভিন্ন

রকমের মাপকে এক মাপে আনিবার জন্য অনর্থক পরিশ্রম ও সময়ের ব্যয় হয়। সময় সময় খুব প্রয়োজনীয় সংবাদ শুধু পরিমাণ জানার অভাবে একেবারে অকেজো হইয়া যায়। তারপর পুরাতন নথীপত্র ঘাঁটিয়া যখন আগেকার মাপ পাওয়া যায়, তখন তার ঠিক পরিমাণ না জানা থাকার দরুণ সেইসব তথ্য কোনও কাজে লাগান যায় না। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে এইরকম বিভিন্ন মাপ একটা মস্ত অন্তরায় হইয়া আছে।

দ্বিতীয় কথা, যদি মাপ সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়, তা হইলে কোন্ মাপ প্রচলিত হওয়া উচিত? অধ্যাপক মহলানবিশের মতে "মেট্রিক" মাপই প্রচলিত করা আবশ্যক। এই মাপের দশমিক প্রথার ভাগ একটি মস্ত সুবিধা। বিশেষতঃ, সংখ্যাতত্ত্ববিদের হিসাব করিবার জন্য এই প্রথায় বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়।

পরিশেষে অধ্যাপক মহলানবিশ বলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে এক ভাষা প্রচলিত করার পক্ষে অনেকে আছেন; এই প্রস্তাবের উপযোগিতা সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে একরকম মাপ ও ওজন প্রচলিত করার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র বলেন যে, সারা ভারতে একরকম মাপ ও ওজন প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু কি প্রকার মাপ ও ওজন প্রচলিত হইবে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত থাকা সম্ভব। ভারতবর্ষের নিজস্ব অনেক রকমের মাপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকটিরই নানা রকমের অসুবিধা আছে। আর তা ছাড়া যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সব রকম মাপ ও ওজনকে নিয়মিত করিয়া এদেশের পক্ষে একটা নূতন নিজস্ব মাপ প্রচলিত করা হইল। তা হইলেও অনেক

রকম অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। ছাত্র, শিক্ষক, গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানবিদ্ সকলকে ভারতীয় মাপ তো শিখিতে হইবেই, আবার ব্রিটিশ ফুট-পাউণ্ড মাপ এবং বৈজ্ঞানিক মেট্রিক মাপও শিখিতে হইবে। এই কারণে সকলেরই অনেক শক্তি ও সময়ের অপচয় হইবে। সব দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতে যদি বাধ্যতা-মূলকভাবে কোনও মাপ প্রচলিত করা হয়, তাহা হইলে সে মাপ মেট্রিক মাপ হওয়া উচিত। মেট্রিক্ মাপে একটা মস্ত সুবিধা এই যে, মাপের ভগ্নাংশ সবই দশমিক প্রথায় নিবদ্ধ করা আছে। এই কারণে এই প্রণালীতে হিসাব করা অত্যন্ত সহজ। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে—বৃটিশ সাম্রাজ্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া—এখন এই মাপ বাধ্যতা-মূলকভাবে প্রচলিত। সারা পৃথিবীতে (বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রেও) বৈজ্ঞানিক কাজে এই মাপ ব্যবহৃত হয়। অধ্যাপক মিত্র উপসংহারে বলেন যে, সারা ভারতের অধুনা-প্রচলিত বিভিন্ন রকমের মাপ উঠাইয়া দিয়া তাহার জায়গায় বাধ্যতামূলকভাবে মেট্রিক মাপ প্রবর্ত্তন করার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। তিনি সকলকে এই আন্দোলনে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন আগামী জানুয়ারী মাসে বোম্বাইতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের একবিংশতি অধিবেশনে এই সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

"আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন যে, মেট্রিক প্রথা ফরাসী বিপ্লবের দৌলতে ফ্রান্সে প্রথম কায়েম হয়। তখনই ইহার দিগ্‌বিজয়ও সুরু হয়। কিন্তু ভারতীয় মাপকাঠিগুলার সঙ্গে বিলাতী বণিক্ ও বেপারীদের সমঝোতা বাহাল আছে। মেট্রিক প্রথা চালাইতে গেলে বিলাতী-ভারতীয় বাণিজ্যের লেন-দেনে অসুবিধা সৃষ্ট হইতে পারে। ইংরেজদের এই ভয় বোধ হয় ভারতে মেট্রিক প্রথা প্রবর্ত্তনের অন্যতম বাধা।

# ব্যবসা-বৃদ্ধির ভবিষ্য-গণনা*

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস সি, বি এল, গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

[ ১৯৩৩ সনের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক সভায় গবেষক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় বি এস সি, বি এল ব্যবসা বাণিজ্যের পূর্ব্বাভাষের রেওয়াজ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভারম্ভে অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেন—"ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে যেমন সচরাচরই পূর্ব্বাভাষের রেওয়াজ দেখা যায়, ব্যবসাদার এবং অর্থসচিবগণও তেমনি পূর্ব্বাভাষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।" তিনি আরও বলেন,—"কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং রাজস্ব-বিষয়ক পূর্ব্বাভাষ-রচনা একটা বিশেষ ধরণের বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। দিনের পর দিন মাপজোকের সাহায্যে গবেষণার উপরই এই বিজ্ঞানটী গড়িয়া উঠিয়াছে। ধনবিজ্ঞানের কেন্দ্রীভূত বিষয় মূল্যতত্ত্ব সঙ্কটতত্ত্বের আকারে নবরূপ ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে এই শাস্ত্রকে সম্পদের বিজ্ঞান অপেক্ষা সঙ্কটের বিজ্ঞানরূপে উল্লেখ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

"মাপজোক ও বাস্তব ঘটনানিচয় অনুসারে গবেষণা পরিচালনা না করিয়া বাঙালীরা প্রধানতঃ আর্থিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়াছে। বর্ত্তমানে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন দেশের মধ্যে একদল লোককে দ্রব্য-মূল্যের নয়া পরিস্থিতি অনুসারে তুলনামূলক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত অবস্থার ভিতর দিয়া অর্থ নৈতিক

---

* "আর্থিক উন্নতি"। পৌষ ১৩৪০ ( ডিসেম্বর ১৯৩৩ )।

উঠানামার সন্ধান লইতে হইবে। আর্থিক জরীপ এবং ধনবিজ্ঞানে "ক্যালকুলাস" প্রভৃতি উচ্চ গণিতের প্রভাব সম্বন্ধে বাঙালীকে অবহিত হইতে হইবে; বিশেষতঃ, বাঙালীদের মধ্যে কয়লা, পাট, ব্যাঙ্ক, বীমা, চা প্রভৃতি ব্যবসা যে ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে তাহাতে বাঙালীদের পক্ষে ঐরূপ গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়।" অধ্যাপক সরকার বাঙালী জাতির ব্যবসায় সাফল্যের উপর আস্থা প্রকাশ করিয়া বলেন "অনতিকাল মধ্যেই বাঙালী সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওস্তাদ ও সমঝদার লোক আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে।"

সভায় অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত বীরেন দাশগুপ্ত, জিতেন সেনগুপ্ত, সুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, শিবচন্দ্র দত্ত, নগেন চৌধুরি, হরিদাস পালিত, লেপ্টেনাণ্ট নলিনী চৌধুরি, কামাখ্যা বসু, মণি মৌলিক, সুধাকান্ত দে প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

প্রবন্ধটী নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।]

ব্যবসার অবস্থা ভাল কিম্বা মন্দ সে সম্বন্ধে অনেকে যখন কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন তখন যে ব্যবসার তেজী-মন্দার তেমন কোন মাপকাঠি বিচার করেন তাহা নহে। এরূপ মতামত সাধারণভাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কোন বিশেষ ব্যবসাতে, এমন দুই একজন লোক থাকিতে পারেন, যাঁহাদের স্মরণ থাকা সম্ভব গত দুই-তিন বৎসর, কি দশ-পনের বৎসর মোটামুটিভাবে ব্যবসার অবস্থা কেমন ছিল না ছিল। অতি সাধারণ ভাবের কথা বলিতেছি—এরূপও দেখা যায় যে, কেহ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া এমন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন বা এমন ইতিহাস বর্ণনা করিলেন যাহা প্রকৃত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। অনেক সময় এই কারণে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি ও কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ভ্রমাত্মকভাবে নির্দ্ধারিত হয়। এদেশের ব্যবসায়ীরা ধারাবাহিক

ভাবে বহু বৎসরের তথ্য-রক্ষা বা সংগ্রহের এবং সে সকলের বিজ্ঞান-সম্মত প্রথায় বিশ্লেষণ ও বিচার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলে আশার কথা হইবে। মুখে-মুখে, মনে-মনে অতীতের একটা দৃশ্য আঁকিয়া লইয়া ভবিষ্যতের কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া আমাদের "দেশীয়" কত ছোট বড় ব্যবসা চালান হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ আজ কালকার দুনিয়ায় ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে ভাঙন-গড়ন চলিতেছে খুব জোরের সহিত। একটা নবীন ধনবিজ্ঞানের সূত্রপাত হইতেছে। যুবক বাঙ্গলার অর্থশাস্ত্রীদিগের সঙ্গে তাহার কিছু পরিচয় হওয়া আবশ্যক।"* এক এক শ্লোকে বিপুল মহাভারতের কোনো-কোনো পর্ব্ব আওড়াইয়া যাইতেছি।

ক্রাইসিস বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বকে নবীন ধনবিজ্ঞানের মেরুদণ্ড বলিতে পারি। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার জন্য আমেরিকায় আর জার্ম্মাণিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম হইয়াছে।

"আলোচনার একটা নমুনা দেখাইতেছি। বাজারদরের ওঠা-নামাই হইতেছে সকল দোষের গোড়া। এইটাকে কাবু করিতে পারিলেই আর্থিক সমতা সাধিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা করা যায় কি করিয়া?……"

এই নমুনা গ্রহণ না করিয়া পুরাতন পদ্ধতিতে ব্যবসা করিয়া যদি দশ জন লাভবান হইতে পারিয়াছে তাহা হইলে আরও একশত জন কেন পারিবে না এরূপ বিশ্বাস লইয়া কত নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান জাগিয়া উঠিতেছে, আবার বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইতেছে তাহার সংখ্যা

* "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" দ্বিতীয় ভাগ (১৯৩২) ১৯৯ পৃষ্ঠা—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। পুরাতন পদ্ধতিতে চলিয়া যেসকল প্রতিষ্ঠান এখনও জীবিত আছে তাহাদের পশ্চাতে বহু বৎসরের মূল্যবান সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, এই দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায়। যদিও যথাযথ তথ্যসংগ্রহ করিয়া কোন উক্তি করিতেছি না, তথাপি একথা বলিতে পারি যে, আমাদের দেশীয় ব্যবসা হয়ত বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে চালিত হয় না। যে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে ব্যবসার পরিক্রম নির্দ্ধারিত হইতেছে তাহা কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহার পরীক্ষা যখন হয় না, তখন তাহাতে আস্থা স্থাপন করিয়া তদনুযায়ী ভবিষ্যতের কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্ধারণ করা অযৌক্তিক সন্দেহ নাই। মূলতঃ ব্যবসার অর্থ কতকগুলি হিসাব নিকাশের ব্যাপার। ব্যবসার প্রতি স্তরে এ হিসাব নিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরূপ স্থলে যাহা কিছু হিসাবের পর্য্যায়ে পড়ে না, তাহা ব্যবসায়ীর স্বার্থের দিক্ দিয়া পরিত্যাজ্য বিবেচনা করা যায়।

এরূপ বিবেচনা করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে, পাশ্চাত্য দেশের ব্যবসার নানারূপ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতেই স্পষ্ট দেখা যায়, অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারেও তাহাদের কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার। বিচার যেখানে যত সূক্ষ্ম হইয়াছে উন্নতি ও সাফল্য সেখানে তত অধিক হইয়াছে। এ বাস্তব ঘটনাকে উপেক্ষা করা যায় না। ব্যবসাতে বিজ্ঞান-চর্চ্চার যে স্থান আছে তাহা আমরা উপেক্ষা করি কেন?

এরূপ অনেক কেন’-র সৃষ্টি আমাদের চতুষ্পার্শে হইতেছে; আমরা ক্রমশঃ কেন’-র জালে বিজড়িত হইয়া পড়িতেছি। এ নাগপাশ ছিন্ন করিতে হইলে আমাদের চিন্তাধারার প্রভূত পরিবর্ত্তন এবং কর্ম্মশীলতারও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা যে এ পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে কিছুই অগ্রসর হই নাই তাহা বলিতে পারি না।

তবে যে গতিতে অগ্রসর হইয়াছি তাহা অতি মন্থর। আমাদের অগ্রসর হইবার গতি আমরাই মন্থর হইতে দিয়াছি।

এত মন্থর গতিতে উন্নতি করিলে এ প্রবল প্রতিযোগিতার দিনে জগৎ-সভায় প্রকৃত স্থান পাওয়া কঠিন, ব্যবসা-ক্ষেত্রে স্থানলাভ করা ভাগ্যফল বলিয়া ধরিয়া লইতে আমরা এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে, উন্নতির সমস্ত অংশই আমরা ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপার উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত, নিশ্চেষ্ট, বিকল হইয়া বসিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিয়া নিরানন্দের মধ্যেও আনন্দ ও দুর্ব্বলতাজনিত তৃপ্তিলাভ করিতেছি। কৃপার উপযুক্ত পাত্র হইলে তবে যে কৃপালাভ করা যায় ইহা অতি প্রাথমিক নিয়ম। বাধা বিঘ্নের অন্ত নাই সত্য, কিন্তু মানুষের শক্তিও অসীম।

"অর্থশাস্ত্রের তরফ হইতে মাত্র একটা বড় শক্তির কথা এইখানে বলিব। সে হইতেছে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বা সংখ্যা ও অঙ্ক-শ্রেণীর কথা। মার্কিণ মুল্লুকের যেখানে-সেখানে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের ছড়াছড়ি দেখিতেছি। নৃতত্ত্ব ও চিত্তবিজ্ঞান হইতে সুরু করিয়া রেল-তত্ত্ব ও তেল-তত্ত্ব পর্য্যন্ত বিদ্যারাজ্যের সকল মহলে,—সকল গলিঘোঁচেই—ঝালে ঝোলে অম্বলে,—সর্ব্বত্রই পাইয়াছি অঙ্করাশি। আমেরিকান ফ্যাক্টরীতে, আমেরিকান ব্যাঙ্কে, আমেরিকান বীমা-ভবনে, আমেরিকান বেপারী-সৌধে, আর ইস্কুল, লাইব্রেরী ইত্যাদির ত কথাই নাই,—আগে অঙ্কময় তথ্য অথবা তথ্যে ভিজানো অঙ্ক, তাহার পর অন্যান্য যা হয় কিছু,—বক্তৃতা, সমালোচনা, বাদানুবাদ, তর্কপ্রশ্ন। এই ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্-প্রীতি মার্কিণ মুল্লুকে যত দুনিয়ার আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত তত পরিমাণে নজরে আসে নাই। সুতরাং সহজে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌কে (সংখ্যাবিজ্ঞানকে) মার্কিণ বিদ্যা সমঝিয়া রাখা আমার দস্তুর দাঁড়াইয়াছে। আর ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের সাহায্যে চিন্তা-প্রণালীকে যে নিরেট ও কর্ম্মঠ করিয়া তোলা সম্ভব সেই বিষয়ে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। আমেরিকায় বহুদিন ধরিয়া লোকজনের

সঙ্গে,—বিদ্যাক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে, ঘনিষ্ঠরূপে গা ঘেঁষাঘেঁশি না করিলে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের গৌরব যথোচিত উপলব্ধি করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।"*

ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স বা সংখ্যা-বিজ্ঞান নূতন শাস্ত্র নয়; তবে আধুনিক কালে মত ও পথ দু-এরই অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংখ্যা-বিজ্ঞান অতি প্রাচীন শাস্ত্র। প্রাচীন কাল হইতে রাজ্যশাসন সম্পর্কে তথ্য ও সংখ্যা সংগ্রহ করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। মিশর, ব্যাবিলন ও রোমক রাজ্যে লোকগণনা, রাজ্যের বিত্ত ও ঐশ্বর্য্যের হিসাব করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই অর্থে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও যে ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন-কার্য্যে সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১১ হইতে ৩০০ অব্দের মধ্যে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, এই সময়েও ভারতবর্ষে সংখ্যা-বিজ্ঞানের অনুশীলন ছিল। 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কি প্রথায় কর-নির্দ্ধারণ, সৈন্য-সংগ্রহ, শস্যাদি উৎপাদন, শ্রমিক-সমস্যা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সমগ্র গ্রামগুলিকে বিভক্ত করা যায়, গ্রাম্য হিসাব-রক্ষক দ্বারা কি ভাবে ভূমির তারতম্য যেমন—উর্ব্বর, অনুর্ব্বর, গোচারণ ক্ষেত্র, অরণ্য ইত্যাদি অনুসারে গ্রামের সীমা সাব্যস্ত করা হয়, অথবা উপজীবিকা অনুযায়ী গ্রামবাসীদের সংখ্যা সম্বন্ধে কি ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষা করা যায়। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত সভ্যতার যুগে শাসনকার্য্যে যে এইরূপ সংখ্যা-বিজ্ঞানের ব্যবহার ছিল তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন-সম্পর্কিত সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মন্ত্রী

* 'একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র' প্রথম ভাগ (১৯৩০) ১৮ পৃষ্ঠা—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত।

আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ ( ১৫৯৬-৯৭ খৃঃ ) রচনা করেন। তাহাতে জন-সংখ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পাওয়া যায়। ইয়োরোপে খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন-সম্পর্কিত সংখ্যা-বিজ্ঞানের ব্যবহার প্রধানতঃ অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক তথ্যের সংগ্রহ ও প্রকাশের বাহিরে প্রসার লাভ করে নাই। ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতবর্ষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সংখ্যাবিজ্ঞান প্রথমে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে কি তত্ত্বের অংশে, কি ব্যবহারিক অংশে সে রূপের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সংখ্যা-বিজ্ঞান দুইটি বিশিষ্ট পর্য্যায়ে পরিবর্দ্ধিত। প্রথম পর্য্যায়ে পূর্ব্বের রূপ কিছু বজায় আছে। দ্বিতীয় পর্য্যায় সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিতেছে। প্রথম পর্য্যায় কোন বিশেষ বিষয়ের বিবরণে ও তথ্যে পর্য্যবসিত, আর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লক্ষ্য কোন বিশেষ বিষয়ের তথ্যের বিশ্লেষণ ও বিচার। বিবরণী-পর্য্যায়ে সমগ্র বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমষ্টি ও গড় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভই যথেষ্ট। বিশ্লেষণ-পর্য্যায়ে সমষ্টি বা গড় সম্বন্ধে জ্ঞান যথেষ্ট নয়।

রাজ্যশাসন সমগ্রের সমস্যা। রাষ্ট্রের অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিশিষ্ট বিভাগও সমগ্রের বিষয়। এই কারণে সভ্যতার সকল স্তরেই সংখ্যা-বিজ্ঞানের যে পর্য্যায়ে সমগ্রের বিষয় আলোচিত হয়, সে পর্য্যায়ের প্রয়োজন ও ব্যবহার রহিয়া যাইবে, বিলুপ্ত হইবে না। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি যাইবে। কারণ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা লাভ করিবার স্পৃহা সর্ব্বদাই বৃদ্ধি পাইতেছে। পরীক্ষার পরিসর যত অল্প হইবে, বিশ্লেষণ তত তীব্র হইবার সুযোগ পাইবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সহায়তা ব্যবসার হ্রাস-বৃদ্ধি গণনার জন্যও আবশ্যক। আর

ব্যবসা-সংক্রান্ত বিবরণ ও তথ্যের জন্য নির্ভর করিতে হয় প্রথম পর্য্যায়ের উপর। এই দুই পর্য্যায়ের মিলিত শক্তি এক বিরাট শক্তি, যে শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারিলে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য কেন, সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি স্তরে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। এই শক্তির মূর্ত্তি কালে কালে বহু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্যবসাক্ষেত্রে বুদ্ধিচাতুর্য্য ও মানসিক শক্তির প্রয়োগের অর্থ যে সততার বিরুদ্ধে অভিযান তাহা নহে। ব্যবসায় সততার যে সর্ব্বদা জয় তাহার বহু প্রমাণ দেওয়া সম্ভব। সততাই একমাত্র অবলম্বন করিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে যাঁহারা অবতীর্ণ হন এবং সেই অবলম্বন চিরদিন যাঁহারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকেন তাঁহারা যে নিজেরাই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হন তাহা নহে, উপরন্তু জাতীয় ব্যবসার উন্নতি ও সাফল্য তাঁহারা বহুলাংশে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিতে পারেন। ব্যবসা-বিজ্ঞানে সম্যক জ্ঞানলাভ না করিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে অবশেষে শঠতা ও অসাধুতা অবলম্বন ও নানারূপ নীচতার আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী। আর তজ্জনিত যত কুফল তাহার জন্য পরবর্ত্তী বংশধরদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কালক্ষেপ করাও তদনুরূপ অবশ্যম্ভাবী। সততা রক্ষা করিয়াও মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রয়োগ কি করিয়া করা যায় এবং তাহার প্রভাবে কি করিয়া ব্যবসাতে উন্নতি লাভ করা যায় তাহা জানিতে হইলে ব্যবসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হয়।

ব্যবসা বিজ্ঞান বিস্তৃত বিষয়। বিজ্ঞানের নানারূপ শাখা-প্রশাখার মত ব্যবসা বিজ্ঞানেরও নানারূপ শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও তথ্যগুলি সমস্তই একটা না একটা মাপ জোকের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মাপ জোকের কথায় আমাদের জ্ঞান প্রকাশ করা না গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে বিজ্ঞানানুশীলন হইল না,

সে বিষয়ে ততক্ষণ বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ রশ্মি প্রবেশ করিতে পারিল না। ব্যবসাক্ষেত্রে এই মাপজোকের অন্ত নাই। সেইজন্য ব্যবসা বস্তুকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলা তেমন কঠিন হয় নাই।

ব্যবসার হ্রাস-বৃদ্ধির ভবিষৎ বিচার ও গণনা একটি বিরাট প্রশ্ন। এ জন্য যেসকল মৌলিক তথ্য বিচার করার প্রয়োজন হয় তাহার কয়েকটি প্রধান বিষয় উল্লেখ করা গেল, যথা :—

(১) কোথায় কত মাইল রেল লাইন বসিল বা কমিল? কত ঘর বাড়ী, পথ ঘাট, সেতু, বন্দর ইত্যাদি নূতন তৈরী বা ধ্বংস হইল?

(২) কোন কোন ব্যাংকে কি রকম টাকার আদান-প্রদান হইল?

(৩) কতগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নূতন হইল বা উঠিয়া গেল?

(৪) লোক চলাচল, মাল চলাচল, অর্থ চলাচল কোন দেশ হইতে কোন দেশে হইতেছে? বেকার-সমস্যার প্রাবল্য কোথায় কেমন?

(৫) টাকার বাজার বা ব্যাঙ্কের সুদের হার বাড়তি না কমতির পথে?

(৬) দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা কেমন, আমদানি আর রপ্তানির তারতম্য দেশের স্বার্থের অনুকূলে না প্রতিকূলে?

(৭) স্বর্ণ আমদানি রপ্তানির অবস্থা কেমন?

(৮) দ্রব্যমূল্য কম না বেশী?

(৯) শেয়ার বাজার তেজী না মন্দী?

(১০) শস্য-উৎপাদন কম না বেশী?

(১১) রেল কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী ডাকঘরের আয়ের মাত্রা কেমন?

(১২) এইসকল অর্থনৈতিক অবস্থা ছাড়াও দেশের ও বিদেশের সামাজিক পরিবর্ত্তন, রাজনৈতিক আবহাওয়া প্রভৃতির প্রভাব দেশের আর্থিক অবস্থার উপর কেমন?

এই সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য প্রথম প্রয়োজন ব্যবসার কোন একটি বিশেষ রূপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। ব্যবসার কোন্ বিশেষ রূপের পরিবর্ত্তন ও হ্রাস বৃদ্ধি গণনা করা প্রয়োজন তাহা সাব্যস্ত করিয়া লইয়া সেই বিশেষ রূপের দিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। সেই বিশেষ রূপ অতীতে কখন কিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল সে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সেই তথ্যগুলির বিশ্লেষণ ও অপর অপর বিষয়ের সহিত তুলনামূলক বিচার করিলে বর্ত্তমান রূপের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যায় এবং ভবিষ্যতে কিরূপ পরিগ্রহ করিবার দিকে বিষয়টির ঝোঁক সে সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যায়।

অতীতের তথ্যগুলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় কেন প্রশ্ন হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছামত ঘটনা সৃষ্টি করা যায় না; যেমন সমাজের আচার ব্যবহার ইচ্ছামত সহসা গড়িয়া তোলা যায় না, যেমন ইচ্ছামত জোয়ার ভাঁটা ঘটান যায় না, যেমন ইচ্ছামত ব্যবসা বাণিজ্যের গতিরোধ করা যায় না অথবা যেমন দ্রব্যমূল্যের তারতম্য ইচ্ছামত সাধন করা যায় না। যে ক্ষেত্রে ইচ্ছামত ঘটনা সৃষ্টি হয় না, সে ক্ষেত্রে ঘটনাস্রোত কিভাবে বহিয়া চলিয়াছে তাহার পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত অন্য কি উপায় থাকিতে পারে? অতীতের ঘটনা সম্বন্ধে তথ্য প্রস্তুত থাকিলে অথবা সংগ্রহ করিবার সুযোগ থাকিলে সেই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বিষয়টির প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা সহজ হয়। বর্ত্তমানকে উপলব্ধি করিতে হইলে অতীতের সহায়তা প্রয়োজন, তেমনি ভবিষ্যতের আভাষ পাইতে হইলে অতীতের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিহার্য্য। অতীতকে অবহেলা করিবার উপায় নাই। অতীতের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা সঞ্চয় করিবার জন্য অতীতকে অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা যে শিক্ষাদান করিতে সক্ষম নবীনের সে ক্ষমতা হইবে কিরূপে? নবীনের জ্ঞান-ভাণ্ডার অপূর্ণ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যে দেহ বহু আনন্দ ভোগ ও যাতনা সহ্য করিয়া অতীতে জীবন ধারণ করিয়াছিল, তাহাই আবার জীবন চলিয়া যাওয়ার পরও জীববিদ্ ও চিকিৎসাশাস্ত্রীর কৌতূহল চরিতার্থ করে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ ও পরীক্ষাদ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহা বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের রোগ নিবারণের সহায়তা করে। সমাজশাস্ত্রীর পক্ষেও অতীত ও মৃত সমাজ-ব্যবস্থা ও আচার নিয়মের বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। কল্যাণকামী বিজ্ঞানসেবী বা ঐতিহাসিকের নিকট অতীতের সম্ভ্রম অতি উচ্চে। সংখ্যা বিজ্ঞানেও অতীতের সম্মান দেওয়া হইয়াছে বহু বৎসর পূর্ব্বে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যখন প্রথম সংখ্যা বিজ্ঞান সমিতি স্থাপিত হয়, তখন যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহাতেও অতীত যে ভবিষ্যতের আভাষ দিতে পারে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। আধুনিক কালেও ঐ মতবাদ বলবৎ রহিয়া গিয়াছে বরং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অতীতের বিশ্লেষণ হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা সম্পূর্ণ হয় না যদি অতীতের প্রকৃতি বিষয়ে কোন কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নিরূপিত না হয়। অপর বিষয়ের সহিত তুলনামূলক বিচার করিতে করিতে বা সমসাময়িক ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্য বা তারতম্যের রীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নিরূপণ করা সম্ভব। যেমন কোন দেশ বা জাতি বা ভাষাকে বুঝিতে হইলে, অপর দেশ বা জাতি বা ভাষাকে বুঝিতে হয়, তেমনি ব্যবসার কোন একটি বিশেষ রূপের বা অঙ্গের পরিবর্ত্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝিতে হইলে অপর রূপের বা অঙ্গের পরিবর্ত্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত তুলনামূলক পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের একটি কার্য্য সুশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। ব্যবসায় শৃঙ্খলা আনয়ন

করা ব্যবসা-বিজ্ঞানের কার্য্য। কোন আমোদ-প্রমোদের স্থানে যাইয়া আমরা দেখি কত শৃঙ্খলা। সে শৃঙ্খলা না থাকিলে আমোদ-প্রমোদ কত না বিষাদে পরিণত হইত। আমোদ-প্রমোদ হইবার কত পূর্ব্ব হইতে কত লোকের মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধি-বিবেচনার ফলে একটা নির্দ্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত হয়। প্রীতি-উৎপাদক আনন্দ কিসে অধিক হইবে তাহা নির্দ্ধারণ ও তাহার ব্যবস্থা করা, কাহার কি কি কর্ত্তব্য হইবে, কখন কি কি আমোদ সৃষ্টি করিতে হইবে, এইরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূর্ব্ব হইতে যথায় যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার তাহা সাব্যস্ত হয়। আর যতটা সূক্ষ্মতার সহিত পূর্ব্ব হইতে এরূপ সাব্যস্ত হয় এবং যেরূপ দৃঢ়তার সহিত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করা হয় সে প্রকার আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ বা এক কথায় প্রোগ্রাম বা ফিক্সার বা বাজেট বা এষ্টিমেট বা প্ল্যানিং সবই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। বিজ্ঞান মানুষের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার সৃষ্ট জ্ঞান। ব্যবসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ দান 'বাজেট' বা প্ল্যানিং। পূর্ব্ব হইতে একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া লওয়া দরকার—সাফল্যের জন্য কোন পথে, কবে, কখন, কিভাবে চলিতে হইবে এবং দৃঢ়তার তদনুরূপ চলা। কোন নূতন ব্যবসা বহুদিন চলিবে এই ধারণা লইয়াই সে ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করা হয়। তাহা হইলে কি (ধরা যাউক নূতন ব্যবসাটি পনের বৎসর চলিবে) এই আগামী পনের বৎসরের জন্য একটা 'বাজেট' বা প্ল্যানিং করিয়া লইতে হইবে? এরূপ প্রশ্ন উদিত হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের সমাধান ঐ ব্যবসা-বিজ্ঞানেই স্থান পাইয়াছে। প্রতি ব্যবসাতে বৎসরের জন্য সর্ব্বপ্রথম একটা বাজেট এস্‌টিমেট্ করার দরকার। তারপর ইহাকে আরও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক, দ্বৈমাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক, এমন কি দৈনিক—যেখানে যাহা প্রশস্ত সেইরূপ—বাজেট করিয়া লইয়া

বাৎসরিক বাজেটের বা ধারণার চ্যুতি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

ব্যবসার শৃঙ্খলার জন্য বাজেট করা যে দরকার তাহা পূর্ব্বের আমোদপ্রমোদের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়। ভবিষ্যতের বিষাদময় নিষ্ফলতা রোধ করিবার বল্‌গা হইল সুচারু বাজেট। 'বাজেট' যত সুচারু হইবে সফলতার নিশ্চয়তা তত দৃঢ় হইবে।

কিন্তু বাজেট করিবার একমাত্র উপকরণ দূরদৃষ্টি। দূরদৃষ্টির অভ্রান্ততার উপর অবশেষে ব্যবসার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। কি করিয়া দূরদৃষ্টি লাভ করা যায়? আমরা পুরাকালের বহু মনীষীর দূরদৃষ্টির কথা শুনিয়াছি, আর ইহাও শুনিয়াছি, তাঁহারা সাধনা করিয়া দূরদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। সে সাধনার বীজমন্ত্র কি তাহা জানি না। যদি সে বীজমন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, আর যদি সে সাধনা কারবার স্পৃহা ও ক্ষমতা জন্মায় তাহা হইলে করা কঠিন হয় না।

ব্যবসাতে দূরদৃষ্টি লাভ করিতে হইলে ব্যবসা-ক্ষেত্রে যাঁহারা মনীষী—তাঁহারা যে দেশীয়ই হউন না কেন—যাঁহারা সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া দীক্ষালাভ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে ব্যবসাতে পণ্ডিত ও মনীষীরা বিজ্ঞানের বলে দূরদৃষ্টি লাভ করিবার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যবসাতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন! কথাগুলি অনেকের নিকট আজগুবি প্রহেলিকা বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহাদের এ ধারণা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ী দুইটি যেন স্বতন্ত্র জীব, যেন কেহ কাহারো স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না—এই বিশ্বাস অনেকের মনে বদ্ধমূল। কিন্তু এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার সময় এখন উপস্থিত।

ব্যবসার যে কোনো রূপ ধরা যাক—কোনো দ্রব্যমূল্যই ধরা যাক। দ্রব্যমূল্যে এত বেশী তারতম্য হয় যে, ইহার মধ্যে দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করা

সম্পূর্ণ অসম্ভব কাণ্ড, আমরা এইরূপ ধরিয়া লইয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে বাতিল করিয়া দেই এবং কেহ এই বিষয় গবেষণার কথা বলিলে তাহাকে উন্মাদ সাব্যস্ত করিতেও আমাদের বাধে না। তারতম্য যে আছে তাহা ধ্রুব সত্য। এ তারতম্যের কারণ আছে যথেষ্ট, আর প্রতিকারের উপায় থাকিলেও তাহা যে অতি দুঃসাধ্য সেকথা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু যে বিজ্ঞান সমস্ত অসমতার ভিতর সমতা, অসামঞ্জস্যের ভিতর সামঞ্জস্য, অনিয়মের ভিতর নিয়ম খুঁজিয়া থাকে, তাহার সাহায্যে কি এই দ্রব্যমূল্যের অনিয়মের মধ্যে কোনো নিয়ম পাওয়া যায় না? এরূপ প্রশ্ন করা অনুচিত হইবে না। যদি কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলার সন্ধান লাভ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের দূরদৃষ্টি লাভ করিতে আর বাকি কি থাকিবে? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মনীষীরা যে প্রশ্ন লইয়া ব্যবসার অসমতার মধ্যে সমতার সন্ধানের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তাহা হইল এই যে, অর্থনৈতিক ঝঞ্ঝা-বাত্যার গতিরোধ করা যদি মানুষের সাধ্যাতীত রহিয়া যায়, তাহা হইলে কি মনুষ্যজাতি এই অর্থনীতির প্রাকৃতিক খেয়ালের ক্রীড়নক হইয়া চিরকাল বিধ্বস্তই হইবে? অথবা ভগবদ্দত্ত প্রজ্ঞা, চাতুর্য্য ও বুদ্ধিবৃত্তির বলে এ 'নৈসর্গিক' আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার গৃহ শক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া আক্রমণের হাত হইতে ত্রাণ লাভ করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সরল। মনুষ্যের প্রকৃতিগত বিবেক তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে শিক্ষা দিয়া থাকে। কিন্তু কবে ঝড় আসিবে তাহা জানা থাকা দরকার, নতুবা গৃহনির্ম্মাণ কবে করিবে? ব্যবসার 'তেজী' কবে, 'মন্দা' কবে জানা ব্যবসায়ীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। নতুবা বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক। কিন্তু ব্যবসার উত্থান-পতন—ধরা যাক্ কোন স্থানের কোন বিশেষ দ্রব্য-মূল্যের উঠ্‌তি-পড়্‌তি—এত সামঞ্জস্যহীন যে কেবল মাত্র উঠ্‌তি

অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে তেমন নির্দ্দিষ্টতার আভাস পাওয়া যায় না। এই অনির্দ্দিষ্টতার ভিতর নির্দ্দিষ্টতার অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈজ্ঞানিকের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা হইবে না। কারণ এ কার্য্য সম্পূর্ণ তাহার, ব্যবসায়ীর নহে।

আমেরিকা ও ইয়োরোপের বহু দেশে ব্যবসা সম্বন্ধে এখন বৈজ্ঞানিক পরিষৎ রহিয়াছে। এইসকল পরিষদের গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ব্যবসার গতি চক্রবৎ এবং এই 'চক্রবৎ' গতির বেগ এক এক ব্যবসাতে এক এক ধরণের। তাহাদের গতি-উৎপাদক শক্তির উৎস কোথায়, কাহার উপর সে শক্তি কতটা নির্ভর করে, এই সমস্ত বিষয় নির্ণয় করিবার যথোপযুক্ত পরিমাপক সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে অর্থনীতিকে অন্যান্য বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে আনয়ন করা হইয়াছে। এখন, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান যেরূপ গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, অর্থনীতির পক্ষেও গণিতের তদ্রূপ সাহায্য অপরিহার্য্য হইয়াছে।

যে প্রণালীতে ব্যবসার এই অসামঞ্জস্যের ভিতর সামঞ্জস্য আনয়ন করা যায়, তাহাকে বলা হয় ব্যবসা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ-গণনা-প্রণালী।

যাঁহারা জ্যোতিষ গণনা চর্চ্চা করেন তাঁহারা জানেন যে, এক জাত-কুণ্ডলী হইতে কোষ্ঠী বিচার করা সম্ভব নয়, আরো কয়েকটী তথ্য হইতে নানারূপ বিশ্লেষণ ও গণনা করিয়া লইলে তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভব হয় এবং গণনা যত সূক্ষ্ম ও নির্ভুল হইবে ভবিষ্যৎ বিচার তত নির্ভুল হইবে।

ব্যবসার হ্রাস-বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ বিচার করিতে হইলেও সেইরূপ বিশ্লেষণ, অঙ্কপাত—নানারূপ প্রণালীর প্রয়োজন। উচ্চাঙ্গ-গণিতের সাহায্য লইয়া দ্রব্যমূল্য কখন কিরূপ হইতে পারে তাহার ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রণালীতে দৃশ্যতঃ অনিয়মগুলির মধ্যে

কতকগুলি নিয়মের সন্ধান লাভ করা যায়। সেই নিয়মের অনুপাতে ব্যবসার হ্রাস-বৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হইতে পারে এবং ব্যবসায়িগণ সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর অনেকটা নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন। ব্যবহারিক জীবনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী সর্ব্বদা প্রয়োজন। জোয়ার-ভাঁটার সঠিক পূর্ব্বাভাষ মানুষের কত উপকারে আসে তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

ব্যবসার হ্রাস-বৃদ্ধি গণনা ও সেগুলির কার্য্যে প্রয়োগ এ দেশে অতি অল্পই হইয়াছে। এ জ্ঞান যথাযথ প্রসার লাভ করিলে কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

গণিত ব্যতিরেকে সংখ্যা বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও বিচার-পদ্ধতির আভাষ দেওয়া যায় একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা। এইরূপ দৃষ্টান্তের জন্য বাঙ্গলা দেশের পাটের দর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

সংক্ষেপে আমরা এই কয়টি প্রধান বিষয়ের আলোচনা করিব :—

(১) কেন পাট বাঙ্গলায় এত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে?

(২) পাটের সম্বন্ধে চাহিদা ও যোগান নিয়ম খাটে কিনা? পাট-চাষ হ্রাসের ফলে দরবৃদ্ধির সম্ভাবনা কিরূপ?

(৩) ফাট্‌কা বাজারের দর ও কাঁচা পাটের দরের উঠ্‌তি-পড়্‌তির সামঞ্জস্য কিরূপ? ফাট্‌কা বাজারের উঠ্‌তি-পড়্‌তি কোনো নিয়ম মানে কিনা?

(৪) দরের উপর স্থানীয় চটকলে মজুত পাটের পরিমাণের প্রভাব কিরূপ?

( ১ )

<u>বাঙ্গলা দেশের আর্থিক উন্নতি অবনতির জন্য 'পাট'কেই</u> দায়ী করা হয়। অন্যান্য যেসব পণ্যদ্রব্য বাঙ্গলার কৃষকেরা উৎপাদন

করে সেগুলির সহিত পাটের পার্থক্য কি তাহা দেখিলে পাটের উপর এত জোর কেন দেওয়া হয় তাহা বুঝা যাইবে।

| | | ১৯৩১-৩২ সনের হিসাব |
|---|---|---|
| মোট ফসলের মূল্য | ... | ১০৬ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা |
| ,, উৎপন্ন পাটের মূল্য | ... | ১০ কোটি ২১ লক্ষ ,, |
| পাটের মূল্য মোট ফসলের মূল্যের | ... ... | প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ |

দেখিতে গেলে ইহা মোট ফসলের অতি সামান্য অংশ মাত্র; কিন্তু অন্যান্য যেসকল ফসল উৎপন্ন হয় অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া তাহাদের সহিত পাটের পার্থক্য অতি বেশী। ধান, রবি শস্য, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি ফসলের বিদেশী রপ্তানি ছাড়াও দেশের কৃষক অকৃষকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার আছে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে রপ্তানি ব্যাপারে এসকল ফসল বাঙ্গলার একচেটিয়া মাল নয়। অন্যান্য ফসলের কেবল যে অংশ বিদেশে রপ্তানি হয় তাহার উপর দেশের লাভালাভ নির্ভর করে। যে ফসল কৃষকগণ নিজেরা ব্যবহার করে তাহাদের দামের তারতম্যে কৃষকের যায় আসে না। দেশের অকৃষকেরা যে অংশ ব্যবহার করে তাহার দাম বেশী হইলে কৃষকেরা লাভবান হইলেও যে লাভ তাহারা সংগ্রহ করে তাহা আসে দেশেরই অকৃষকের নিকট হইতে। এই প্রণালীতে দেশের মোট অর্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস না হইয়া দেশের মধ্যেই এক হাত হইতে অন্য হাতে টাকাকড়ি প্রবাহিত হয় মাত্র। কিন্তু পাটের ব্যাপার অন্য রকম। অধিকাংশই রপ্তানি হয় কাঁচা পাট ও চট হিসাবে, যথা—

১৯৩১ সনের হিসাব

বাঙ্গলা দেশ হইতে বিদেশে মোট রপ্তানি মালের মূল্য প্রায় ৫২ কোটি টাকা।

তন্মধ্যে কাঁচা পাট ও পাট-জাত সামগ্রীর মূল্য প্রায় ৩১ কোটি টাকা।

অর্থাৎ পাটের দরুণ বিদেশ হইতে আসিয়াছে মোট ১০ ভাগের ৬ ভাগ টাকা।

## কাঁচা পাট, ছালা, চটের হিসাব

কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার।

তৈরী পাট (ছালা, চট ইত্যাদি) বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে ২১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার।

অর্থাৎ কাঁচা পাটের দরুণ বিদেশ হইতে আসিয়াছে মোট ১০ ভাগের প্রায় ২ ভাগ।

আর তৈরী পাটের দরুণ বিদেশ হইতে আসিয়াছে মোট ১০ ভাগের প্রায় ৪ ভাগ।

ছালা, চটের রপ্তানির মাত্রা কাঁচা পাটের রপ্তানির মাত্রা হইতে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলার শিল্পোন্নতির পক্ষে ছালা, চট প্রস্তুত করার শিল্প কম সহায়ক নয়। কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ না করিয়াও আরও দু'একটি চটকল বাঙ্গলা দেশে বোধ হয় বসান সম্ভব। পাট ও ছালার চট প্রয়োজন হয় পৃথিবীর সকল দেশেই, অথচ পাট বাঙ্গলা দেশের প্রায় একচেটিয়া সম্পত্তি। বিহার ও আসামেও পাট জন্মায় বটে, কিন্তু এই তিন প্রদেশে মোট যে পরিমাণ পাট জন্মায় তার কম-বেশী চৌদ্দ আনা হয় বাঙ্গলা দেশে।

## ১৯২২-৩৩ সনের হিসাব

(৪০০ পাউণ্ডে এক গাঁট হিসাবে)

তিন প্রদেশে মোট পাট জন্মিয়াছিল ৫৮ লক্ষ ৪৪ হাজার গাঁট। তন্মধ্যে

বাঙ্গলায় „ „ „ ৫১ লক্ষ ২৭ „ „

এই প্রকার হিসাব হইতে দেখা যায় পাটের সমকক্ষ এমন আর একটি দ্বিতীয় সামগ্রী নাই যাহা হইতে বাঙ্গলা দেশে টাকার এত আমদানি হয়, আর যে টাকা চাষী হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সকলের মধ্যে এত বিস্তৃতভাবে বিতরিত হয়। এই সকল কারণে পাট বাঙ্গলা দেশের প্রাণ-স্বরূপ, সকল বাঙ্গালীর আগ্রহের বস্তু। বাঙ্গলার যে কোনো আর্থিক প্রচেষ্টার পশ্চাতে রহিয়াছে পাট-রহস্য, আর সকল আর্থিক পরিকল্পনার ভিত্তি হইল পাট-তত্ত্ব। পাটের চাষ, পাটের দর, বিদেশে রপ্তানি, দেশের বাজার ইত্যাদির খবর লইতে বাঙ্গলার অধিবাসী সকলেই উদ্‌গ্রীব। ১৯২১ হইতে ১৯৩৩ সন পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসে কলিকাতায় পাটের দর কিরূপ ছিল তাহা তালিকা ১এ দেখান হইল।

তালিকা ১

কলিকাতা বাজারে কাঁচা পাটের দর

( ৪ মণ কাঁচা পাটের প্রতিমাসের গড়ে যত টাকা দর দেখা যায়, ইয়োরোপিয়ান 'আর' গ্রেড্ )*

| | ১৯২১ | ১৯২২ | ১৯২৩ | ১৯২৪ | ১৯২৫ | ১৯২৬ | ১৯২৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | ২৩ | ২৮ | ৫২ | ৪৪ | ৬১ | ৯৮ | ৫২ |
| ফেব্রুয়ারী | ২২ | ২৮ | ৫৩ | ৪২ | ৬২ | ৯৭ | ৫০ |
| মার্চ্চ | ২২ | ৩০ | ৫২ | ৪৬ | ৬৫ | ৬৮ | ৫২ |
| এপ্রিল | ২১ | ৩৫ | ৪৬ | ৪৬ | ৬৮ | ৬২ | ৫২ |
| মে | ২১ | ৪৪ | ৪২ | ৪০ | ৬০ | ৫৭ | ৪৫ |
| জুন | ২০ | ৪৯ | ৩৭ | ৪০ | ৬৩ | ৫২ | ৪৫ |

*'ক্যাপিট্যাল', কলিকাতা,—সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রতি সপ্তাহের দর সংগৃহীত হয়। আংশিক সংগ্রাহক শ্রীঅনিল রায়, শ্রীসুশীল রায় ও শ্রীসরোজ মজুমদার।

| | ১৯২১ | ১৯২২ | ১৯২৩ | ১৯২৪ | ১৯২৫ | ১৯২৬ | ১৯২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জুলাই | ২৪ | ৫১ | ৩৮ | ৪৫ | ৬৪ | ৪৮ | ৪৪ |
| আগষ্ট | ২৯ | ৫০ | ৩২ | ৪৮ | ৬৮ | ৪১ | ৪৫ |
| সেপ্টেম্বর | ৩০ | ৪৪ | ২৯ | ৫৩ | ৬৮ | ৪৫ | ৪২ |
| অক্টোবর | ৩০ | ৪৪ | ২৮ | ৬০ | ৯২ | ৪৬ | ৪০ |
| নভেম্বর | ২৬ | ৪৪ | ৩৪ | ৬১ | ১০৪ | ৪৭ | ৩৬ |
| ডিসেম্বর | ২৫ | ৫২ | ৩৮ | ৫৭ | ১০১ | ৪৯ | ৩৯ |

| | ১৯২৮ | ১৯২৯ | ১৯৩০ | ১৯৩১ | ১৯৩২ | ১৯৩৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | ৪২ | ৫৩ | ৩৪ | ১৯ | ৩১ | ২১ |
| ফেব্রুয়ারী | ৪১ | ৫৬ | ৩৫ | ১৯ | ২৭ | ২০ |
| মার্চ্চ | ৪১ | ৫৪ | ৩৩ | ১৮ | ২৫ | ২০ |
| এপ্রিল | ৪৫ | ৫১ | ৩৩ | ২০ | ২২ | ২২ |
| মে | ৪৬ | ৪৮ | ৩২ | ২০ | ২২ | ২৪ |
| জুন | ৪৯ | ৪৫ | ৩০ | ২০ | ২১ | ২৫ |
| জুলাই | ৫৫ | ৪৩ | ২৬ | ১৯ | ২১ | ২৫ |
| আগষ্ট | ৫১ | ৩৮ | ২২ | ১৯ | ২৬ | ২৩ |
| সেপ্টেম্বর | ৪৫ | ৩৭ | ১৮ | ২৩ | ২৮ | ১৮ |
| অক্টোবর | ৪৬ | ৩৫ | ১৯ | ২৮ | ২৫ | ১৮ |
| নভেম্বর | ৪৯ | ৩৪ | ২২ | ৩৩ | ২২ | ১৭ |
| ডিসেম্বর | ৫২ | ৩৪ | ২১ | ৩২ | ২১ | ১৯ |

( ২ )

পাটের চাহিদা-যোগানের উপর দর কিরূপ নির্ভর করে তাহার দৃষ্টান্ত "ক" চিত্রের প্রথম চারিটী অংশে দেখান হইয়াছে (পৃঃ ৫৪৭-৪৮)।

প্রথম অংশ—১৯২১ হইতে ১৯৩১ সনে স্থানীয় কলে বৎসর বৎসর যত লক্ষ গাঁট লওয়া হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অংশ—কলিকাতায় পাঁচ মণ পাটের ১৯২১ হইতে ১৯৩১

সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১৯১৪ সনের মূল্যের ( টাকা ) তুলনায় কত দর ছিল ( এই দরকে চিত্রে প্রকৃত দর বলা হইয়াছে )।

তৃতীয় অংশ—১৯২১ হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর যত লক্ষ গাঁট রপ্তানি করা হইয়াছিল।

চতুর্থ অংশ—১৯২১ হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ( লক্ষ গাঁট হিসাবে ) পাট জন্মিয়াছিল ( চিত্রে অ—অ রেখা কেবল বাঙ্গলা দেশে যে পরিমাণ হইয়াছিল, ক—ক রেখা কেবল বাঙ্গলা, বিহার ও আসামে যে পরিমাণ হইয়াছিল )।

'ক' চিত্র
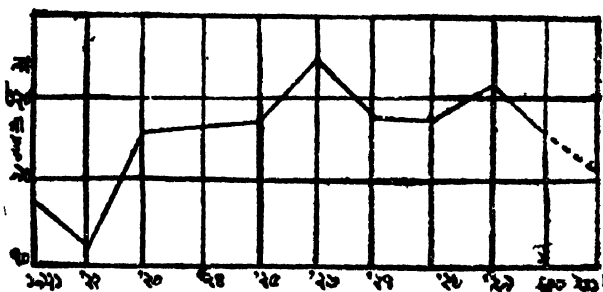
(২) কলিকাতায় পাঁচ মণ কাঁচা পাটের প্রকৃত দর :—
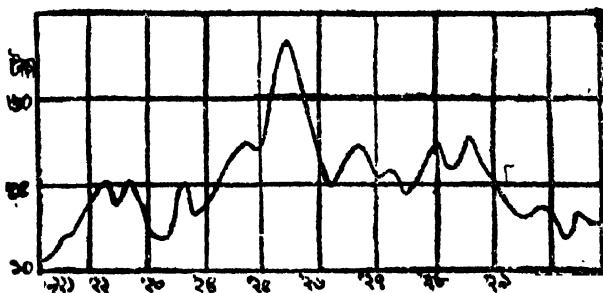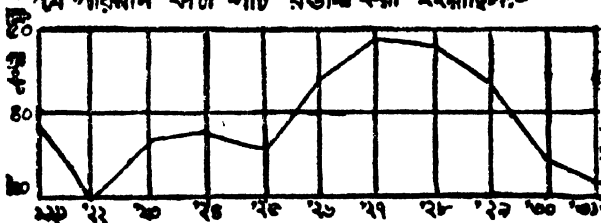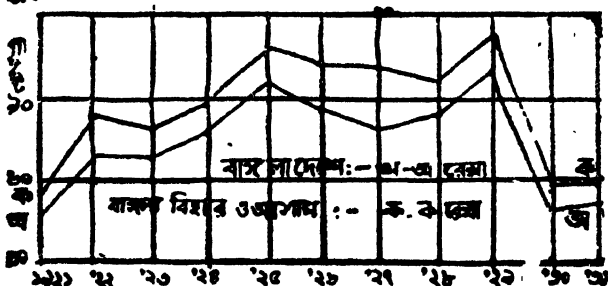
এই চিত্রগুলিতে উৎপন্ন পাটের স্থানীয় কলে লওয়ার ও রপ্তানির পরিমাণের সহিত দরের সম্বন্ধ এইরূপ ছিল দেখা যায় :—

| | ১৯২১ হইতে ১৯২২ | ১৯২২ হইতে ১৯২৩ | ১৯২৩ হইতে ১৯২৪ | ১৯২৪ হইতে ১৯২৫ | ১৯২৫ হইতে ১৯২৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| রপ্তানির হার :— | কমিল | বাড়িল | প্রায় সমান | কমিল | বাড়িল |
| দর :— | বাড়িল | কমিল | বাড়িল | বাড়িল | বাড়িয়া কমিল |
| স্থানীয় কলে লওয়ার হার :— | কমিল | বাড়িল | প্রায় সমান | প্রায় সমান | বাড়িল |
| উৎপাদন হার :— | বাড়িল | প্রায় সমান | বাড়িল | বাড়িল | কমিল |

| | ১৯২৬ হইতে ১৯২৭ | ১৯২৭ হইতে ১৯২৮ | ১৯২৮ হইতে ১৯২৯ | ১৯২৯ হইতে ১৯৩০ | ১৯৩০ হইতে ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|---|
| রপ্তানির হার :— | বাড়িল | প্রায় সমান | কমিল | কমিল | কমিল |
| দর :— | কমিয়া বাড়িল | বাড়িল | কমিল | কমিল | প্রায় সমান |
| স্থানীয় কলে লওয়ার হার :— | কমিল | প্রায় সমান | বাড়িল | কমিল | কমিল |
| উৎপাদন হার :— | কমিল | প্রায় সমান | বাড়িল | কমিল | সমান |

একটু মনোযোগ সহকারে উপরের তালিকা দেখিলে জানা যাইবে, এই দশ বৎসর উৎপাদন ও রপ্তানি অনুকূলে থাকিলেও প্রায়ই দর বাড়ে নাই, বরং স্থানীয় কলে লওয়ার হার বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে প্রায়ই দর যথাক্রমে কমিয়াছে বা বাড়িয়াছে।

( ৩ )

ফাটকা বাজারের দর ও কাঁচা পাটের দরের উঠ্‌তি-পড়তির সামঞ্জস্য কেমন তাহার দৃষ্টান্ত "ক" চিত্রের পঞ্চম অংশে (পৃঃ ৫৫০) দেখান হইয়াছে—১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ (জুলাই হইতে জুন) পর্য্যন্ত কলিকাতার ফাটকা বাজার দর ও পাঁচ মণ কাঁচা পাটের দর কত টাকা ছিল (গোটা রেখা দ্বারা ফাটকা বাজার ও ভাঙ্গা রেখা দ্বারা পাঁচ মণ পাটের দর দেখান হইয়াছে)। ফাটকা বাজারের প্রতি মাসের মাঝামাঝি দর আর কাঁচা পাটের মাসের গড়পড়তা দর লওয়া হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই ১৯১৪ সনের মাপকাঠিতে টাকা গুন্‌তি করা হইয়াছে।

'ক' চিত্র

(৫)
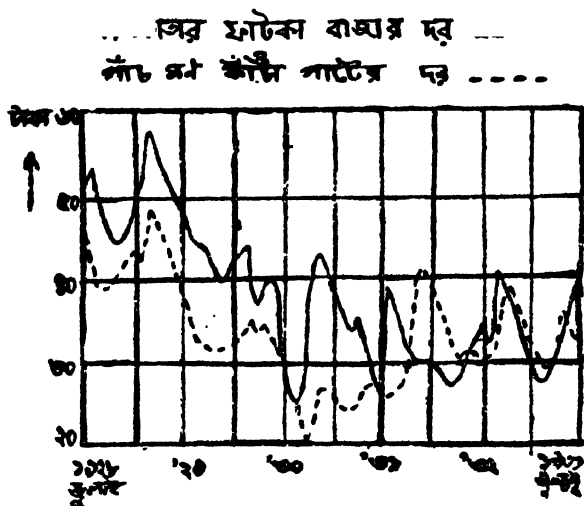
তালিকা ২

১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ সনে কলিকাতার ফাটকা বাজার দর ও কাঁচা পাটের পাঁচ মণের দরের কিরূপ সামঞ্জস্য ছিল নীচের তালিকায় দেখান হইল :—

| | ১৯২৮ হইতে ১৯২৯ প্রথমার্দ্ধ (জুলাই—ডিসেম্বর) | ১৯২৮ হইতে ১৯২৯ দ্বিতীয়ার্দ্ধ (জানুয়ারী—জুন) | ১৯২৯ হইতে ১৯৩০ প্রথমার্দ্ধ (জুলাই—ডিসেম্বর) | ১৯২৯ হইতে ১৯৩০ দ্বিতীয়ার্দ্ধ (জানুয়ারী—জুন) |
|---|---|---|---|---|
| ফাটকা দর | কমিয়া বাড়িল | বাড়িয়া কমিল | কমিল | কিছু বাড়িয়া কমিল |
| পাটের দর | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |

| | ১৯৩০ হইতে ১৯৩১ | | ১৯৩১ হইতে ১৯৩২ | |
|---|---|---|---|---|
| | প্রথমার্দ্ধ (জুলাই—ডিসেম্বর) | দ্বিতীয়ার্দ্ধ (জানুয়ারী—জুন) | প্রথমার্দ্ধ (জুলাই—ডিসেম্বর) | দ্বিতীয়ার্দ্ধ (জানুয়ারী—জুন) |
| ফাটকা দর | কমিয়া বাড়িল | কমিল | বাড়িয়া কমিল | কমিয়া বাড়িল |
| পাটের দর | ঐ | প্রায় সমান | বাড়িল | কমিয়া সমান |

| | ১৯৩২ হইতে ১৯৩৩ | |
|---|---|---|
| | প্রথমার্দ্ধ (জুলাই—ডিসেম্বর) | দ্বিতীয়ার্দ্ধ (জানুয়ারী—জুন) |
| ফাটকা দর | বাড়িয়া কমিল | কমিয়া বাড়িল |
| পাটের দর | ঐ | ঐ |

এই তালিকা হইতে দেখা যায় ফাটকা বাজার দর এবং কাঁচা পাটের দরের উঠ্তি-পড়তির মধ্যে আলোচ্য সময়ে কোন পার্থক্য নাই (কেবল ১৯৩১ সনের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর ও ১৯৩২ সনের জুন পর্য্যন্ত সময় ব্যতীত)। পাটের দর বিচার করিতে ফাটকা বাজারকে উপেক্ষা করিয়া চলা সঙ্গত নহে ইহা তাহার প্রমাণ।

ফাটকা বাজারের উঠতি-পড়তিও আবার নানারূপ কারণে ঘটিয়া থাকে। কয়েকটী বিশেষ ব্যাপার, যথা :—

(ক) চট-কলের কেনার পরিমাণ,

(খ) রপ্তানিকারকদের ক্ষমতা,

(গ) লণ্ডনের দাম,

(ঘ) হেসিয়ান, চাঁদি, চটকলের—প্রধানতঃ 'হাওড়া' ও 'কামারহাটি'—শেয়ারের দাম, ও

(৬) 'তেজীওয়ালা' বা 'মন্দীওয়ালা'দের জোর।

এইগুলিকেই মূলতঃ ফাটকা বাজারের দৈনন্দিন উঠতি-পড়তি ঘটাইবার কারণ বলা যায়। তবু এই উঠতি-পড়তি যে কিছু-না-কিছু নিয়ম মানিয়া চলে তাহা প্রমাণ করা সম্ভব। পাটের দরেও এইরূপ নিয়ম অনুযায়ী উঠা-নামা ঘটে।

(৪)

স্থানীয় চটকলে মজুত পাটের পরিমাণের প্রতিপত্তি পাটের দরের উপর কেমন তাহা দেখা যায় নীচের তালিকায়:—

তালিকা ৩

| বৎসর (জুলাই) (১) | চটকলে মজুত পাট (লক্ষ গাঁট) (২) | বৎসরে গড়পড়তা গাঁট প্রতি দর কত টাকা (৩) |
|---|---|---|
| ১৯২৫ | ১৭·৫ | ১১১·৬ |
| ১৯২৬ | ১৬·০ | ৯৮·৭ |
| ১৯২৭ | ৩৬·০ | ৭৬·৪ |
| ১৯২৮ | ৩৮·৫ | ৭৫·১ |
| ১৯২৯ | ৩৮·০ | ৭১·৩ |
| ১৯৩০ | ৩৪·৫ | ৫০·৩ |
| ১৯৩১ | ৫১·৫ | ৩৭·৩ |
| ১৯৩২ | ৪২·০ | ৩১·৭ |
| ১৯৩৩ | ৪৬·৫ | ২৮·৮ |
| ১৯৩৪ | ৪৪·২ | ২৫·৫ |

| বৎসর (জুলাই) | বৎসরে গড়পড়তা গাঁটপ্রতি দর ১৯১৪ সনের মাপকাঠিতে টাকা গুন্‌তি করিয়া | মজুত পাটের পরিমাণকে উল্টাইয়া লিখিলে দশমিক প্রণালীতে যে সংখ্যা হয় ( উল্টান অর্থ ধরা হইয়াছে এইরূপ : ১৯২৫ সনের ১৭'৫কে $\frac{১}{১৭'৫}$ = '০৫৭ ইত্যাদি ৫৭'১ সহস্রাংশ) |
|---|---|---|
| | (৪) | (৫) |
| ১৯২৫ | ৬৯'০৮ | ৫৭'১ সহস্রাংশ |
| ১৯২৬ | ৬৬'২৩ | ৬২'৫ ,, |
| ১৯২৭ | ৫১'২৬ | ২৭'৭ ,, |
| ১৯২৮ | ৫১'৮২ | ২৫'৯ ,, |
| ১৯২৯ | ৫০'৪৫ | ২৬'৩ ,, |
| ১৯৩০ | ৪৩'২৬ | ২৮'৯ ,, |
| ১৯৩১ | ৩৮'৭৯ | ১৯'৪ ,, |
| ১৯৩২ | ৩৪'৮৭ | ২৩'৮ ,, |
| ১৯৩৩ | ৩৩'১২ | ২১'৫ ,, |
| ১৯৩৪ | ২৯'৫৪ | ২৬'৬ ,, |

'ক' চিত্রের ষষ্ঠ অংশে ( পৃঃ ৫৫৪ ) দেখান হইয়াছে গড়পড়তা গাঁট-প্রতি পাটের দর ( ১৯১৪ সনের মাপকাঠিতে টাকা গুন্‌তি করিয়া ) ও মজুত পাটের পরিমাণ উল্টাইয়া লইলে যে সহস্রাংশ সংখ্যা হয় সেগুলি বৎসরের পর বৎসর ১৯২৫ হইতে ১৯৩৪ সন পর্য্যন্ত সমান তালে নামিয়া চলিয়াছে।

তালিকা ৩এর সংখ্যাগুলি ( পৃঃ ৫৫২-৫৩ ) সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় :—

(ক) পাটের দর হ্রাস ও চটকলে মজুত পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে বিপরীতভাবে।

(খ) শতকরা ৯৩ বার মজুত পাটের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে

দরের হ্রাস ঘটিয়াছে ; মজুতের উপরে দর নির্ভর করে ১০০ ভাগের ৮৫ ভাগ।

'ক' চিত্র
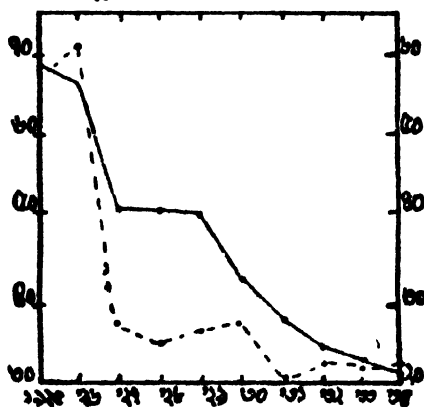
(গ) প্রতি ১ লক্ষ গাঁট মজুত-বৃদ্ধির সহিত পাটের দাম গাঁট প্রতি ১৯১৪ সনের মাপকাঠিতে টাকা গুন্‌তি করিলে এক টাকা এবং সেরূপ গুন্‌তি না করিলে প্রায় আড়াই টাকা কমিয়াছে। ১ গাঁটে ৫ মণ পাট হিসাব করিলে এক মণ পাটের দাম এক টাকা বৃদ্ধি করিতে হইলে অন্ততঃ দুই লক্ষ গাঁট মজুত কমান দরকার। এই হিসাবে চাষীর মণপ্রতি অন্ততঃ ১০৲ টাকা দাম পাইতে হইলে চটকলে মজুত ত্রিশ বত্রিশ লক্ষ গাঁটের বেশী হওয়া চলে না।

এখন আমরা তালিকা ১এর সংখ্যাগুলি (পৃঃ ৫৪৫-৫৪৬) কিরূপে বিশ্লেষণ করা যায় এবং সেরূপ বিশ্লেষণের তাৎপর্য্য কি সে বিষয়ে আলোচনা করিব। বিশ্লেষণ-প্রণালী কিরূপ তাহার আভাষ দেওয়া যায় নিম্নের চিত্রদ্বারা :—

'ক—১' চিত্র

পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় 'ক-১' চিত্রে একটী গোটা রেখা ও একটী ভাঙ্গা-ভাঙ্গা রেখা দ্বারা পাটের দর কখন কিরূপ ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গোটা রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে কলিকাতা বাজারে কাঁচা পাট মণ প্রতি কি দরে বিক্রী হইয়াছিল। ভাঙ্গা রেখাটীর অর্থ এই যে, যদি ১৯১৪ সনের তুলনায় অন্যান্য সকল দ্রব্যমূল্যের অনুপাতে টাকার দর স্থিরভাবে থাকিত তাহা হইলে প্রতি মণ পাটের দর 'প্রকৃত' পক্ষে কখন কিরূপ থাকিত।

দ্রব্যমূল্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথম সোপান হইল চলিত মুদ্রার দরের বাড়তি কমতি বাদ দিয়া লওয়া। এজন্য সমগ্র দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা জানা প্রয়োজন। এরূপ বাদ দিয়া লওয়ার সুবিধা এই যে, যে দ্রব্যের মূল্য বিশ্লেষণ করা হইতেছে তাহার প্রত্যেকটী দর একটী নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। যেমন জলমিশ্রিত দুধের ওজন হইবে একরূপ, আর খাঁটি দুধের ওজন হইবে অন্যরূপ। তেমনি, ১৯১৪ সনের এক টাকায় যে সুবিধা সুযোগ ক্রয় করা যাইত, ১৯২১ সনের বা ১৯২৫ সনের এক টাকায় হয়ত সে সুযোগ সুবিধা ক্রয় করা সম্ভব হইত না। যে দ্রব্যের এক মণের দাম ১৯২৫ সনে ২৫৲ টাকা, সে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া হয়ত ১৯১৪ সনের অনুপাতে ২৫৲ টাকার মত সুবিধা সুযোগ ক্রয় করা যাইত না। পাট ১৯২৫ সনে ২৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রী হইয়াছিল, কিন্তু সে সময় ২৫৲ টাকায় যে সুযোগ সুবিধা ক্রয় করা যাইত সেই সুযোগ সুবিধা ১৯১৪ সনে ক্রয় করিতে লাগিত ১৬৲ টাকা। এই জন্য ধরা যায়, ১৯২৫ সনের ২৫৲ টাকা ১৯১৪ সনের ১৬৲ টাকার সমান। এইভাবে প্রত্যেক সময়ের দর ১৯১৪ সনের কোন্ দরের সমান তাহা ঠিক করিয়া লইয়া সেই দরগুলি ক-১ চিত্রে ভাঙ্গা রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। যুদ্ধের প্রায় প্রাক্কালের (১৯১৪ সনের) টাকার মাপকাঠিতে বিচার করা ভারতবর্ষে

সর্ব্ববাদিসম্মত। তালিকা ৪এ (পৃঃ ৫৫৯) কলিকাতার সমগ্র দ্রব্যমূল্য ১৯১৪ সনের জুলাইয়ের তুলনায় কিরূপ ছিল তাহা দেখান হইল। এইরূপে সাব্যস্ত করা দরকে 'প্রকৃত' দর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় 'খ' চিত্রে প্রকৃত দর পৃথকভাবে দেখান হইল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, প্রকৃত দরও ঢেউ-কাটাভাবে বাড়িয়াছে কমিয়াছে। এখন এই হ্রাস-বৃদ্ধির রীতি কিরূপ তাহার বিশ্লেষণ করা চলে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় ও গণিত-সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া অর্থ-নীতিবিদ্‌রা দেখিয়াছেন যে, কি দ্রব্যমূল্য, কি ব্যবসার অন্য কোন অস্থির ও পরিবর্ত্তনশীল রূপ সকলগুলির ভিতরই প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটী বিশিষ্ট প্রক্রিয়া ধরা যায় :—

( ১ ) বৃদ্ধি বা হ্রাসের বহু বৎসরব্যাপী একটী সাধারণ গতি (ট্রেণ্ড)।

( ২ ) বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরের ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন ( সিজন্যাল ভ্যারিয়েশন )।

( ৩ ) অল্পবিস্তর ধারাবাহিকভাবে চক্রাকার বা আবর্ত্তমান গতি ( সাইক্লিক্যাল মুভমেণ্ট )।

গত ১৯২১ সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৩৩ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত পাটের 'প্রকৃত' দাম এইরূপ তিন প্রক্রিয়া দ্বারা কিরূপ হ্রাস ও বৃদ্ধি পায় তাহা সংখ্যাতত্ত্ব-বিষয়ক গণিতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে।

১৯২১ সন হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত দরের গতি বৃদ্ধির দিকে ছিল। এই পথ অ—আ রেখা দ্বারা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় 'খ' চিত্রে দেখান হইয়াছে। ১৯২৫ সনের পর হইতে ১৯৩০ সন পর্য্যন্ত দরের গতি হ্রাসের দিকে ছিল। সেই পথ ই—উ রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। আবার ১৯৩০ সনের পর হইতে বৃদ্ধির পথ এ—ও রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। এই রেখাগুলি গণিতের নানারূপ পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

অ' চিত্র:- কলিকাতার প্রতি মন পাটের প্রকৃত দর।
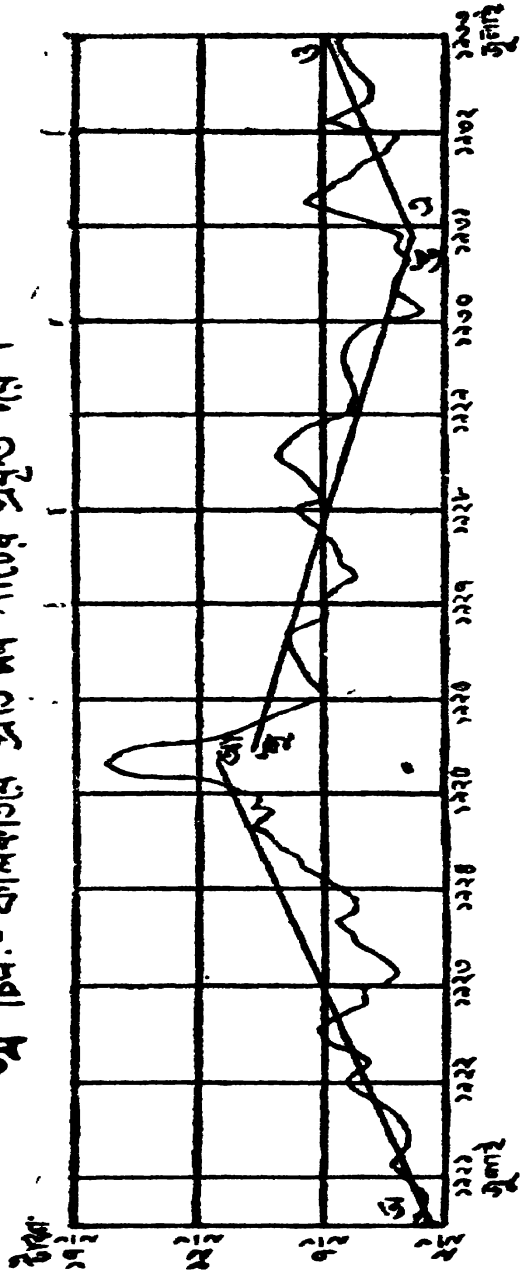
## তালিকা ৪

কলিকাতার সমগ্র দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা (১৯১৪, জুলাই =১০০)*

| | ১৯২১ | ১৯২২ | ১৯২৩ | ১৯২৪ | ১৯২৫ | ১৯২৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | ১৭৮ | ১৭৮ | ১৭৯ | ১৭২ | ১৬৫ | ১৫৯ |
| ফেব্রুয়ারী | ১৭৪ | ১৭৯ | ১৮০ | ১৭৮ | ১৬৪ | ১৫৪ |
| মার্চ্চ | ১৭৫ | ১৮২ | ১৮১ | ১৭৯ | ১৬২ | ১৫১ |
| এপ্রিল | ১৮৩ | ১৮২ | ১৭৮ | ১৭৪ | ১৬৪ | ১৪৯ |
| মে | ১৮৪ | ১৮৭ | ১৭৭ | ১৭৬ | ১৫৯ | ১৪৬ |
| জুন | ১৭৮ | ১৮৩ | ১৭৫ | ১৭৬ | ১৫৩ | ১৪৭ |
| জুলাই | ১৮৩ | ১৮১ | ১৭০ | ১৭৯ | ১৫৭ | ১৪৫ |
| আগষ্ট | ১৮৪ | ১৭৮ | ১৭১ | ১৮০ | ১৫৪ | ১৪৭ |
| সেপ্টেম্বর | ১৮৭ | ১৭৬ | ১৭৪ | ১৭৯ | ১৫৫ | ১৪৬ |
| অক্টোবর | ১৮৪ | ১৭৭ | ১৭৪ | ১৮১ | ১৫৮ | ১৪৪ |
| নভেম্বর | ১৮০ | ১৭৮ | ১৭৭ | ১৮০ | ১৬১ | ১৪৬ |
| ডিসেম্বর | ১৮০ | ১৭৬ | ১৭৯ | ১৭৬ | ১৫৯ | ১৪৬ |

| | ১৯২৭ | ১৯২৮ | ১৯২৯ | ১৯৩০ | ১৯৩১ | ১৯৩২ | ১৯৩৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | ১৪৮ | ১৪৫ | ১৪৫ | ১৩১ | ৯৮ | ৯৭ | ৮৮ |
| ফেব্রুয়ারী | ১৪৬ | ১৪৪ | ১৪৪ | ১২৬ | ৯৯ | ৯৭ | ৮৬ |
| মার্চ্চ | ১৪৮ | ১৪৪ | ১৪৩ | ১২৫ | ১০০ | ৯৪ | ৮২ |
| এপ্রিল | ১৪৫ | ১৪৬ | ১৪০ | ১২৩ | ৯৮ | ৯২ | ৮৪ |
| মে | ১৪৬ | ১৪৭ | ১৩৯ | ১২১ | ৯৭ | ৮৯ | ৮৭ |
| জুন | ১৪৯ | ১৪৫ | ১৩৮ | ১১৬ | ৯৩ | ৮৭ | ৮৯ |
| জুলাই | ১৫০ | ১৪৮ | ১৪২ | ১১৫ | ৯৩ | ৮৭ | ৯১ |

* 'ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল' পত্রিকা হইতে সংগৃহীত।

'গ' চিত্র : কলিকাতার পাটের দরের ঋতুব্যাপী হ্রাসবৃদ্ধি।
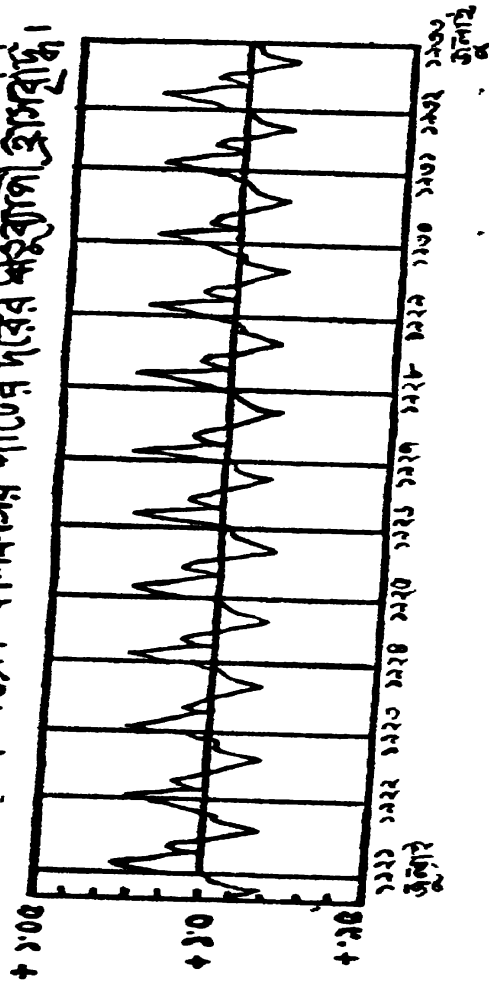
| | ১৯২৭ | ১৯২৮ | ১৯২৯ | ১৯৩০ | ১৯৩১ | ১৯৩২ | ১৯৩৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আগষ্ট | ১৫১ | ১৪৩ | ১৪৩ | ১১৪ | ৯২ | ৯১ | ৮৯ |
| সেপ্টেম্বর | ১৪৯ | ১৪২ | ১৪৩ | ১১১ | ৯১ | ৯১ | ৮৮ |
| অক্টোবর | ১৪৭ | ১৪৩ | ১৪০ | ১০৭ | ৯৬ | ৯১ | ৮৮ |
| নভেম্বর | ১৪৮ | ১৪৬ | ১৩৭ | ১০৩ | ৯৭ | ৯০ | ৮৮ |
| ডিসেম্বর | ১৪৮ | ১৪৫ | ১৩৪ | ১০০ | ৯৮ | ৮৮ | ৮৯ |

নূতন পাট জুলাই মাসে আমদানি হয় এবং এক বৎসরের পাট পর বৎসর জুন পর্য্যন্ত (এই বার মাস) চলে। এই বার মাসের মধ্যে জুলাই মাসের পর আগষ্ট সেপ্টেম্বরে প্রায়ই দর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়া কমিতে থাকে। মাঝে একটু বাড়িয়া পর বৎসর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর দিকে সর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া আবার বাড়িতে থাকে। প্রতি বৎসর এইরূপ বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। এই ঋতুব্যাপী গতি পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় 'গ' চিত্রে দেখান হইয়াছে। ঋতুব্যাপী হ্রাস-বৃদ্ধিও নির্দ্দিষ্ট করা হয় গণিতের সাহায্যে।

কিছু সাধারণ হ্রাসবৃদ্ধির দরুণ এবং কিছু ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তনের দরুণ এই দুইটীর দরুণ হ্রাস-বৃদ্ধি বাদ দিয়া প্রকৃত দরের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় 'ঘ' চিত্রে দেখান হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন ঘুরিয়া ফিরিয়া অল্পবিস্তর প্রায় এক প্রকার। একটী পূর্ণ তরঙ্গ, এক ঢেউয়ের শীর্ষদেশ হইতে পরবর্ত্তী ঢেউয়ের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত। এই আবর্ত্তন ঘটিতে প্রায় সাড়ে তিন হইতে চারি বৎসর সময় লাগে। এই তরঙ্গও গণিতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, তিনটী সহজ ও প্রাথমিক তরঙ্গ একত্রিত হইবার ফলে গোটা তরঙ্গরাজি যেন একটী যৌগিক তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে।

ব্যবসার অন্যান্য রূপ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের তরঙ্গরাজি পৃথক করিয়া, কোন্ তরঙ্গ এই পাট-তরঙ্গের অনুরূপ বা কোন্ তরঙ্গের সহিত পাট-তরঙ্গের সামঞ্জস্য কত নিকট তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। এইরূপ

পদ্ধতি দ্বারা পাটের দর কখন কিরূপ হইতে পারে তাহার ভবিষ্য-গণনা করা সম্ভব।

এই প্রকার বিশেষ পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে পাটের দর কিরূপ হইতে পারে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এইরূপ ইঙ্গিত হইতে পাটের দর

সম্বন্ধে কিরূপ পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল এইরূপ :—

২৩শে জানুয়ারী (১৯৩৩) তারিখ [বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স'এর নিকট] ইয়োরোপীয়ান "আর" গ্রেডের প্রতি মণ পাটের কলিকাতার দর বলা হইয়াছিল নিম্নরূপ :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪ঠা ফেব্রুয়ারী | ১৯৩৩ | তারিখের | সপ্তাহান্তে | হইবে | ৪৸৵০ |
| ১১ই ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ৫৲ |
| ১৮ই ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ৫৲ |
| ২৫শে ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ৫৲ |
| ৪ঠা মার্চ্চ | ,, | ,, | ,, | ,, | ৪৸৵০ |
| ১১ই ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ৪৸০ |
| ১৮ই ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ৪৷৶০ |
| ২৫শে ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ৪৷৵০ |

আর প্রকৃতপক্ষে পরে দর দেখা গেল নিম্নরূপ :—

| | | |
|---|---|---|
| ৪ঠা ফেব্রুয়ারী | ১৯৩৩ | ৫৵০ |
| ১১ই ,, | ,, | ৫৲ |
| ১৮ই ,, | ,, | ৫৵০ |
| ২৫শে ,, | ,, | ৫৵০ |
| ৪ঠা মার্চ্চ | ,, | ৪৸৵০ |
| ১১ই ,, | ,, | ৪৸০ |
| ১৮ই ,, | ,, | ৪৷৶০ |
| ২৫শে ,, | ,, | ৪৸৵ |

বিদেশের কথা এই প্রসঙ্গে কিছু বলা যায়। বিদেশে দ্রব্যমূল্যের পূর্ব্বাভাষ করিবার চেষ্টা চলিতেছে অনেক দিন হইতে। এইসকল চেষ্টার মধ্যে দুইএকটি গবেষণার উল্লেখ করা যাইতেছে যথা,—

'শূকরের দর সম্বন্ধে পূর্ব্বাভাষ'—গবেষক হাস্ ও ইজেকিল ( জার্ণাল অব্ অ্যামেরিকান্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ অ্যাসোসিয়েশন্, ১৯২৭ দ্রষ্টব্য )।

'বাণিজ্য পূর্ব্বাভাষ ও দ্রব্যমূল্য'—গবেষক ই, সি, স্নো ( জার্ণাল অব্ রয়্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটি, ১৯২৮ দ্রষ্টব্য )।

'ব্যাঙ্কের জমা হইতে সাধারণ দ্রব্যমূল্যের পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় কিভাবে'—গবেষক এইচ, ওয়ারকিং (রিভিউ অব্ ইকনমিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্স, ১৯২৬ )।

এই প্রকার প্রচেষ্টাদ্বারা ইহাই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে যে, গণিতাত্মক অর্থনীতির ফলস্বরূপ ব্যবসার পূর্ব্বাভাষ যেন একটি যন্ত্রবিশেষ যাহাদ্বারা ব্যবসা সুনিয়ন্ত্রিত করা এখন আর অসম্ভব নয়।

এদেশে গণিতাত্মক অর্থনীতির চর্চ্চা ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতিদ্বারা ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত করিবার সহায়তার জন্য কোনো সমিতি অদ্যাবধি গঠিত হয় নাই। আমেরিকা ও ইয়োরোপে এইরূপ আলোচনা ও গবেষণাদ্বারা যাহাতে ব্যবসায় দূরদর্শিতা লাভ করা যায় তাহার ব্যবস্থা অনেক উন্নত ও সম্পদশালী হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশে যেসকল প্রতিষ্ঠান ও সমিতি হইতে ব্যবসা সম্বন্ধে আভাষ দেওয়া হয় তাহা তালিকা ৫এ দেখান হইল :—

তালিকা ৫

| দেশ | প্রতিষ্ঠানের নাম | যে যে বিষয়ের আভাষ প্রকাশ করা হয় |
|---|---|---|
| অষ্ট্রেলিয়া | অ্যালেক্স হ্যামিল্টন ইনষ্টিটিউট লিমিটেড্ | ১। শেয়ার দর—২০টি শেয়ার সম্বন্ধে,<br>২। ব্যাঙ্কের ক্লিয়ারিং—৫টি সহরের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে,<br>৩। মূলধন, জমাওয়াশীল, মুদ্রা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের যৌথ তারতম্য সম্বন্ধে। |

| দেশ | প্রতিষ্ঠানের নাম | যে যে বিষয়ের আভাষ প্রকাশ করা হয় |
|---|---|---|
| জাপান | মিটস্যুবিশি গোসি কাইসা | ১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর—৫০টি শেয়ার সম্বন্ধে,<br>২। সমগ্র পাইকারী দর সম্বন্ধে,<br>৩। ডিস্কাউণ্ট দর—ব্যাঙ্ক অব জাপানের। |
| আমেরিকা | ব্রুক্‌মায়ার্স ইকনমিক সার্ভিস, নিউইয়র্ক | ১। শিল্প প্রতিষ্ঠান ও রেল কোম্পানীর শেয়ার দর ইত্যাদি—৪০টি শেয়ার দর সম্বন্ধে,<br>২। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের অনুপাত ইত্যাদি সম্বন্ধে,<br>৩। বৈদেশিক বাট্টার হার (বিশেষতঃ লণ্ডন বাজারের হার) সম্বন্ধে। |
| | হার্ভার্ড ইকনমিক সার্ভিস, (পরে—ডিপার্টমেণ্ট অব ইকনমিক্‌স্) হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি | ১। সরকারী কাগজ দর, রেল ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর সম্বন্ধে,<br>২। ব্যাঙ্কের লগ্নী—নিউইয়র্ক ব্যতীত ১৪০টি নগরের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে, দ্রব্যমূল্য ও সমগ্র পাইকারী দর সম্বন্ধে,<br>৩। চারি মাস হইতে ছয় মাসের মেয়াদী সুদ সম্বন্ধে, ৬০ দিন হইতে ৯০ দিনের মেয়াদী সুদ সম্বন্ধে। |

| দেশ | প্রতিষ্ঠানের নাম | যে যে বিষয়ের আভাষ প্রকাশ করা হয় |
|---|---|---|
| আমেরিকা | ব্যাবসন্‌স্ ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অর্গানিজেশন্ ব্যবসনস্ পার্ক ম্যাসাচুসেট্‌স্ | ১। শেয়ার বাজার সম্বন্ধে, শস্য সম্পর্কে ও রেলকোম্পানীর আয় সম্বন্ধে,<br>২। লোক চলাচল, নূতন গৃহ-নির্ম্মাণ, ব্যবসা ফেল, ও ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং ইত্যাদি সম্বন্ধে,<br>৩। সমগ্র পাইকারী দর, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সুদের হার, দেশী সুদের হার সম্বন্ধে। |
| বেলজিয়াম | লুভেন ইউনিভার্সিটি | ১। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দরের সূচক-সংখ্যা,<br>২। সমগ্র পাইকারী দরের সূচক-সংখ্যা,<br>৩। ডিসকাউণ্ট দর, ব্রাসেলস্‌এর ব্যবসা সম্বন্ধে। |
| ফ্রান্স | প্যারিস ইউনিভার্সিটির ইনষ্টিটিউট অব্ ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্ | ১। ধাতু শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার—১০টী শেয়ার সম্বন্ধে,<br>২। কাঁচা মালের সমগ্র পাইকারী দর সম্বন্ধে,<br>৩। নিউইয়র্কের টাকার বাজার সম্বন্ধে। |

| দেশ | প্রতিষ্ঠানের নাম | যে যে বিষয়ের আভাষ প্রকাশ করা হয় |
|---|---|---|
| জার্ম্মাণি | ডক্টর এলসাস | ১। শেয়ার সম্বন্ধে সূচক-সংখ্যা,<br>২। রপ্তানি সম্বন্ধে,<br>৩। অল্প মেয়াদী সুদ সম্বন্ধে। |
| গ্রেট ব্রিটেন | লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ ইকনমিক সার্ভিস | ১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার—২০টি শেয়ার সম্বন্ধে,<br>২। সমগ্র পাইকারী দর (বোর্ড অব ট্রেডের খাদ্য-সামগ্রী ব্যতীত অন্য দ্রব্যের পাইকারী দরের সূচক সম্বন্ধে,<br>৩। অল্প মেয়াদী সুদের হার, দৈনন্দিন সুদের হার ইত্যাদি সম্বন্ধে। |
| ইতালী | তিউরিন ইউনিভার্সিটি | ১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার—২০টি শেয়ার সম্বন্ধে,<br>২। রপ্তানির পাইকারী দর—শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে,<br>৩। নিউইয়র্ক ও লণ্ডন বাজারের টাকার দর সম্বন্ধে। |

| দেশ | প্রতিষ্ঠানের নাম | যে যে বিষয়ের আভাষ প্রকাশ করা হয় |
|---|---|---|
| হোলাণ্ড | ইন্‌ষ্টিটিউট ফর্ ইকনমিক রিসার্চ্চেস্, ওয়ার্‌স | ১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার—৬৪টি শেয়ার সম্বন্ধে, ২। শিল্প দ্রব্যের সমগ্র পাইকারী দর, শিল্প প্রতিষ্ঠানের লোক-নিয়োগ সম্বন্ধে, ৩। প্রাইভেট ডিসকাউণ্ট দর। |
| সুইডেন | বোর্ড অব ট্রেড | ১। শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও জাহাজ কোম্পানীর শেয়ার দরের শতকরা হার সম্বন্ধে, ২। লোক নিয়োগ সম্বন্ধে, ৩। ডিসকাউণ্ট দর।* |

এখন প্রশ্ন হইল, এই প্রকার গবেষণার মূলনীতি কি? কোন্ যুক্তির বলে ব্যবসার হ্রাস-বৃদ্ধির পূর্ব্বাভাষ বা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে অগ্রসর হওয়া যায়? এই সম্বন্ধে কোনো বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ এই মতবাদ প্রচার করেন যে, অর্থনীতি একমাত্র সম্পদ-বিজ্ঞানেই পর্য্যবসিত নহে; অর্থনীতি বরং সঙ্কট-বিজ্ঞান। অর্থনীতির এই ব্যাখ্যার—সম্পদ-বিজ্ঞান হইতে সঙ্কট-বিজ্ঞানে আগমনের—পশ্চাতে রহিয়াছে কতকগুলি সমস্যার সমাবেশ, যাহার উত্তর ও মীমাংসা এই ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। ব্যবসার উন্নতির পর অবনতি, আবার অবনতির পর উন্নতি এরূপভাবে ঘটিয়া আসিতেছে যে, এই পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যে

* ম্যানেজমেণ্ট প্ল্যানিং অ্যাণ্ড কণ্ট্রোল—এ, জি, এইচ ডেণ্ট, পী অ্যাণ্ড কোং, কারবী ষ্ট্রীট, লণ্ডন।

কোন প্রকার সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব আছে কিনা, থাকিলে তাহার সন্ধান লাভ করা যায় কিনা—অর্থনীতির সম্মুখে এইসকল সমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে। ইহাদের মীমাংসা করিতে গিয়া যে সত্যের আভাষ অর্থনীতিবিদগণ পাইয়াছেন তাহাই সঙ্কট-বিজ্ঞানের ভিত্তি।

অর্থনীতির তথ্যে সাধারণ যোগ এবং সামান্য গড়-পড়তা হিসাব (অ্যাভারেজ্) ব্যতীতও উচ্চাঙ্গের গণিত কিরূপে ব্যবহার করা যায় গত দুই এক যুগ হইতে সে চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। এই চেষ্টা যতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহাতেই অত্যাশ্চর্য্য এবং চমকপ্রদ ফল প্রদান করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে বহুকাল হইতে ধারাবাহিকভাবে সকল রকম ব্যবসার তথ্য রক্ষা করা হইয়া থাকে। সেই তথ্যগুলি সংগ্রহ ও একত্রিত করিয়া উচ্চাঙ্গের গণিত শাস্ত্রের সহায়তায় একটি সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, ব্যবসার হ্রাস-বৃদ্ধি, সুযোগ-দুর্য্যোগ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল।

অর্থশাস্ত্রী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বাঙ্গলা ভাষায় সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম এ সংবাদটী লিপিবদ্ধ করেন, * যথা :—

"আজকালকার পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন 'ক্রাইসিস' বা আথিক দুর্য্যোগ-তত্ত্ব। ধূমকেতুর মতন কয়েক বৎসর পর পর সংসারে এই দুর্য্যোগ দেখা দিয়া থাকে। এই আর্থিক ধূমকেতুর আকার-প্রকার বিশ্লেষণ করা, আর সম্ভব হইলে সেটাকে পাকড়াও করিয়া ঘাড় মটকাইয়া দেওয়া হইতেছে এখনকার ধন-চিন্তার এক বড় সমস্যা।

"এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মূল্য-তত্ত্বের আলোচনাও

* 'নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন', দ্বিতীয় ভাগ (১৯৩২) ২৪৭ পৃঃ।

এই দুর্য্যোগ-তত্ত্বের আনুষঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, ধনোৎপাদন, ধন-বিতরণ, মজুরির হার, বাজারের দর,—সব-কিছুই আর্থিক ধূমকেতুর আকার-প্রকার বিশ্লেষণের এ-পীঠ ও-পীঠ বিশেষ। আর সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রানীতি, নোট ছাড়িবার কৌশল, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম এইসব কথাও দুর্য্যোগ-তত্ত্বের বড় কথা। কারেন্সী আর ব্যাঙ্কিং স্বাধীন ভাবেও আজকাল খুব বেশী আলোচিত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'ক্রাইসিস'-তত্ত্বের সঙ্গে এই টাকা-কড়ি তত্ত্বের যোগাযোগ আজকাল বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

"মোটের উপর ক্রাইসিস-বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বকে নবীন ধন-বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড বলিতে পারি। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার জন্য আমেরিকায় আর জার্ম্মাণিতে স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম হইয়াছে।" কেবল আমেরিকা ও জার্ম্মাণি কেন অধুনা অন্যান্য দেশেও এরূপ পরিষৎ যে রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ব্যবসার হ্রাস-বৃদ্ধি কেন হয়, এ প্রশ্ন এত বিস্তৃত যে, সে সম্বন্ধে আলোচনার শেষ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কেন'র উত্তর জটিলও কম নহে, বহু বিতণ্ডাপূর্ণও বটে। এ প্রশ্ন হইতে সহজ ও সরল মীমাংসার পথ সুগম হইলে অবশ্য এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে। যে ক্ষেত্রে সে মীমাংসা সুদূরপরাহত রহিয়া যায় সেক্ষেত্রে কেন'র প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া অন্য কোনভাবে হ্রাসবৃদ্ধির আলোচনা করা চলে কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বিশেষ আপত্তির কারণ না থাকাই সম্ভব। বিশেষ কোন ব্যবসার হ্রাসবৃদ্ধি বিচার করিতে হইলে একটি বা কয়েকটি মূল কারণ লইয়া অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে আপত্তির বিষয় তেমন থাকিতে পারে না। সে ক্ষেত্রেও সরলতার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নিরূপণের অত্যধিক মার-প্যাঁচে বিষয়টীর জটিলতা বৃদ্ধির যথেষ্ট আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

ব্যবসার হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করিলে একটি বিষয় পরিষ্কার দেখা যায় যে, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রধানতঃ ঘটে তরঙ্গপ্রবাহের মত। তরঙ্গের উত্থান-পতন আর ব্যবসার হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য অনেক স্থলেই পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। সে সম্বন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। এইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধির তরঙ্গের আকৃতি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে কিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়?

জলরাশির তরঙ্গ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক তরঙ্গই এক প্রকার নহে। সমগ্র তরঙ্গ-শ্রেণীর মিলিত নৃত্য হইতে একটি দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। ব্যবসা-তরঙ্গের শ্রেণীতেও একই প্রকার ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। ব্যবসা-তরঙ্গেও একটি তরঙ্গ প্রতিবেশী অপর একটি তরঙ্গের অনুরূপ নহে। সমগ্র তরঙ্গ-শ্রেণীর নৃত্য হইতে একটি দৃশ্য কেবল প্রকটিত হয়। বিভিন্ন ব্যবসার তরঙ্গ-শ্রেণীর রূপ বিভিন্ন। এরূপ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তরঙ্গগুলি যে কি এক কৌশলে পরস্পর একত্রে নৃত্যশীল তাহা আপাতদৃষ্টিতেও প্রতীয়মান হয়। এই কৌশলের আরও গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার স্পৃহা জাগিলে গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। পদার্থবিদ্যায় পৃথিবীর চুম্বক-শক্তি ও জ্যোতির্বিদ্যায় সৌর কলঙ্কের রীতিনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান-পদ্ধতির আবিষ্কার করেন আর্থার সুষ্টার*। সম্ভবতঃ তিনিই তরঙ্গ-শ্রেণীর নৃত্য-ভঙ্গী সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধানের সূত্রপাত করেন। কি শব্দ-তরঙ্গ, কি আলোক-তরঙ্গ, কি ব্যবসা-তরঙ্গ যে কোনরূপ তরঙ্গ-ভঙ্গীর নৃত্যকৌশলের অনুসন্ধান-পদ্ধতি উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত এবং উন্নত হইয়া চলিয়াছে †।

---

* অন দি ইন্‌ভেস্‌টিগেশন্ অব্ হিডেন্ পিরিয়ডিসিটি, আর্থার সুষ্টার; টেরেষ্ট্রিয়াল্ ম্যাগনেটিজম্, ভলিয়ুম ৩; ১৮৯৮।

অন্ দি পিরিয়ডিসিটি অব্ সান্‌স্পট্‌স্—আর্থার সুষ্টার, ফিলসফিক্যাল ট্রানজাক্‌শন্‌স্ সিরিজ এ, ভলিয়ুম ২০৬; ১৯০৬; পৃ ৭৬

† পিরিয়ডোগ্রাম্ অব্ ম্যাগনেটিক্ ডেক্লিনেশন্ অ্যাজ্ অবটেনড্ ফ্রম্ দি রেকর্ডস্

পদার্থবিদ্ আর পদার্থকে কঠোর এবং একমাত্র পদার্থতে পর্য্যবসিত দেখেন না। তাঁহার নিকট পদার্থ এখন তরঙ্গ-শ্রেণীর সমষ্টিমাত্র। ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসাকে একটি তরঙ্গের বাহ্য প্রকাশ বলিয়া বিবেচনা করা অযৌক্তিক হইবে কি?

প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গীর পশ্চাতে যে অদৃশ্য শক্তি ক্রিয়াশীল সে শক্তির রূপ কেমন তাহা নির্ণয় করা যায় কি না—এ সমস্যা বিজ্ঞানের প্রচেষ্টাকে এখনও পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে। সে শক্তির পরিচয় না হয় না-ই বা পাওয়া গেল, সে শক্তির প্রকাশ যাহা তরঙ্গে প্রকটিত, সে প্রকাশের ধর্ম্মাধর্ম্ম গুণাগুণ জানিয়া চলিলেও মানব-সমাজের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা চলে। ব্যবসা-ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের তরঙ্গ-প্রকৃতি হইতে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে, কিম্বা সে সম্বন্ধে আভাষ লাভ করিতে পারিলে কল্যাণ কি কম হইবে?

দ্রব্যমূল্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যদি সম্যকভাবে বহুপূর্ব্বে জানা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় তাহা হইলে ফল কিরূপ দাঁড়াইবে জিজ্ঞাসা করা যায়। সকলেই সেরূপ জানিতে পারিলে দ্রব্যমূল্যের তারতম্য হয়ত ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে। দ্রব্যমূল্যের

---

অব্ দি গ্রীনিচ অবজারভেটরি ডিউরিং দি ইয়ারস্ ১৮৭১-১৮৯৫—ট্রানজাকশনস্ অব দি ক্যামব্রিজ ফিলসফিক্যাল্ সোসাইটি, ভলিয়ুম ১৮; ১৯০০; পৃঃ ১০৭।

জেনারেটিং ইকনমিক সাইকল্স্—এইচ, এল্, মুর; নিউইয়র্ক; ১৯২৩।

হোয়াই ডু উই সাম্‌টাইমস্ গেট্ ননসেন্স কোরিলেশন্ বিটুইন্ টাইম্ সিরিজ; জি, ইউ, ইয়ুল; জার্ণাল্ অব রয়াল ষ্ট্যাটিসটিক্যাল্ সোসাইটি, ভলিয়ুম ৮৯; ১৯২৬; ডাব্লিউ, সি, মিচেলের মুখবন্ধ; ডাব্লিউ এল্, থর্পের বিজনেস্ অ্যানালস্ (নিউইয়র্ক, ১৯২৬) গ্রন্থে দি সামেশন্ অব্ র‍্যানডম্ কজেস্ অ্যাজ্ দি সোর্স অব্ সাইক্লিক্ প্রসেসেস—অয়জেন্ স্লুটজ্‌কি, কনজেকচার ইনষ্টিটিউট; ১৯২৭ (ইংরেজী অনুবাদ ইকনমেট্রিকা, কলরাডো, এপ্রিল ১৯৩৭)।

তারতম্য বিদূরিত হইলে মানব-সমাজে একপ্রকার শান্তভাব বিরাজ করিবে সন্দেহ নাই। এরূপ শান্তি যে কাম্য তাহা অস্বীকার করা চলে কি? চিন্তাধারা এরূপ খাদে প্রবাহিত হইলে ব্যবসার হ্রাসবৃদ্ধির পূর্ব্বাভাষ নিরূপণ করিবার প্রয়াসের সার্থকতা দেখা যায়।

# সম্পাদকীয় মন্তব্য

## শ্রীবাণেশ্বর দাস

১৯৩১ হইতে ১৯৩৩ সনের ভিতর প্রত্যেক গবেষক বহুসংখ্যক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেকের রচনার বিষয়-বস্তু নানাবিধ। অধিকন্তু ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি, আমেরিকা, জাপান এবং এশিয়ার অন্যান্য জনপদ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের আর্থিক প্রগতি এবং আইন-কানুন সম্বন্ধে গবেষকগণের বহুসংখ্যক রচনা আছে। কোনো-কোনো গবেষকের সকলপ্রকার রচনা সংগ্রহ করিলে তিন-চারি শত পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারে।

এই সঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, ১৯৩২ সনে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত প্রণীত "ধনবিজ্ঞানে সাক্রেতি" (৩৩০ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩০-৩২ সনে তাঁহার বহুসংখ্যক অর্থনৈতিক রচনা "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক রামকৃষ্ণ মিশনের ইংরেজি মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সমুদয় পরে ১৯৩৪ সনে "কন্‌ফ্লিক্‌টিং টেন্‌ডেন্সীজ ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক থট্" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে (কলিকাতা, ২৩৪ পৃষ্ঠা)।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস" "আর্থিক উন্নতি"তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। এখনও প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে প্রণীত রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইতেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা চলিতেছে।

সুতরাং একমাত্র বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী হইতে গবেষকগণের অর্থনৈতিক চিন্তার পরিধি ও প্রণালী বুঝিতে পারা যাইবে না।

# নির্ঘণ্ট

# নির্ঘণ্ট

# বাংলায় ধনবিজ্ঞান
## দ্বিতীয় ভাগ

# Banglay Dhana-Vijnan

( Economics in Bengali )

Vol. II.

( 1931-1933 )

By Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar and others

600 pages. Price Rs. 3/-

This Bengali book is the second volume of *Banglay Dhana-Vijnan* (Economics in Bengali) and contains the papers discussed at the *Bangiya Dhana-Vijnan Parishat* (Bengali Institute of Economics) as well as some of the papers published in the *Parishat's* monthly journal, *Arthik Unnati* (Economic Progress). The period covered is 1931 to 1933. The President of the B.I.E. is Dr. Narendra Nath Law, and the Hony. Director of Researches Prof. Benoy Sarkar, who is also the editor of *A. U.*

Contents

The Emancipation of Economic Science : By Professor Dr. Benoy Kumar Sarkar, M.A., (Cal.), *Vidya-Vaibhava* (Benares), *Docteur en géographie honoris causa* (Teheran), Cavalier of the Crown of Italy, Decoration of the German Academy, Hony.

Director of Researches, Bengali Institute of Economics and Editor *Arthik Unnati*.

The Principles of Reserve Banks : By Benoy Sarkar

Indian Railways in the Railway-World : ,, ,,

Rationalization in Economic India : ,, ,,

The Birth, Death and Growth-Rates of the Nations : ... ... ,, ,,

The Tariff Theory of the Ottawa Agreement ,, ,,

The World-Economic Depression : ,, ,,

Labour-India and World-Economy : ,, ,,

Control over Foreign Insurance Companies : ,, ,,

Bengali Banks : ,, ,,

Seven Years of *Arthik Unnati* : ,, ,,

The Eighteen-penny Rupee : ,, ,,

Editorial Observations : By Professor Banesvar Dass, B. S. Ch. E. (Illinois, U. S.A.), Chemical Engineer, College of Engineering and Technology, Jadabpur, Calcutta, Hony. Adviser to the Research Fellows, Bengali Institute of Economics.

Carefulness in the Selection of Banks : By Rabi Ghosh, M.A. (Com.), B.L., Hony. Research Fellow, B.I.E., Author of *Takakadi* (Money).

The Items of Expenditure in Public Finance : By Narendra Nath Ray B.A., F.R. Econ. S. (London), Hony. Research Fellow, B. I. E., Author of *Takar Katha* (On Money).

The Material Wants of Man : By Sudha Kanta De, M. A., B. L., Hony. Research Fellow, B. I. E., Translator of Ricardo's *Principles of Economics and Taxation*.

Jessore and the Mofussil of Bengal : By Shib Chandra Dutt, M.A., B.L., Hony. Research Fellow, B.I.E.,

Author of *Dhana-Vijnane Sakreti* (Apprenticeship in Economics) and *Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought.*

Safeguarding Provincial Interests: By Dr. Narendra Nath Law, M.A., B.L., P.R.S., Ph.D., Director *Arthik Unnati.*

Unemployment Insurance: By Advocate Pankaj Kumar Mukherjee, M. A., B. L., Secretary, "International Bengal" Institute, Author of *Labour Legislation in British India.*

The Economic Anthropology of Villages in Radha (West Bengal): By Haridas Palit, *Vidyavinod* (Murshidabad), Associate, Bengali Institute of Sociology.

War-Reparations and War-Debts: By Sudhis Ranjan Biswas, M.A., Hony. Research Fellow, B.I.E.

Labour and Wages in India: By Kamakhya Charan Bose, M. A., B. L., Hony. Research Fellow, B. I. E.

The Economic Condition of Middle Class Bengali Women: By Mrs. Sushama Sen-Gupta, M.A., Ballygunge Girls' School.

Visiting Navadvip: By Advocate Pankaj Kumar Mukherjee, M.A., B.L., Secretary, "International Bengal" Institute.

Evening Party given by Professor Banesvar Dass, B. S. Ch. E. (Illinois) at his residence, 22 South End Park, Ballygunge, Calcutta.

Insurance Business in Soviet Russia: By Moni Moulik, B. A., F. R. Econ. S. (London), Editor, *Insurance and Finance Review*, Hony. Research Fellow, B.I.E.

India's Contributions to World-Trade: By Sudha

# Arthik Unnati

(ECONOMIC PROGRESS)

Established April, 1926

A monthly journal, in Bengali, on economics (theoretical and applied), the applications of industrial researches and scientific inventions for social welfare and material progress.

The object of the journal is to function as an organ of banking, foreign trade, money market, insurance, industrialization, agricultural enterprises, railway and shipping economics, public finance, economic legislation, national health, technical education, rural reorganization, municipal administration and other civic interests.

**Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar** *Vidya-vaibhava,* Cavalier of the Crown of Italy, Decoration of the German Academy.

**Section 1.** deals with the *wealth of Bengal,* profession by profession. The data are furnished by the weekly journals published in the districts. The standard of life prevailing among cultivators, artisans, fishermen, boatmen, leather-workers, weavers, shop-keepers, merchants, land-owners, exporters, importers, industrial workers, sailors, clerks, directors and founders of modern industries, banks and other business establishments—all classes of the Bengali population,—is the main theme of these statistical and objective investigations.

**Section 2.** deals with the agricultural, manufactur-

ing and commercial activities of India (excluding Bengal, but including the Indian states).

**Section 3.** deals with the *economic developments of the world.* It seeks to interpret the movements in foreign finance, industries and commerce to the Indian businessmen and economists. India's opportunities for co-operation with foreigners in all spheres of international trade and investment constitute likewise a special subject of study. The facts of world-economy involving, as they do, the intimate inter-dependence of India and the other countries in regard to economic functions and material welfare are placed before the readers in the form of a regular news-service.

**Section 4.** deals with the movements and pronouncements of the world's prominent bankers, captains of industry, engineers, chemists, experts in technical, commercial and agricultural education, statisticians, economists, finance-ministers and so forth. The *programmes of learned societies,* businessmen's associations and bankers' institutes etc. fall within this section.

**Section 5.** is given over to *interviews* with specialists on problems of applied economics and economic thought.

In all these sections *Arthik Unnati,* although a monthly, intends to acquire the dynamic character of a weekly or even a daily newspaper.

**Special Features:**

1. A tabular statement of the contents (with occasional synopsis) of the economic, financial, export-

import, statistical and allied journals in the Indian and foreign languages including *French, German, Italian,* and whenever possible, *Russian, Japanese* and *Turkish.*

2. Review of books.

3. A serial announcement of Indian and foreign books on economics, banking, commerce, technical education and all other branches of material and social welfare.

*N.B.* About *fifty per cent* of the monthly devotes itself to essays and discussions of permanant value bearing on the methods and problems of the economic sciences. Bengali translations or summaries of the views and theories of foreign economists of the present or preceding generations form a marked characteristic of this journal.

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

*Office : 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.*

**Director**

Dr. Narendra Nath Law, M. A., B. L., Ph. D., Managing Director, Bangeswari Cotton Mills Ltd., Director Reserve Bank of India, Eastern Circle, President, Bengal National Chamber of Commerce, President, *Bangiya Dhana-Vijnan Parishat* (Bengali Institute of Economics).

# একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

অধ্যাপক বিনয় সরকার

(Sarkar's *Wealth and Economics of Our Own Times*, 2 vols.)

প্রথম ভাগ,—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০ ।

দ্বিতীয় ভাগ,—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭১০ পৃষ্ঠা ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪৲ ।

# বিনয় সরকারের বঙ্গদর্শন

১। **যুবক বঙ্গের জীবন-প্রভাত** (১৯০৬-১৯১৪) (যন্ত্রস্থ)

প্রথম ভাগ,—সাধনা, ৫০০ পৃষ্ঠা ।

দ্বিতীয় ভাগ,—শিক্ষাবিজ্ঞান, ৫০০ পৃষ্ঠা ।

২। **নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন** (১৯২৬-১৯৩২)

প্রথম ভাগ :—তত্ত্বাংশ ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২॥০ ।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল, ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ ।

৩। **বাড়্‌তির পথে বাঙালী** (১৯৩৪), ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি, মূল্য ৩॥০ ।

# বিনয় সরকারের বাংলা বই

১। **স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি** ( জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা ), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ ।

২। **ধনদৌলতের রূপান্তর** ( ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা ), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷০।

৩। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** ( জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা ), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

৪। **হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন**, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

---

## "বর্ত্তমান জগৎ"—গ্রন্থাবলী

অধ্যাপক বিনয় সরকার

( বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ )

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃষ্ঠা, ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ২৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ৭০৭ পৃষ্ঠা, ৯৪টা ছবি, মূল্য ৬৲।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৷৵০।

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১৷৷০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲।

---

## দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক

## (Desh-Bidesher Bank)

### Banking in India and Abroad

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল

৩০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৵০।

# টাকাকড়ি

## (Taka-Kadi) Money

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি এল্

পৃষ্ঠা ২২০, মূল্য ১৷৹

"বঙ্গশ্রী" বলেন—

"..."রবি বাবুর পুস্তকখানি নিরপেক্ষতার সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লেখা। কোন মতবাদকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। বইটী এমনভাবে লেখা যে, বি-এ ক্লাসের ইকনমিক্সের ছাত্রেরা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে; কিন্তু তাহা বলিয়া বইখানি শুধুই টেক্স্ট বুক নয়"..."

**Amrita Bazar Patrika** (Calcutta):

'...The author's aim has been to give the readers a clear idea of the theories of Currency and to say the least he has been more than successful....The book reveals its author's dispassionate and scientific outlook. The book is very up-to-date. Such terms as Purchasing Power Parity, Exchange Control, Quota System etc. have been adequately explained with appropriate equivalents. The book will have an important place in the economic literature of Bengal."

# বাংলায় ধনবিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

## (Banglay Dhana-Vijnan Vol. I)

৭৫০ পৃষ্ঠা, ছয়খানা ছবি, মূল্য ৪৷৹

**লেখকগণের নাম:**—অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার, লেডী অবলা বসু, রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল

রায়, ইন্দ্রকুমার চৌধুরী, জগজ্জ্যোতি পাল, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ( মেম্বার, লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লি ), সুধাকান্ত দে, নরেন্দ্রনাথ রায়, তাহেরউদ্দিন আহম্মদ, জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্রনাথ অধিকারী, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, সুষমা সেনগুপ্তা, মন্মথনাথ সরকার, অ্যাডভোকেট ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ও রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস।

**Advance** (Calcutta) :—A pioneering work * * * an excellent instance of the efforts that are being made to rationalize the study of economics through the medium of Bengali.

সোনার বাংলা ( ঢাকা )—"পুস্তকখানিতে দেশের আর্থিক দুর্গতি ও তাহার প্রতীকার, শিল্পবাণিজ্যের ভবিষ্যৎ, রেলওয়ে, কয়লার খনি, ব্যাঙ্ক, সমবায়-নীতি ইত্যাদিতে জাতীয় সম্পদ্ কিভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং পরস্পরের সহযোগিতায় বেকার সমস্যা সমাধান করিয়া আর্থিক প্রগতিকে কিরূপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় তাহা খুবই সহজ ও সরলভাষায় বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ধনবিজ্ঞানের কতকগুলি ইংরেজি শব্দের পরিভাষাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

# টাকার কথা

## (Money)

নরেন্দ্রনাথ রায় তত্ত্বনিধি, বি,এ

মূল্য—১৲

# ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা

## (Economic Terminology)

নরেন্দ্রনাথ রায়  মূল্য ।/০

# ধনবিজ্ঞানে সাকরেতি

## (Dhana Vijnane Sakreti)

Apprenticeship in Economics

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল্ প্রণীত

৩৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲

**Prabuddha Bharata** (Ramakrishna Mission) :—"Mr. Dutt has got the art of making the dry bones of economics instinct with life and his book is an interesting reading throughout."

# সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র

## (Samaj-Chintay Bankim Chandra)

Bankim Chatterji in Social Thought

অধ্যাপক সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল, এম-এ, প্রেসিডেন্সী গার্ল'স্ কলেজ, কলিকাতা, সহযোগী সম্পাদক, "সমাজ-বিজ্ঞান", গবেষক, বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষৎ, ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ ।

# LABOUR LEGISLATION IN BRITISH INDIA

by

Advocate Pankaj Kumar Mukherjee, M.A., B.L.
Lecturer in Economics, Sir John Anderson Health School, Calcutta, Secretary, "*Antarjatik Banga*" *Parishat* ("International Bengal" Institute).

Pages 242. Price Rs. 3/- only.

**Allgemeines Statistisches Archiv** (Jena):

"The author has rendered excellent service to the scholars such as would like to get instructed in the labour and wage conditions of India as well as of other extra-European countries, because data on the labour conditions of Egypt, Japan and China have also been furnished in this work. We have here a complete picture based on legal and statistical documents."

**Amrita Bazar Patrika** (Calcutta): "To undertake to put within the compass of some 240 pages all that is knowable and ought to be known about Indian labour is surely an ambitious task, but it redounds to the credit of the author that he has performed it very well. He has not only produced all relevant statistics but also the views on the subject of the various master-thinkers of the West beginning with Karl Marx and Herbert Spencer to Bertrand Russell. The work would indeed rank as an encyclopaedia on Indian Labour, presenting as it does information on all aspects of labour including welfare, education, wages, hours, and limitations, perils and pitfalls of the workers, duties of factory owners, and on French, German, Swedish and other Western industrial codes."

**Prof. F. Zahn,** President of the Bavarian Bureau of Statistics, Munich: "It furnishes plenty of data and characteristic details such as are almost unknown to the European readers. The method of presentation as well as the numerous suggestions for reform made by the author indicate a deep understanding and a warm heart in regard to the needs of the working classes of his fatherland."

**Prof. E. R. A. Seligman,** Columbia University, New York: "Most informing and well done."

**Prof. C. Gini** (Rome): "Sufficient to appreciate its interest and usefulness."

**Hon. Mr. Justice R. C. Mitter** (Calcutta): "The book gives a fair idea of the problems relative to labour and covers a good part of the field. Your summary of labour legislation in India is a good one and your comments thereon in some places of your book, where you point out defects and gaps, would, I hope, receive due attention in the legislatures.

The short annotations on the Workmen's Compensation Act would, I hope, meet the cases which usually come up for consideration."

## La Politica Finanziaria Britannica in India

(British Financial Policy in India)

By Dr. Moni Moulik, D. Sc. Pol. (Rome), Hony. Research Fellow, Bengali Institute of Economics, Secretary, *Bangiya Dante Sabha* (Bengali Dante Society).

Demy 254 Pages. Bologna. Price Rs. 5.

**Indian Journal of Economics** (Allahabad): "Dr. Moulik's work has made good use of Government publications and newspaper cuttings. He has tried to be objective in regard to his sources of information, utilizing the different schools of interpretation without bias. The several dozen works quoted by the author exhibit his scientific catholicity and open-mindedness. The work does credit to the Economic Seminar of Professor De Stefani under whose directions it was planned and executed. Italian economists can take Moulik as a dependable guide on Indian economic developments and economic thought. As a keen economic researcher and as a perspicuous writer on economic topics Moulik deserves appreciation. Besides, he has rendered an important service to Indian economists in general by introducing their contributions and methods of analysis to the milieu of Italian economists and statesmen."

The work has been published in Italy by Nicola Zanichelli Editore of Bologna in 1938.

## Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought

By Shib Chandra Dutt, M.A., B.L.

Royal 8vo. Pages 234, Price Rupees Five.

**The Economic Journal** (London): "Mr. Dutt has provided his readers with a very useful bibliography of the increasing number of books and journals dealing with economic questions which are being published

by Indian writers since the close of the nineteenth century * * * also illustrates how in the last decade or so, banking and currency problems have largely (and quite rightly) engaged the attention of Indian economists. Its main thesis is to present to the reader a summary of the contrasted economic ideas and ideals of Mahatma Gandhi and Professor Sarkar. As Mr. Dutt acknowledges, the Mahatma does not profess to be an economist, but he has undoubtedly influenced the economic conceptions of his numerous followers. Though Mr. Dutt is obviously in sympathy with the modernist views of Professor Sarkar he has, so far as we can judge, furnished a fair presentation of the doctrines enunciated by Mahatma Gandhi."

**Weltwirtschaftliches Archiv** (Jena): "The bibliographical portion deals with the period of thirty-five years from the publication of Ranade's *Essays in Indian Economics* in 1898. We understand from Dutt that Indian economics is less the science of the distribution of wealth than the science of the combating of poverty."

**Prof. Charles Rist,** University of Paris: 'I have read it with the greatest interest and am getting a notice published in the *Revue d' Economie Politique*."

**Prof. P. T. Homan** (Cornell, U.S.A.): Author of *Modern Economic Thought*: "I was especially glad to see an extended treatment of Sarkar's writings. I was of course aware of the tendencies you analyze but had never before run on to any clear statement and contrast of them."

**Prof. A. P. Usher** (Harvard University, U.S.A.): "I have read your book *Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought* with great pleasure and profit. Although I had read some of Sarkar's writings, unfamiliarity with the Indian problem in its entirety left me with a very imperfect appreciation of their significance. Your essay is thus especially important. It should contribute much to the understanding of Indian problems outside India. It is to be hoped that it will also clarify the issues before the Indian public."

**Prof. Henri See** (Paris): "It is a very interesting volume. I have experienced great pleasure in reading it and derived much profit also. I am reviewing it in the *Revue Historique*."

**Nankai Social and Economic Quarterly**, Tientsin (China): "Affords highly illuminating comparative lessons for students of oriental economics, particularly in China, where the need for industrialization has lately become a common and universal cry."

## Works By Benoy Sarkar

**Economic Development:** Studies in Applied Economics and World-Economy. By Prof. Dr. Benoy Sarkar, M.A., Vidyavaibhava (Benares), Dr. Geog. h. c. (Teheran).

Vol. I. *Post-War World-Movements in Commerce, Economic Legislation, Industrialism and Technical Education* (2nd edition). Demy 8vo 464 pages. Rs. 8.

Vol. II. *Comparative Industrialism and its Equations* with special reference to Economic India (2nd edition), Demy 8vo 320 pages. 9 charts. Rs. 6.

**Comparative Birth, Death and Growth Rates:** A Study of the Nine Indian Provinces in the Background of Eur-American and Japanese Vital Statistics. Nine Charts. Rupee one.

**The Politics of Boundaries and Tendencies in International Relations:** By Prof. Benoy Sarkar.

Vol. I. *Analysis of Post-War World Forces* (2nd edition), Double Crown 340 pages. Rs. 2-8-0.

**Greetings to Young India:** Messages of Cultural and Social Reconstruction. By Prof. Benoy Sarkar. Part I. (2nd edition), Double Crown 190 pp. Re. 1/-

**The Political Philosophies Since 1905:** By Prof. Benoy Sarkar.

Vol. I. *The Expansion of Democracy, Socialism and Asian Freedom (1905-1928)* Double Crown 440 pages. Rs. 4.

Vo. II. *The Epoch of Neo-Democracy and Neo-Socialism* (1929-1939). Double Crown 600 pages.

**The Sociology of Population** with special reference to optimum, standard of living and progress: A study in societal relativities. By Prof. Benoy Sarkar. Royal 8vo. 150 pages. Six charts. Rs. 3.

**Social Insurance Legislation and Statistics:** A study in the labour-economics and business organization of neo-capitalism. By Prof. Benoy Sarkar. Demy 8vo. 460 pages. 9 charts. 2 portraits. Rs. 8.

**Imperial Preference vis-a-vis World-Economy** in relation to the international trade and national

economy of India. By Prof. Benoy Sarkar. Royal 8vo. 170 pages. 15 charts. Rs. 5.

**Indian Currency and Reserve Bank Problems:** By Prof. Benoy Sarkar. 2nd Edition Royal 8vo. 94 pages. 14 charts. Re. 1-8-0.

# The Messages of Dante

By Professor Subodh Krishna Ghoshal, M.A., Presidency Girls' College, Calcutta, Research Fellow, Bengali Institute of Economics, Assistant Editor, *Samaj-Vijnan* (Sociology).

CONTENTS



**Prabuddha Bharata** (Calcutta): "Very interesting and thoughtful in as much as it tries to discover the underlying identities between the deeper foundations of Hindu thought and Dante's spirituality. Dante's message was one of patriotism, nationalism and man-making like that of Swami Vivekananda of our own times."

Double Crown Pages 32. Annas Four.

## Accident Insurance in Comparative Legislation and Statistics

A Pamphlet By Professor Benoy Kumar Sarkar

---

## Hindu Politics in Italian

A Pamphlet By Professor Benoy Kumar Sarkar

## The Methodology of Research Followed by the Bengali Institute of Economics

A Pamphlet By Prof. Shib Chandra Dutt, M.A., B.L.

## Seligman's Theory of Instalment Selling

A Pamphlet By Sudha Kanta De, M.A., B.L.

---

## How To Detect Counterfeit Coins and Forged Notes

A Pamphlet by Narendra Nath Roy.

## Shipping and Railway Policies in Economic Legislation

A Pamphlet By Professor Benoy Kumar Sarkar

## The Law and the Cultivator The Example of France

A Pamphlet By Prof. Benoy Kumar Sarkar

## The Economics and Law of Central Banking

A Study of the Reserve Bank of India

By Professor Sachindra Nath Dutt, M.A.

## The Cotton Tariff—Its Significance

A Pamphlet By Sudha Kanta De, M.A., B.L.

## Colliery Labourers in the Jheria Field

A Pamphlet By Professor Shib Chandra Dutt, M.A.,B.L.

---

## Trusts and Rationalization Aspects of the New Industrial Revolution

A Pamphlet By Professor Benoy Kumar Sarkar

## Bengali Banking in Comparative Bank Statistics

A Pamphlet By Professor Benoy Kumar Sarkar

---

## The Acceptable and the Unacceptable in Bankim's Social Philosophy

A Pamphlet By Profesor Benoy Sarkar

---

## The Economic Aspects of Khaddar

A Pamphlet By Prof. Shib Chandra Dutt, M.A., B.L.

## Herder's Doctrine of the National Soul

A Pamphlet by Prof. Subodh Krishna Ghoshal, M.A.

---

## Social Idealism in Goethe's Lyrics and Dramas

A Pamphlet By Professor Benoy Sarkar

## The New Foundations of French Social Economy

A Pamphlet By Professor Benoy Sarkar

## The Agricultural, Industrial and Commercial Banks of America

A Pamphlet By Professor Benoy Sarkar

## Japanese Expansion through Bengali Eyes

A Pamphlet By Professor Benoy Sarkar

---

## The Social Philosophy of Masaryk

A Pamphlet By Professor Benoy Sarkar

# সমাজ-বিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

## (Samaj-Vijnan, Sociology)

Vol. I.

A work in Bengali by Professor Dr. Benoy Kumar Sarkar, President, *Bangiya Samaj-Vijnan Parishat* (Bengali Institute of Sociology) and others. Double Crown 600 pages. Rs. 3/-

The contents of this volume, published in 1938, are derived in the main from the discussions held or papers read at the *Bangiya Samaj-Vijnan Parishat* (established 1937), "*Antarjatik Banga*" *Parishat* ("International Bengal" Institute), estd. 1931 and the Bengali Institute of Economics (Estd., 1928). The Appendix describes the constitution of the Bengali Institute of Sociology.

Part I. deals with the origins and the milieu of the Bengali Institute of Sociology. It contains a paper on "Sociology in Bengal" (1801-1938) by the Founder-President Professor Dr. Benoy Sarkar and a paper entitled "What is Sociology?" by Professor Subodh Krishna Ghoshal, M.A.

Part II. is given over to the analysis of social processes, social relations and social forms. It contains five papers from Professor Sarkar (on poverty, demographic density, religion and society of world-conquest, progress, and crimes and punishments). The other nine papers are as follows: (1) The Varieties of Society and Culture (Haridas Palit), (2) The Indivi-

dual and the Society (Nagendra Nath Chaudhury, M. A., Northwestern University, Chicago), (3) The Sociology of Prisons and Prisoners (Advocate Pankaj Kumar Mukherjee), M.A., B.L. (4) The Scare of Overpopulation (Rabi Ghosh, M.A., B.L.), (5) The Brain of Calcutta (Professor Sachin Dutt, M.A.), (6) The Caste-journals of Bengal (Sushilendu Das-Gupta, B. Sc., B. L.), (7) The Social Aims of the Student Movement (Professor Humayun Kabir, M.A. (Cal), B.A. (Oxon.), M.L.C., Calcutta University), (8) Changes in Vocational Education (Dr. Debendra Chandra Das-Gupta, M.A., Ed. D. California, U.S.A.), (9) Educational Reform and Social Reform (Binod Bihari Chakravarti), Author of Biographical Studies on Lincoln, Garfield, Asutosh etc.

Part III. deals with the history of social thought at home and abroad. It contains ten papers as follows: (1) The Political Ideal of Kautalya's Arthashastra (Dr. Narendra Nath Law), (2) The French Triumvirate in Sociology; Bodin, Montesquieu and Rousseau (Prof. Sachin Dutt), (3) Social Problems in British Education (Dr. D. C. Das-Gupta), (4) Individual Freedom and the Sense of Duty in Kant's Philosophy (Prof. Kabir), (5) Herder, the Prophet of Nationalism (Manmatha Nath Sarkar, M. A.), (6) The Social Values of Ramakrishna's Sayings (Professor Benoy Sarkar), (7) Bankim Chatterji as Sociologist (Professor Subodh Ghoshal), (8) Bengali Society and Educational Revolution in the Swadeshi Epoch 1905-1912 (Professor Banesvar Dass, B.S.Ch.E., Illinois, U.S.A., College of Engineering and Technology, Jadabpur, Calcutta), (9) Giddings's Consciousness of Kind (Advocate

Pankaj Mukherjee), (10) Sociology in French Educational Institutions (Professor Subodh Ghoshal).

The full contents of this volume as well as an account of the Bengali Institute of Sociology have been published in French by Professor A. Ouy in the *Revue Internationale de Sociologie* of Paris for May-June 1939 (pages 300-301).

**Oriental Literary Digest** (Poona):—"In view of the difficulty of rendering alien ideas and terminology of a new subject in the vernacular, one must say that the work has been highly successful. Most of the contributions, even if they sometimes express somewhat sweeping and unconventional views, are well written and deserve the attention of all interested readers. The contents of this interesting and stimulating volume of 25 articles are derived chiefly from the discussions held and papers read at the Vangiya Samaj Vijnan Parishat, Bengali Institute of Economics and similar other institutions of Economics and Politics, started at Calcutta by the untiring energy of Professor Benoy Kumar Sarkar, all of which have a comprehensive and ambitious programme and the members of which are all earnest and honorary workers" (Professor Dr. S. K. De).

**Comrade** (Calcutta): "The volume furnishes evidence of a great deal of study and at times of original thinking and being in Bengali it of course has a high value as a pioneer on which fact the authors are to be sincerely congratulated."

**Hindusthan Standard** (Calcutta): "We think that the time has come when similar institutions should be started for the study of the different sciences through

the medium of the Bengali language. It will be absurd to expect immediate or spectacular results, from the business point of view, from such publications. But the ultimate effect of such works on the life of the nation cannot be exaggerated. We can unhesitatingly recommend the volume under reference to the educated public of Bengal."

**Prabuddha Bharata** (Calcutta): "Topics treated in the book show earnest study and in spite of differences on personal and acquired grounds, the style is popular and the treatment lucid. Professor Sarkar has undoubtedly succeeded in organizing social thinkers, young and old, into something like a corporate body. The step taken in thus organizing the forces of creatively critical thought is bound to stimulate further efforts" (Prof. Priya Ranjan Sen).

**সোনার বাংলা** ( ঢাকা ) :—"বাঙালীকে বাড়তির পথে ঠেলিয়া দিতে বিনয়বাবু যে অনন্যসাধারণ কর্ম্ম এবং গবেষক-গোষ্ঠী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছেন সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ তাহারই একাংশের পরিচয় মাত্র। ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া—বিভিন্ন সাহিত্যিক—সুলেখক—গবেষক সমাজবিজ্ঞান রচনা করিয়াছেন। আমরা আশা করি বাঙালীকে যাঁহারা বিশ্বজগতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন তাঁহারা বাংলার সমাজবিজ্ঞান তথা বাংলার জীবন-গতির সঙ্গে বাংলার হৃদি-স্পন্দনের সঙ্গে সুপরিচিত হইবেন। গ্রন্থের বহুলপ্রচার কামনা করি।"

**জয়শ্রী** ( কলিকাতা ) :—"শিক্ষায়তনের বাইরে যাঁরা বিশ্বের চিন্তাধারা মাতৃভাষায় দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করেছেন, তাঁদের ভিতর অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং তাঁর টোলের সহযোগিগণ

অগ্রণী। বিনয়বাবু ও তাঁর সহকর্ম্মীদের প্রচেষ্টায় অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের গবেষণামূলক চিন্তা বাংলা ভাষা ও জাতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এঁদের মহৎ চেষ্টা যে সফলতার দিকে দিন দিন যাচ্ছে তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী এবং প্রকাশিত গ্রন্থমালা। রচনাগুলি অধিকাংশই সুচিন্তিত তথ্যবহুল ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ভাষা সাধারণের বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানা চিন্তা-সম্ভার ও ভাষা-সম্পদে সমাজবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানে অনুরাগী পাঠকদের নিকট সমাদৃত হবে নিঃসন্দেহ" (শৈলেশ রায়)।

**আজাদ** (কলিকাতা):—"অধ্যাপক সরকার বাংলা ভাষায় এক স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। সমাজ-চিন্তায় মুছলমানদের অবদান সম্বন্ধেও তিনি অনেকগুলি মূল্যবান কথার উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তকখানির দ্বারা বাঙালী পাঠকের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। আমরা পুস্তকখানির বহুলপ্রচার কামনা করি।"

**আনন্দবাজার পত্রিকা** (কলিকাতা):—"এইভাবে বাংলা দেশে সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে আলোচনা ও গবেষণা ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের এই কৃতিত্ব সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক্ বিভিন্ন লেখক এমন নিপুণভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, সমস্ত মিলিয়া পূর্ণাঙ্গ সমাজ-বিজ্ঞান গ্রন্থের ভূমিকা রচিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের এই মূল্যবান্ রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অভাব পূর্ণ করিবে সন্দেহ নাই।"

**শ্রীভারতী** (কলিকাতা):—"এই পুস্তকখানি বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও সদস্যগণের লিখিত প্রবন্ধসমূহে সমৃদ্ধ। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্যে একটি নূতন দান। বিনয়বাবুর 'টোল'গুলিতে অর্থাৎ 'আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ' ও বঙ্গীয়

ধনবিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি পরিষদে আলোচিত প্রবন্ধসমূহ ভাব-গৌরবে সুপুষ্ট। ভাব-সমৃদ্ধির অনুধাবনের সঙ্গে-সঙ্গে অধ্যাপক সরকারের যথাস্থানে আরবী ও ফার্শী শব্দ মেশান বাংলা ভাষাও উপভোগ্য। এরূপ উপাদেয় সারগর্ভ গ্রন্থের প্রচার দেশে যত বেশী হয় ততই দেশের মঙ্গল সাধিত হবে, সন্দেহ নেই" ( অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী )।

**উদ্বোধন** ( কলিকাতা ) :—"এই প্রকার গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে নাই। বাংলায় অথবা বাংলার বাহিরে সমাজ-বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে বাঙালীর দান নাই বলিলেই চলে। ডক্টর সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা ও কৃতিত্বের ফলে যেসকল 'টোল' গঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে এই সকল বিষয়ে যে গবেষণা বা আলোচনা হইতেছে তাহাতে শিক্ষিত বাঙালীর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। এই গ্রন্থের প্রবন্ধলেখক প্রায় সকলেই লেখক হিসাবে সুপরিচিত। ডক্টর সরকারের নাম জানে না এমন বাঙালী নাই,—ভারতবাসীও কম আছে। তাঁহার ইউরোপীয় ভাষায় অসামান্য দখল, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তাঁহার বাগ্মিতা ও লেখনভঙ্গী চমৎকার। তদুপরি তাঁহার মৌলিক ও নির্ভীক চিন্তাশক্তি অপূর্ব্ব। এই সম্বন্ধে আমাদের বা কাহারও কিছু বলিবার নাই, কিন্তু তাঁহার বাংলা আরও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইলে চমৎকার হইত" ( কেশব চক্রবর্ত্তী, এম এ )।

# The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar

Edited by Professor Banesvar Dass, B.S.Ch.E. (Illinois, U.S.A.), College of Engineering and Technology, Jadabpur, Calcutta (National Council of Education Bengal).
with a Foreword by
Dr. Narendra Nath Law.

Contents.

6. The Demographic Studies of Benoy Sarkar By Professor Sachindra Nath Dutt M.A.
7. The Alleged Inferior Races and Classes in Benoy Sarkar's Social Eugenics By Rabindra Nath Ghose M.A. (Com.) B.L.
8, The Seven Creeds of Benoy Sarkar By Mrs. Ida Sarkar *née* Stieler.
9. The National Schools of Benoy Sarkar By Birendra Nath Das-Gupta, B. S. E. E. (Purdue, Lafayette, U.S.A.), Managing Director, Indo-Europa Trading Co., Calcutta, Bombay, Rangoon, London, ete.
10. Sarkarism: The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Man and His Conquests By Professor Subodh Krishna Ghoshal, M.A., Presidency Girls' College, Calcutta.
11. The Research Institutes of Benoy Sarkar By Principal Dr. Rafidin Ahmed, D. D. S. (Iowa, U. S. A.), Calcutta Dental College and Hospital.
12 The Works of Benoy Sarkar By Professor Banesvar Dass, B.S.Ch. E. (Illinois, U. S. A.).

This book contains seven Appendices by Professor Benoy Sarkar, namely,

1. The Equations of Comparative Industrialism and Culture-history.
2. Kant, Vivekananda and Modern Materialism.
3. The Problem of Correlation between Exchange Rates and Exports : An Analysis of Indian Statistics in its bearings on Economic Theory.

4. Economic Planning for Bengal.
5. National Education and the Bengali Nation.
6. Siksha-Sopan or Steps to a University: A Course of Intellectual Culture Adapted to the Requirements of Bengal.
7. The Expansion of Spirituality as a Fact of Industrial Civilization.

Pages 300 Royal Octavo. Price Rs. 5.